দর্শন প্রসঙ্গ

(A Manual of General Philosophy)
in Bengali

ইন্দুভূষণ মজুমদার,
অধ্যক্ষ, জলপাইগুড়ি কলেজ,
মনোবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান ও হিন্দুদর্শন প্রণেতা।

আশুতোষ বুক ষ্টল
বুকসেলার্স ও পাবলিশার্স
৯০ বি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি রোড, কলিঃ—২৬।

প্রকাশক :—
স্বপন কুমার সাহা
১২৮/১, হাজরা রোড
কলিকাতা-২৬

প্রথম সংস্করণ
১৩৬৭ সাল

মেসার্স তারকনাথ প্রেস, ২নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪ হইতে
শ্রীবিমল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

নিবেদন

যখন প্রথম "মনোবিজ্ঞান" রচনা করি তখন ভাবিতে পারি নাই যে, একে B. A. (Pass) দর্শনশাস্ত্রের প্রত্যেক বিষয়েই পুস্তক লিখিতে পারিব। তাহাই হইল। মনোবিজ্ঞানের পরে "নীতিবিজ্ঞান" প্রকাশ করেন ..তাষ বুক ষ্টল এবং "হিন্দুদর্শন" (ন্যায় ও বৈশেষিক) প্রকাশ করেন ..প্ এণ্ড কোম্পানি। তারপরে আজ "দর্শনপ্রসঙ্গ" (General Philosophy ..etaphysics) প্রকাশিত হইল। এই উদ্যোগের মূলে আছে মুখ্যতঃ ছাত্রীগণের উৎসাহ ও অনুরোধ; তাহারা নানাস্থান হইতে আমাকে লিখিয়াছে। তাহাদের বক্তব্য এই যে, B. A. দর্শনশাস্ত্রের তিনটি ..রের মধ্যে দুইটিই যদি বাংলায় লিখিতে পারিলাম, তাহা হইলে তৃতীয়টি .. বাকী থাকে কেন? মূলতঃ তাহাদের জন্য এবং তাহাদের উৎসাহেই পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে। তবে এই প্রসঙ্গে আমার প্রাক্তন ছাত্র এবং ..-প্রকাশক শ্রীশচীন্দ্র নাথ সাহার নাম উল্লেখ না করিলে অন্যায় হইবে। ..ত্য-জগতে যাহাই হউক না কেন, ব্যবসায়-জগতে একখানি দর্শন পুস্তক ..কাশনের দায়িত্ব গ্রহণ করা যে খুবই সাহস বা দুঃসাহসের বিষয়—তাহাতে ..নই সন্দেহ নাই। শচীন্দ্রনাথের এই সাহস এবং উদ্যম না থাকিলে এত ..ড়ে এই পুস্তকখানি প্রকাশিত হইতে পারিত কি না সন্দেহ।

মনোবিজ্ঞান প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছি, আজ দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধেও তাহাই ..তে চাহি। বাঙালী পাঠক সমাজকে অনেকে একটু অবজ্ঞা করিয়া ..ন যে তাহারা শুধু নাটক, উপন্যাস, গল্প এবং কবিতা লইয়া মগ্ন ..ক, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি পুস্তকের প্রতি তাহাদের নাকি তেমন কোন .. নাই। এইরকম অভিযোগ করা আজকাল অনেকটা ফ্যাসন হইয়া ..ইয়াছে; ইহার মধ্যে কতটুকু সত্য আছে; তাহা বলা কঠিন। ..ব আমার অভিজ্ঞতা এই যে, গল্প উপন্যাস পড়িতে সকলেই ভালবাসে .. তবে দর্শন, বিজ্ঞানের প্রতিও বাঙালী পাঠকের আকর্ষণ কম নহে। ..বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলি জানিবার জন্য যেমন তাহাদের আগ্রহ আছে; ..-তত্ত্ব ও অধ্যাত্ম-তত্ত্ব জানিবার আগ্রহও তেমন তাহাদের কম নহে। ..জন্য এই পুস্তকখানি মুখ্যতঃ কলেজের ছাত্রদের জন্য রচিত হইলেও যাহাতে ..রণ পাঠকেরও কাজে লাগে—সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। কারণ ..নিক আলোচনা যে শুধু ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে, তাহা সঙ্গত

নহে ; সাধারণ পাঠকেরাও যাহাতে দার্শনিক আলোচনায় আকৃষ্ট হইতে পারে—সেদিকেও লক্ষ্য রাখা উচিত। ইহাতে এক সমস্যার উদ্ভব হয় ; সাধারণ পাঠকের জন্য শুধু বাংলায় ব্যাখ্যা করিলেই হয় না—কারণ বাংলা ব্যাখ্যাও তো দুরূহ হইতে পারে ; অতএব ব্যাখ্যা যাহাতে সরল এবং প্রাঞ্জল হয়—তাহার জন্যও বিশেষ চেষ্টা করা দরকার। কিন্তু ইহা খুব সহজ নহে। প্রথমতঃ পারিভাষিক শব্দ পরিহার করিয়া দর্শন শাস্ত্রের সূক্ষ্ম ও জটিল তত্ত্বগুলি ব্যাখ্যা করা খুবই কঠিন ; তারপরে উহা সর্বসাধারণের উপযোগী করিয়া তোলা আরও কঠিন। সেইজন্য আমাকে খুবই অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। অভ্যস্ত ব্যক্তির পক্ষে প্রাঞ্জল ইংরাজীতে ব্যাখ্যা করা যেমন সহজ, প্রাঞ্জল বাংলায় ব্যাখ্যা করা তেমন সহজ নহে। তবে এইটুকু বলিতে পারি যে উহার জন্য আমি চেষ্টার কিছুমাত্র ত্রুটি করি নাই। ইহাতে কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি, বা মোটেই কৃতকার্য হইয়াছি কি না—পাঠকেরাই বিবেচনা করিবেন।

দর্শনশাস্ত্রের বিষয়বস্তুগুলি যেরূপভাবে এই গ্রন্থে বিন্যস্ত করা হইয়াছে তাহা অভ্যস্ত ব্যক্তির নিকট কিঞ্চিৎ অসঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে, তাহা আমি স্বীকার করি। সাধারণতঃ প্রত্যেক গ্রন্থকারই জ্ঞান-তত্ত্ব দিয়া তাঁহাদের পুস্তক আরম্ভ করেন, তারপর জড়-তত্ত্ব, প্রাণ-তত্ত্ব, অধ্যাত্ম-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া ভগবৎ-তত্ত্ব দিয়া শেষ করেন। জ্ঞান-তত্ত্বে আরম্ভ, আর ভগবৎ-তত্ত্বে শেষ। এই পুস্তকে আমি ইহার ঠিক বিপরীত পন্থা অবলম্বন করিয়াছি, ভগবৎ-তত্ত্ব দিয়া আরম্ভ করিয়া জ্ঞান-তত্ত্বে শেষ করিয়াছি। ইহার কারণ আছে। জ্ঞান-তত্ত্ব একটু জটিল ; অথচ অন্যান্য তত্ত্ব খুবই চিত্তাকর্ষক। যেমন, ভগবৎ-তত্ত্ব ; ঈশ্বর আছেন কি না, মানুষের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ কি, সংসারে পাপ ও অন্যায়ের জন্য তিনি দায়ী কি না, ইত্যাদি বিষয় জানিবার জন্য কাহার না আগ্রহ হয় ? সেইরূপ, অধ্যাত্ম-তত্ত্ব ; আত্মার সহিত দেহের সম্বন্ধ কি, দেহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও মৃত্যু হয় কি না—ইত্যাদি জানিবার জন্য কে না ইচ্ছা করে ? এই সব বিষয়ের তুলনায় জ্ঞান-তত্ত্বের বিষয়গুলি যে তেমন চিত্তাকর্ষক নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। জ্ঞানের উৎপত্তি হয় কেমন করিয়া, জ্ঞানের সীমারেখা কতদূর, ইত্যাদি বিষয় জানিবার জন্য সাধারণ লোকের বিশেষ কোন আগ্রহ নাই। সেইজন্য জ্ঞান-তত্ত্ব আলোচনা অনেকের নিকটেই খুব শুষ্ক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অথচ এই শুষ্ক আলোচনা লইয়াই সাধারণতঃ দর্শনশাস্ত্রের গ্রন্থ আরম্ভ হয় ; ফলে অনভিজ্ঞ পাঠকের মনে প্রথমেই ভীতির উদ্রেক হয় ; তাহারা মনে করিয়া বসে যে Metaphysics

বুঝি আগাগোড়াই খুব শুষ্ক ও নীরস বিষয়, ইহার মধ্যে কোথাও কোন রস নাই। এই সম্ভাবনা পরিহার করিবার উদ্দেশ্যে আমি জ্ঞান-তত্ত্ব দিয়া আরম্ভ না করিয়া ভগবৎ-তত্ত্ব দিয়া পুস্তক আরম্ভ করিয়াছি। চিত্তাকর্ষক বিষয় সমূহ আলোচনা করিতে করিতে তাহারা যখন দর্শনশাস্ত্রের পদ্ধতি ও বিষয়বস্তুর সহিত কিঞ্চিৎ পরিচিতি লাভ করিবে, তখন জ্ঞান-তত্ত্ব অনুশীলন করা তাহাদের পক্ষে আর বিশেষ অপ্রীতিকর হইবে না বলিয়া আমার বিশ্বাস।

এই পুস্তকখানি রচনা করিবার জন্য আমি অনেক গ্রন্থেরই সাহায্য লইয়াছি, বিনীতভাবে ও সকৃতজ্ঞ চিত্তে প্রথমেই তাহা স্বীকার করি। তবে যে দুইখানি পুস্তকের উপরে আমি বিশেষভাবে নির্ভর করিয়াছি তাহাদের নাম Problems of Philosophy (Cunningham) এবং Problems of Metaphysics (Stephen)। সম্প্রতি প্রকাশিত পুস্তকের মধ্যে অধ্যাপক শিবপদ চক্রবর্তির Introduction to General Philosophy এবং ডাঃ রামচন্দ্র পালের "দর্শন পরিচয়" পড়িয়া বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। আর রচনার সৌকার্য সাধনে প্রভূত সাহায্য পাইয়াছি আনন্দচন্দ্র কলেজের অধ্যাপক ভবানী গোপাল সান্যাল, অমূল্যচন্দ্র মিত্র এবং জীবেন্দ্র বিনোদ সিংহরায়ের নিকট হইতে, বাংলাভাষার এই সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপকগণের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ। আমাদের কলেজের গ্রন্থাগারিক শ্রীপরেশচন্দ্র ভৌমিক এবং বি. এ. ক্লাসের ছাত্রী শ্রীমতী জয়ন্তী সেন পাণ্ডুলিপির প্রেস কপি লিখিতে সাহায্য করিয়া আমার খুবই উপকার করিয়াছে; তাহারা সকলেই আমার ধন্যবাদার্হ।

আনন্দচন্দ্র কলেজ,
জলপাইগুড়ি

ইন্দুভূষণ মজুমদার

পিতৃদেব ও মাতৃদেবীর

শ্রীচরণে।

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড ঃ ভগবৎ-তত্ত্ব

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ অধ্যাত্ম-তত্ত্ব

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

তৃতীয় খণ্ড ঃ প্রাণ-তত্ত্ব

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

চতুর্থ খণ্ড : জড়-তত্ত্ব

দ্বাদশ অধ্যায়

ত্রয়োদশ অধ্যায়

চতুর্দশ অধ্যায়

পঞ্চম খণ্ড : মূল-তত্ত্ব

পঞ্চদশ অধ্যায়

ষোড়শ অধ্যায়

সপ্তদশ অধ্যায়

ষষ্ঠ খণ্ড : জ্ঞান-তত্ত্ব (Epistemology)

অষ্টাদশ অধ্যায়

ঊনবিংশ অধ্যায়

বিংশ অধ্যায়

একবিংশ অধ্যায়

দ্বাবিংশ অধ্যায়

দর্শন প্রসঙ্গ

প্রথম খণ্ড

ভগবৎ-তত্ত্ব

(The Problem of God)

প্রথম অধ্যায়

নিরীশ্বরবাদ

জড়বাদ ও নিরীশ্বরবাদ (Materialism & Atheism)

আজকাল বিজ্ঞানের যুগ ; সহজে কেহ পারমার্থিক জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে চাহে না ; কারণ উহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় নহে। যেমন ধর, জীবাত্মা ও পরমাত্মার কথা। জীবাত্মাকে আমরা কেহ দেখিতে পাই না, পরমাত্মাকে আমরা কেহই স্পর্শ করিতে পারি না, অর্থাৎ কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা ইহাদিগকে প্রত্যক্ষ করিতে পারি না ; সেইজন্য স্বভাবতঃই আমরা ইহাদের অস্তিত্বে সন্দেহ করিয়া থাকি। তবে বলা বাহুল্য, প্রত্যক্ষণই জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায় নহে , প্রত্যক্ষ না করিতে পারিলেও অনুমানের সাহায্যে আমরা অনেক বিষয় অবগত হইয়া থাকি। অতীতে ভারতবর্ষের অবস্থা কেমন ছিল তাহা আজ আমরা কেহই প্রত্যক্ষ করিতে পারি না বটে, কিন্তু বহু শ্রুত ও দৃষ্ট বস্তুর উপর নির্ভর করিয়া আমরা ভারতবর্ষের অতীত গৌরবের কথা অনুমান করিতে পারি। সেইরূপ জীবাত্মা ও পরমাত্মা যদিও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নহে, যদিও আমরা ইহাদিগকে দেখিতে বা স্পর্শ করিতে পারি না, তবুও আমরা বহু সূক্ষ্ম বিচারের সাহায্যে ইহাদের অস্তিত্ব অনুমান করিতে পারি। এইভাবে অনেকেই ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। কিন্তু ন্যায়ের করাত দুই দিকেই কাটে, অনুমানের দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব যেমন প্রমাণ করা যায়, অনুমানের দ্বারা তাহার অস্তিত্ব আবার তেমন অপ্রমাণও করা যায়। জড়বাদিগণ তাহাই করেন।

জড়বাদিগণ বলেন যে এই জগতে ঈশ্বরের কোন স্থান নাই। তাহারা বলেন, ঈশ্বরের প্রয়োজন কি ? এই বিশ্বদুনিয়া সৃষ্টি করিবার জন্য যদি কোন সত্তার প্রয়োজন হইয়া থাকে, তবে আমাদের অণুপরমাণু দোষ করিল কি ?

উহাদের সাহায্যেই আমরা সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে পারি, ভগবানের অস্তিত্ব কল্পনা করিবার কোন প্রয়োজন হয় না। সূর্য-চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্র, নদ-নদী, পর্ব্বত-প্রান্তর সমস্তই জড় পদার্থ; অসংখ্য পরমাণুর সমন্বয়ে ইহারা সংগঠিত হইয়াছে। যাঁহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন তাঁহারা বলেন যে এই সকল পরমাণুর সমন্বয় সাধনের জন্য ঈশ্বরের প্রয়োজন; তিনিই এই সকল পরমাণু নানাভাবে সংযুক্ত করিয়া সূর্য-চন্দ্র গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু জড়বাদিগণ ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না; তাঁহারা বলেন, পরমাণুগুলি আপনাআপনিই সংযুক্ত হইতে পারে; ইহাদের সংযোগ সাধনের জন্য ঈশ্বরের প্রয়োজন নাই। প্রত্যেক পরমাণুর নিজ নিজ গুণ বা ধর্ম আছে; এই অন্তর্নিহিত গুণ বা ধর্ম অনুসারে তাহারা ক্রিয়া করে; পরকীয় পরিচালনার অপেক্ষা রাখে না। ইহাকে প্রাকৃতিক নিয়ম বলে। এইরূপ প্রাকৃতিক নিয়মের বশীভূত হইয়া পরমাণুগুলি অনন্তকাল ধরিয়া দিকেদিকে ছুটিয়া চলিয়াছে, যখন মিলিত হইতেছে তখন পরস্পরের স্বভাব অনুযায়ী তাহারা যৌগিক পদার্থে পরিণত হইতেছে, আর যখন বিচ্ছিন্ন হইতেছে তখন নিজ নিজ অন্তর্নিহিত তেজের প্রভাবেই তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে। বাহির হইতে কেহ উহাদিগকে জোর করিয়া মিলিত করিতেছে না, বা জোর করিয়া ভাঙ্গিয়া দিতেছে না; ইহাদের মিলন ও ভাঙ্গন, গতি ও স্থিতি, স্পন্দন ও উত্তেজন—সবই প্রকৃতির নিয়মে সংঘটিত হইতেছে। এই ভাবেই জগৎ সৃষ্ট হইতেছে; শুধু জড়জগৎ নহে, অধ্যাত্ম জগৎ সৃষ্টির মূলেও রহিয়াছে এই সকল অণুপরমাণুর ক্রিয়া প্রক্রিয়া। অর্থাৎ এই সকল পরমাণু হইতে সূর্য চন্দ্র গ্রহের ন্যায় শুধু যে অচেতন পদার্থই উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা নহে; মন ও আত্মার ন্যায় সচেতন পদার্থেরও উদ্ভব হইতে পারে এবং উদ্ভব হইয়া থাকে। অতএব চেতন ও অচেতন সকল পদার্থেরই মূলে আছে এই সব জড় উপকরণ; ইহারাই নানাভাবে সংগঠিত হইয়া নানাবিধরূপে আবির্ভূত হইতেছে। ইহাকে বিশুদ্ধ জড়বাদ (Materialism) বলে; ইহাতে ঈশ্বরের কোন স্থান নাই।

সমালোচনা

জড়বাদকেই অনেক বৈজ্ঞানিক মতবাদ বলিয়া বর্ণনা করেন। কিন্তু ইহা যতই বৈজ্ঞানিক বলিয়া প্রতীয়মান হউক না কেন, ইহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিতে অনেকেই আজকাল প্রস্তুত নহেন। ইহার প্রধান কয়েকটি ত্রুটির কথা আমরা উল্লেখ করিতেছি। প্রথমতঃ, আমরা জিজ্ঞাসা করি, জড় পরমাণু হইতে জড় পদার্থ উৎপন্ন হইতে পারে বটে, কিন্তু জড় পরমাণু

হইতে অধ্যাত্ম পদার্থ উৎপন্ন হইতে পারে কি? সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি সবই জড পদার্থ; আর আমাদের অণু-পরমাণুও জড় পদার্থ। অতএব এই সকল অণু-পরমাণুর সংযোগে সূর্য চন্দ্র গ্রহ প্রভৃতির উদ্ভব হওয়া যে সম্ভব, তাহা আমরা স্বীকার করি; কিন্তু মন ও আত্মা তো জড় পদার্থ নহে, ইহারা অধ্যাত্ম পদার্থ; ইহাদের সহিত জড় পদার্থের কোন প্রকার সাদৃশ্য নাই। তাহা হইলে জড়পদার্থ হইতে কেমন করিয়া ইহাদের উদ্ভব হইতে পারে? জডবস্তুর স্থান-ব্যাপ্তি আছে, আত্মার কোন স্থান-ব্যাপ্তি নাই; আত্মার সুখ-দুঃখ বোধ আছে, জড় বস্তুর সুখ-দুঃখ বোধ নাই; আত্মার মধ্যে চেতনা আছে, জড়বস্তুর মধ্যে চেতনা নাই; ইহা সম্পূর্ণ অচেতন। এক কথায় চেতন ও অচেতন পদার্থ—ইহারা সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির পদার্থ। তাই বিবর্ত্তনবাদিগণ বলেন যে জড় পরমাণু হইতে জড় পদার্থ উৎপন্ন হইতে পারে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী মন বা চেতনার উদ্ভব হইতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, জডবাদিগণের বিশ্বসৃষ্টির ব্যাখ্যা সম্ভবপর বলিয়া গ্রহণ করা কঠিন। তাঁহারা বলেন, পরমাণু অসংখ্য; অনন্তকাল ধরিয়া ইহারা অসীম বিশ্বে ছুটিয়া চলিয়াছে, কখনও একত্র মিলিত হইতেছে, কখনও বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে, আর কখনও বা বিস্ফোরিত হইয়া প্রলয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি করিতেছে। ইহাদের ক্রিয়া-ফলেই সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র, নদ নদী পর্বত প্রান্তর প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থ আপনা-আপনিই সৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি— একটি সামান্য ঘড়ি যখন আপনা আপনি সৃষ্ট হইতে পারে না, তখন এই সূর্য চন্দ্র গ্রহ তারাই বা আপনা আপনি সৃষ্ট হইবে কেমন করিয়া? ধর, যে সব মাল মশলা দিয়া একটি ঘড়ি নির্মিত হয়, যেমন কাচ, কাঁটা, স্প্রিং, স্টিল প্রভৃতি জিনিষ সবই অনন্ত আকাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহা হইলেই কি ইহারা আপনা-আপনি সংযুক্ত হইয়া একটি সুন্দর ঘড়িতে পরিণত হইতে পারিবে? ঘুরিতে ঘুরিতে কাঁচ আসিয়া কাঁটার সহিত সংযুক্ত হইতে পারে, তাহা আমরা স্বীকার করি, এবং স্টিলও ঘুরিতে ঘুরিতে স্প্রিং-এ পরিণত হইতে পারে, তাহাও আমরা মানিতে রাজী আছি। কিন্তু তাই বলিয়া কি এতগুলি বিভিন্ন জিনিষ এমনভাবে সংযুক্ত হইতে পারে যাহার ফলে একটি সুন্দর ঘড়ি উৎপন্ন হইতে পারে? উহা কি সম্ভব? ঘড়ির বিভিন্ন অংশের মধ্যে যে শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য আছে—উহার উৎপত্তি হইল কেমন করিয়া? এক্ষেত্রে কোথাও কোন কারিগরের প্রয়োজনীয়তা নাই; সবই আকস্মিক ঘটনা প্রবাহে সৃষ্টি হইতেছে—ইহা কি সম্ভবপর ব্যাপার?

ঘড়ির বিভিন্ন অংশের মধ্যে যে শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য লক্ষ্য করি, তাহা অপেক্ষাও অদ্ভুত শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য দেখিতে পাই সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যে।

যে আশ্চর্য শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা সহকারে এইসকল বিশাল গ্রহ উপগ্রহ নিরন্তর আবর্তন করিয়া চলিয়াছে, তাহা ভাবিলে আমরা অবাক্ হইয়া যাই। উহাদের অদ্ভুত শৃঙ্খলা ও পারস্পরিক সামঞ্জস্য আসিল কোথা হইতে? তাই দার্শনিক পণ্ডিত বলেন যে ঘড়ি নির্মাণের জন্য যেমন কারিগরের প্রয়োজন, এই বিশ্বজগৎ নির্মাণের জন্যও তেমন স্রষ্টিকর্তার প্রয়োজন; অর্থাৎ ইহাদের কোনটিও আপনা-আপনি সৃষ্ট হইতে পারে না, প্রত্যেকেরই সৃষ্টির মূলে আছে কোন এক মননশীল কর্তার মানসিক নিয়ন্ত্রণ। আর একটি উদাহরণ দেওয়া যাউক। ইংরাজী ভাষায় A হইতে Z পর্যন্ত ২৬টি অক্ষর আছে, অসংখ্য কার্ডে এই অক্ষরগুলি অসংখ্যবার লিখিয়া আকাশে উড়াইয়া দিলাম। এখন মনে করা যাউক, এই কার্ডগুলি অনন্তকাল ধরিয়া অসীম আকাশে উড়িতে লাগিল এবং নানাস্থানে ইহারা নানাভাবে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইতে লাগিল। কখন A, N, এবং D আসিয়া সংযুক্ত হইল এবং একটি শব্দ সৃষ্টি করিল, যেমন And। এইভাবে বিভিন্ন অক্ষরের আকস্মিক সংযোগে বিভিন্ন শব্দের সৃষ্টি হইতে পারে, তাহা আমরা স্বীকার করি, এমন কি ইংরাজী অভিধানের প্রত্যেকটি শব্দই এইভাবে সৃষ্ট হইতে পারে, তাহাও আমরা মানিতে পারি। কিন্তু তাই বলিয়া কি এইভাবে Paradise Lost-এর ন্যায় একখানি সুচিন্তিত কাব্য রচিত হইতে পারে? মোটেই না; অথচ কাব্যখানি অসংখ্য শব্দের সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে, ইহার প্রত্যেকটি শব্দই অভিধানে পাওয়া যাইবে। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? শব্দগুলির আকস্মিক সমন্বয়ে কাব্য রচিত হইতে পারে না, ইহার জন্য এক মননশীল কবির প্রয়োজন যিনি শব্দগুলি নির্বাচন করিবেন এবং কোন এক সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী উহাদের সমন্বয় সাধন করিবেন। তাই আমরা বলিতে চাই যে, পরমাণুগুলিকে অনন্তদেশে অনন্তকালের জন্য ভাসিয়া বেড়াইতে দিলেই সূর্য চন্দ্রের সৃষ্টি হইতে পারে না। এইসব অদ্ভুত জিনিসগুলি সৃষ্টি করিতে হইলে পরমাণুগুলিকে কোন এক পূর্বনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে পরিচালনা করা দরকার। এইপ্রকার পরিচালনার জন্য কোন এক মননশীল কর্তার প্রয়োজন। তাঁহাকেই সাধারণ ভাষায় ঈশ্বর বলা হয়।

তৃতীয়তঃ, জড়বাদিগণ বলেন যে যাঁহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন তাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পারেন না; শুধু ভাবাবেশে তাঁহারা ঈশ্বরের

অস্তিত্ব মানিয়া লয়েন। ইহা হয়ত ঠিক। কিন্তু জড়বাদিগণই কি সব জিনিষের প্রমাণ দিতে পারেন? তাঁহারাও অনেক তত্ত্ব শুধু মানিয়া লইয়াছেন, কিন্তু প্রমাণ দেন নাই; যেমন তাঁহারা বলেন যে, অনাদিকাল হইতে পরমাণুগুলি বিদ্যমান আছে। কিন্তু ইহার প্রমাণ কি? বোধ হয় প্রমাণ দেওয়া সম্ভব নহে বলিয়াই তাঁহারা এই প্রসঙ্গে কোন আলোচনা উত্থাপন করেন নাই, শুধু মানিয়া লইয়াছেন যে অনাদিকাল হইতে পরমাণুগুলি ক্রিয়া করিতেছে। কিন্তু ইহারা তো অচল জড় পদার্থ; ইহারা ক্রিয়া করে কেমন করিয়া? ইহাদের মধ্যে গতি আসে কোথা হইতে? ইহারা কি করিয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে ছুটিয়া চলে? অতএব শুধু পরমাণু নাই; উহার নিজস্ব চলৎ-শক্তি আছে, তাহাও মানিয়া লইতে হইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে আরও মানিয়া লইতে হইবে যে অনন্তকাল ও অনন্ত দেশ বলিয়া স্বতন্ত্র জিনিষ আছে, নতুবা পরমাণুসমূহ কোথায় ক্রিয়া করিবে এবং কখনই বা ক্রিয়া করিবে? ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, জড়বাদিগণ শুধু পরমাণু তত্ত্বই মানিয়া লয়েন নাই, তৎ-সংশ্লিষ্ট আরও অনেক তত্ত্ব তাহারা মানিয়া লইয়াছেন। এমতাবস্থায় ঈশ্বর-বাদিগণ বলিতে পারেন যে, যদি এতগুলি তত্ত্বই বিনা প্রমাণে মানিয়া লইতে হয়, তবে ঈশ্বর তত্ত্ব মানিয়া লইলে ক্ষতি কি? বরং ইহাতে লাভ এই যে, এক্ষেত্রে আমরা একটিমাত্র তত্ত্বের সাহায্যে জগৎসৃষ্টি ব্যাখ্যা করিতে পারি, জড়বাদিগণের ন্যায় বহু তত্ত্বের সাহায্য লইতে হয় না। যে ক্ষেত্রে একটিমাত্র তত্ত্বের দ্বারাই সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, সেক্ষেত্রে বহু তত্ত্ব স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি?

নিরীশ্বরবাদের যুক্তি (Anti-theistic arguments)

উপরোক্ত সমালোচনার উত্তরে কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে জড়বাদ অগ্রাহ্য করিলেই যে ঈশ্বরবাদ গ্রহণ করিতে হইবে এমন কোন মানে নাই। জড়বাদিগণ যেভাবে বিশ্বসৃষ্টি ব্যাখ্যা করেন, তাহা হয়ত ভুল; কিন্তু তাহা হইলেই কি বলিতে হইবে যে ঈশ্বরবাদিগণ যেভাবে বিশ্বসৃষ্টি ব্যাখ্যা করেন, তাহাই ঠিক? উঁহাদের ব্যাখ্যাও তো ভুল হইতে পারে। নিরীশ্বরবাদিগণ তাহাই বলেন; তাঁহারা বলেন যে নৈসর্গিক জগতে যে সব ত্রুটিবিচ্যুতি আছে এবং নৈতিক জগতে যে সব পাপ ও অন্যায় আছে, সে সব দেখিলে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে আমাদের মন চাহে না। এখন নিরীশ্বরবাদিগণের এই যুক্তির সবিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া যাউক।

নৈসর্গিক জগতে

প্রথমতঃ নৈসর্গিক জগতের দিকে লক্ষ্য করা যাউক। ভূমিকম্প, প্লাবন, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি—এসমস্ত তো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এইসব প্রাকৃতিক দুর্যোগে (Natural Evils) কত অসংখ্য জীবজন্তুর যে কি ভীষণ দুর্গতি হইতেছে তাহা বর্ণনা করা যায় না। তখন স্বভাবতঃই সন্দেহ হয়—দুনিয়ায় কি ঈশ্বর বলিয়া কিছু নাই? সত্যই যদি ঈশ্বর থাকিতেন, তবে তাঁহার পক্ষে এই সকল অমঙ্গল নিরাকরণ করা কি সম্ভব হইত না? অমঙ্গলের যেন শেষ নাই; শুধু তো অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি নহে, জরাব্যাধি, অকাল মৃত্যু প্রভৃতি নৈসর্গিক ঘটনাও কি আমাদের কম অমঙ্গল সাধন করিতেছে? কেবল অকাল মৃত্যুতেই সংসারের যে কত ক্ষতি হইতেছে—তাহা একবার ভাবিয়া দেখ তো। কত অসাধারণ শক্তি-সম্পন্ন মানুষ হটাৎ দুর্ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে; অথচ তাঁহারা দীর্ঘকাল জীবিত থাকিলে সংসারের কত উপকার করিতে পারিতেন। এই সকল অমঙ্গলের কথা চিন্তা করিলে ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে কি?

ইহার উত্তরে আমদের দুইটি কথা বলিবার আছে। (১) আমরা যে দৃষ্টিবিন্দু হইতে বিচার করি তাহা নিতান্তই সংকীর্ণ ও পরিমিত। আমরা কতটুকু দেখিতে পারি বা বুঝিতে পারি? বন্যায় বা ভূমিকম্পে জীবজন্তুর যে খুবই অনিষ্ট হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু উহা আপাততঃ অনিষ্টকর হইলেও ভবিষ্যতে যে মঙ্গলকব নহে, তাহার প্রমাণ কি? সুদূর ভবিষ্যতে উহার ফলাফল কি হইবে—তাহা কি আমরা বর্তমান মুহূর্তে প্রত্যক্ষ করিতে পারি? অথচ এই প্রকার সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিবিন্দু হইতে বিচার না করিতে পারিলে আমাদের সিদ্ধান্ত যে ভুল হইতে পারে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। একটি সামান্য উদাহরণ লওয়া যাউক। তিনশত বৎসর আগে আমাদের ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে সব প্রলয়ঙ্কর ঘটনা ঘটিতেছিল—তদানীন্তন লোকেরা কি তাহার ফলাফল সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিতেছিলেন? বর্তমানের দৃষ্টিবিন্দুতে তখনকার অনেক ঘটনাই আজ আমাদের নিকট বিশেষ তাৎপর্যমূলক এবং মঙ্গলজনক বলিয়া প্রতিভাত হয়; কিন্তু তখনকার লোকেরা কি এইভাবে বিচার করিতে পারিয়াছিলেন? নিশ্চয়ই না; তখন তাঁহাদের নিকট যাহা অমঙ্গলজনক বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল তাহা সত্যই অমঙ্গলজনক বলিয়া তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়া-ছিলেন। কিন্তু উহা তো ঠিক নহে। মোটকথা, আমরা আমাদের ক্ষুদ্র স্বার্থ ও সংকীর্ণ অভিজ্ঞতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চিন্তা করি; কিন্তু ঈশ্বর তো এইভাবে চিন্তা করিতে পারেন না; তাঁহাকে সমগ্র বিশ্বের দিকে চাহিয়া, সকলের মঙ্গলের

কথা চিন্তা করিয়া, এবং ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমানকালের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া কাজ করিতে হয়। সেইজন্য আমাদের ন্যায় নিকটদৃষ্টি লোকের পক্ষে ঈশ্বরের কার্যকলাপ বিচার করা সহজ নহে, বোধহয় সম্ভবই নহে। ঈশ্বরের কার্যকলাপ অখণ্ড ; কিন্তু আমরা উহাকে কালের মধ্যে খণ্ড খণ্ড করিয়া বিচার করি ; তাই আমাদের সিদ্ধান্ত সংকীর্ণ ও অপূর্ণ না হইয়া পারে না। (২) আর এক কথা ; ঈশ্বর অসীম, কিন্তু তাঁহার সৃষ্টপদার্থ সবই সসীম। তাঁহার এই সৃষ্টপদার্থের মধ্যে বহু দোষ-ত্রুটি আছে, তাহা আমরা স্বীকার করি ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও আমরা বলিতে বাধ্য যে যাহা সৃষ্ট পদার্থ তাহা কখনই ত্রুটিহীন হইতে পারে না। কারণ, সৃষ্টপদার্থ মাত্রই সসীম ; সসীম মানে ক্ষুদ্র, সীমাবদ্ধ, অপূর্ণ , তবে অপূর্ণ জিনিষ কি করিয়া পূর্ণ (Perfect) হইতে পারে ? ইহা অসম্ভব ; ইহার মধ্যে দোষ-ত্রুটি থাকিবেই। একমাত্র ঈশ্বরই পূর্ণ ও ত্রুটিশূন্য , তাঁহার মধ্যে কোন প্রকার দোষত্রুটি থাকিতে পারে না ; তিনি ছাড়া আর সবই ক্ষুদ্র, সীমাবদ্ধ ও অপূর্ণ। এই সব ক্ষুদ্র পদার্থও যদি ঈশ্বরের ন্যায় ত্রুটিশূন্য হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের সহিত ইহাদের পার্থক্য থাকে কোথায় ? তখন ইহারাও এক একটি ঈশ্বর হইয়া যায়। কিন্তু তাহা তো সম্ভব নহে। অতএব পার্থিব জগতের ত্রুটিবিচ্যুতি দেখিয়া আমাদের কিছুমাত্র বিচলিত বা আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কারণ নাই। কারণ, ক্ষুদ্র জিনিষের মধ্যে ক্ষুদ্রত্ব থাকিবে, সসীম জিনিষের মধ্যে অপূর্ণতা থাকিবে, ইহাই তো স্বাভাবিক ; ইহাতে ঈশ্বরের দোষ কি আছে ? মনে রাখিতে হইবে, ঈশ্বরও অসাধ্য সাধন করিতে পারেন না ; তিনিও তিন আর তিন যোগ দিয়া সাত করিতে পারেন না। সেইরূপ, তিনিও সসীম জিনিষ সৃষ্টি করিয়া তাহাকে অসীমের ন্যায় পূর্ণতা সম্পন্ন করিতে পারেন না। সসীম সৃষ্টি করিলেই উহাকে সসীমের ন্যায় অপূর্ণ করিতে হয় ; এবং তাহাই করা হইয়াছে। ইহাতে আশ্চর্য হইবার কি আছে ?

নৈতিক জগতে

এতক্ষণ আমরা নিরীশ্বরবাদিগণের প্রথম যুক্তির কথা আলোচনা করিলাম। এখন আমরা তাহাদের দ্বিতীয় যুক্তির কথা আলোচনা করিব। প্রথম যুক্তিতে তাহারা প্রাকৃতিক জগতের ত্রুটিবিচ্যুতির (Natural Evils) কথা বলিয়াছেন ; উহার ফলে জীবজন্তুর অশেষ দুর্ভোগ ও দুর্গতি দেখিয়া তাহারা বিচলিত হইয়াছেন। দ্বিতীয় যুক্তিতে তাঁহারা নৈতিক জগতের দিকে লক্ষ্য করিয়াছেন। নৈতিক জগৎ মানে মানুষের কার্যকলাপ ; পশুদের কার্যকলাপ নহে বা

নৈসর্গিক ঘটনাবলীও নহে। নৈসর্গিক ঘটনা, যেমন বন্যা বা ভূমিকম্প—এইসব ঘটনাবলীর মধ্যে নীতি-দুর্নীতির কোন প্রশ্ন নাই; আর পশুদের কার্যাবলী, উহাদের সম্বন্ধেও কোন নৈতিকতার প্রশ্ন উঠিতে পারে না। নৈতিক প্রশ্ন ওঠে মানুষের কার্যাবলী সম্বন্ধে, তাহাদের কার্যে যে অনেক কিছু অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচার আছে—তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই; মানুষের ক্রূরতা, নীচতা ও পাপ-প্রবণতা দেখিলে অবাক হইয়া যাইতে হয়। পশু মিথ্যা কথা বলে না, মিথ্যা কথা বলে মানুষ, মানুষ চুরি করে, হত্যা করে, এমন কোন অসৎ কাজ নাই যাহা সে করিতে পারে না বা করে না। তাহা হইলে স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে—এই অসত্যের, এই পাপের (Moral Evils) উদ্ভব হইল কোথা হইতে? যাহারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী তাহারা বলেন যে, পৃথিবীর সবই ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন, ঈশ্বর ব্যতীত কোন জিনিষেরই উদ্ভব হইতে পারে না। তাহা হইলে তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে পাপেরও মূল কারণ ঈশ্বর, তিনিই মানুষের মনে পাপের বীজ উপ্ত করিয়াছেন। অতএব মানুষের পাপ কাজের জন্য তিনিও কিঞ্চিৎ দায়ী; এই দায়িত্ব তিনি কিছুতেই এড়াইতে পারেন না। তাই নিরীশ্বরবাদিগণ বলেন যে, এই প্রকার পাপাচারী ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়া লাভ কি? যিনি দুনিয়া হইতে অন্যায় অত্যাচার দূর করিতে পারেন না, বরং অন্যায় অত্যাচারের কারণ রূপেই বিরাজ করেন—তাঁহাকে মানুষ পূজা করিবে কেন?

ইহার উত্তরে ঈশ্বরবাদিগণ বলেন যে, ঈশ্বর পাপ সৃষ্টি করেন নাই, তিনি মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি ইচ্ছা করিলে মানুষকেও পশুর মতন করিয়া সৃষ্টি করিতে পারিতেন বটে, কিন্তু তাহা হইলে আরো কতকগুলি পশু সৃষ্ট হইত মাত্র, মানুষ সৃষ্টি হইত না। মানুষ সৃষ্টি করিতে হইলে তাহাকে পশু হইতে ভিন্ন করিয়া সৃষ্ট করিতে হয়। ঈশ্বর তাহাই করিয়াছেন। পশুদের বুদ্ধি-শক্তি নাই, ইচ্ছা-স্বাতন্ত্র্যও নাই; তাই তাহারা ভাবিয়া চিন্তিয়া স্বাধীনভাবে কোন কাজ করিতে পারে না; তাহারা প্রকৃতির হাতে পুত্তলিকার ন্যায় সাহজিক প্রবৃত্তি বশে কাজ করে। কিন্তু মানুষ তাহা করে না, তাহার চিন্তা-শক্তি আছে, ইচ্ছা-স্বাতন্ত্র্যও আছে; তাই সে ভাবিয়া চিন্তিয়া স্বাধীনভাবে কাজ করে। এইখানেই পশুদের সহিত মানুষের পার্থক্য। এই পার্থক্য বজায় রাখিতে হইলে মানুষকে ইচ্ছা-স্বাধীনতা দিতেই হইবে। এইখানেই মুশকিল। যদি মানুষকে স্বাধীনতা না দেওয়া হয়, তবে তাহার সহিত পশুর কোনই প্রভেদ থাকে না, আর যদি স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তবে তাহাকে পাপ করিবার স্বাধীনতাও দিতে হইবে; নতুবা স্বাধীনতার কোন অর্থই হয় না। শুধু পুণ্য কাজ করিবারই ক্ষমতা

থাকিবে, পাপ কাজ করিবার ক্ষমতা থাকিবে না, উহাকে তো স্বাধীনতা বলে না। এমতাবস্থায় ঈশ্বর কি করিবেন? আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, ঈশ্বরও অসাধ্য সাধন করিতে পারেন না, তিনি মানুষকে স্বাধীনতা দিবেন, অথচ পাপ করিবার ক্ষমতা দিবেন না—উহা তো সম্ভব নহে। অতএব মানুষের নৈতিক দুর্গতি দেখিয়া ঈশ্বরের প্রতি দোষারোপ করার কোন অর্থ হয় না। আর এক কথা। মানুষ ভুল করিবে, দোষ করিবে, অন্যায় করিবে—ইহা তো খুবই স্বাভাবিক। এইভাবে ভুলত্রুটির মধ্য দিয়াই সে উন্নতি করিতে পারিবে। নতুবা, যে মানুষ ভুল করে না, সে কখনই "মানুষ" হইতে পারে না। মানুষ হইতে হইলে তাহাকে বারে বারে পড়িতে হইবে, আবার বারে বারে উঠিতে হইবে, দুঃখের সহিত ও দৈন্যের সহিত তাহাকে সংগ্রাম করিতে হইবে। তবেই তো তাহার সুপ্ত শক্তি বিকশিত হইবার সুযোগ পাইবে, নতুবা সে "যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই" রহিয়া যাইবে। যাহাকে কোনরূপ প্রলোভনের সম্মুখীন হইতে হয় না, বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করিতে হয় না, যাহার জীবন পথে কোনরূপ বিপদ আপদ নাই, তাহার চরিত্র গঠনের কোন সম্ভাবনাই নাই। চরিত্র গঠনের জন্য পদে পদে প্রতিবন্ধকতা চাই, কারণ, প্রতিবন্ধকতা না থাকিলে আমরা চেষ্টা করি না, আর চেষ্টা না করিলে যে রত্ন পাওয়া যায় না—তাহা বলাই বাহুল্য। অতএব আমরা উপরে যেসব প্রাকৃতিক ও নৈতিক প্রতিবন্ধকতার কথা উল্লেখ করিয়াছি—তাহাকে ঈশ্বরের অভিশাপ না মনে করিয়া ঈশ্বরের আশীর্বাদ মনে করা উচিত; কারণ এইসব প্রতিবন্ধক আছে বলিয়াই আমরা আমাদের সুপ্ত শক্তি জাগ্রত করিবার সুযোগ পাইতেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঈশ্বরবাদ

নিরীশ্বরবাদিগণ যাহাই বলুন না কেন, সাধারণ লোকে সকলেই ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন। আদিমযুগে বা বর্তমান যুগে—যেদিকেই লক্ষ্য করি না কেন, আমরা এমন কোন মানব সমাজের খবর পাই না যেখানে কোন না কোন প্রকারের ধর্মজ্ঞান নাই। ধর্মজ্ঞান—অর্থাৎ ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছু না কিছু ধারণা সকলেরই আছে; এমন কি যাহাদিগকে আমরা আদিম বা অসভ্য বলিয়া মনে করি তাহারাও বিশ্বাস করে যে এই জগতের এক কর্তা বা নিয়ন্তা আছে। এই সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বর সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা হয়ত স্পষ্ট নহে; তাঁহাকে পূজা করা

অপেক্ষা তৃপ্ত করাই হয়ত তাহাদের লক্ষ্য ; কিন্তু তবুও স্বীকার করিতে হইবে যে তাহারা একেবারে ধর্ম্মজ্ঞানহীন নহে, তাহারাও ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে।

কেহ কেহ বলেন যে সাধারণ মানুষের এই প্রকার ধর্মজ্ঞানের মূলে আছে কতিপয় স্বার্থান্ধ ব্যক্তির শঠতা। যেমন চার্বাক বলেন যে ব্রাহ্মণ ও পূজারীগণই নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য মানুষকে বেদে ও ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন ; কারণ ঈশ্বরের পূজা না করিলে তাহাদের ব্যবসা নষ্ট হইয়া যায়। ইহা যে একেবারে বাজে কথা—তাহা বলা যায় না ; ইহার মধ্যে যথেষ্ট সত্যতা আছে। অনেক ধর্মযাজক এবং ধর্মগোষ্ঠীর কথা জানি যাহারা মানুষকে ধর্মান্ধ বানাইয়া নিজ নিজ স্বার্থ সিদ্ধি করিয়া গিয়াছেন এবং বহুক্ষেত্রে এখনও করিতেছেন। আফিং খাওয়াইয়া মানুষকে যেমন মোহগ্রস্ত করা হয়, ধর্মামৃত পান করাইয়াও তাহাকে তেমন অন্ধ ও অজ্ঞ করিয়া রাখা হয়। সত্যিকারের ঈশ্বর না থাকিলেও এক মিথ্যা ধারণার সৃষ্টি করিয়া, নরকের ভয় এবং স্বর্গের লোভ দেখাইয়াও মানুষকে যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করানো যায় তাহা আমরা স্বীকার করি ; কিন্তু তবুও আমরা জিজ্ঞাসা করি—দুনিয়ায় সর্ব্বত্রই কি এইরূপ করা হইয়াছে ? কোন এক যুগে বা কোন এক সমাজে যাহা হইয়াছে—সকল সমাজে এবং সকল যুগেই কি তদ্রূপ হইয়াছে ? ইহা সম্ভব নহে ; অথচ আমরা দেখিতেছি যে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই লোকে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না এমন লোকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। এমত অবস্থায় আমরা যদি বলি যে মানুষের ধর্ম বিশ্বাসের মূলে স্বার্থান্ধ ব্যক্তির মিথ্যা প্ররোচনা ব্যতীত আর কিছুই নাই—তাহা হইলে মোটেই সঙ্গত হয় না।

মোটকথা, মানুষের ধর্মবিশ্বাস এত ব্যাপক যে ইহার মূল অনুসন্ধান করিতে হইলে শুধু বাহ্য কারণের দিকে লক্ষ্য করিলেই চলে না, ইহার অন্তর্নিহিত কারণও লক্ষ্য করিতে হইবে। এক কথায় শুধু বাহির হইতে চাপ দিয়া এই বিশ্বাস সৃষ্টি করা যায় না ; ইহার মূলে যে অন্তর্নিহিত কারণ বিদ্যমান আছে, তাহাও লক্ষ্য করিতে হইবে। প্রত্যেক মানুষের মনেই এমন কয়েকটি ভাব আছে, যাহা তাহাকে স্বভাবতঃই ধর্মপ্রবণ করিয়া তোলে ; তাই শুধু অপরের প্ররোচনায় নহে, নিজের আন্তরিক প্রেরণাতেও সে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে চাহে। এখন আমরা এইরূপ দুইটি অন্তর্নিহিত কারণের উল্লেখ করিব যাহার প্রেরণায় মানুষ নিজে ইচ্ছা করিয়াই ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, অপরের ভয়ে বা লোভে নহে।

প্রথমতঃ, নির্ভরতা বোধ (Feeling of Dependence)। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই যে নির্ভরতা বোধ আছে, উহা হইতেই সাধারণতঃ ধর্মজ্ঞানের

উদ্ভব হইয়া থাকে। ঝড়, ঝঞ্ঝা, বন্যা ভূমিকম্প প্রভৃতি নৈসর্গিক বিপদের নিকট মানুষ নিজেকে নিতান্তই দুর্বল ও অসহায় বলিয়া মনে করে; সে যতই শক্তিমান হউক না কেন, ইহাদের সম্মুখে তাহার সমস্ত শক্তি কোথায় যেন অন্তর্হিত হইয়া যায়। তারপরে, যখন জরা, ব্যাধি ও অবশেষে মৃত্যু ঘনাইয়া আসে তখন সে স্পষ্ট উপলব্ধি করে যে মানুষের শক্তি নিতান্ত তুচ্ছ ও নগণ্য; তখন সে মানুষ অপেক্ষাও অধিকতর শক্তিসম্পন্ন কোন দেবতার কথা চিন্তা না করিয়া পারে না। ইহাই তাহার ঈশ্বর, তাহার সমস্ত বিপদে আপদে একমাত্র এই ঈশ্বরই তাহাকে রক্ষা করিতে পারেন। অতএব ঈশ্বরের উপর নির্ভর করা ছাড়া তাহার আর উপায় নাই, তাই সে আকুলচিত্তে তাহার সাহায্য প্রার্থনা করে। ইহাকে ধর্মভাব বলে; আমাদের নির্ভরতা বোধ হইতে ইহার উদ্ভব।

দ্বিতীয়তঃ, নৈরাশ্যবোধ (**Feeling of Frustration**)। ক্যাণ্ট ইহার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে আমরা সাধারণতঃ বিশ্বাস করি যে, মানুষ নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী সুখ বা দুঃখ ভোগ করে, যে সৎকাজ করে সে সুখভোগ করে, আর যে অসৎকাজ করে সে দুঃখভোগ করে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে আমরা কি দেখি? আমরা অনেক সময়েই দেখি, যে লোক আজীবন সৎকাজ করিল এবং পরের উপকার করিয়া জীবন অতিবাহিত করিল, সে হয়ত শেষ জীবনে খুবই কষ্টে পড়িয়াছে, আর যে লোক চিরকাল অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করিল এবং অসৎভাবে জীবন যাপন করিল, সে শেষ পর্যন্ত বেশ সুখেই জীবন কাটাইয়া গেল, তাহার কোন দুঃখ কষ্ট হইল না। এই সব দেখিয়া আমাদের মন স্বভাবতঃই খুব ক্ষুব্ধ হইয়া ওঠে। এ কি রকম বিচার? সাধুলোক তাহার সৎকাজের পুরস্কার পাইবে না? আর অসাধুলোক কোনরূপ শাস্তি পাইবে না? ইহা তো গুরুতর অন্যায়। ইহার কি কোনরূপ প্রতিকার নাই? কিন্তু কে প্রতিকার করিবে? সংসারে যেদিকে তাকাই সেদিকেই দেখি এই অন্যায় ও অবিচার অপ্রতিহত গতিতে বহিয়া চলিয়াছে। মানুষের পক্ষে ইহার প্রতিরোধ করা সম্ভব নহে, অথচ অবিচলিত চিত্তে ইহা সহ্য করাও আমাদের পক্ষে সহজ নহে। আমাদের মন তখন নৈরাশ্যে ভরিয়া ওঠে, তখন মনে হয় মানুষ অপেক্ষাও নিশ্চয়ই এক শক্তিশালী কেহ আছেন যিনি কিছুতেই এই অন্যায় সহ্য করিবেন না। তিনিই আমাদের ঈশ্বর; তিনি কাহারও প্রতি কোন প্রকার অবিচার হইতে দিবেন না, প্রত্যেকের কৃতকর্মের যথাযথ ফল তিনি প্রদান করিবেন। এতএব আজ সংসারে যাহাই ঘটুক না কেন—ঈশ্বর একদিন সব ঠিক করিয়া দিবেন।

এইভাবে মানুষ ঈশ্বরের কথা চিন্তা করিয়া থাকে। তবে এখানে একটি বিষয়ে সাবধান করিয়া দেওয়া দরকার। আমরা আমাদের দুর্বলতা ও অপূর্ণতার জন্য ঈশ্বরের কথা চিন্তা করি বটে, কিন্তু ইহা হইতে আমরা যদি অনুমান করি যে সত্যই ভগবান বলিয়া কেহ আছেন, তবে খুবই ভুল হইবে। কয়েকটি উদাহরণ দিয়া কথাটি বুঝানো যাউক। খ্রীষ্টানদের বড়দিনে ইউরোপে নানাপ্রকার উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে; এই উৎসবের একটি প্রধান অনুষ্ঠান—ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য উপহার দেওয়া। সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া তাহারা দেখে থলি ভর্ত্তি উপহার বিছানায় পড়িয়া আছে। তাহাদের বিশ্বাস বৃদ্ধ Santa Claus আসিয়া এই সব উপহার রাখিয়া গিয়াছেন। সেইজন্য ঘুমাইবার পূর্ব্বে তাহারা সকলেই এই স্নেহ-প্রবণ বৃদ্ধের কথা চিন্তা করিয়া থাকে, এবং তাহার নিকট হইতে নানারূপ উপহার পাইবার কামনা করিয়া থাকে। আমরা জিজ্ঞাসা করি—তাহারা সকলেই Santa Claus-এর কথা চিন্তা করে বলিয়াই কি বুঝিতে হইবে যে সত্য সত্যই তাহার কোন অস্তিত্ব আছে? বস্তুতঃ Santa Claus বলিয়া শিশুদের কোন বন্ধু নাই; তাহাদের পিতামাতাই তাহাদের জন্য গোপনে উপহার রাখিয়া যান। অথচ শিশুরা ভাবে Santa Claus-এর কথা, কিন্তু বাস্তব জগতে ইহার কোন অস্তিত্ব নাই, ইহার অস্তিত্ব আছে শুধু কল্পনা জগতে। সেইরূপ, রাতে একাকী শ্মশানের নিকট দিয়া যাইবার সময় আমরা সকলেই ভূতের ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়ি। এইভাবে ভূতের কথা চিন্তা করি বলিয়াই কি স্বীকার করিতে হইবে যে সত্যই জগতে ভূত আছে? মোটেই না, কারণ আমরা যাহা কল্পনা করি তাহা সবসময়ে বাস্তব সত্য নাও হইতে পারে, ইহার জন্য স্বতন্ত্র প্রমাণের প্রয়োজন। সেইরূপ আমাদের দুর্বল মুহূর্তে আমরা ঈশ্বরের কথা চিন্তা করি বটে, কিন্তু সত্যই ঈশ্বর আছেন কি না প্রমাণ করিবার জন্য যথাযথ যুক্তি দেখাইতে হইবে। আমরা এখন এইসকল যুক্তির কথা আলোচনা করিব।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ

পাশ্চাত্য দর্শনে সাধারণতঃ চারিপ্রকার যুক্তি প্রদর্শন করা হয়; যথা Cosmological Argument; Ontological Argument; Teleological Argument এবং Moral Argument; হিন্দুদর্শনে আর একটি যুক্তির উপরে খুবই গুরুত্ব আরোপ করা করা হয়, যথা শব্দ বা Authority। আমরা একে একে এইগুলি ব্যাখ্যা করিব।

I. Cosmological Argument.

বিজ্ঞানের একটি অবশ্য স্বীকার্য তত্ত্বের নাম কার্যকারণ সম্বন্ধ (Causal Connection)। এই কার্য্যকারণ সম্বন্ধের উপরেই Cosmological Argument প্রতিষ্ঠিত। পৃথিবীতে যে কোন ঘটনাই ঘটুক না কেন, তাহার নিশ্চয়ই কোন "কারণ" আছে; বিনা কারণে কোন কার্যের উদ্ভব হওয়া সম্ভব নহে। আজ জলপাইগুড়ি সহর জলে প্লাবিত হইয়া গেল—এই প্লাবন "কার্য" (Effect); অতএব নিশ্চয়ই ইহার কোন "কারণ" (Cause) আছে, ইহার কারণ তিস্তা নদীতে বন্যা আসিয়াছে। কিন্তু তিস্তা নদীতে আজ এত বন্যা আসিল কেন? ইহার কারণ, হিমালয়ের পাদদেশে অতিবৃষ্টি হইয়াছে। আবার হিমালয়ে আজ এত বৃষ্টি হইল কেন? ইহারও কারণ আছে, বঙ্গোপসাগর হইতে মেঘ আসিয়া জমা হইয়াছে। এইভাবে কারণ হইতে কারণান্তরে চলিয়া যাইতে পারি। কিন্তু কতদূর যাইব? যদি পরপর শুধু চলিতেই হয়, তবে আমাদের চিন্তার মধ্যে অনবস্থা দোষ (Infinite regress) আসিয়া জোটে। কিন্তু উহা তো সঙ্গত নহে। অতএব কোন এক বিন্দুতে আসিয়া আমাদিগকে থামিতেই হইবে। উহাকে আমরা আদি কারণ বা মূল কারণ বলিতে পারি, এই প্রথম কারণের কোন কারণ নাই। জগৎ ব্যাখ্যা করিবার জন্যও এমন একটি আদি কারণ স্বীকার করা প্রয়োজন। নতুবা আমরা যদি ক্রমাগত কারণের পর কারণ অন্বেষণ করিয়া নিরন্তর শুধু চলিতেই থাকি, তাহা হইলে আমরা কখনই কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছিতে পারিব না। স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে হইলে জগতের এক আদি কারণে আসিয়া থামিতেই হইবে। এই আদি কারণের কোন কারণ থাকিতে পারে না; ইহাই আমাদের ঈশ্বর। এইভাবে জগৎ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া উহার আদি কারণ বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করাকে Causal Argument বলে।

সমালোচনা। ইহাকে আমরা সবল যুক্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। প্রথমতঃ, এই যুক্তিতে মানিয়া লওয়া হইতেছে যে আদি কারণ বা ঈশ্বরের কোন কারণ নাই। কিন্তু কেন নাই? ঈশ্বরকে যদি স্বয়ম্ভু বলিয়া মানিয়া লইতে হয়, তবে জগৎকেও স্বয়ম্ভু বলিয়া মানিয়া লওয়া যাইতে পারে। তাহা হইলে আর ইহার কারণ অনুসন্ধানের জন্য ছুটিবার প্রয়োজন কি? যদি স্বীকার করিতে হয় যে জগতের কোন কারণ আছে, তাহা হইলে বলিতে হইবে তথাকথিত আদি কারণেরও নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে; হঠাৎ থামিয়া যাইবার কোন অর্থ হয় না। দ্বিতীয়তঃ, যদি আদি কারণের অস্তিত্ব মানিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলেও মুশকিল আছে। মানিয়া লইলাম

যে জগতের এক আদি কারণ আছে, এবং উহা হইতে জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে ঈশ্বরের জীবনে এমন এক মুহূর্ত ছিল যখন তিনি একাকী কারণরূপে বিরাজ করিতেন, তাঁহার কার্য অর্থাৎ জগৎ, তখনও সৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু উহা তো সম্ভব নহে। কার্য ও কারণকে আমরা এইভাবে পৃথক করিয়া স্বতন্ত্র ভাবে দেখিতে পারি না; উহারা বস্তুতঃ একই জিনিষের দুইটি দিক। যেমন ধর, জল হইতে বাষ্প নির্গত হইতেছে; এক্ষেত্রে জল "কারণ" এবং বাষ্প "কার্য"। কিন্তু যখন বাষ্প নাই, তখন কি আমরা জলকে 'কারণ' বলিতে পারি? জলকে আমরা তখনই 'কারণ' বলি যখন দেখি ইহা হইতে বাষ্প নির্গত হইতেছে। অর্থাৎ বাষ্প ছাড়া কারণ থাকিতে পারে না; আবার কারণ ছাড়াও বাষ্প থাকিতে পারে না, সত্যই তো জল না থাকিলে বাষ্প আসিবে কোথা হইতে? অতএব আমরা যখন বলি যে ঈশ্বরই জগতের আদি কারণ তখন বুঝিতে হইবে যে, তাঁহার সৃষ্ট জগৎও তখন সঙ্গে সঙ্গে বিরাজ করিতেছে। তৃতীয়তঃ, মানিয়া লইলাম যে জগৎ ব্যতীতও ভগবান আদি কারণরূপে একাকী বিরাজ করিতেন, এবং কোন এক শুভ মুহূর্তে তিনি তাঁহার এই একাকীত্ব পরিহার করিয়া বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিলেন। এইপ্রকার কল্পনাতেও মুশ্‌কিল আছে। তিনি তো একাকী ভালই ছিলেন, তবে বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিতে গেলেন কেন? তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে যে তিনি যখন একাকী ছিলেন তখন তিনি পূর্ণ ছিলেন না? তাঁহার মধ্যে অভাব ও অপূর্ণতা ছিল বলিয়াই কি তিনি এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিলেন? তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, ঈশ্বরের জীবনেও উন্নতি অবনতি আছে; সৃষ্টির পূর্বে তিনি অপূর্ণ ছিলেন, সৃষ্টির পরে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু ঈশ্বরের সম্বন্ধে কি এই প্রকার কথা প্রযোজ্য?

II. Ontological Argument.

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মানুষ মাত্রই ঈশ্বরের কথা চিন্তা করিয়া থাকে। শিক্ষিত অশিক্ষিত, সভ্য, অসভ্য, আদিম ও আধুনিক সকল মানুষের মনেই ঈশ্বরের সম্বন্ধে একটি ধারণা আছে। কেহ মনে করেন ঈশ্বর পরম কারুণিক, কেহ মনে করেন ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান; কেহ মনে করেন ঈশ্বর সর্ব্বগুণাধার, আর কেহ মনে করেন তিনি নির্গুণ, দয়া মায়া, করুণা প্রভৃতি কোন গুণই তাঁহার মধ্যে আরোপ করা যায় না। এইভাবে নানা-

লোকে তাঁহার সম্বন্ধে নানাভাবে চিন্তা করিয়া থাকেন। কিন্তু একটি বিষয়ে সকলেই একমত, সকলেই বলেন ঈশ্বর পূর্ণ (Perfect), তাঁহার মধ্যে কোনরূপ অপূর্ণতা (Imperfection) থাকিতে পারে না। এই পূর্ণতা বোধ হইতেই অনেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে চাহেন। ইহাকে Ontological Argument বলে। তাঁহারা বলেন—আমরা যাঁহাকে perfect বা পূর্ণ বলিতেছি, তাঁহার যদি কোন অস্তিত্ব না থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে পূর্ণ বলা যায় কেমন করিয়া ? ঈশ্বরের যত গুণই থাকুক না কেন, তাহার যদি অস্তিত্বই না থাকিল, তবে আর তাঁহার রহিল কী ? যাঁহার অস্তিত্বই নাই, তাঁহাকে perfect বলা যায় কেমন করিয়া ? অতএব, যেহেতু আমরা সকলেই ঈশ্বরকে perfect বলিয়া মনে করি, সেই হেতু স্বীকার করিতে হইবে যে তাঁহার অস্তিত্বও নিশ্চয়ই বিদ্যমান আছে।

সমালোচনা। এই প্রকার যুক্তির উপর আমরা বিশেষ কিছু গুরুত্ব আরোপ করিতে পারি না। আমি মনে করিতেছি যে আমার পকেটে দশ টাকা আছে, তাহা হইলেই কি বলিতে হইবে যে সত্যই আমার পকেটে দশ টাকার অস্তিত্ব আছে ? তর্কের খাতিরে আমরা মানিয়া লইলাম যে আমরা সকলেই ঈশ্বরকে perfect বলিয়া **ধারণা** করি, তাহা হইলেই কি বুঝিতে হইবে যে তিনি সত্যই বাস্তব জগতে বিদ্যমান আছেন ? আমরা এইটুকু বলিতে পারি যে, যখন আমরা ঈশ্বরকে perfect বলিয়া মনে করি, তখন তাঁহার অস্তিত্বও আছে বলিয়া **ধারণা** করি। কিন্তু **ধারণা** করা এক জিনিষ, আর বাস্তব জগতে বিদ্যমান থাকা আর এক জিনিষ। আমি ধারণা করিতেছি যে ঈশ্বর আছেন, তাহা হইলেই কি বুঝিতে হইবে যে সত্যই তিনি বিদ্যমান আছেন ? ইহা মোটেই ঠিক নহে।

III. Teleological Argument.

আমরা পৃথিবীর সৃষ্টিকৌশল দেখিয়া অবাক না হইয়া পারি না। প্রজাপতি মধুসংগ্রহের জন্য ফুলে গিয়া বসে; তাহার পাখার রং-এর সঙ্গে ফুলের রং-এর কি অদ্ভুত সাদৃশ্য। ফলে তাহাকে প্রজাপতি বলিয়া চিনিয়া ফেলা খুবই কঠিন হয়। এইভাবে সে তাহার শত্রুর দৃষ্টি হইতে সহজেই আত্মগোপন করিতে পারে। পাখির হাড়গুলি দেখ, কি পাতলা এবং উহাদের ওজন কত কম। কারণ তাহাকে আকাশে উড়িতে হয়, সেইজন্য ভূচর জন্তুর ন্যায় তাহার হাড় ভারী নহে। আবার দেখ, যে সব পশু দুর্বল, তাহাদের দৌড়াইবার

শক্তি প্রবল; নতুবা তাহারা শত্রুর হাত হইতে নিজদিগকে রক্ষা করিতে পারিত না। এই অদ্ভুত শৃঙ্খলা-সৌকার্য দেখিলে আমাদের স্বভাবতঃই মনে হয় যে, দুনিয়ায় নিশ্চয়ই এক কুশলী ঈশ্বর আছেন যিনি বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে এক সুপরিকল্পিত সামঞ্জস্য বিধানপূর্বক বিশ্বসৃষ্টি করিয়াছেন।

সমালোচনা। আমাদের মতানুসারে এই যুক্তিও বিশেষ সবল নহে। আমরা স্বীকার করি যে, বিশ্ব-দুনিয়ায় এই শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্যের বহু উদাহরণ পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু অন্য প্রকার উদাহরণও তো বহু আছে। জাপানে যেখানে কোটী কোটী লোকের বাস—সেখানে আগ্নেয়গিরি বা ভূমিকম্পের এত উৎপাত কেন? সাহারায় জল নাই কেন? সেখানে জল থাকিলে কত লোকের উপকার হইত। অতএব শুধু সামঞ্জস্যের উদাহরণ খুঁজিলে হইবে না, অসামঞ্জস্যেরও উদাহরণ দেখিতে হইবে। তখন আর ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা খুব সহজ হয় না। তখন মনে হয় ঈশ্বর বলিয়া কেহ থাকিলে দুনিয়ায় এইরূপ অন্যায় ও অবিচার মোটেই সম্ভব হইত না।

IV. Moral Argument.

আমাদের নৈতিক জীবনের আদর্শ প্রসঙ্গে এই যুক্তি উপস্থাপিত করা হয়। উদাহরণ দিয়া ব্যাখ্যা করা যাউক। শিল্পী যখন ছবি অঙ্কন করেন তখন তিনি তাঁহার মনের পুরোভাগে একটি আদর্শ ধরিয়া রাখেন। তাই তিনি শুধু ছবি আঁকিয়া ক্ষান্ত হন না; সেই ছবিটি তাঁহার আদর্শ অনুযায়ী হইয়াছে কি না—তাহাও বিবেচনা করেন। সেইরূপ, আমরা যখন ছবি দেখি বা কবিতা পড়ি, তখন শুধু দেখিয়াই বা পড়িয়াই আমরা ক্ষান্ত হই না; কবিতাটি সুন্দর হইয়াছে কি না, ছবিটি মনোরম হইয়াছে কি না—ইত্যাদি বিচার করি। এইরূপ বিচারের জন্য এক মানদণ্ডের প্রয়োজন; ইহাকে আমরা সৌন্দর্য্য বিচারের মাপকাঠি বলিতে পারি। এই আদর্শের সহিত তুলনা করিয়া আমরা ছবিটিকে সুন্দর বা অসুন্দর বলি। মানুষের নৈতিক ক্রিয়া সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা প্রযোজ্য; তাহার ক্রিয়া প্রক্রিয়া শুধু লক্ষ্য করিয়াই আমরা ক্ষান্ত হই না; ইহা সৎ কি অসৎ, ন্যায় কি অন্যায়—তাহাও বিচার করি। এক্ষেত্রেও আমরা মনের পুরোভাগে এক নৈতিক আদর্শ ধরিয়া রাখি, এবং সেই আদর্শের সহিত তুলনা করিয়া আমরা মানুষের কাজকে উচিত বা অনুচিত বলিয়া বিবেচনা করি। যে কাজ আদর্শ অনুসরণ করে তাহাকে আমরা ভাল কাজ বলি; আদর্শের যত

নিকটে পৌঁছিতে পারে—ততই ভাল। আর যে কাজ আদর্শ হইতে বহুদূরে থাকে, অর্থাৎ আদর্শকে অনুসরণ করে না, তাহাকে আমরা খারাপ কাজ বলি।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে নৈতিক আদর্শের প্রভাব আমাদের জীবনে অপরিমেয়; উহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই আমরা আমাদের জীবন পরিচালিত করিতে চেষ্টা করি। এখন প্রশ্ন হইতেছে এই—যে নৈতিক আদর্শের কথা বলা হইতেছে, উহা বাস্তব সত্য (Objective), না আমাদের কল্পনাপ্রসূত মানসিক তথ্য মাত্র (Subjective)। যদি বলা হয় যে ইহা আমাদের মানসিক কল্পনা মাত্র, তাহা হইলে প্রশ্ন করা যাইতে পারে যে, এইরকম এক মিথ্যা কল্পনার দ্বারা আমাদের নৈতিক জীবন পরিচালিত হয় কেমন করিয়া? যে আদর্শ অনুসরণ করিয়া আমরা জীবনকে শুধু সুষ্ঠু-ভাবে পরিচালনা করি, তাহাই নহে; জীবনকে মহৎ, পবিত্র ও উন্নত করিতে পারি, সেই নৈতিক আদর্শকে একেবারে অলীক কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় কি? তাহা তো সম্ভব নহে। সেইজন্য অনেকে বলেন যে, যেহেতু আমাদের জীবনকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না, সেইহেতু জীবনের আদর্শকেও মিথ্যা বলিয়া কল্পনা করা যায় না, ইহাকে আমরা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য। তাঁহারা আরও বলেন যে, এই আদর্শকে যখন আমরা সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লই, তখন ঈশ্বরের অস্তিত্বও আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য। কারণ ঈশ্বর বলিতে আমরা তো কোন অদ্ভুত জিনিষ বুঝি না; ঈশ্বর বলিতে আমরা বুঝি মানব জীবনের সর্বোত্তম আদর্শ—যাঁহার মধ্যে আমাদের সকল আশা ভরসা, সকল আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনা পুঞ্জীভূত হইয়া জীবন্তরূপ গ্রহণ করিয়াছে। ঈশ্বর এই আদর্শের প্রতীক ব্যতীত আর কিছুই নহেন। অতএব আদর্শ সত্য হইলে, ঈশ্বরের অস্তিত্বও সত্য হইতে বাধ্য।

সমালোচনা—এই যুক্তিও আমরা বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করিতে পারি না। কোন এক আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া আমরা আমাদের জীবন পরিচালিত করিতেছি বলিয়াই যে সেই আদর্শের বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে—এমন কোন অর্থ নাই; উহা ভুল হইতে পারে, মিথ্যাও হইতে পারে। অতএব আগে উহার বাস্তবিকতা প্রমাণ করিতে হইবে, তারপরে অন্যকথা। দ্বিতীয়তঃ এই যুক্তিতে নৈতিকতার প্রতি অতিশয় গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে; কিন্তু সকলেই হয়ত নৈতিক জীবনের এতাদৃশ প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিবেন না। যীশুখৃষ্ট জগতে প্রেমের বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার কোটি কোটি শিষ্য কামানের

গুলিতে এবং বোমার আগুনে তাঁহার সেই বাণী পুড়াইয়া দিতেছেন; অর্থাৎ তাঁহারা ইহার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না। অতএব তাহাদের নিকট এই প্রকার যুক্তির যে বিশেষ কোন মূল্য থাকিতে পারে না—তাহা বলাই বাহুল্য। নৈতিক জীবনের সত্যই যে বিশেষ কোন সার্থকতা আছে—তাহার প্রমাণ কি?

[এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে আমরা উপরোক্ত নৈতিক যুক্তিকে মোটেই উপেক্ষা করিতেছি না, এবং উপেক্ষা করিতে পারিও না। অধ্যাপক কানিংহামের মতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার পক্ষে ইহাই সর্বাপেক্ষা প্রধান যুক্তি, এবং আমরাও উহা স্বীকার করি। সেইজন্য আমরা এখানে ইহা অগ্রাহ্য করিতেছি না; আমরা শুধু বলিতেছি যে ইহা প্রমাণ সাপেক্ষ ব্যাপার, অর্থাৎ ইহা গ্রহণ করিবার আগে কয়েকটি কথা প্রমাণ করা দরকার। প্রথমতঃ প্রমাণ করিতে হইবে যে আমরা উপরে যে ভগবৎ সত্তার কথা উল্লেখ করিয়াছি তাহা শুধু কাল্পনিক তথ্য নহে, বাস্তব সত্য। তুমি বা আমি আমাদের খুশীমত এই আদর্শ সৃষ্টি করি নাই, তাই আমাদের খুশীমত ইহা বর্জনও করিতে পারি না। মোট কথা, আমাদিগকে প্রমাণ করিতে হইবে যে বাস্তব জগতে এবং মানব সমাজে সত্যই এমন কিছু আছে যাহার জন্য এই ভগবৎ-আদর্শ সৃষ্টি করিতে আমরা বাধ্য, ইহা আমাদের মনগড়া কথা নহে। দ্বিতীয়তঃ, প্রমাণ করিতে হইবে যে আমরা উপরে যে নৈতিক আদর্শের কথা বলিয়াছি, উহাও নিছক কবি কল্পনা নহে, উহাও কঠোর বাস্তব সত্য। ইহা আমার বা তোমার খেয়ালের উপর নির্ভর করে না; আমাদের মানব জীবনে এমন এক বৈশিষ্ট্য আছে যাহার প্রভাবে ইহার সত্যতা স্বীকার করিতে আমরা যেন বাধ্য। মোটকথা, প্রথমেই আমাদিগকে এই আদর্শের বাস্তবিকতা প্রমাণ করিতে হইবে; প্রমাণ করিতে হইবে যে, আদর্শ (ideal) হইলেও ইহা কাল্পনিক নহে, বাস্তব (real)। তখনই আমরা কানিংহামের নৈতিক যুক্তিকে মনে প্রাণে গ্রহণ করিতে পারিব, কারণ তখন আমরা অনায়াসেই বলিতে পারিব যে যাহা কাল্পনিক তাহা অগ্রাহ্য করিলেও করা যাইতে পারে, কিন্তু যাহা বাস্তব তাহা অমান্য করা যায় না; উহার প্রতি নতি স্বীকার করিতেই হইবে। এই প্রমাণের অপেক্ষায় আমরা এখানে শুধু ইহার সমালোচনা করিলাম। পরে ইহার কথা আবার উত্থাপন করা হইবে; তখনই ইহার বাস্তবিকতা প্রমাণ করা হইবে। "আদর্শতত্ত্ব" দ্রষ্টব্য।]

V. Authority

সাধারণতঃ দেখা যায় যে অতীন্দ্রিয় বিষয়বস্তু আলোচনা করিবার জন্য আমরা ধর্মশাস্ত্র বা মহাপুরুষের উপদেশ যাচঞা করি। সত্যই তো, সাধারণ মানুষ আমরা

—ইন্দ্রিয়াতীত জগৎ সম্বন্ধে আমাদের কোনরূপ অভিজ্ঞতা নাই; অতএব সেই অধ্যাত্ম জগতের কথা আমরা সাক্ষাৎভাবে জানিতে পারিব কেমন করিয়া? সেইজন্য আমরা সত্যদ্রষ্টা ঋষির নিকট যাই; কারণ আমরা মনে করি যে তিনি এই অধ্যাত্ম জগৎ সম্বন্ধে হয়ত প্রত্যক্ষ জ্ঞান (Intuition) লাভ করিয়াছেন; তাই আত্মা বা পরমাত্মা বিষয়ে তিনি যাহা বলেন তাহা আমরা শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করি। যুবক নরেন্দ্রনাথ অনেককেই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—আপনি কি ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ করিয়াছেন? সকলেই বলিলেন "ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ করা যায় না; মানুষ সীমাবদ্ধ জীব, তাহার পক্ষে অসীম ও অনন্ত ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নহে।" শেষে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নিকট গেলে তিনি বলিলেন "ব্রহ্ম কেন প্রত্যক্ষ করা যাইবে না? তুমি যেমন গাছের উপর ফুল দেখিতে পাইতেছ, আমিও তেমনি ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ করিতেছি।" রামকৃষ্ণদেব সত্যদ্রষ্টা ঋষি, অধ্যাত্ম তত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন; অতএব তিনি যাহা বলিতে পারেন সাধারণ মানুষ তাহা পারে না। তাই অনেকে বলেন যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ কবিতে হইলে ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষিদের নিকট যাওয়া দরকার। বহু সাধনার ফলে তাঁহারা যাহা উপলব্ধি করিয়াছেন, উহার সত্যতা অস্বীকার করা আমাদের পক্ষে সহজ নহে।

সমালোচনা। প্রথমেই আমরা বলিতে চাই যে অতীন্দ্রিয়বাদিগণের (Mystics) এই উপলব্ধি শুধু তাঁহাদের নিকটেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ, আমাদের নিকট প্রত্যক্ষ প্রমাণ নহে। কারণ আমরা তো সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করিতেছি না, আমরা তাঁহাদের কথা শ্রবণ করিতেছি মাত্র। অতএব কেহ যদি উহা প্রামাণিক বলিয়া বিশ্বাস না করেন তাহা হইলে আমাদের পক্ষে কিছু বলিবার থাকে না। দ্বিতীয়তঃ, অতীন্দ্রিয়বাদিগণের এই উপলব্ধির মধ্যে অবগতি অপেক্ষা অনুভূতির পরিমাণই বেশী। ভাবের আবেগে তাঁহারা এমনই অভিভূত হইয়া পড়েন যে তখন তাঁহাদের পক্ষে সম্যক্ জ্ঞানলাভ করা সম্ভব নহে। ভাব আসিয়া সমস্ত মন অধিকার করিয়া বসিয়া থাকিলে জ্ঞান আসিবে কেমন করিয়া? অতএব ভাবের আবেগে তাঁহারা যে ভগবৎ সত্তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করেন উহার বাস্তবতায় বিশ্বাস করা সকলের পক্ষে সহজ নহে।

উপসংহার

উপরে আমরা পাঁচ প্রকার যুক্তির কথা আলোচনা করিলাম: Cosmological, Ontological, Teleological, Moral এবং Intuitional Arguments. দেখিলাম কোন যুক্তির দ্বারাই আমরা সুনিশ্চিতভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ

করিতে পারিতেছি না। সেইজন্য ঈশ্বর যে সত্যই আছেন, তাহা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি না, আর তিনি যে নাই, তাহাও আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি না। এক কথায়, ঈশ্বর আছেন কি নাই, তাহা আমরা যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করিতে পারি না। তাই বৈষ্ণবেরা বলেন "বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।" তবে তর্কের দ্বারা আমরা যে কোনপ্রকার সাহায্য পাই না—তাহাও ঠিক নহে। তর্ক করিয়া আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পারি না বটে, তবে কেহ যদি মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন যে সত্যই ঈশ্বর আছেন, তাহা হইলে তর্কের দ্বারা তাঁহারা এই বিশ্বাস তিনি সুদৃঢ় করিতে পারেন। তাই সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত Lotze বলেন "All proofs that God exists are pleas put forward in justification of our faith in God." অর্থাৎ আমরা প্রথমে বিশ্বাস করি যে ঈশ্বর আছেন, তারপরে এই বিশ্বাসের স্বপক্ষে যুক্তির অবতারণা করি। এক কথায়, বিশ্বাস করি বলিয়া যুক্তি প্রয়োগ করি; যুক্তি প্রয়োগের ফলে বিশ্বাস করি না।

তৃতীয় অধ্যায়

ঈশ্বরের স্বরূপ

(Nature of God)

প্রথমে আমরা অনেকেশ্বরবাদের (Polytheism) কথা আলোচনা করিতে চাই। এই মতানুসারে ঈশ্বর "এক এবং অদ্বিতীয়" নহেন; ঈশ্বর অনেক। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, ইন্দ্র যম বরুণ—দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী—এইরূপ বহু দেবদেবী আছেন। কেহ আকাশের দেবতা, কেহ পাতালের দেবতা, কেহ বা জলের দেবতা; প্রত্যেকেরই নিজ নিজ অধিকার-স্থল আছে। প্রাকৃতিক জগতে যেখানেই শক্তি বা গতির প্রকাশ দেখা যায়, সেখানেই মানুষ কোন না কোন দেবতার অস্তিত্ব কল্পনা করিয়াছে; সূর্যের মধ্যে, চন্দ্রের মধ্যে, বন্যার মধ্যে, বজ্রের মধ্যে—নদীতে পর্বতে সমুদ্রে—সর্বত্র কোন এক দেবতা অধিষ্ঠিত আছেন; তিনিই উহার শক্তির আধার। বলা বাহুল্য, এইপ্রকার বহু দেবতায় মানুষের মন তৃপ্ত হইতে পারে না। জ্ঞান বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বুঝিতে পারে যে পৃথিবীর কোন বস্তুই স্বতন্ত্র বা বিচ্ছিন্ন নহে; প্রত্যেক বস্তুর সহিত অপর বস্তুর এক ঘনিষ্ঠ সংযোগ বিদ্যমান। সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি প্রত্যেকটি পদার্থ পৃথক হইলেও উহাদের মধ্যে এক অদ্ভুত শৃঙ্খলা-সূত্র বিরাজ করিতেছে; নদী ও পর্বত, বন্যা ও বর্ষা, আকাশ ও সমুদ্র—

প্রত্যেকেই পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত আছে। এক কথায়, সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড এক অবিচ্ছিন্নসূত্রে আবদ্ধ আছে। এমতাবস্থায় দেবতাসমূহের মধ্যেই বা ঐক্য থাকিবে না কেন? বজ্র ও বর্ষার মধ্যে যদি ঐক্যসূত্র থাকে তাহা হইলে উহাদের অধিষ্ঠিত দেবতার মধ্যেও ঐক্য থাকিতে বাধ্য। তাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ঐক্য দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দেবতার মধ্যেও মানুষ ঐক্যের সন্ধান করিতে থাকে; ফলে বহু দেবতা লইয়া আমরা আর সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না; আমরা এমন এক দেবতার সন্ধানে ব্যাপৃত হই যাহাকে আমরা একমাত্র দেবতা বা সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। তিনিই সকল দেবতার দেবতা, তিনি শুধু আকাশের বা বাতাসের অধীশ্বর নহেন; তিনি জগদীশ্বর—এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের তিনিই একমাত্র অধিপতি। এইভাবে অনেকশ্বরবাদ হইতে আমরা একেশ্বরবাদের দিকে অগ্রসর হইতে থাকি। কিন্তু ইহাদের অন্তবর্তী একটি মতবাদ আছে, উহার নাম দ্বি-ঈশ্বরবাদ। এই মতানুসারে ঈশ্বর "এক" নহেন; দুইজন ঈশ্বর আছেন। প্রথমে এই মতবাদটি ব্যাখ্যা করা যাউক, তারপরে একেশ্বরবাদ ব্যাখ্যা করা যাইবে।

দ্বি-ঈশ্বরবাদ (Di-theism)

দ্বি-ঈশ্বরবাদিগণ বলেন যে পৃথিবীতে দুইজন ঈশ্বর আছেন; একজন ভাল আর একজন মন্দ, একজন ইষ্ট করেন আর একজন অনিষ্ট করেন। যিনি ইষ্ট করেন তিনি মঙ্গলময় বিধাতা; তিনি স্বভাবতঃই চেষ্টা করেন যাহাতে সব জিনিষই ভাল হয় এবং সুন্দর হয়। তিনি একাকী থাকিলে হয়ত তাহাই হইত; সমস্ত দোষ-ত্রুটি পরিহার করিয়া তিনি এক সর্বাঙ্গ সুন্দর পৃথিবী সৃষ্টি করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি একাকী নহেন; তাঁহার সঙ্গে আর এক প্রতিদ্বন্দ্বী বিধাতা আছেন—যাহার সহিত তাঁহাকে সর্বদাই সংগ্রাম করিতে হইতেছে। এই প্রতিদ্বন্দ্বী বিধাতাকে আমরা অমঙ্গলময় বিধাতা বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। মঙ্গলময়ের সকল কার্যে বাধা দেওয়া এবং বিঘ্ন উৎপাদন করাই তাহার কাজ। তাহার এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে পৃথিবীর কোন জিনিষই সর্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারিতেছে না; কোন না কোন দোষ-ত্রুটি রহিয়া যাইতেছে।

ইহাই দ্বি-ঈশ্বরবাদিগণের মত। তাঁহারা বলেন দুইরকম ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে পৃথিবীতে অন্যায় অবিচার এবং দোষ-ত্রুটির কোন সন্তোষ-জনক ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। কথাটি ভাল করিয়া বুঝান যাউক। পৃথিবীতে যে বহু দোষ ও ত্রুটি আছে—তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না।

কিন্তু এত যে দোষ ত্রুটি, তাহা আসিল কোথা হইতে? এত যে অন্যায় অবিচার, তাহার জন্য দায়ী কে? ইহার উত্তর সহজ। যদি আমরা বলি যে দুনিয়ায় একজন মাত্র ঈশ্বর আছেন, দ্বিতীয় কোন ঈশ্বর নাই, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে এই "এক এবং অদ্বিতীয়" পরমেশ্বরই সব দোষ-ত্রুটির জন্য দায়ী; যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন তিনিই ইহার দোষ-ত্রুটিও সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি করিয়াছেন। এক্ষেত্রে ঈশ্বর "এক" বটে, কিন্তু সেই একক ঈশ্বর সম্পূর্ণ মঙ্গলময় বলা যায় না; তিনি অমঙ্গলের জন্যও সম্পূর্ণ দায়ী।

তখন সাধারণতঃই প্রশ্ন উঠে, এইপ্রকার দোষ-ত্রুটিবহুল অপূর্ণ ঈশ্বরকে পূজা ও শ্রদ্ধা করা যায় কি? আমরা জানি যে তিনি শুধু মঙ্গলময় নহেন, অমঙ্গলময়ও বটেন; তৎসত্ত্বেও তাঁহাকে ভক্তি করিতে পারা যায় কি? জানিয়া শুনিয়াও কি কেহ এই প্রকার অমঙ্গলময় বিধাতাকে পূজা করিতে পারেন? তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে একেশ্বরবাদ স্বীকার করিলে আমাদের মনে ধর্মভাবের উদ্রেক হওয়া সম্ভব নহে। সেইজন্য অনেকে বলেন যে যদি দ্বিতীয় ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় তাহা হইলে আমরা ঈশ্বরের মহত্ত্ব বজায় রাখিতে পারি এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্মভাবের সার্থকতাও প্রমাণ করিতে পারি। কারণ, তখন এই দ্বিতীয় ঈশ্বরের উপর জাগতিক অপূর্ণতার সকল দায়িত্ব আরোপ করিয়া আমরা আমাদের ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ মঙ্গলময় বলিয়া কল্পনা করিতে পারি। তখন আমরা বলিতে পারি যে ঈশ্বর সত্যই কল্যাণময়; তিনি সর্বদাই কল্যাণ-কার্যে ব্যাপৃত আছেন; কিন্তু এক প্রতিদ্বন্দ্বী ঈশ্বরের সহিত সংগ্রাম করিতে হইতেছে বলিয়া তাঁহার সৃষ্টি সর্বাঙ্গ-সুন্দর হইতে পারিতেছে না। ইহার জন্য ঈশ্বরের কোন দোষ নাই; তিনি মহৎ, তিনি পূর্ণ, তিনি পবিত্র। অতএব তাঁহাকে আমরা সর্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা ও পূজা করিতে পারি।

সমালোচনা

এইভাবে দ্বিতীয় ঈশ্বরেব অস্তিত্ব স্বীকার করিলে ঈশ্বরের মহত্ত্ব বজায় রাখা যায় বটে, কিন্তু তাঁহাকে খুবই ক্ষুদ্র ও সীমাবদ্ধ করিয়া দেখা হয়। সীমাবদ্ধ, কারণ তিনি আর তখন এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বর নহেন; আর একজন ঈশ্বরের জন্য তাঁহাকে স্থান করিয়া দিতে হইয়াছে; পরিণামে তিনি পরিবেষ্টিত ও সীমায়িত হইয়া পড়িয়াছেন। এক কথায়, তখন আর তাঁহাকে

অনন্ত ও অসীম বলা যায় না ; তিনিও আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র ও সসীম। শুধু তাহাই নহে ; তাঁহার শক্তিও মানুষের শক্তির ন্যায় সীমায়িত হইয়া পড়ে। সেইজন্যই তো তিনি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাভূত করিতে পারেন না, বরং প্রতিদ্বন্দ্বীর দ্বারাই তিনি পরাভূত হইয়া পড়েন, ফলে তাঁহার সৃষ্টিতে বহু ত্রুটি বিচ্যুতি রহিয়া যায়। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যাহার সহিত তাহাকে নিরন্তর সংগ্রাম করিতে হইতেছে, তাহার সহিত তিনি পারিয়া উঠিতেছেন না ; অর্থাৎ তিনি সর্বশক্তিমান নহেন ; তাঁহার শক্তি সীমায়িত ও পরিমিত। এখন আমরা জিজ্ঞাসা করি—এইপ্রকার পরিমিত শক্তিসম্পন্ন, সংকীর্ণ ও সসীম ভগবানকে মানুষ পূজা করিতে যাইব কেন ? উত্তরে দ্বি-ঈশ্বরবাদিগণ বলেন, কেনই বা পূজা করিব না ? যে ঈশ্বর সর্বদাই আমাদের মঙ্গল কামনা করেন, সকলেরই তাঁহাকে পূজা করা উচিত। প্রত্যুত্তরে আমরা বলি—যতই তিনি মঙ্গল কামনা করুন না কেন, অমঙ্গলকে জয় করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই। তিনি ক্ষুদ্র, তিনি দুর্বল, তিনি সসীম। কিন্তু মানুষের মন সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে চায় না, সে চায় তাহার ঈশ্বরকে অসীম ও অনন্তরূপে উপলব্ধি করিতে, নতুবা তাহার মন তৃপ্ত হয় না। তাহার ঈশ্বর হইবেন সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান, এক এবং অদ্বিতীয়, সেক্ষেত্রে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির অস্তিত্ব সম্ভব নহে। এমতাবস্থায় একেশ্বরবাদ গ্রহণ করা ছাড়া আর উপায় নাই।

একেশ্বরবাদ (Monotheism)

পাশ্চাত্যদর্শনে একেশ্বরবাদ তিন প্রকার রূপ গ্রহণ করিয়াছে, ; যথা—Conditional Monotheism, Abstract Monotheism এবং Concrete Monotheism. আমরা একে একে ইহাদের কথা আলোচনা করিব।

1. Conditional Monotheism : (Deism)

ইহাকে সাধারণতঃ Deism নামে অভিহিত করা হয়। এই মতানুসারে ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি অনাদিকাল হইতে একাকী বিরাজ করিতেছিলেন, তখন আর কিছুই ছিল না। একদিন হঠাৎ তাঁহার ইচ্ছা হইল তিনি বিশ্বসংসার সৃষ্টি করেন ; তখন তাঁহার ইচ্ছা হইতেই (out of nothing) এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইল। অতএব তিনিই ইহার আদি কারণ (First cause)।

সৃষ্টির পরে ঈশ্বর আবার আত্মসমাহিত হইয়া পড়িলেন ; অর্থাৎ বিশ্ব

সংসারের কার্য্যকলাপে তাহার আর কোন সম্পর্ক থাকিল না; তিনি নিজেকে দূরে অপসৃত করিয়া লইলেন। ফলে সৃষ্টির পূর্বে তিনি যেমন একাকী ছিলেন আবার সেইরূপ একক হইয়া পড়িলেন। অবশ্য এখন তাঁহার বাহিরে এক বিশ্ব সংসার রহিয়া গেল বটে, কিন্তু উহার সহিত তাঁহার কার্যতঃ কোনই সম্বন্ধ থাকিল না, তিনি আগে যেমন ছিলেন এখনও ঠিক সেই রকমই রহিয়া গেলেন—নির্জ্জন, নিঃসঙ্গ, একাকী।

তখন বিশ্বসংসারের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক থাকিল না বটে, কিন্তু তাহাতে বিশ্বসংসারের বিশেষ কোন ক্ষতি হইল না; উহার কার্যকলাপ আগের মতই সুষ্ঠুভাবে চলিতে লাগিল। কারণ, ঈশ্বর যখন দুনিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন তখন তিনি শুধু দুনিয়া সৃষ্টি করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, ইহাকে পরিচালিত করিবার জন্য যথাযথ নিয়মাবলীও প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। তাই ঈশ্বর যখন দূরে সরিয়া গেলেন তখন তাঁহার প্রবর্তিত নিয়মগুলির দ্বারা জগতের কার্যাবলী পরিচালিত হইতে লাগিল, ফলে কোথাও কোনরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারিল না। তাই দেখি, সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি প্রত্যেক জিনিষই এখন এই দুর্লঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে নিজ নিজ কার্য সম্পাদন করিয়া চলিয়াছে; কোন ক্ষেত্রেই এখন আর প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরকে কিছু করিতে হইতেছে না। সেইজন্য এখন আর ঈশ্বরকে "সূর্যগ্রহণের" কারণ বলা যায় না; এখন ইহার কারণ সূর্য এবং চন্দ্র, অর্থাৎ সূর্যচন্দ্রই এখন "গ্রহণ" সৃষ্টি করে, ঈশ্বরের কোন হাত নাই। কিন্তু এখানে একটি কথা আছে, চন্দ্রসূর্য "গ্রহণ" সৃষ্টি করে বটে, কিন্তু চন্দ্রসূর্য সৃষ্টি করিল কে? পূর্বেই বলিয়াছি, ঈশ্বরই সব সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব চন্দ্রসূর্যও ঈশ্বরেরই সৃষ্টি, এবং যে নিয়ম অনুসারে ইহারা "গ্রহণ" সৃষ্টি করে সেই নিয়মেরও সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর। সেইজন্য ঈশ্বরকে বলা হয় গ্রহণের আদি কারণ (First cause), আর সূর্য চন্দ্রকে বলা হয় বর্তমান কারণ বা গৌণ কারণ (Secondary Cause)।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে সৃষ্ট করিবার পরে ঈশ্বর আর এই বিশ্বজগতের কোন কার্যে হস্তক্ষেপ করেন না, বস্তুতঃ হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজনই হয় না। কিন্তু যদি কখন প্রয়োজন হয় তবে তৎক্ষণাৎ তাঁহার সাহায্য পাওয়া যাইবে। কোথাও কোন ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটিলে তিনি অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করেন এবং উহার প্রতিকারের যথাযথ ব্যবস্থা করিয়া সংসারকে আবার নির্দিষ্ট পন্থায় পরিচালিত করেন। গীতার ভাষায় বলা যায় "যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত, অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং"। যদি কোন সাধু কার্য

বা সাধুজনকে রক্ষা করিবার কখন প্রয়োজন হয় তাহা হইলে কিছুক্ষণের জন্য প্রাকৃতিক নিয়মকেও তিনি প্রত্যাহার করিতে পারেন ; তাই শুনি জলের উপর দিয়া যীশু হাঁটিয়া গিয়াছিলেন এবং সিংহের মুখে পড়িয়াও প্রহ্লাদের কোন বিপদ হয় নাই। এইসব ঘটনাকে আমরা সাধারণতঃ অলৌকিক ঘটনা (Miracle) বলিয়া বর্ণনা করি। প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে ইহা সম্ভব নহে ; ঈশ্বরের হস্তক্ষেপেই এইরূপ ঘটিয়া থাকে।

এইরূপ অসাধারণ উপলক্ষ ব্যতীত ঈশ্বরের সহিত বিশ্বজগতের এখন আর কোন সাক্ষাৎ সম্পর্ক নাই , তিনি নিজেকে জগৎ হইতে দূরে অপসারিত করিয়া রাখিয়াছেন। পারিভাষিক সংজ্ঞায় ইহাকে অতিবর্তন (Transcendence) বলে। অতিবর্তন, কারণ এ ক্ষেত্রে ঈশ্বর বিশ্বকে অতিক্রম করিয়া একেবারে ইহার বাহিরে বর্তমান থাকেন, ইহার ভিতরে থাকেন না। অতিবর্তনের বিপরীত অবস্থার নাম অনুবর্তন (Immanence) , সে ক্ষেত্রে বিশ্বের বাহিরে তিনি বিদ্যমান থাকেন না, তিনি থাকেন বিশ্বের অভ্যন্তরে। তাই তখন ঈশ্বরকে বলা হয় বিশ্বানুগ (Immanent), অর্থাৎ বিশ্বের অন্তর্গত। আর যখন তিনি বিশ্বের বাহিরে থাকেন তখন তাঁহাকে বলা হয় বিশ্বাতিগ। Deism মতে ঈশ্বর বিশ্বাতিগ।

সমালোচনা

Deism মতে বলা হইতেছে যে আদিতে শুধু ঈশ্বর ছিলেন, বিশ্বজগৎ ছিল না। পরে এক শুভ মুহূর্তে তিনি এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিলেন। এখন আমরা জিজ্ঞাসা করি , তিনি তো একাকী ভালই ছিলেন, তবে হঠাৎ এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিতে গেলেন কেন ? তাহা হইলে কি বলিতে হইবে যে যখন তিনি একাকী ছিলেন তখন তিনি পূর্ণ ছিলেন না ? তাঁহার মধ্যে অপূর্ণতা ছিল বলিয়াই কি তিনি বিশ্বসংসার সৃষ্টি করিয়া নিজের পূর্ণতা সাধন করিলেন ? তাই যদি হয়, তবে তিনি আরও আগে সৃষ্টি করিলেন না কেন ? বলা বাহুল্য, এইরকম কোন প্রশ্নেরই সমুচিত উত্তর পাওয়া যাইবে না।

দ্বিতীয়তঃ, সৃষ্টির পরে যখন তিনি নিজেকে বিশ্বজগৎ হইতে দূরে সরাইয়া লইলেন তখন তাঁহার অবস্থা কি হইল ? Deism মতে তখন তো সমস্ত কার্যই বর্তমান কারণ বা গৌণ কারণের দ্বারা সম্পন্ন হইতে লাগিল ; তাহা হইলে আদি কারণ অর্থাৎ ঈশ্বরের কি কাজ রহিল ? শেক্‌স্‌পিয়ারের ভাষায় বলিতে হয় "His occupation is then gone"। তিনি কি তখন নিশ্চল নিষ্কর্মা হইয়া

নিদ্রামগ্ন হইলেন ? কিন্তু ঈশ্বরের সম্বন্ধে এইরকম কথা কি প্রযোজ্য ? তাই কেহ হয়ত উত্তর দিবেন, ভগবানের সম্বন্ধে এরকম কথা বলিবার কোন কারণ নাই ; তিনি আবার নিদ্রামগ্ন হইবেন কেন ? এ কি কথা ? সৃষ্টির পরে তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করেন বটে, কিন্তু সর্বদাই সজাগ থাকেন ; তাই বিশ্বজগতের কার্য-কলাপে যখনই কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে তখনই তিনি হস্তক্ষেপ করেন এবং যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া উহার প্রতিকার সাধন করেন। এমতবস্থায় তাহাকে নিদ্রামগ্ন বলা যাইতে পারে কি ? উত্তরে আমরা জিজ্ঞাসা করি—এইপ্রকার বারংবার হস্তক্ষেপের প্রয়োজনই বা হয় কেন ? তিনি কি প্রথম হইতেই একটি ত্রুটি-বিচ্যুতিহীন পূর্ণাঙ্গ বিশ্ব সৃষ্টি করিতে পারিতেন না ? তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি নিজেই পূর্ণ এবং সর্বশক্তিমান নহেন ; তাই তাঁহার সৃষ্ট বিশ্বও অপূর্ণ এবং ত্রুটিবহুল।

তৃতীয়তঃ, সৃষ্টির পরে ঈশ্বর বিশ্বজগতের সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া দূরে অবস্থান করেন, ইহাই যদি ঠিক হয় তবে বলিতে হইবে যে ঈশ্বর বিশ্বজগতের দ্বারা সীমায়িত হইয়া পড়েন ; এমতাবস্থায় তাঁহাকে অসীম ও অনন্ত (Infinite) বলিয়া বর্ণনা করা যায় না। এক্ষেত্রে তিনি সসীম—একদিকে আছেন ঈশ্বর স্বয়ং আর একদিকে আছে তাঁহার সৃষ্ট বিশ্বজগৎ, দুই ই স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। সেইজন্য এই মতবাদকে আমরা Conditional Monotheism বলিয়াছি। Monotheism, কারণ, এক্ষেত্রে ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার পাশে আর একটি জিনিষ আছে—যাহা ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াও বস্তুতঃ ঈশ্বরকেই আবার সীমায়িত করিয়া ফেলিয়াছে। এইভাবে প্রকারান্তরে ঈশ্বরের ন্যায় উহারও স্বাধীন সত্তা স্বীকার করা হইতেছে। বলা বাহুল্য, ঈশ্বরকে এইভাবে সীমায়িত করিয়া দেখিতে আমাদের মন চায় না। আমরা ঈশ্বরকে দেখিতে চাই অসীম অনন্তরূপে। পরবর্তী মতবাদে আমরা ঠিক তাহাই পাই।

(II) Abstract Monotheism. (Pantheism)

ইহাকে সাধারণতঃ Pantheism নামে অভিহিত করা হয়। Pan মানে all, আর theos মানে God ; অতএব Pantheism মানে "all is God" অর্থাৎ সবই ঈশ্বর বা ঈশ্বরই সব। ঈশ্বর ব্যতীত কিছুই নাই। কিন্তু ঈশ্বর ব্যতীত যদি কিছুই না থাকে, তাহা হইলে বিশ্বজগতের কি অবস্থা হয় ? প্রধানতঃ এই প্রসঙ্গ লইয়াই Pantheism এবং Deism-এর পার্থক্য। Deism বলেন যে

এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন স্বয়ং ঈশ্বর, তিনিই ইহার স্রষ্টা। কিন্তু Pantheism তাহা মোটেই স্বীকার করেন না ; এই মতানুসারে, ঈশ্বরের পক্ষে সৃষ্টি করা মোটেই সম্ভব নহে। কারণ 'ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিলেন', ইহা বলিলেই বুঝিতে হইবে যে ঈশ্বরের জীবনে এমন এক মুহূর্ত ছিল যখন তিনি জগৎ সৃষ্টি করেন নাই ; তখন তিনি শুধু একাকী ছিলেন, জগৎ ছিল না। কিন্তু Pantheism মতে ইহা সম্ভব নহে। Pantheism বলেন যে ঈশ্বর লইয়াই জগৎ, এবং জগৎ লইয়াই ঈশ্বর ; ইহাদিগকে এক মুহূর্তও বিচ্ছিন্ন বা পৃথক করা যায় না। যেমন সমুদ্র ও জলবিন্দু, আমরা কি এমন কোন মুহূর্ত কল্পনা করিতে পারি যখন শুধু সমুদ্র আছে, কিন্তু জলবিন্দু নাই ; অথবা শুধু জলবিন্দু আছে অথচ সমুদ্র নাই ? সেইরূপ, আমরা এমন কোন মুহূর্ত কল্পনা করিতে পারি না যখন শুধু ঈশ্বর আছেন অথচ জগৎ নাই। অতএব Deism যে সৃষ্টির কথা বলেন তাহা মোটেই গ্রহণ যোগ্য নহে। দ্বিতীয়তঃ, সৃষ্টির পরে জগতের যে স্বতন্ত্র সত্তার কথা Deism কল্পনা করেন তাহা আরও গ্রহণযোগ্য নহে। Pantheism মতে "ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ", অর্থাৎ জগতে যাহা কিছু আছে সমস্তই ঈশ্বরের দ্বারা পরিব্যাপ্ত। এই জগৎ হইতে যদি ঈশ্বরকে পৃথক করিয়া ফেলা হয়, তাহা হইলে জগতের কোন অস্তিত্বই থাকে না। সমুদ্রের মধ্যেই তরঙ্গ অবস্থিত এবং তরঙ্গের মধ্যেই সমুদ্র পরিব্যাপ্ত। এমতাবস্থায়, তরঙ্গগুলিকে কি আমরা সমুদ্র হইতে পৃথক করিয়া বিচ্ছিন্ন করিতে পারি ? মোটেই না। সমুদ্র ব্যতীত তরঙ্গের অস্তিত্ব যেমন সম্ভব নহে, সেইরূপ ঈশ্বর ব্যতীত বিশ্বেরও স্বতন্ত্র সত্তা সম্ভব নহে। তৃতীয়তঃ, Deism শুধু বিশ্বেরই স্বতন্ত্র সত্তা প্রচার করেন, তাহা নহে, ঈশ্বরেরও স্বতন্ত্র সত্তায় বিশ্বাস করেন। এই মতানুসারে ঈশ্বর বিশ্বাতিগ, তিনি বিশ্ব হইতে দূরে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করেন (Transcendent); কিন্তু Pantheism মতে ঈশ্বর মোটেই বিশ্বাতিগ নহেন ; তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বানুগ ; তিনি বিশ্বের মধ্যেই অবস্থিত আছেন (Immanent)। বিশ্বের বাহিরে ঈশ্বর নাই, আর ঈশ্বরের বাহিরে কিছুই নাই। সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত করিয়া ঈশ্বর বিরাজ করিতেছেন ; তিনিই বিশ্ব এবং বিশ্বই তিনি।

সমালোচনা

Pantheism মতে সবই ঈশ্বর ; ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই নাই, অতএব বিশ্বজগতেরও কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই। তাহা হইলে সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র সমন্বিত

এই যে বিশ্বজগৎ আমরা প্রতিমুহূর্তে প্রত্যক্ষ করিতেছি, উহা কি একেবারে মিথ্যা এবং অবাস্তব? উহার কি কোনই অস্তিত্ব নাই? Pantheism তাহাই বলেন, এই মতানুসারে জগতের সত্যই কোন অস্তিত্ব নাই; জগৎ একেবারে মিথ্যা, মায়া। আমরা ইহাকে সত্য বলিয়া মনে করি বটে, কিন্তু উহা আমাদের মনের ভুল মাত্র। ইহার উত্তরে আমরা বলিতে চাই যে Pantheism যাহাই বলুন না কেন, আমরা আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতাকে একেবারে অস্বীকার করিতে পারি না। আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতায় বুঝি যে সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি পদার্থ কঠোর বাস্তব পদার্থ, ইহাদিগকে একেবারে মিথ্যা বা মায়া বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া সহজ নহে এবং সঙ্গতও নহে।

দ্বিতীয়তঃ, বিশ্বের অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার ফলে শুধু যে সূর্য চন্দ্রই মিথ্যা হইয়া যায়, তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অস্তিত্বও অবলুপ্ত হইয়া যায়। ঈশ্বর ব্যতীত যদি কিছুই না থাকে, তাহা হইলে মানুষই বা থাকে কি করিয়া? তাহারও স্বতন্ত্র সত্তা অবলুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু মানুষের স্বাতন্ত্র্য অবলুপ্ত হইলে পৃথিবী হইতে নৈতিকতাও অবলুপ্ত হইয়া যায়। কারণ, নৈতিক জীবন শুধু তাহার পক্ষেই সম্ভব যাহার আত্ম-স্বাতন্ত্র্য আছে, কিন্তু মানুষ ব্যতীত আর কাহার জীবনে এই আত্ম-স্বাতন্ত্র্য সম্ভব? মানুষই শুধু স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে পারে, সেই কেবল বিচার-বিবেচনা-পূর্বক কাজ করিয়া থাকে। তাই সে তাহার কার্যের জন্য দায়ী, এবং দায়ী বলিয়াই তাহার কাজ সম্বন্ধে ন্যায় অন্যায়ের প্রশ্ন তুলিয়া আমরা তাহাকে নৈতিকভাবে বিচার করিতে পারি। এক কথায়, আত্ম-কর্তৃত্ব আছে বলিয়াই আমাদের নৈতিক দায়িত্ব আছে, নতুবা আমাদের জীবনে নৈতিকতাই সম্ভব হইত না। তাই আমরা বলিয়াছি যে মানুষের আত্ম-স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত হইয়া গেলে পৃথিবী হইতে নৈতিকতাও লুপ্ত হইয়া যাইবে। শুধু নীতিজ্ঞান নহে, মানুষের ধর্মজ্ঞানও লুপ্ত হইয়া যাইবে। কারণ, ধর্মভাবের মূলেও আছে মানুষের স্বাতন্ত্র্য বোধ। মানুষ ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র, তাই তো মানুষ ঈশ্বরের পূজা করে, কিন্তু মানুষের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব না থাকিলে, কে কাহাকে পূজা করিবে? এক কথায়, ধর্মভাবের জন্য দ্বৈতবোধের প্রয়োজন; একদিকে আছেন ঈশ্বর—তাঁহার বিশাল অসীমত্ব লইয়া, আর একদিকে আছে মানুষ তাহার সসীম ক্ষুদ্রত্ব লইয়া। যখন মানুষ তাহার এই ক্ষুদ্রত্ব উপলব্ধি করিতে পারে, তখনই সে ঈশ্বরের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু Pantheism বলেন মানুষের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই, সবই ঈশ্বরের; তাহা হইলে আমরা জিজ্ঞাসা করি ঈশ্বরের পূজা করিবার জন্য তখন থাকিল কে? কে তখন ঈশ্বরকে পূজা করিতে

যাইবে ? তাই আমরা বলিয়াছি যে Pantheism মতে ধর্মবোধ ও নীতিবোধ কিছুই সম্ভব নহে, সমস্তই মিথ্যা, সমস্তই মায়া। কিন্তু Pantheism যাহাই বলুন না কেন, মানুষের এই নীতিবোধ ও ধর্মবোধকে আমরা একেবারে উড়াইয়া দিতে পারি না। যাহা মানব জীবনের অমূল্য সম্পদ তাহা সম্পূর্ণ অবাস্তব বলিয়া বর্জন করা সহজ নহে, সম্ভবও নহে।

তৃতীয়তঃ, Pantheism মতানুসারে মানুষের কোন স্বাতন্ত্র্য নাই, বিশ্বজগতের কোন অস্তিত্ব নাই। তাহা হইলে আমরা জিজ্ঞাসা করি ঈশ্বরের মধ্যে রহিল কি ? কোথাও কোন জীব নাই, মানুষ নাই, সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র কোথাও কিছু নাই, সবই অলীক, সবই মায়া। এমতাবস্থায় ঈশ্বরকে "মহাশূন্য" বলিয়া ব্যাখ্যা করা ছাড়া আর গতি কি ? তিনিই একমাত্র সত্য পদাথ বটে, কিন্তু তাঁহার মধ্যে কোনই বিষয়বস্তু নাই, তিনি একক, তিনি শূন্য। বহুত্ব বর্জন করিয়া এই যে একত্ব, এই যে মহাশূন্যতা, ইহার কি কোন সার্থকতা আছে ? তাই Pantheism সম্বন্ধে Dr. Stephen বলেন "It is **abstract** monotheism in the sense that it takes the One in abstraction from the Many, and regards it as constituting all reality by itself. But unity without plurality, the one apart from the many, is an unreal abstraction." অতএব আমাদিগকে এখন Concrete Monotheism সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হইবে। এক্ষেত্রেও ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয় ; তবে তিনি শূন্য নহেন, তিনি পূর্ণ ; তাঁহার মধ্যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, চেতন অচেতন, সমস্ত পদার্থই বিদ্যমান রহিয়াছে। বহুত্বকে বর্জন করিয়া তিনি তাঁহার একত্ব লাভ করেন নাই ; বহুত্বের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াই তিনি তাঁহার একত্ব বজায় রাখিয়াছেন। তাই ইহাকে Concrete Monotheism বলে। এখন এই মতবাদ ব্যাখ্যা করা যাইবে।

(III) Concrete Monotheism : (Panentheism)

ইহার সাধারণ নাম Theism ; এবং ইহাই পাশ্চাত্য জগতে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা বলিয়া গৃহীত হয়। এই মতবাদের বৈশিষ্ট্য এই যে—ইহাতে Deism এবং Pantheism, উভয় মতবাদেরই সমন্বয় সাধন করা হইয়াছে। Deism বলেন যে ঈশ্বর বিশ্বাতিগ, অর্থাৎ বিশ্বকে অতিবর্তন করিয়া বিশ্বের বাহিরে তিনি বর্তমান আছেন। আর Pantheism বলেন যে ঈশ্বর বিশ্বানুগ, বিশ্বকে ব্যাপ্ত করিয়া বিশ্বের অভ্যন্তরেই তিনি বিদ্যমান আছেন।

বলা বাহুল্য দুইটিই চরম মতবাদ; সেইজন্য দুইটিকেই সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। তবে দুইটিকেই আংশিকভাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে; Theism ঠিক তাহাই করেন। তাই Theism বলেন যে ঈশ্বর একেবারে বিশ্বাতিগ নহেন বা একেবারে বিশ্বানুগ নহেন, তিনি একাধারে বিশ্বাতিগ এবং বিশ্বানুগ—দুই-ই। কথাটি ভাল করিয়া বুঝান দরকার। Pantheism যখন বলেন যে ঈশ্বর বিশ্বের অভ্যন্তরে বর্তমান আছেন, তিনিই বিশ্বের প্রাণ, তিনিই বিশ্বের সব—তখন Theism তাহা স্বীকার করেন। তাঁহারাও বলেন যে ঈশ্বর অন্তর্ব্যাপী, তিনি বিশ্বানুগ; কিন্তু Pantheism যখন বলেন যে এই বিশ্ব লইয়াই ঈশ্বর, ইহার বাহিরে কোন ঐশ্বরিক সত্তা নাই, তখন Theism তাহা স্বীকার করেন না; Theism বলেন যে এই বিশ্বের বাহিরেও ঈশ্বর আছেন, তিনি বিশ্বাতিগও বটেন। এবিষয়ে বরং Deism-এর সহিত তাঁহারা একমত; কারণ Desim বলেন যে বিশ্বের মধ্যে ঈশ্বরকে সীমায়িত করা যায় না, তিনি বিশ্বেরও অতীত, তিনি বিশ্বাতিবর্তী। Theism-ও ঠিক তাহাই বলেন; শুধু বিশ্বের মধ্যেই ঈশ্বর লীন নহেন; বিশ্বকে অতিক্রম করিয়া অসীমের মধ্যেও তিনি পরিব্যাপ্ত। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে Theism এক মধ্যপন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, এবং এইভাবে Deism ও Pantheism-এর মধ্যে এক সমন্বয় স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

পারিভাষিক সংজ্ঞায় এই Theism-কে Panentheism নামে অভিহিত করা হয়। পূর্ব বর্ণিত Pantheism-এবং অধুনা বর্ণিত Panentheism মতদ্বয়ের পার্থক্য বুঝিতে হইলে এই দুইটি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। (১) Pantheism; মানে Pan = all, Theos = God; অতএব Pantheism মানে All is God; অর্থাৎ সবই ঈশ্বর। (২) Panentheism; Pan = all, en = in, Theos = God: অতএব Panentheism মানে All is in God, অর্থাৎ সবই ঈশ্বরের মধ্যে বিদ্যমান। একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে "সবই ঈশ্বর" এবং "সবই ঈশ্বরের মধ্যে বিদ্যমান"—ইহাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। "সবই ঈশ্বর" বলিলে বুঝিতে হইবে যে ঈশ্বর ছাড়া আর কাহারো কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। কিন্তু "সবই ঈশ্বরের মধ্যে বিদ্যমান—ইহার অর্থ এই যে ঈশ্বর ছাড়া আরও অনেক জিনিষ আছে, তবে তাহারা ঈশ্বরের বাহিরে নাই, ঈশ্বরের ভিতরে আছে। ঈশ্বরের ভিতরে থাকিলেই যে তাহাদের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিবে না—এমন কোন অর্থ নাই, ভিতরে থাকিয়াও তাহারা নিজ নিজ স্বতন্ত্র সত্তা বজায় রাখিতে পারে এবং

রাখিয়া থাকে। যেমন ধর, এখন আমি দুঃখ অনুভব করিতেছি; অতএব এই দুঃখানুভূতি আমার মধ্যে বিদ্যমান। কিন্তু তাই বলিয়া কি বুঝিতে হইবে যে দুঃখবোধের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই? আমি ও দুঃখবোধ কি একই জিনিষ? মোটেই না; সেইরূপ যখন বলা হয় যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সবই ঈশ্বরের মধ্যে বিদ্যমান, তখন ইহার অর্থ এই নহে যে বিশ্ব এবং ব্রহ্ম একই জিনিষ; ব্রহ্মের মধ্যে থাকিয়াও বিশ্বের এক স্বতন্ত্র সত্তা থাকিতে পারে ও থাকে। ইহাই Panentheism-এর মত। এই বিষয়ে শুধু Pantheismএর সহিত কেন, Deism-এর সহিতও ইহার কোন মিল নাই। কারণ Deism বলেন যে বিশ্বের স্বতন্ত্র সত্তা আছে বটে, তবে ঈশ্বরের মধ্যে ইহা বিদ্যমান নাই, ইহা বিদ্যমান আছে ঈশ্বরের বাহিরে। Panentheism বলেন, তাহা হইবে কেন? ঈশ্বরের বাহিরে থাকিলেই বুঝিতে হইবে যে ইহা ঈশ্বরকে সীমায়িত করিয়া ফেলিয়াছে; কিন্তু ঈশ্বর তো সসীম নহেন, তিনি অসীম, তিনি সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার বাহিরে কিছুই থাকিতে পারে না।

ঈশ্বরের আত্ম-প্রকাশ

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে Deism মতানুসারে বিশ্বের স্বতন্ত্র সত্তা আছে বটে, কিন্তু ব্রহ্মের বাহিরেই ইহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, ব্রহ্মের ভিতরে নহে। আবার Pantheism মতানুসারে ব্রহ্মের বাহিরে কিছুই নাই, বিশ্ব আছে ব্রহ্মের ভিতরে, এবং সেইজন্য ইহার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। এই দুই মতবাদের সমন্বয় সাধন করিয়া Theism বলিতেছেন যে, বিশ্বের স্বতন্ত্র সত্তা আছে বটে (Deism), তবে ব্রহ্মের ভিতরেই ইহার স্বতন্ত্র সত্তা (Pantheism), বাহিরে নহে। এখন আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিব—যে বিষয়ে Pantheism-এর সহিত ইহার মিল আছে, কিন্তু Deism-এর সহিত কোন মিল নাই। Deism বলেন যে, কোন এক শুভ মুহূর্তে ঈশ্বর এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন; কিন্তু Theism এবং Pantheism কেহই ইহা স্বীকার করে না। কারণ সৃষ্টির কথা স্বীকার করিলেই মানিয়া লইতে হইবে যে সৃষ্টির পূর্বে অন্য কিছু ছিল না, তখন ঈশ্বর শুধু একাকী ছিলেন। কিন্তু Theism এবং Pantheism উভয়েই বলেন যে ইহা অসম্ভব। কারণ, ঈশ্বর আগে একাকী ছিলেন, পরে বিশ্ব সৃষ্টি করিলেন—ইহার অর্থ এই যে ঈশ্বর আগে অপূর্ণ ছিলেন, পরে বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া তিনি নিজের পূর্ণতা সাধন করিলেন। কিন্তু ঈশ্বরকে কখনই আমরা এইরূপ অপূর্ণভাবে চিন্তা করিতে পারি না; তিনি পূর্ণ, অনাদিকাল হইতে পূর্ণ, চিরকালের জন্য পূর্ণ। অতএব

ঈশ্বরের সম্বন্ধে সৃষ্টির কথা উঠিতেই পারে না, সৃষ্টির কথা যদি বলিতেই হয় তবে বলিতে হইবে যে তিনি আবহমানকাল সৃষ্টি করিতেছেন। তাঁহার সৃষ্টি কখন আরম্ভ হয় নাই, আর কখন শেষও হইবে না। সৃষ্টি মানে আত্মপ্রকাশ; ইহাই তাঁহার ধর্ম। তিনি কখন আত্মগোপন করিয়া বা আত্মসঙ্কুচিত হইয়া থাকিতে পারেন না। তিনি নিরন্তর আত্মপ্রকাশ করিয়া চলিয়াছেন; জীবের মধ্য দিয়া, মানুষের মধ্য দিয়া—চেতন অচেতন সকল প্রকার পদার্থের মধ্য দিয়া তিনি নিজেকে প্রকাশ করিয়া চলিয়াছেন। তাহার এই কাজের কখন শেষ নাই; তাঁহার সুপ্তি নাই, বিরাম নাই, তিনি চিরতৎপর। কবির ভাষায় বলা যায় তিনি "চঞ্চল হে", তিনি "সুদূরের পিয়াসী", সুদূরের পিয়াসী—কারণ শুধু অতীত বা বর্তমান কর্মধারায় তিনি তৃপ্ত নহেন, তিনি অনন্ত কর্মধারায় নিমগ্ন; তিনি সুদূরের মধ্যে, অসীমের মধ্যে, আত্ম-বিকশিত করিবার জন্য চিরচঞ্চল। তাই আমরা ঈশ্বরের জীবনে এমন কোন মুহূর্ত কল্পনা করিতে পারি না যখন তিনি শুধু একাকী থাকেন, কিন্তু তাঁহার সৃষ্টি থাকে না। নাড়ির স্পন্দন ছাড়া যেমন মানুষের প্রাণ থাকিতে পারে না, সেইরূপ সৃজন ছাড়াও ঈশ্বর থাকিতে পারেন না, সীমা ব্যতিরেকে অসীম অসম্ভব, সসীমের মধ্যেই অসীমের প্রকাশ। "সীমার মাঝে অসীম তুমি, তাই এত মধুর।"

চতুর্থ অধ্যায়

ঈশ্বর ও জীব জগৎ

Theism (বা Panentheism) মতানুসারে ঈশ্বরের সহিত জীব ও জগতের কি সম্বন্ধ পূর্ব অধ্যায়ে তাহার কিঞ্চিৎ নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এখন একটু সবিস্তারে বর্ণনা করা যাউক। জড়জগৎ বলিতে আমরা বুঝি সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র, নদী পর্বত বৃক্ষ সমন্বিত এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড। আমরা ইহাদিগকে মায়া বা মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি না; ইহারা কঠোর সত্য, ইহারা বাস্তব। ঈশ্বর নিজে ইহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং এইরূপ আরও অসংখ্য জিনিষ তিনি নিরন্তর সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি এই সৃষ্টি ক্ষণিকের সৃষ্টি নহে, চিরন্তন সৃষ্টি; অনাদি কাল হইতে তাঁহার এই সৃষ্টিলীলা চলিয়াছে। তবে শুধু লীলাখেলার জন্যই তাঁহার এই সৃষ্টি নহে; ইহার এক অন্তর্নিহিত গূঢ় উদ্দেশ্য আছে—উদ্দেশ্য আত্মপ্রকাশ। কারণ ঈশ্বর কখনই অপ্রকট থাকিতে পারেন না, তাঁহাকে ব্যক্ত হইতেই হইবে। কিন্তু ব্যক্ত হইতে

হইলেই তাঁহাকে সৃষ্টি করিতে হয়; তাই সৃষ্টির মাধ্যমেই তিনি নিরন্তর আত্ম-প্রকাশ করিয়া চলিয়াছেন। অতএব সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র সমন্বিত এই যে বিশ্বজগৎ আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি—উহার কোনটিকেই আমরা অবাস্তব বলিয়া অবহেলা করিতে পারি না; প্রত্যেকটি সৃষ্ট পদার্থই ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশের অপরিহার্য্য উপকরণ। কেবল তাহাই নহে; যাহা তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার প্রত্যেকটির মধ্যেই তিনি নিজেকে ব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছেন; অর্থাৎ তিনি অন্তর্ব্যাপী, তিনি বিশ্বানুগ (Immanent)। তবে বলা বাহুল্য, বিশ্বের মধ্যেই তাহার সত্তার পরিসমাপ্তি হয় নাই; বিশ্বকে অতিক্রম করিয়া, বিশ্বের বাহিরেও তিনি বিদ্যমান আছেন; তিনি বিশ্বাতিগ (Transcendent)।

মানুষের চিন্তা ঈশ্বরের ও চিন্তা

জড়জগতের ন্যায় প্রাণীজগতের সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা প্রযোজ্য; কারণ তাহারাও বিশ্বেরই অন্তর্ভুক্ত জীব, তাহারাও ঈশ্বরের সৃষ্টি, ঈশ্বরেরই আত্মপ্রকাশ। জড়জগতের ন্যায় প্রাণীজগতের মধ্যেও তিনি অধিষ্ঠিত আছেন, এবং অধিষ্ঠিত রহিয়াও তিনি উহাকে অতিক্রম করিয়া বিরাজ করিতেছেন। প্রাণীজগতের মধ্যে মানুষের সম্বন্ধে একটু আলাদা করিয়া আলোচনা করা দরকার, কারণ মানুষের এমন এক বৈশিষ্ট্য আছে যাহা অন্য কোন প্রাণীর নাই। মানুষ চিন্তা করে, কল্পনা করে, অনুমান করে; এক কথায় মানুষের বুদ্ধিশক্তি বা Reason আছে। এই বুদ্ধিশক্তিই তাহাকে অন্য প্রাণী হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। তবে যতই পৃথক হউক না কেন, বিশ্বের অন্যান্য পদার্থের ন্যায় সেও ঈশ্বরেরই সৃষ্ট; শুধু তাহাই নহে, তাহার বুদ্ধি-শক্তি, চিন্তা-শক্তি সমস্তই ঈশ্বরেরই অবদান। সূর্যের জ্যোতির মধ্যে তিনি যেমন আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, মানুষের বুদ্ধি-শক্তির মধ্যেও তিনি ঠিক তেমনভাবেই আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। বস্তুতঃ মানুষের বুদ্ধি তাঁহারই বুদ্ধি, মানুষের চিন্তা তাঁহারই চিন্তা—শুধু মানুষের মধ্যে পরিমিত হইয়া একটু সসীমরূপ গ্রহণ করিয়াছে মাত্র। নতুবা ঈশ্বরের সেই অনন্ত অসীম জ্ঞানই আমাদের মনের মধ্যে প্রতিভাত হইয়াছে; তিনি যাহা জানেন আমরা ঠিক তাহাই জানি, তিনি যাহা চিন্তা করেন আমরাও ঠিক তাহাই চিন্তা করি (We rethink what has already been thought out by God)। তবে পার্থক্য এত যে, ঈশ্বর চিন্তা করেন অসীমের দৃষ্টিবিন্দু হইতে, আর আমরা চিন্তা করি সসীমের দৃষ্টিবিন্দু হইতে। যেমন ধর, স্থান ও কালের সাহায্য না লইয়া আমরা চিন্তা করিতে পারি না। আমরা মনে করি, জিনিষটি কোন এক

নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত আছে বা কোন এক বিশিষ্ট সময়ে সংঘটিত হইয়াছে। অর্থাৎ আমরা কোন বিষয়কেই অখণ্ড ও অবিচ্ছিন্নরূপে চিন্তা করিতে পারি না; স্থানের মধ্যে বিচ্ছিন্ন করিয়া বা কালের মধ্যে খণ্ডিত করিয়া উহার কথা চিন্তা করিতে হয়। স্থান ও কালের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারি না বলিয়া আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী এইরূপ সীমায়িত হইয়া যায়। কিন্তু ঈশ্বর—স্থান ও কাল, উভয়েরই অতীত; তাই দূরের জিনিষ বা নিকটের জিনিষ, অতীত জিনিষ বা ভবিষ্যৎ জিনিষ—কোন জিনিষই তাঁহার প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বাহিরে থাকিতে পারে না। কিন্তু আমরা ঐভাবে প্রত্যক্ষ করিতে পারি না বলিয়া অনেক সময়ে বিভ্রান্ত হইয়া পড়ি। তখন হয়ত কোন ঘটনা দেখিয়া আমরা ভাবি—এইরূপ হইল কেন? ইহা অন্যরূপ হওয়া উচিত ছিল। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সংঘটন মুহূর্তে ঘটনাটি আমাদের নিকট যতই বিভ্রান্তিকর প্রতিভাত হউক না কেন, ইহার ভবিষ্যৎ ফলাফল জানিতে পারিলে আমরা হয়ত বিভ্রান্ত হইতাম না। তাই দেখি অনেকক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা আসিয়া বলেন যে ব্যাপারটি ভালই হইয়াছিল, বরং অন্যথা হইলেই খারাপ হইত। এইভাবে স্থান ও কালের প্রভাবে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিতে হয় বলিয়া আমাদের মুশকিল; অমাদের চিন্তার মধ্যে দোষত্রুটি রহিয়া যায়। কিন্তু ভগবানের চিন্তায় স্থান বা কালের কোনই প্রভাব নাই, তাই তাঁহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া চিন্তা করিতে হয় না, অখণ্ড জিনিষকে অখণ্ডভাবেই তিনি প্রত্যক্ষ করিতে পারেন (**Sub specie aeternitatis**)।* মানুষের ন্যায় তাঁহাকে জ্ঞাত বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া অজ্ঞাত বিষয় সম্বন্ধে অনুমান করিতে হয় না; সবই তাঁহার নিকট জ্ঞাত এবং প্রত্যক্ষ। সেইজন্য ভগবানের জ্ঞান পূর্ণ, আর আমাদের জ্ঞান অপূর্ণ। তবে পূর্বেই বলিয়াছি আমাদের জ্ঞান যতই অপূর্ণ হউক না কেন, ইহা ভগবৎ জ্ঞানেরই প্রকাশ মাত্র; যিনি অসীম তিনিই আমাদের মধ্যে সসীমরূপে চিন্তা করিতেছেন।

মানুষের ইচ্ছা ও ঈশ্বরের ইচ্ছা

বুদ্ধি-শক্তি ব্যতীত মানুষের আর একটি বৈশিষ্ট্য আছে—তাহার কথাও এখানে কিছু বলা দরকার; যথা ইচ্ছা-স্বাধীনতা (Freedom of will)। আমাদের সকলেরই ইচ্ছা-স্বাধীনতা আছে। তুমি I. A ক্লাসে ভর্তি হইয়া

---

*স্থানাতীত, কালাতীত এইপ্রকার ইন্দ্রিয় নিরপেক্ষ জ্ঞানকে অলৌকিক জ্ঞান বলা যাইতে পারে; মানুষের পক্ষে এইপ্রকার জ্ঞানলাভ করা সম্ভব নহে; শুধু ঈশ্বরের পক্ষেই সম্ভব। তাঁহার এই অলৌকিক জ্ঞান বা চেতনার স্বরূপ (*Nature of Divine consciousness*), পরে আরও একটু সবিস্তারে বিশ্লেষণ করা হইবে।

ইতিহাস লইবে কি ভূগোল লইবে তাহা তুমি নিজে ইচ্ছাপূর্বক ঠিক করিতেছ, কেহই তোমাকে জোর করিতেছে না; অর্থাৎ কি করিবে আর না করিবে সে বিষয়ে তুমি সম্পূর্ণ স্বাধীন। কিন্তু মানুষের যদি এই স্বাধীনতা থাকে, তাহা হইলে ঈশ্বরের অবস্থা কি হয়—উহা একবার ভাবিয়া দেখা দরকার। আমার স্বাধীনতা আছে—ইহার অর্থ, আমি নিজের ইচ্ছায় কাজ করি, ঈশ্বরের আদেশে নহে। এক্ষেত্রে আমার ইচ্ছা শুধু আমারই ইচ্ছা, ঈশ্বরের ইচ্ছা নহে। অথচ আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে আমাদের বুদ্ধি-শক্তি, চিন্তা-শক্তি সমস্তই ঈশ্বরের অবদান; ঈশ্বরের দানেই আমাদের সমৃদ্ধি। কিন্তু এক্ষেত্রে দেখিতেছি, আমার ইচ্ছা আর ঈশ্বরের ইচ্ছা ঠিক এক জিনিষ নহে; ইহারা পৃথক। অতএব আমি যখন আমার ইচ্ছা পূর্ণ করি তখন আমি ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ করিতেছি—এইরূপ বলা যায় না। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে মানুষের মনে এমন এক জিনিষ আছে, যাহা মানুষের নিজস্ব জিনিষ, ঈশ্বরের অবদান নহে। আমার ইচ্ছাও যদি ঈশ্বরেরই অবদান হয় তাহা হইলে আমার স্বতন্ত্র ইচ্ছা বলিয়া কোন জিনিষ থাকে না, আমার ইচ্ছা তখন প্রকারান্তরে ঈশ্বরের ইচ্ছারই নামান্তর হইয়া যায়; অতএব আমি তখন নিজ ইচ্ছা অনুসারে কাজ করিয়া প্রকারান্তরে ভবগৎ ইচ্ছাই পূর্ণ করি না কি? সেইজন্য আমার ইচ্ছা-স্বাধীনতা বজায় রাখিতে হইলে আমার ইচ্ছাকে আমারই স্বকৃত ইচ্ছা বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে, ঈশ্বরের প্রতিবিম্বিত ইচ্ছা-বলিলে চলে না। আমিই তখন আমার ইচ্ছা অনুসারে সংকল্প করি, ঈশ্বর আমার মধ্য দিয়া সংকল্প করেন না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে মানুষের চিন্তাবৃত্তি সম্পর্কে যাহা বলা যায়, তাহার ইচ্ছাবৃত্তি সম্পর্কে ঠিক তাহা বলা যায় না। মানুষের চিন্তাবৃত্তি সম্পর্কে আমরা বলিয়াছি "We rethink what has already been thought out by God"; কিন্তু তাহার ইচ্ছাবৃত্তি সম্বন্ধে আমরা বলিতে পারি না "We rewill what has already been willed by God"। অর্থাৎ মানুষের চিন্তা ঈশ্বরেরই চিন্তা, তিনিই আমাদের মধ্যে চিন্তা করিতেছেন; কিন্তু মানুষের ইচ্ছা সম্পূর্ণ ঈশ্বরের ইচ্ছা নহে, মানুষের স্বকীয় অবদানও ইহার মধ্যে যথেষ্ট আছে।

আমরা ইহা স্বীকার করি। তবে আমরা বলি যে মানুষের এই স্বাধীনতা সর্তশূন্য অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা নহে, ইহা আপেক্ষিক স্বাধীনতা। প্রথমতঃ, এই স্বাধীনতা শুধু আমার মধ্যেই আছে, তাহা নহে, আমাদের প্রত্যেকেরই মধ্যে আছে; ফলে অন্য মানুষের কার্যকলাপের দ্বারা আমার স্বাধীনতা কিঞ্চিৎ ব্যাহত

না হইয়া পারে না; আবার আমার কার্যকলাপের দ্বারাও তাহাদের স্বাধীনতা ব্যাহত হইয়া থাকে। সেইজন্য আমাদের সকলকেই পরস্পরের সুবিধা অসুবিধার কথা চিন্তা করিয়া কার্য করিতে হয়; ফলে আমরা একেবারে অনিয়ন্ত্রিতভাবে যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারি না। দ্বিতীয়তঃ, শুধু মানুষের কার্যাবলীর দ্বারাই আমাদের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত হয় না, অন্যান্য পরিস্থিতির দ্বারাও আমাদের স্বাধীনতা যথেষ্টভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। যেমন, সব মেয়েই অল্প বয়সে পুতুল লইয়া খেলিতে ভালবাসে, কিন্তু তাহারা যখন কলেজে পড়ে, তখনও কি তাহারা পুতুল খেলিতে ইচ্ছা করে? এক্ষেত্রে বয়সের দ্বারা তাহাদের ইচ্ছা-স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। সেইরূপ ছেলেরা ফুটবল খেলিতে ভালবাসে, কিন্তু তাই বলিয়া কি তাহারা দুপুর রাতে ফুটবল খেলিতে চায়? জাগতিক পরিস্থিতি চিন্তা করিয়া তাহারা নিজেদের ইচ্ছা নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে।

ইচ্ছা-স্বাধীনতা

তাহা হইলে দেখা গেল যে আমাদের ইচ্ছা-স্বাধীনতা আছে বটে, কিন্তু তাহা অবাধ স্বাধীনতা নহে, নানাভাবে নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা। একটি উদাহরণ দিলেই এই নিয়ন্ত্রণের স্বরূপ বুঝা যাইবে। তোমাকে বই কিনিবার জন্য দশটাকা দেওয়া হইল, তুমি যে কোন বই কিনিতে পার—সে স্বাধীনতা তোমার আছে। কিন্তু দশ টাকার বেশী খরচ করিবার ক্ষমতা তোমার নাই; ইহাতে তোমাব স্বাধীনতা যে বিশেষ পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হইয়া যায়, তাহা বলাই বাহুল্য। মানুষের যে ইচ্ছা স্বাধীনতার কথা বলা হইয়াছে, তাহাও এইরূপ নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা। তবে যতই নিয়ন্ত্রিত হউক না কেন, স্বাধীনতা তো বটে। এখন আমাদের জিজ্ঞাস্য এই—এইটুকু স্বাধীনতাই বা মানুষকে দেওয়া হইল কেন? ঈশ্বর তো পশুপক্ষীকে কোনপ্রকার স্বাধীনতা দেন নাই, তবে মানুষকে স্বাধীনতা দিতে গেলেন কেন? পশুপক্ষীদের স্বাধীনতা নাই বলিয়া তো কোন ক্ষতি হইতেছে না; তাহারা প্রবৃত্তির হাতে পুত্তলিকার ন্যায় বেশ সুন্দর কাজ করিয়া যাইতেছে। সুতরাং মানুষের স্বাধীনতা না থাকিলে মানুষও ঠিক তাহাই করিয়া যাইত। তাহা হইলে মানুষকে স্বাধীনতা দিবাব অর্থ কি? আমাদের বক্তব্য এই যে—কোন এক বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ঈশ্বর মানুষকে স্বাধীনতা দিয়াছেন, নতুবা তাঁহার সৃষ্টির উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যাইত। কথাটি ভাল করিয়া বুঝান যাউক। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে প্রত্যেক জিনিষের মধ্যেই আধ্যাত্মিক শক্তি নিহিত আছে, প্রত্যেকের মধ্যেই ঈশ্বর বিরাজ করিতেছেন। সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যে

যেমন তিনি আছেন, পশুপক্ষীর মধ্যেও তেমন তিনি আছেন, আবার মানুষের মধ্যেও তেমন তিনি বিরাজ করিতেছেন। তবে জড়বস্তুর মধ্যে তিনি গুপ্ত আছেন, পশুপক্ষীর মধ্যে তিনি সুপ্ত আছেন, তাই মানুষের মধ্যে তিনি জাগ্রত হইতে চান। তিনি চান যে মানুষ স্বীয় ভগবৎ স্বরূপ উপলব্ধি করুক; কারণ উহাতে শুধু মানুষেরই মুক্তি ঘটে, তাহা নহে, ঈশ্বরেরও মুক্তি ঘটে। যে ঈশ্বর স্বীয় সৃষ্টির মধ্যে সুপ্ত ছিলেন, তিনি মানুষের মধ্যে আত্মচেতনা লাভ করেন, আর যে মানুষ স্বীয় ভগবৎ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে, সে তাহার ক্ষুদ্র জীবন হইতে মুক্ত হইয়া দেবত্ব লাভ করে। ইহাই ঈশ্বরের সৃষ্টি রহস্য, সৃষ্টির মাধ্যমে ঈশ্বর মানবত্ব লাভ করেন আর মানুষ দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। অতএব মানুষ দেবত্ব লাভ করুক—ইহাই ঈশ্বরের উদ্দেশ্য। কিন্তু এই উদ্দেশ্যকে কার্যে পরিণত করিতে হইলে মানুষের পক্ষে ইচ্ছা-স্বাধীনতা অপরিহার্যরূপে প্রয়োজন, নতুবা আত্মোন্নতির জন্য সে চেষ্টা করিবে কেমন করিয়া? কারণ অপরে চেষ্টা করিয়া আমাকে "মানুষ" করিতে পারে না, "মানুষ" হইতে হইলে আমাকে নিজে চেষ্টা করিতে হইবে। নিজে চেষ্টা করিয়া আমি আমার অন্তর্নিহিত শক্তির পরিস্ফূরণ সাধন করিব, তবেই তো আমি দেবত্ব লাভ করিতে পারিব। তাই আমরা বলিয়াছি যে, মানুষ যাহাতে নিজে চেষ্টা করিতে পারে, নিজেই নিজের ভগবৎ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে, সেইজন্য তাহার পক্ষে স্বাধীনতা অপরিহার্য্যরূপে প্রয়োজন; এবং এই উদ্দেশ্যেই ঈশ্বর তাহাকে কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা দিয়াছেন, নতুবা তাঁহার সৃষ্টির উদ্দেশ্যই বিফল হইয়া যাইত।

এখন এই প্রসঙ্গের উপসংহার করা যাউক। আমরা পূর্ব প্রসঙ্গে বলিয়াছি যে মানুষের বুদ্ধি-শক্তি (Reason) আছে, তাই সে চিন্তা করিতে পারে এবং ভালমন্দ বিচার করিতে পারে। আর এখন দেখিতেছি তাহার ইচ্ছা-শক্তিও আছে, তাই সে সিদ্ধিলাভের জন্য চেষ্টা করিতে পারে। এই ইচ্ছা-শক্তি না থাকিলে জীবনে সে কোন উন্নতি সাধন করিতে পারিত না। তাই ঈশ্বর তাহাকে এই শক্তি দিয়াছেন, যাহাতে ইচ্ছা করিলে সে আত্মবিকাশ সাধন করিয়া দেবত্ব লাভ করিতে পারে।

ঈশ্বরের গুণাবলী

(Attributes of God)

আমরা ঈশ্বর সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ আলোচনা করিয়াছি। এইসব আলোচনার ফলে ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা হয় তাহাই এখন সংক্ষেপে

উল্লেখ করা হইবে (Contents of our idea of God)। প্রথমতঃ, ভগবান এক এবং অদ্বিতীয় (একমেবাদ্বিতীয়ং); সেইজন্য আমরা বহু ঈশ্বরবাদ (Polytheism) এবং দ্বি-ঈশ্বরবাদ (Ditheism) গ্রহণ করিতে পারি নাই। একাধিক ঈশ্বর হইলে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য ও অসীমত্ব ক্ষুণ্ণ হইয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, তিনি অনন্ত ও অসীম; তিনি অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান এবং অনন্তকাল বিদ্যমান থাকিবেন। স্থান ও কালের দ্বারা তাঁহাকে সীমাবদ্ধ করা যায় না; তিনি স্থান ও কালের অতীত। তৃতীয়তঃ, তিনি বিশ্বের মূল ও আদি কারণ (First Cause)। সমস্তই ঈশ্বর হইতে উদ্ভূত হইতেছে এবং ঈশ্বরের মধ্যেই সমস্ত অবস্থিত আছে। ইহাকে ঈশ্বরের সৃষ্টিও বলা যাইতে পারে; তবে সৃষ্টি অর্থে কেহ যদি মনে করেন যে কোন এক বিশেষ মুহূর্তে ঈশ্বর এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা হইলে খুবই ভুল হইবে। কারণ ঈশ্বরের জীবনে আমরা এমন কোন মুহূর্ত কল্পনা করিতে পারি না যখন তিনি শুধু একাকী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সৃষ্টি ছিল না; উহা সম্ভব নহে। ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁহার সৃষ্টি অপরিহার্যরূপে সম্বদ্ধ। তাই অনেকের মতানুসারে ইহাকে সৃষ্টি না বলিয়া আত্মপ্রকাশ বলাই অধিকতর সঙ্গত; সৃষ্টির মাধ্যমে ঈশ্বর নিরন্তর আত্মপ্রকাশ করিয়া চলিয়াছেন। আত্মপ্রকাশই তাঁহার ধর্ম; আত্মপ্রকাশ ছাড়া তাঁহার অস্তিত্বই সম্ভব নহে। চতুর্থতঃ, তিনি একাধারে বিশ্বাতীত এবং বিশ্বানুগ। তিনি সমস্ত বিশ্বকে পরিব্যাপ্ত করিয়া আছেন, সমস্ত বিশ্বই তাঁহার মধ্যে অবস্থিত। তবে বিশ্বের দ্বারা তিনি সীমায়িত নহেন, বিশ্বকে অতিক্রম করিয়াও তিনি বিদ্যমান আছেন। পঞ্চমতঃ, তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান। তাঁহার নিকট অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বলিয়া কোন পার্থক্য নাই—সমস্তই তিনি একই মুহূর্তে উপলব্ধি করিতেছেন, অর্থাৎ তিনি সর্বজ্ঞ। তবে এখানে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে; তিনি সবই জানেন বটে, কিন্তু আমি হাতে দশ টাকা পাইলে কোন্ বইটি কিনিব আর কোন্ বইটি কিনিব না—তাহা তিনি আগে হইতে জানিতে পারেন না। কারণ, তাহা যদি তিনি জানিতেন তবে আমার ইচ্ছা-স্বাধীনতা বলিয়া কোন জিনিষই থাকিত না। আমি কি বই কিনিব তাহা তিনি আগে হইতেই জ্ঞাত আছেন, ইহার সরল অর্থ আমি তাঁহার ইচ্ছা অনুসারে কাজ করিতেছি, নিজের ইচ্ছা অনুসারে নহে। তাহা হইলে বলিতে হইবে যে আমার কাজ পূর্ব হইতেই ঈশ্বরের দ্বারা নির্দিষ্ট করা হইয়াছে (predetermined)। এমতাবস্থায় মানুষের ইচ্ছা-স্বাতন্ত্র্য (Freedom of Will) থাকিতে পারে না। তাই আমরা বলিতে চাই যে ঈশ্বর সর্বজ্ঞ হইয়াও সম্পূর্ণ সর্বজ্ঞ নহেন। মানুষের ইচ্ছা-স্বাধীনতা

বজায় রাখিবার জন্য তাঁহার জ্ঞানের পরিধিকে নিজেই কিঞ্চিৎ নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখিয়াছেন। সেইরূপ সর্বশক্তিমান হইয়াও তিনি নিজেই নিজের শক্তির কিঞ্চিৎ নিয়ন্ত্রণ সাধন করিয়াছেন। সর্বশক্তিমান বলিয়াই কি তিনি পাঁচের সহিত পাঁচ যোগ করিয়া আট করিতে পারেন? ঈশ্বরও তাহা পারেন না। তবে ইহার অর্থ এই নহে যে তিনি কোন বাহ্যবস্তু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছেন, তিনি তাঁহার স্বধর্ম অনুযায়ী কাজ করিতেছেন।

উপরে যে কয়েকটি গুণের কথা বলা হইল, উহা হইতে আমরা ঈশ্বরের শক্তির পরিচয় পাই—যেমন তিনি অসীম, অনন্ত, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ইত্যাদি। ইহা ছাড়াও আরও কয়েকটি গুণের কথা বলা হয়, যেমন স্নেহ, করুণা পবিত্রতা, ন্যায়পরায়ণতা প্রভৃতি। এগুলি তাঁহার শক্তির পরিচায়ক নহে; তাঁহার মহত্ত্বের পরিচায়ক। তিনি আমাদিগকে পিতার ন্যায় ভালবাসেন, মায়ের ন্যায় স্নেহ করেন, সাধুকে পুরস্কৃত করেন, পাপীকে শাস্তি দেন, অর্থাৎ সকলের প্রতিই সুবিচার করেন*। বলা বাহুল্য, বিচার বিবেচনা, স্নেহ করুণা, দয়ামায়া প্রভৃতি সমস্তই চেতনা জগতের ব্যাপার; চেতনার মধ্যেই ইহাদের উদ্ভব, চেতনার মধ্যেই ইহাদের লীলা। অতএব ঈশ্বরের প্রতি এইসব গুণ আরোপ করিয়া আমরা প্রকারান্তরে স্বীকার করিতেছি যে মানুষের ন্যায় ঈশ্বরেরও চেতনা আছে।

ভগবৎ চেতনা
(Divine Consciousness)

কিন্তু অনেকের মতানুসারে ঈশ্বরের কোন চেতনা থাকিতে পারে না। কারণ, যে পরিস্থিতিতে চেতনার উদ্ভব হইতে পারে তাহা শুধু মানুষের পক্ষেই সম্ভব, ঈশ্বরের পক্ষে সম্ভব নহে। কথাটি ভাল করিয়া বুঝান দরকার। ধর, তুমি বাগানে একটি গাছ দেখিতেছ, অর্থাৎ গাছের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তুমি এখন সচেতন। একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে এই চেতনার মূলে আছে বহির্জগৎ; বহির্জগতে যে গাছটি আছে উহা হইতে উদ্দীপনা আসিয়া প্রথমে

---

* ঈশ্বরের সম্বন্ধে এইভাবে চিন্তা করাকে anthropomorphic conception of God বলা যাইতে পারে। এক্ষেত্রে আমরা মানুষের দৃষ্টিবিন্দু হইতে, ঈশ্বরকে অনেকটা মানুষের মতন করিয়া কল্পনা করিতেছি কিন্তু ইহা কি ঠিক? সিংহ যদি ঈশ্বর সম্বন্ধে চিন্তা করিতে পারিত, তবে সিংহও ঈশ্বরকে এক সিংহসদৃশ প্রাণী বলিয়া কল্পনা করিত না কি? তবে তাহার এই সিংহ অবশ্য এক সাধারণ সিংহ নহে, অসাধারণ সিংহ হইত, যখন ইচ্ছা এবং যেখানে ইচ্ছা সে হরিণ মারিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে পারিত. সাধারণ সিংহের ন্যায় আহারের জন্য দিনের পর দিন ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত না। মানুষের ঈশ্বরও সেইরূপ এক অসাধারণ মানুষ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

তোমার ইন্দ্রিয়ের উপর ক্রিয়া করে; পরে সেই উদ্দীপনা সংবাদ মস্তিষ্কে পৌঁছিয়া সংবেদনে রূপান্তরিত হইয়া যায়। এইভাবে বহির্জগতের ক্রিয়াফলে আমাদের মনের মধ্যে চেতনার উদ্রেক হয়। কিন্তু ধর, বহির্জগৎ বলিয়া কোন জিনিষ নাই; গাছ পাতা ফল ফুল কোথাও কিছু নাই। তাহা হইলে বাহির হইতে কোনরূপ উদ্দীপনা আসিয়া আমাদের মনে সংবেদন সৃষ্টি করিতে পারিত না; ফলে শব্দ স্পর্শ গন্ধ প্রভৃতি সকল প্রকার সংবেদনশূন্য হইয়া হইয়া আমাদের মন এক মহাশূন্যে পরিণত হইয়া যাইত। তখন আর চেতনা থাকিত কেমন করিয়া? কিন্তু মানুষের সৌভাগ্য যে সে সসীম জীব, তাহার বাহিরে এক জগৎ আছে; সেই জগৎ আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপর ক্রিয়া করে এবং ইন্দ্রিয়ের উপর ক্রিয়া করিয়া আমাদের মনে চেতনার উদ্রেক করে। কিন্তু ঈশ্বর তো সসীম নহেন, তিনি অসীম, অর্থাৎ তাঁহার বাহিরে কোন দ্বিতীয় বস্তু নাই। অতএব কোন জিনিষই তাঁহার উপব ক্রিয়া করিতে পারে না; ফলে তাঁহাব মনে চেতনার উদ্রেক হওয়া সম্ভব নহে, তাই তিনি সম্পূর্ণ অচেতন। অতএব তাঁহার পক্ষে বিচার বিবেচনা করা, দয়া করা, স্নেহ কবা প্রভৃতি কোনপ্রকার মানসিক ক্রিয়াই সম্ভব নহে।

ইহার উত্তরে আমরা বলি যে, বহির্জগৎ হইতে উদ্দীপনা পাওয়াই আসল কথা নহে, আসল কথা জ্ঞাতা ও জ্ঞাতব্যের মধ্যে পার্থক্য থাকা দরকার, এই পার্থক্য-বোধ না থাকিলে জ্ঞান বা চেতনার উদ্রেক হইতে পারে না। যেমন, তুমি গাছ দেখিতেছ, এক্ষেত্রে গাছের কথা জানা তোমার পক্ষে সম্ভব হইতেছে, যেহেতু তুমি ও গাছ সম্পূর্ণ পৃথক। তুমি একদিকে আছ, আর গাছ অন্যদিকে আছে; তাই তুমি গাছের কথা জানিতে পারিতেছ। কিন্তু ধর, গাছের সহিত তোমার কোনই পার্থক্য নাই; কোন এক যাদুমন্ত্রের বলে গাছ এবং তুমি এক হইয়া গেলে। তাহা হইলে গাছ সম্বন্ধে জ্ঞান সংগ্রহ করিবার কোন প্রশ্নই আর উঠিবে না; তখন আর চেতনার উদ্রেক হইবে কেমন করিয়া? অতএব চেতনা উদ্রেকের জন্য পার্থক্য-বোধের প্রয়োজন। কিন্তু এই পার্থক্য-বোধ সৃষ্টির জন্য বহির্জগৎ যে অপরিহার্য্যরূপে প্রয়োজন—তাহা আমরা স্বীকার করি না। বহির্জগৎ না থাকিলেও আমাদের মনে পার্থক্যবোধ থাকিতে পারে। যেমন ধর, আমার মনে এখন দুঃখ আসিয়াছে; হয়ত বহির্জগতে এখন দুঃখের কোন কারণ নাই; তবুও আমি দুঃখবোধ করিতেছি। সেইরূপ একজন ব্যক্তি ধ্যানমগ্ন হইয়া ঈশ্বরের কথা চিন্তা করিতেছেন, বা একজন কবি মুদিতনেত্রে সৌন্দর্য্যলোকের কল্পনা করিতেছেন—কোন ক্ষেত্রেই বহির্জগৎ হইতে উদ্দীপনা

আসিতেছে না, অথচ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই জ্ঞাতা ও জ্ঞাতব্যের পার্থক্য বিদ্যমান রহিয়াছে—যেমন, আমি ও আমার অনুভূতি পৃথক, যোগী ও তাহার ঈশ্বর-ধারণা পৃথক, কবি ও তাহার কল্পনালোক পৃথক। বলা বাহুল্য, এইরূপ পার্থক্য আমরা নিজেরাই সৃষ্টি করিতেছি। কিন্তু আমরা নিজেরাই সৃষ্টি করি বা বহির্জগতই সৃষ্টি করুক না কেন—পার্থক্য সকল ক্ষেত্রেই পার্থক্য। অতএব উপরোক্ত প্রত্যেক ক্ষেত্রে আমাদের মনের মধ্যে যখন জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের পার্থক্য বিদ্যমান আছে, তখন আমাদের পক্ষে জ্ঞানলাভ করা কিছুই কঠিন নহে। তাই আমি আমার দুঃখ সম্বন্ধে সচেতন, এবং কবিও তাহার কল্পনা সম্বন্ধে সচেতন। মানুষের সম্পর্কে যাহা বলা যায় ঈশ্বরের সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা প্রযোজ্য; মানুষের ন্যায় তিনিও তাঁহার মনেব মধ্যে অসংখ্য ভাবরাশি সৃষ্টি করিতে পারেন এবং সৃষ্টি করিযা থাকেন। বস্তুতঃ বিশ্বজগৎই তাঁহার মনের মধ্যে অধিষ্ঠিত আছে, অতএব তাঁহার মনেও জ্ঞাতা-জ্ঞেয় পার্থক্য বিদ্যমান; তিনিই জ্ঞাতা হইয়া নিজের অভ্যন্তরীণ ভাবরাশি লক্ষ্য করিতেছেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, যে কারণে মানুষেব মনে চেতনা সম্ভব হইতেছে, সেই কারণে ঈশ্বরের মনেও চেতনা বিদ্যমান রহিযাছে। অতএব ঈশ্বরেরও চেতনা আছে, তিনি অচেতন নহেন।*

সগুণ ঈশ্বর (Personal God)

উপরোক্ত আলোচনায় আমরা ঈশ্বরের বহুবিধ গুণের কথা উল্লেখ করিয়াছি,—কোন কোন গুণ তাঁহার শক্তির পরিচায়ক, আর কোন কোন গুণ তাঁহার মহত্ত্বের পরিচায়ক। এইরূপ গুণসমন্বিত ঈশ্বরকে ইংরাজীতে Personal God বলিয়া অভিহিত করা হয়। এখানে Personal কথাটির অর্থ কি? ইহা ব্যাখ্যা করিবার জন্য প্রথমেই বিচার করা যাউক মানুষকেও Person বলা হয় কেন?

---

* **Nature of Divine Consciousness.**—এই প্রসঙ্গে প্রবন্ধের প্রারম্ভে আমরা যাহা বলিয়াছি তাহা এখানে স্মরণ রাখা দরকার। সেখানে বলিয়াছি যে ভগবৎ চেতনার মধ্যে স্থান বা কালের কোনই প্রভাব নাই; তাই তাঁহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া চিন্তা করিতে হয় না; অখণ্ড জিনিষকে অখণ্ডভাবেই তিনি প্রত্যক্ষ করিতে পারেন (Sub Specie Aeternitatis)। আর এখানে যাহা বলিতেছি তাহাও স্মরণ রাখিতে হইবে। মনুষের ন্যায় ভগবৎ চেতনাতেও জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের পার্থক্য বর্তমান; ঈশ্বরই জ্ঞাতা হইয়া স্বীয় অভ্যন্তরীণ ভাবরাশিকে লক্ষ্য করিতেছেন। তবে এক্ষেত্রে তাঁহার বাহিরে কোন "জ্ঞেয়" বস্তু নাই, সবই আছে তাঁহার ভিতরে। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে অনেক সময়ে এই "জ্ঞেয়" বস্তুর উদ্দীপনা আসে বাহির হইতে। কারণ, মানুষের বাহিরে জগৎ আছে, কিন্তু ঈশ্বরের বাহিরে কোন জগৎ নাই।

মানুষ person, তাহার প্রধান কারণ মানুষের চেতনা (consciousness) আছে, সে অচেতন পদার্থ নহে। কিন্তু শুধু যে মানুষেরই চেতনা আছে, তাহা তো নহে, পশুপক্ষীরও চেতনা আছে; তবুও আমরা পশুপক্ষীকে Person বলি না, তাহার কারণ পশুপক্ষীর চেতনা থাকিলেও, **বুদ্ধি-বিবেচনা** (**Reason**) নাই; তাই তাহারা বিচার বিবেচনা পূর্বক কাজ করিতে পারে না। তাহারা নিজ নিজ প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া কাজ করে, তাই তাহাদের জীবন প্রবৃত্তি-সর্বস্ব। কিন্তু আমাদের জীবন প্রবৃত্তি-সর্বস্ব নহে; প্রবৃত্তির সহিত বুদ্ধিও আমাদের যথেষ্ট আছে। এই বুদ্ধি আছে বলিয়াই আমরা মানুষ; ইহাই আমাদিগকে পশু হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, বুদ্ধি বিবেচনা ব্যতীত আমাদেব চেতনার মধ্যে আরো একটি জিনিষ আছে যাহা কেবল মানুষেরই আছে, পশুদের নাই; উহাকে আমরা **আত্মচেতনা** (**Self consciousness**) বলিতে পারি। আমার মধ্যে যখন কোন ভাব আসে, তখন আমি শুধু সেই ভাবের সম্বন্ধেই সচেতন থাকি, তাহা নহে; সঙ্গে সঙ্গে আমার নিজেব সম্বন্ধেও সজাগ থাকি। ধর, আমার মনের মধ্যে এখন সুখের ভাব আসিয়াছে, ফলে আমি শুধু সুখের কথাই জানিতে পারি না; কেন সুখ পাইতেছি, আমার পক্ষে এই প্রকাব সুখ বাঞ্ছনীয় কি না, আত্মোন্নতির পক্ষে ইহা বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারে কি না—ইত্যাদি আত্ম সম্বন্ধীয় অনেক কথাই চিন্তা করিতে পারি। ইহাকে আত্ম-চেতনা বলে। কিন্তু পশুপক্ষীর পক্ষে এই প্রকার আত্মচেতনা সম্ভব নহে। বর্তমান মুহূর্তে তাহার মনের মধ্যে যদি সুখবোধ আসে, তবে সেও মানুষের ন্যায় অনায়াসে উহার কথা উপলব্ধি করিতে পারে সত্য, কিন্তু উহাকে অবলম্বন করিয়া সে আত্ম চিন্তা করিতে পারে না; উহার ভবিষ্যৎ ফলাফল কি, উহাতে তাহার আত্মোন্নতি হইতে পারে কি না—ইত্যাদি কোন কথাই সে ভাবিতে পারে না। অর্থাৎ তাহার চেতনা আছে, কিন্তু আত্মচেতনা নাই। এই আত্মচেতনাই মানুষের বৈশিষ্ট্য। সে জানে যে তাহার জীবনের এক উদ্দেশ্য (End) আছে; সেইজন্য ঐ উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই সে তাহার কার্যাবলী পরিচালিত করে। তাই তাহাকে সর্বদাই আত্মবিচার করিতে হয়। এইভাবে নিজের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত থাকা এবং সেই উদ্দেশ্য অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা—ইহা কেবল মানুষের পক্ষেই সম্ভব। ইহার জন্য যে আত্মচিন্তা বা আত্মচেতনার প্রয়োজন তাহা পশুদের পক্ষে সম্ভব নহে। এই আত্ম-চেতনার সহিত আর একটি শক্তিও মানুষের আছে—তাহাব নাম **আত্ম-নিয়ন্ত্রণ** (**Self determination**)। যেহেতু মানুষ নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা সম্বন্ধে সম্যক

অবহিত আছে, সেইহেতু সে নিজেই নিজের কর্তব্য নির্ধারণ করিতে পারে; অপরের ইচ্ছা অনুসারে তাহার কার্য নিয়ন্ত্রিত হয় না; এক কথায় সে স্বাধীন।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে মানুষের তিনটি বিশিষ্ট গুণ আছে, যথা বুদ্ধি-বিবেচনা, আত্মচেতনা ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণ। এইসব গুণ আছে বলিয়া মানুষকে Person বলা হয়। অনেকের মতানুসারে, ঈশ্বরেরও এইসব গুণ আছে; সেইজন্য তাঁহাকে Personal God বলা যাইতে পারে। তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর অচেতন জড় পদার্থ নহে; তিনি 'সত্যং জ্ঞানং', তিনি **চৈতন্যময়** পুরুষ। তিনি সর্বজ্ঞ; তাঁহার অজ্ঞাতে গাছের একটি পাতাও মাটিতে পড়িতে পারে না। সকলের মনের কথাই তিনি জানেন; আমাদের সুখ, দুঃখ, শোক অনুতাপ-কিছুই তাঁহার অজ্ঞাত নহে। শুধু তাহাই নহে; আমাদের কর্ম অনুযায়ী প্রত্যেককেই তিনি যথাযথভাবে বিচার করিয়া থাকেন; সকলের জন্যই তিনি চিন্তা করেন, তাঁহার স্নেহ দয়া ও করুণার অন্ত নাই। দ্বিতীয়তঃ, শুধু যে আমাদের কথাই তিনি চিন্তা করেন, তাহা নহে, আত্ম সম্বন্ধেও তিনি সচেতন। আমরা সকলেই বলি "তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণাময় স্বামী", তবে তাঁহার ইচ্ছা কি, উহা আমরা সঠিক জানি না, কিন্তু তিনি সবই জানেন। তাঁহার সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি, তিনি কি সৃষ্টি করিতে চান এবং কি উপায়েই বা উহা সাধন করিতে চান—সবই তিনি অবগত আছেন। এক কথায়, আত্মগত সমস্ত বিষয়েই তিনি সম্যক সচেতন (**আত্মচেতনা**)। তৃতীয়তঃ, তিনিও নিজের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করেন; অপরের দ্বারা তাঁহার কার্যাবলী নিয়ন্ত্রিত হয় না, বস্তুতঃ সেইরূপ কোন সম্ভাবনাই এক্ষেত্রে নাই; কারণ ভগবানের বাহিরে তো কিছুই নাই, অতএব অপরের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইবার কোন প্রশ্নই এখানে উঠিতে পারে না। অর্থাৎ তাঁহার **আত্মনিয়ন্ত্রণের** পথে কোনই বাধা নাই।

ঈশ্বর ও ব্রহ্ম (God and the Absolute)

যাহারা ঈশ্বরকে Personal God বলিয়া মনে করেন তাহাদের মতবাদ ব্যাখ্যা করা হইল। তাঁহারা বলেন যে, ঈশ্বরের মধ্যে বহুবিধ গুণ আছে, সেইজন্য তিনি সগুণ ঈশ্বর। তবে বলা বাহুল্য, সকলেই এই মতবাদ গ্রহণ করেন না। অনেকে মনে করেন যে ঈশ্বরের প্রতি কোনরূপ গুণ আরোপ করা সম্ভব নহে; তিনি গুণাতীত। তাঁহার প্রতি যে কোন গুণই আরোপ করা হউক না কেন—উহাতে তাঁহার মর্য্যাদা বৃদ্ধি হয় না, বরং তাঁহাকে সীমায়িত করিয়া

দেখা হয়। এর, আমরা বলিলাম "ঈশ্বর দয়ালু"; এক্ষেত্রে "দয়ালু" বলিলেই বুঝিতে হইবে যে তিনি নির্দয় নহেন; কিন্তু ইহাতে তাঁহার ব্যক্তিত্বকে সীমায়িত করা হয় না কি? কেন তিনি নির্দয় হইবেন না? নির্দয় হইবার ক্ষমতা কি তাঁহার নাই? যদি না থাকে তবে বলিতে হইবে যে তাঁহার শক্তি সীমায়িত করা হইয়াছে। সেইরূপ আমরা যদি বলি "ঈশ্বর মহৎ" (বৃহৎ), তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে ঈশ্বর "অণু" (ক্ষুদ্র) নহেন; কিন্তু কেন তিনি অণু হইতে পারিবেন না? বরং অণু অপেক্ষাও অণুতর হইতে তাঁহার বাধা কি? তাই গীতা বলেন "ঈশ্বর মহৎ অপেক্ষাও মহত্তর, আবার অণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর"। বস্তুতঃ ঈশ্বরের প্রতি কোনপ্রকার গুণ আরোপ করা যাইতে পারে না। সেইজন্য শংকরাচার্য্যের মতে ঈশ্বর নির্গুণ; তবুও তাঁহাকে যখন বেদান্তে "সত্যং জ্ঞানং অনন্তং আনন্দং ব্রহ্ম" বলিয়া বর্ণনা করা হয়, তখন উহার অর্থ এই নহে যে এই গুণগুলি ঈশ্বরের মধ্যে সত্যই নিহিত আছে, উহার অর্থ এই যে ঈশ্বরকে যদি বর্ণনাই করিতে হয় তবে এইরকম ভাবে বর্ণনা করা ছাড়া আর কোন ভাল পন্থা নাই। নির্গুণ ব্রহ্মকে ভাষায় বর্ণনা করিতে গেলেই তিনি সগুণরূপে প্রতিভাত হইয়া পড়েন। এ বিষয়ে একটি সুন্দর গল্প আছে। এক রাজা আশ্রমে গিয়া মুনিবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন "গুরুদেব, ঈশ্বরের স্বরূপ কি?" মুনিবর যেমন নীরব ছিলেন তেমনই নীরব রহিয়া গেলেন, কোন উত্তর দিলেন না। রাজা আরও দুই তিনবার এই প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু কোন উত্তর না পাইয়া একটু অসন্তুষ্ট হইয়া আশ্রম হইতে চলিয়া গেলেন। তখন তাঁহার শিষ্য বলিলেন "গুরুদেব, রাজাকে তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিলেন না কেন?" মুনি বলিলেন, "বৎস, আমি তো উত্তর দিয়াছি। রাজা ঈশ্বরের স্বরূপ জানিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু ঈশ্বরের স্বরূপ তো ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। যদি এক কথায় বলিতে হয়, তবে বলিব তিনি নির্গুণ, তিনি নীরবতা, তিনি Silence, আমি নীরব থাকিয়া রাজাকে তাহাই বলিয়াছি।"

মুনিবর যে ব্রহ্মের কথা বলিতেছেন তাহা নির্গুণ ব্রহ্ম; উহাই শংকরাচার্যের পরমব্রহ্ম (Absolute)। কিন্তু আমাদের ন্যায় সাধারণ মানুষের পক্ষে এই প্রকার নির্গুণ ব্রহ্ম লইয়া তৃপ্ত থাকা সম্ভব নহে। তাই নানা প্রকার গুণ আরোপ করিয়া আমরা তাঁহাকে সগুণ ব্রহ্মে পরিণত করিয়া লইয়াছি, ফলে আমরা তাঁহাকে সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, করুণাময় ঈশ্বর বলিয়া মনে করি। কিন্তু শংকরাচার্য বলেন, পারমার্থিক দৃষ্টিতে এইপ্রকার সগুণ ব্রহ্মের সত্তা স্বীকার করা যায় না। কারণ, আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, ব্রহ্ম সম্পূর্ণ নির্গুণ, তাঁহার প্রতি কোনরূপ গুণ আরোপ

করিলেই তাঁহাকে সীমায়িত করা হয়। তবে ব্যবহারিক জীবনে আমরা তাঁহাকে এইভাবে সীমায়িত করিয়া থাকি। কারণ যতদিন পর্যন্ত আমরা আমাদের অন্তর্নিহিত ভগবৎ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে না পারি, ততদিন পর্যন্ত আমরা আমাদিগকে ক্ষুদ্র ও দুর্বল বলিয়া মনে করি; এবং আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্বল্য অনুযায়ী আমরা আমাদের ঈশ্বরকেও সীমায়িত বলিয়া মনে করি। এইপ্রকার ব্যবহারিক দৃষ্টিবিন্দু হইতে যে সগুণ ঈশ্বরের কথা চিন্তা করা হয়—শংকরাচার্য তাঁহাকে ব্রহ্ম না বলিয়া ঈশ্বর নামে অভিহিত করেন, আর পারমার্থিক দৃষ্টিবিন্দু হইতে যে নির্গুণ ঈশ্বরের কথা চিন্তা করা হয়, তাঁহাকেই তিনি ব্রহ্ম বা পরমব্রহ্ম নামে অভিহিত করেন। তবে বলা বাহুল্য, ব্রহ্ম ও ঈশ্বর—স্বতন্ত্র দুই ঈশ্বর নহেন, একই ঈশ্বর; শুধু দুই বিভিন্ন দৃষ্টিবিন্দু হইতে তাঁহাকে লক্ষ্য করা হইতেছে। একই ব্রহ্ম—জ্ঞানের আলোকে যখন তাঁহাকে উপলব্ধি করি, তখন তিনি নির্গুণ ব্রহ্ম; আর ভাবের আবেগে যখন তাঁহাকে পূজা করি, তখন তিনি সগুণ ঈশ্বর। মোট কথা, একই ঈশ্বর, সত্যস্বরূপে তিনি নির্গুণ, আর প্রতি-ভাসিতরূপে তিনি সগুণ।

দ্বিতীয় খণ্ড

অধ্যাত্ম তত্ত্ব

(The Problem of the Self)

পঞ্চম অধ্যায়

মন ও শরীর

অধ্যাত্ম প্রসঙ্গে আমরা মন ও আত্মা লইয়া আলোচনা করিব। কিন্তু প্রথমেই বলা দরকার যে পাশ্চাত্য দর্শনে মন এবং আত্মার মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা হয় না। মনের ক্রিয়া প্রক্রিয়া বলিতে আত্মার ক্রিয়া প্রক্রিয়াও বুঝায়, আবার আত্মার ক্রিয়া প্রক্রিয়া বলিতে মানসিক ক্রিয়া প্রক্রিয়াও বুঝায়। কিন্তু ভারতীয় দর্শন অনুসারে মন এবং আত্মার মধ্যে গুরুতর পার্থক্য বর্তমান। মন একটি ইন্দ্রিয় মাত্র; চক্ষু কর্ণ নাসিকা যেমন ইন্দ্রিয়, মনও তেমন ইন্দ্রিয় বিশেষ। তবে চক্ষু কর্ণকে বহিরিন্দ্রিয় বলা হয়, ইহাদের দ্বারা আমরা বহির্জগতের কথা জানিতে পারি; আর মনকে বলা হয় অন্তরিন্দ্রিয়; ইহার দ্বারা আমরা শুধু অন্তর্জগতের (অর্থাৎ আত্মার) কথা জানিতে পারি। কিন্তু পাশ্চাত্য দর্শনে মনকে ইন্দ্রিয় বলা দূরে থাকুক, ইহাকে আত্মারই সমানার্থক বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়। সেইজন্য এখানে অধ্যাত্ম আলোচনায় আমরা কখন মন, আর কখন বা আত্মা বলিয়া উল্লেখ করিব; উহাতে বিভ্রান্ত হইবার কারণ নাই।

এখানে আমরা প্রথমেই জিজ্ঞাসা করি—মন কি? মন যে কি জিনিষ, তাহা আমরা সকলেই কিছু না কিছু জানি; কারণ মনের সহিত আমাদের সকলেরই সাক্ষাৎ পরিচয় আছে। আমার মন আছে, তোমার মন আছে, আমাদের সকলেরই অন্তরে মন আছে। যাহা আমাদের এত নিজস্ব এবং অন্তরতম জিনিষ, তাহার সম্বন্ধে কিছু না জানা সম্ভব নহে। তাই মন বলিলে যে কি বুঝায় তাহা আমরা সকলেই জানি। মন যে কি—উহা জানিবার জন্য বাহিরে দৃষ্টি করিবার প্রয়োজন নাই; আমাদের অন্তরের দিকে লক্ষ্য করিলেই আমরা উহার ক্রিয়া প্রক্রিয়া অবলোকন করিতে পারি। আমার অন্তরে যে সকল ভাব আসিতেছে সে সমস্তই মনের বিকার মাত্র। আমার মনে কখন হিংসার ভাব আসিতেছে আর কখন বা রাগ আসিতেছে; কখন আমি সুখ বোধ করিতেছি, আর কখন দুঃখ অনুভব করিতেছি; কখন প্রীতিরসে আপ্লুত হইতেছি আর কখন

বা ভক্তিভরে বিগলিত হইতেছি। এই ভক্তি প্রীতি, সুখ দুঃখ, হিংসা দ্বেষ—সমস্তই মনের বিকার মাত্র। সেইরূপ আমি চিন্তা করিতেছি, কল্পনা করিতেছি বা স্মরণ করিতেছি—এই সমস্তই আমাদের মানসিক ক্রিয়া। ইহারা বহির্জগতে বিরাজ করে না, ইহারা আমার মনোজগতে ভাসিয়া উঠিয়া আবার মনোজগতেই বিলীন হইয়া যায়। মনের মধ্যে মনের এই সকল আত্মপ্রকাশ লক্ষ্য করিবার একমাত্র উপায় অন্তর্দর্শন; ইহা ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই।

তবে শুধু অন্তর্জগতে আত্মপ্রকাশ করিয়াই মন ক্ষান্ত থাকে না; শরীর জগতেও ইহা স্বীয় অস্তিত্ব প্রকট করিয়া থাকে। যেমন ধর, সুখ ও দুঃখ, ইহারা মনোজগতের ক্রিয়া হইলেও আমাদের শারীরিক ক্রিয়ার মাধ্যমে বহির্জগতেও আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। মনে সুখ হইলে আমরা হাসি, মনে দুঃখ হইলে আমরা কাঁদি। সেইরূপ রাগে আমরা কাঁপিতে থাকি, ভয়ে আমাদের মুখ শুকাইয়া যায়, আর দয়ায় আমাদের চোখ ছলছল করে। ইহাই মনের ধর্ম, মনে কোন ভাবের উদয় হইলে তাহা শুধু মনের মধ্যে নিবদ্ধ থাকে না; শরীরকে কাঁপাইয়া দোলাইয়া ইহারা বাহিরে প্রকট হইয়া পড়ে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, আমরা যে মনের কথা আলোচনা করিতেছি তাহা দেহ-বিমুক্ত মন নহে, তাহা দেহ-বদ্ধ মন; দেহের মধ্যে ইহা ক্রিয়া করে; সেইজন্য মন ক্রিয়া করিলে দেহকেও ক্রিয়া করিতে হয়। অর্থাৎ মনের সহিত দেহের এক গভীর সম্বন্ধ আছে। তবে সর্ব্বদেহ অপেক্ষা দেহস্থ মস্তিষ্কের সহিতই ইহার সম্বন্ধ গভীরতম। দৈনন্দিন জীবনের অনেক ব্যাপারেই ইহা আমরা লক্ষ্য করিতে পারি। আমরা যখন মানসিক পরিশ্রম করি তখন বেশ বুঝিতে পারি মস্তিষ্কের মধ্যে কেমন যেন আলোড়ন হইতেছে। অত্যধিক চিন্তা করিলে বা অত্যধিক অধ্যয়ন করিলে আমরা হাতে বা পায়ে কোথাও উত্তেজনা অনুভব করি না, উত্তেজনা অনুভব করি শুধু মস্তিষ্কে। পড়িতে পড়িতে মাথা অনেক সময় এমন গরম হইয়া যায় যে মনে হয় মাথার মধ্যে উষ্ণ রক্ত প্রবাহ ছুটিতেছে; তখন মাথায় কিছু ঠাণ্ডা জল ঢালিলে আমরা আরাম অনুভব করি। মোট কথা মানসিক পরিশ্রম করিলে মস্তিষ্ক ক্ষুব্ধ ও উদ্দীপিত হইয়া উঠে; আবার মানসিক পরিশ্রম বন্ধ করিয়া দিলে মস্তিষ্কের উদ্দীপনাও বন্ধ হইয়া যায়। ইহা হইতে আমরা স্বভাবতঃই অনুমান করিয়া থাকি যে মন ও মস্তিষ্কের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্তমান আছে। তারপরে আর এক কথা; ধর, কেহ সজোরে তোমার হাতে বা পায়ে আঘাত করিল; তাহাতে তোমার চিন্তাস্রোত একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে কি? আঘাতের জন্য তুমি খুব ব্যাথা পাইবে বটে, কিন্তু তাই

বলিয়া তোমার চেতনা যে একেবারে লোপ পাইয়া যাইবে—এমন সম্ভাবনা খুবই কম। কিন্তু হাতে বা পায়ে আঘাত না করিয়া কেহ যদি সজোরে আমাদের মাথায় আঘাত করে, তাহা হইলে কি হয়? তাহা হইলে আমাদের আর চিন্তা করিবার ক্ষমতা থাকে না; আমরা তৎক্ষণাৎ হতচৈতন্য হইয়া পড়িয়া যাই। মোট কথা শরীরের কোথাও আঘাত লাগিলে আমরা শুধু ব্যথা পাই, কিন্তু চেতনা হারাই না; অথচ মাথায়, তথা মস্তিষ্কে জোরে আঘাত করিলে আমরা একেবারে চেতনা হারাইয়া বসি। ইহা হইতেও আমরা মন ও মস্তিষ্কের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অনুমান করিতে পারি।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে মস্তিষ্ক তথা দেহের সহিত মনের গভীর সম্বন্ধ আছে। এই সম্বন্ধ সম্পর্কে যে বিভিন্ন মতবাদ আছে, তাহা আমরা একে একে ব্যাখ্যা করিব।

I. Interactionism (Descartes)

দার্শনিক পণ্ডিত Descartes বলেন যে দেহ মনের উপর ক্রিয়া করিতে পারে, আবার মনও দেহের উপর ক্রিয়া করিতে পারে, ইহারা পরস্পব পরস্পরের উপর ক্রিয়া করিয়া থাকে। উদাহবণ, আমি দেখিলাম গাছে একটি গোলাপ ফুল ফুটিয়া আছে। তখন আমার ইচ্ছা হইল ফুলটি তুলিয়া লই, তাই হাত বাড়াইয়া ফুলটি তুলিয়া লইলাম। এক্ষেত্রে ইচ্ছা বা কামনা মনের ব্যাপার; কিন্তু ইহা শরীরের উপর ক্রিয়া করিয়া আমার হাতকে যথাযথভাবে পরিচালিত করিতেছে। সেইরূপ শরীরও মনের উপর ক্রিয়া করিতে পারে। যেমন বাহির হইতে বায়ুতরঙ্গ আসিয়া আমার কর্ণ-ইন্দ্রিয় উদ্দীপিত করিল; তখন এই উদ্দীপনা সংবাদ নার্ভ বাহিয়া মস্তিষ্কে গিয়া পৌঁছিল এবং সেখানে শব্দ সংবেদনে পরিণত হইয়া গেল। এক্ষেত্রে শারীরিক ক্রিয়া হইতে মানসিক ক্রিয়া উৎপন্ন হইতেছে। তাই Descartes বলেন যে, শরীর মনের উপর ক্রিয়া করে, আর মনও শরীরের উপর ক্রিয়া করে; এই প্রকার পারস্পরিক ক্রিয়া প্রক্রিয়াকে ইংরাজীতে Interactionism বলে।

সমালোচনা

এই মতবাদের স্বপক্ষে প্রথমেই বলা যাইতে পারে যে আমাদের ব্যবহারিক জীবনে ইহা সত্য এবং যথার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অন্তর্দর্শনের সাহায্যে আমি স্পষ্ট বুঝিতেছি যে হাত বাড়াইবার জন্য আমি

শক্তি প্রয়োগ করিতেছি, এবং শব্দ শুনিবার জন্য আমি কান খাড়া করিতেছি; অর্থাৎ দেহ ও মন যে পরস্পরের উপর ক্রিয়া করিতেছে—ইহা আমি স্পষ্ট উপলব্ধি করিতেছি। আমার এই বোধ এত স্পষ্ট এবং প্রকট যে ইহাকে একেবারে অলীক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। তবে সাধারণ অভিজ্ঞতায় যাহাই প্রতীয়মান হউক না কেন, তর্কের দ্বারা এই Interactionism সমর্থন করা যায় না। ইহার বিরুদ্ধে দুইটি গুরুতর আপত্তি আছে—(১) শরীর ও মন সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী পদার্থ; ইহারা যে পরস্পরের উপর কি করিয়া ক্রিয়া করিতে পারে তাহা কেহই বলিতে পারে না; ইহা মনোবিজ্ঞানের চির-রহস্যাবৃত সমস্যা। শারীরিক ক্রিয়ায় নার্ভের স্পন্দন আছে, পেশীর সঞ্চালন আছে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গতি আছে; বলা বাহুল্য, নার্ভ, পেশী ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সবই জড়বস্তু; সেইজন্য জড়বস্তুর সাধারণ গুণ যথা, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ, ঘনত্ব ও দূরত্ব ইত্যাদি সবই ইহাদের মধ্যে বিদ্যমান আছে। এক কথায়, ইহারা সকলেই স্থান দখল করিয়া বিরাজ করে। কিন্তু মনের কোন স্থান-ব্যাপ্তি নাই; দৈর্ঘ্য প্রস্থ ঘনত্ব প্রভৃতি জড়পদার্থের কোন গুণই ইহার মধ্যে থাকিতে পারে না। মোট কথা, মন চেতন পদার্থ আর শরীর অচেতন পদার্থ; ইহারা দুই সম্পূর্ণ বিভিন্ন জগতের ব্যাপার, ইহাদের মধ্যে কোন প্রকার সাদৃশ্য নাই। এইরূপ সম্পূর্ণ দুই বিরোধী বস্তু কিভাবে পরস্পরের উপর ক্রিয়া করিতে পারে, চেতনা কি করিয়া অচেতন শরীরকে সঞ্চালিত করিতে পারে, আর অচেতন শরীরই বা কি প্রকারে চেতন মনের উপর ক্রিয়া করিতে পারে—তাহা মনোবিজ্ঞানের চির-রহস্যাবৃত সমস্যা। (২) আর এক কথা, মানিয়া লওয়া যাউক যে, যে কোনো উপায়েই হউক না কেন ইহারা পরস্পরের উপর ক্রিয়া করিতে পারে এবং ক্রিয়া করিয়া থাকে। তখন আর এক মুশকিল আসিয়া জোটে। জড় বিজ্ঞানের এক প্রধান বিধি, Conservation of Matter and Energy; অর্থাৎ জড়জগতে কোন বস্তুরই বিনাশ নাই। প্রত্যেক বস্তুই রূপান্তর গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু কোন বস্তুই বিনষ্ট হয় না। উদাহরণ, গরম করিলে জল বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়; এক্ষেত্রে জল তো বিনষ্ট হইতেছে না, জল শুধু রূপান্তর গ্রহণ করিয়া আকাশে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। সেইরূপ নদীর স্রোত বৈদ্যুতিক প্রবাহে রূপান্তরিত হইতেছে, এবং পেট্রোলের সুপ্ত শক্তি মোটরের চলৎশক্তিতে পরিণত হইতেছে। অর্থাৎ কোন ক্ষেত্রেই জিনিষগুলি বিনষ্ট হইতেছে না; ইহারা বিভিন্নরূপ পরিগ্রহ করিয়া জড়জগতেই বিরাজ

করিতেছে। ইহাই জড়জগতের নিয়ম; ইহার মোট শক্তির পরিমাণ অপরিবর্তনীয় (Constant); হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই, শুধু রূপান্তর আছে মাত্র। কিন্তু আমরা যদি বলি যে, শরীর ও মন পরস্পরের উপর ক্রিয়া করিতে পারে, তাহা হইলে এই নিয়ম অস্বীকার করিতে হয়। ধর, আমরা বলিলাম যে মস্তিষ্কের ক্রিয়ার ফলে সংবেদন সৃষ্টি হইল; অর্থাৎ মস্তিষ্কের কিঞ্চিৎ শক্তি সংবেদনে পরিণত হইয়া গেল। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে এক্ষেত্রে জড়জগৎ হইতে কিঞ্চিৎ শক্তি চিরতরে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া গেল। আবার ধর, বলিলাম যে মানসিক ক্রিযার ফলে আমার শরীর সঞ্চালিত হইল, অর্থাৎ মানসিক শক্তি শারীরিক শক্তিতে পরিণত হইল। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে এক্ষেত্রে কোথাও হইতে একটু নূতন শক্তি আসিল এবং ফলে জড়জগতের শক্তি কিঞ্চিৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জড়শক্তির মোট পরিমাণ অপরিবর্তনীয—ইহার হ্রাস বা বৃদ্ধি সম্ভব নহে। অতএব Interactionism গ্রহণ করিলে আমাদিগকে বিজ্ঞানের এক প্রতিপাদিত বিধিকে অস্বীকার কবিতে হয়, কিন্তু ইহা সম্ভব নহে।

II Occasionalism

উপরোক্ত আপত্তিগুলি এড়াইবার জন্য ডেকার্টের শিষ্যগণ এক অদ্ভুত মতবাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন; উহার নাম Occasionalism। ডেকার্টের ন্যায় তাঁহারাও বলেন যে মন ও শরীর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ধর্মাবলম্বী বস্তু; তবে তাঁহারা স্বীকার করেন যে ইহাদের পক্ষে পরস্পরের উপর ক্রিয়া করা সম্ভব নহে। কিন্তু তাহা হইলে ইহাদের কার্যকলাপের মধ্যে যে আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য দেখা যায়—উহা কি ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? আমরা স্পষ্ট উপলব্ধি করি যে দিনের বেলায় যখনই আমরা চোখ খুলি (অর্থাৎ শারীরিক ক্রিয়া করি) তখনই আমরা আলোর সংবেদন পাই; আর যখনই আমরা সংকল্প করি (অর্থাৎ মানসিক ক্রিয়া করি) তখনই আমরা চোখ বন্ধ করিতে পারি। শরীর ও মনের মধ্যে এই যে আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য বিদ্যমান—ইহার কারণ কি? ইহারা তো পরস্পরের উপর ক্রিয়া করিতে পারে না; তৎ সত্ত্বেও ইহাদের কাযাবলীর মধ্যে এইরূপ অদ্ভুত মিল দেখি কেন? ইহার ব্যাখ্যায় ডেকার্টের শিষ্যগণ বলেন যে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপের ফলেই এইরূপ হইয়া থাকে। উদাহরণ, আমি ইচ্ছা করিলাম যে হাত বাড়াইয়া ফুলটি তুলিয়া লই। কিন্তু শুধু ইচ্ছা করিলেই তো হয় না; হাতটি বাড়াইতে হইবে; কিন্তু বাড়াইবে কে? ইচ্ছা বা সংকল্প তো আমার মনের ব্যাপার; শরীরের উপর

ইহা ক্রিয়া করিতে পারে না। তাহা হইলে হাতটি সঞ্চালিত হইবে কেমন করিয়া? ইহার উত্তরে Occasionalism বলে যে মনকে সাক্ষাৎভাবে শরীরের উপর ক্রিয়া করিবার প্রয়োজন নাই; মনের মধ্যে যখনই ইচ্ছার উদ্রেক হয় তখনই ঈশ্বর আসিয়া আমার শরীরকে সঞ্চালিত করিয়া দেন; তাই আমি হাত বাড়াইয়া ফুল তুলিয়া লই। এক্ষেত্রে আমার মন শরীরকে সঞ্চালিত করিতেছে না। আমার শরীরকে সঞ্চালিত করিতেছে ঈশ্বর; অতএব আসল কর্ত্তা ঈশ্বর, আমার মনের ইচ্ছা নিমিত্ত মাত্র। আমার ইচ্ছার কোন কার্য্যকারিতা নাই, কার্য্যক্ষমতা আছে ঈশ্বরের, তিনিই আমার ইচ্ছা অনুযায়ী হাতকে সঞ্চালিত করিয়া দিতেছেন। সেইরূপ বাহির হইতে বায়ুতরঙ্গ আসিয়া আমার কর্ণকে যখন উদ্দীপিত করে এবং সেই উদ্দীপনা-সংবাদ যখন আমার মস্তিষ্কে গিয়া পৌঁছে—তখন আমার পক্ষে শব্দ সংবেদন পাওয়া দরকার; কিন্তু মস্তিষ্ক তো শারীরিক বস্তু; ইহা মানসিক সংবেদন সৃষ্টি করিবে কেমন করিয়া? কিন্তু মাভৈঃ, ঈশ্বর আছেন; তিনি যেই দেখিলেন যে আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে উপযুক্ত পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, অমনি তিনি তদুপযোগী সংবেদন সৃষ্টি করিয়া দিলেন; ফলে আমি শব্দ সংবেদন পাইলাম। এ ক্ষেত্রেও আমার উদ্দীপিত মস্তিষ্ক নিমিত্ত মাত্র, উহাকে উপলক্ষ্য করিয়া ঈশ্বর মনের উপর ক্রিয়া করিতেছেন।

সমালোচনা

এই মতবাদের প্রতি মোটেই গুরুত্ব আরোপ করা যায় না। প্রথমতঃ, ঈশ্বর আছেন কি না—তাহারই কোন সঠিক প্রমাণ নাই; তারপরে যে কাজের জন্য তাঁহাকে প্রয়োজন হইতেছে তাহা নিতান্তই হাস্যাস্পদ। প্রতি মুহূর্ত্তে প্রত্যেকের নিকট তিনি হাজির হইতেছেন—যাহাতে তাহার শারীরিক ক্রিয়ার সঙ্গে যথাযথ মানসিক ক্রিয়া এবং মানসিক ক্রিয়ার সঙ্গে যথাযথ শারীরিক ক্রিয়া সংঘটিত হইতে পারে; ইহাই তাঁহার নাকি প্রতি মুহূর্ত্তের কাজ! ইহা নিতান্ত হাস্যাস্পদ কথা নহে কি?

III Pre-established Harmony (Leibnitz)

উপরোক্ত আপত্তি দূর করিবার জন্য অনেকে বলেন যে ঈশ্বরকে প্রতিমুহূর্তে আমাদের কার্যে হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই। প্রারম্ভে একবার সামঞ্জস্য সাধন করিয়া দিলেই হইল; তারপরে স্বয়ংক্রিয় ভাবে আমাদের শরীর ও মন

পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া কাজ করিতে পারে। উদাহরণ, দুইটি ঘড়ি নিখুঁতভাবে তৈয়ারি করিয়া কারিগর দুইটিকেই একই সময়ে দম দিয়া চালু করিয়া দিলেন। তখন হইতে দুইটি ঘড়ি একই সময়ে টং টং করিয়া বাজিবে। এক্ষেত্রে বলা বাহুল্য কোন ঘড়িই অন্য ঘড়ির উপর ক্রিয়া করিতেছে না, অথচ কি অদ্ভুত সামঞ্জস্য রাখিয়া তাহারা কাজ করিতেছে। ইহার কারণ, প্রারম্ভেই তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করিয়া রাখা হইয়াছে, সেইজন্য কারিগরকে ঘন ঘন ইহাদের কাজে হস্তক্ষেপ করিতে হইতেছে না। শরীর ও মনের মধ্যেও ঠিক এইরূপ সম্বন্ধ বর্তমান। ঈশ্বর এমন নিখুঁতভাবে ইহাদিগকে তৈয়ারি করিয়াছেন যে, যখনই মন ক্রিয়া করে, তখনই সঙ্গে সঙ্গে শরীরও ক্রিয়া করে; আবার যখন শরীর ক্রিয়া করে তখন সঙ্গে সঙ্গে মনও ক্রিয়া করে। প্রারম্ভ হইতেই এইরূপ সামঞ্জস্য (Pre-established Harmony) সাধিত করিয়া রাখা হইয়াছে; সেইজন্য ঈশ্বরকে আর এখন হস্তক্ষেপ করিতে হয় না।

সমালোচনা

বলা বাহুল্য, এই মতবাদের উপরেও বিশেষ কোন গুরুত্ব আরোপ করা যায় না। Occasionalism-মতবাদের ন্যায় ইহারও মতে ঈশ্বরই আমাদের শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়ার মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করিতেছেন, তবে প্রতিমুহূর্তে এইরূপ করিবার প্রয়োজন হইতেছে না, প্রারম্ভে একবার করিয়া দিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইয়াছেন। ইহাকে ব্যাখ্যা বলে না; ব্যাখ্যার মাধ্যমে শুধু স্বীকার করা হইতেছে যে মন ও শরীরের মধ্যে অনতিক্রমনীয় পার্থক্য বর্তমান।

(IV) **Parallelism.** (Spinoza)

উপরোক্ত তিনটি মতবাদেই মানিয়া লওয়া হইয়াছে যে মন ও শরীর সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির জিনিষ; ইহাদের মধ্যে কোনপ্রকার সাদৃশ্য নাই, অথচ ইহাদের কাজের মধ্যে অদ্ভুত সামঞ্জস্য বর্তমান। ইহার কারণ কি? এই কারণ ব্যাখ্যা করিবার জন্য ডেকার্ট এবং তাঁহার শিষ্যগণ যাহা বলেন এতক্ষণ তাহা আলোচনা করা গেল। এখন Spinoza কি বলেন, তাহাই ব্যাখ্যা করা যাউক। Spinoza-ও বলেন যে দেহ ও মন সম্পূর্ণ বিভিন্ন; অতএব ইহারা পরস্পরের উপর ক্রিয়া করিতে পারে না। তবে সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইহাও বলেন যে ইহাদের পক্ষে পরস্পরের উপর ক্রিয়া করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। কারণ,

ইহারা বিভিন্ন হইলেও মূলে এক, যেহেতু ইহারা একই ব্রহ্মের বিভিন্ন গুণ মাত্র। Spinoza-র মতানুসারে ব্রহ্মের দুইটি গুণ আছে—দৈহিকতা (দেহ, Extension) এবং মানসিকতা (মন, Consciousness)। এই দুইটি গুণের মধ্য দিয়াই তিনি নিরন্তর আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। অতএব আমরা যখন বলি যে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সমস্তই ব্রহ্মের দ্বারা পরিব্যাপ্ত, তখন আমরা এই বুঝি যে যেখানে যাহা আছে সবই ব্রহ্মের এই গুণদ্বয়ের প্রকাশমাত্র; তাঁহার এই গুণদ্বয়—দৈহিকতা ও মানসিকতা, বিশ্বের সর্বত্রই সমভাবে বর্তমান। যেখানে দেহ আছে সেখানেই মন আছে, আর যেখানে মন আছে সেখানেই দেহ আছে। ঈশ্বর যেমন এই দুইটি গুণ ছাড়া থাকিতে পারেন না, তেমন এই গুণ দুইটিও পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না; সর্বত্রই ইহারা একত্রে বিদ্যমান আছে। তাই যখনই আমরা জড় পদার্থ দেখি তখনই আমরা বুঝিতে পারি যে ইহার মধ্যে মন আছে, আর যখন মন দেখি তখন বুঝি যে ইহার সঙ্গে দেহ আছে। ইহারা একই জিনিষের দুইটি বিভিন্ন দিক। যেমন, বাহির হইতে যখন প্রত্যক্ষ করি তখন দেখি আমি কয়েকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমষ্টিমাত্র; আমার হাত পা নাক কান আছে। কিন্তু ইহা তো শুধু আমার বাহিরের দিক; আমার ভিতরের দিকেও লক্ষ্য করিতে হইবে। ভিতরের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখি আমার মধ্যে চিন্তা কামনা কল্পনা প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়া-নিরন্তর প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। এইভাবে দুই দিক হইতে লক্ষ্য করিলে তবে আমাকে পূর্ণ রূপে দেখা হয়। নতুবা শুধু দেহের দিকে লক্ষ্য করিয়া আমাকে কেবল এক জড়পদার্থ বিবেচনা করিলে, অথবা শুধু মনের দিকে লক্ষ্য করিয়া আমাকে কেবল চেতন-পদার্থ বিবেচনা করিলে, আমাকে আংশিক ভাবে দেখা হয়, পূর্ণরূপে দেখা হয় না। তাই আমরা বলিয়াছি যে দৈহিকতা ও মানসিকতা—ইহারা কখনই বিচ্ছিন্ন হইয়া বিরাজ করে না; ইহারা সর্বদাই একত্র থাকে। সেইজন্য দেখি, যখনই কোন মানসিক ক্রিয়া সংঘটিত হয়, তখনই কোন না কোন প্রকারের শারীরিক ক্রিয়াও সংঘটিত হইয়া থাকে; আবার যখন কোন মানসিক ক্রিয়া সংঘটিত হয় তখন কোন না কোন প্রকারের শারীরিক ক্রিয়াও সংঘটিত হইয়া থাকে। একটি রেল লাইন যেমন আর একটি রেল লাইনের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে চলিয়া থাকে, শারীরিক ক্রিয়াও তেমনি মানসিক ক্রিয়ার সহিত সমান তালে চলিতে থাকে। ইহাকে ইংরাজীতে Parallelism বলে। এক্ষেত্রে মনে রাখিতে হইবে কেহই কাহারো উপর ক্রিয়া করিতেছে না; একটি রেল লাইন যেমন আর একটি রেল লাইনের উপর ক্রিয়া করে না, শুধু সমান্তরাল গতিতে চলিতে থাকে, সেইরূপ মন

ও শরীরও পরস্পরের উপর ক্রিয়া করে না, শুধু সমান্তরাল ভাবে বিরাজ করিতে থাকে।

সমালোচনা

(১) প্রথমতঃ, Spinoza-র মতানুসারে যেখানে মন আছে সেখানে শরীর আছে, আর যেখানে শরীর আছে সেখানে মনও আছে।* ইহা যদি ঠিক হয় তবে বলিতে হইবে যে ইট পাথরের মধ্যেও চেতনা আছে; কিন্তু কবিরা যাহাই বলুন না কেন, বৈজ্ঞানিকেরা এখনও পাথরের মধ্যে চেতনার সন্ধান পান নাই। যাহাদের জীবন আছে, নার্ভ আছে এবং মস্তিষ্ক আছে, শুধু তাহাদেরই চেতনা আছে; ইন্দ্রিয় ও জীবন-বিবর্জিত জড় পদার্থের মধ্যে চেতনা থাকিতে পারে না। (২) দ্বিতীয়তঃ, Spinoza-র মতবাদ যদি ঠিক হয় তবে বলিতে হইবে যে আমাদের শরীরের দ্বারা মন কখনও প্রভাবান্বিত হইতে পারে না, আবার মনের দ্বারাও শরীর কখন প্রভাবান্বিত হইতে পারে না। কিন্তু ইহা কি ঠিক? আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা হইতে আমরা ইহার কোনরূপ সমর্থন পাই না। আমরা সকলেই দেখিতেছি যে শরীরে যখন কোন ক্ষত হয় তখন সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনের মধ্যেও ব্যথার উদ্রেক হয়, আর মন যখন শোকে ও দুঃখে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে, তখন আমাদের শরীরও দুর্ব্বল ও ক্লান্ত হইয়া পড়ে। এমতাবস্থায় আমরা কি করিয়া বলিতে পারি যে মন শরীরের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না? বস্তুতঃ শরীরের উপর মনের প্রভাব অস্বীকার করিতে গেলে বিশ্বের বিবর্ত্তনই অস্বীকার করিতে হয়। বিশ্বজগৎ ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে; ইহার অন্তর্নিহিত বিষয়গুলি ক্রমে ক্রমে বিকশিত হইয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতেছে। জড়ের পর জীবন আসিতেছে, জীবনের পর মন আসিতেছে—এইভাবে নিম্নস্তর-জিনিষের পর উচ্চস্তর-জিনিষের আবির্ভাব হইতেছে। তাই দেখি মন আসিয়াছে সর্ব্বশেষে; অথচ এই মনের নাকি কাহারও উপর কোনই প্রভাব প্রতিপত্তি নাই—ইহাই যদি ঠিক হয় তবে অগ্রগতির সার্থকতা রহিল কোথায়?

(V) Materialism

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে দেহ ও মনের মধ্যে গভীর সম্বন্ধ বর্তমান; বিভিন্ন মতবাদে বিভিন্ন ভাবে এই সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

* ইহাকে Panpsychism বলে; pan=সব, psyche=মন; অর্থাৎ সর্বত্রই চেতনা, সবই চৈতন্যময়।

উপরে আমরা কয়েকটি মতবাদ আলোচনা করিলাম, কিন্তু কোনটিই সন্তোষজনক বলিয়া প্রতীয়মান হইল না। এখন জড়বাদিগণের ব্যাখ্যা শোনা যাউক। তাঁহারা বলেন, উপরোক্ত প্রত্যেক মতবাদেরই গোড়ায় গলদ আছে; তাই তাহাদের কাহারো ব্যাখ্যা ঠিক হইতেছে না। তাহারা সকলেই মানিয়া লইয়াছেন যে মন ও শরীর—দুইটিই সমান গুরুত্বসম্পন্ন বস্তু। এমন কি Spinoza—যিনি ইহাদিগকে স্বতন্ত্র পদার্থ না বলিয়া ব্রহ্মের দুই গুণমাত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন—তিনিও ইহাদের গুরুত্বের তারতম্য করেন নাই; তাঁহারও মতানুসারে ইহারা দুইটিই সমান গুরুত্বসম্পন্ন এবং সমান মর্য্যাদাবিশিষ্ট। কিন্তু জড়বাদিগণ ইহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে মন আসল জিনিষ নহে, আসল জিনিষ জড় পদার্থ; উহাই আদিম এবং অকৃত্রিম বস্তু; উহার ক্রিয়া বশতঃই এই বিশ্বজগৎ উদ্ভূত হইতেছে। শুধু বিশ্বজগৎ কেন, মনোজগৎ উদ্ভবের মূলেও আছে জড়বস্তুর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া। বহির্জগত হইতে উদ্দীপনা আসিয়া আমাদের মস্তিষ্কে যে আন্দোলন সৃষ্টি করে—সেই আন্দোলনের পরিণামেই মানসিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার উৎপত্তি হয়। এই ভাবে জড়বস্তুর ক্রিয়া হইতেই মনের উৎপত্তি, কিন্তু জড়বস্তুর উপর মনের কোন প্রভাব নাই; শুধু তাহাই নহে, জড়বাদিগণের মতে মনের কোন প্রকার কার্য্যকারিতাই থাকিতে পারে না। উদাহরণ:—দুপুর বেলা আমরা গাছের ছায়া দেখিতে পাই; এ ক্ষেত্রে গাছই ছায়া সৃষ্টি করিতেছে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া কি ছায়া গাছের উপর ক্রিয়া করিতে পারে? মোটেই না; বরং ছায়ার কোনই কার্য্যকারিতা নাই; ইহা থাকিলেই বা কি আর না থাকিলেই বা গাছের কি? উহাতে গাছের কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না। সেইরূপ মস্তিষ্কের ক্রিয়াবশতঃ যে মানসিক প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন হয়—উহাও একরকম ছায়া মাত্র;* দেহের উপর উহার কোনই প্রভাব নাই, উহা উৎপন্ন না হইলেও বিশ্বজগতের কোন ক্ষতি হইত না।

সমালোচনা। Spinoza ও ডেকার্টের বিরুদ্ধে আমরা যাহা বলিয়াছি—জড়বাদের বিরুদ্ধেও তাহা বলা যাইতে পারে। প্রথমতঃ জড়পদার্থ হইতে শুধু জড়পদার্থ উৎপন্ন হইতে পারে; মন উৎপন্ন হইতে পারে না। মনের ধর্ম্ম সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির; ইহার মধ্যে চেতনা আছে কিন্তু স্থানব্যাপ্তি নাই; আর দেহের মধ্যে স্থানব্যাপ্তি আছে, কিন্তু চেতনা নাই। এই প্রকার চেতনাহীন পদার্থ হইতে চেতনার উদ্ভব হওয়া সম্ভব নহে। দ্বিতীয়তঃ, যদি বা বলা হয় যে চেতনাহীন

* ইহাকে ইংরাজীতে Epiphenomenon বলে; সেইজন্য এই মতবাদকে Epiphenomenalism নামেও অভিহিত করা হয়।

মস্তিষ্ক হইতেই চেতনার উদ্ভব হইয়া থাকে, তাহা হইলে বিজ্ঞানের এক সর্ব্ববাদী-সম্মত মতবাদকে (conservation of matter and energy) অস্বীকার করিতে হয়। বিজ্ঞান বলে যে জড়জগতে কোন জিনিষেরই হ্রাস বা বৃদ্ধি নাই; কিন্তু জড়জগতের কিঞ্চিৎ শক্তি যদি মানসিক ক্রিয়া উৎপন্ন করিতে ব্যয়িত হইয়া যায়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে জড়জগতের কিঞ্চিৎ শক্তি সত্যই হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া গেল। বিজ্ঞানের পক্ষে ইহা স্বীকার করা সম্ভব নহে। তৃতীয়তঃ, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে দেহের উপর মনের প্রভাব অস্বীকার করিলে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ অভিজ্ঞতাকেও অস্বীকার করিতে হয়। আমি স্পষ্ট উপলব্ধি করি যে মানসিক শক্তি প্রয়োগেই আমার শরীর সঞ্চালিত হইয়া থাকে; আমি যখন মনে মনে সঙ্কল্প করি তখনই প্রবন্ধ লিখিতে বসি; ভয় আসিলে এক রকম কাজ করি আর রাগ আসিলে অন্যরকম কাজ করি। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মনের প্রভাবে শারীরিক ক্রিয়া সম্পাদিত হইতেছে, এমতাবস্থায় আমরা কি করিয়া বলিতে পারি যে মনের কোন কার্যকারিতা নাই?

(VI) Subjective Idealism (Berkeley)

জড়বাদের সম্পূর্ণ বিপরীত মতবাদের নাম Subjective Idealism। জড়বাদে স্বভাবতঃই জড়বস্তুর উপরে অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়, তবে মনের অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করা হয় না, শুধু বলা হয় যে ইহার কোন কার্য্যকারিতা নাই। কিন্তু Subjective Idealism বলেন যে মনই একমাত্র সত্য, জড়বস্তুর কোন অস্তিত্বই নাই। ধর, আমি একটি ফল দেখিতেছি; জড়বাদিগণ বলেন যে ফল জড়পদার্থ, ইহার এক নিজস্ব সত্তা আছে। Idealist বা ভাববাদী বলেন যে, ফল সম্বন্ধে আমি যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহার কোনটিও জড়পদার্থ নহে, প্রত্যেকটিই আমার মনের ভাব মাত্র। যখন ফল প্রত্যক্ষ করি, তখন কি দেখি? দেখি ইহার এক বিশিষ্ট বর্ণ, গন্ধ এবং স্বাদ আছে, অধিকন্তু ইহার এক নিজস্ব আকৃতি আছে এবং ইহাকে আমরা হাত দিয়া স্পর্শ করিতে পারি। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি—ফলের এই যে বর্ণ, বা গন্ধ বা স্বাদ—ইহার একটিও কি জড়বস্তু? মোটেই না; ইহাদের প্রতেকটিই সংবেদন মাত্র, মনের মধ্যে উদিত হইয়া ইহারা মনের মধ্যেই লীন হইয়া যাইতেছে; ইহারা জড় জগতের অচেতন ক্রিয়া নহে, ইহারা আমাদের মনোজগতের সচেতন প্রক্রিয়া। ফলের আকৃতি সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা প্রযোজ্য; চোখ দিয়া দেখিয়া বা হাত দিয়া স্পর্শ করিয়া বুঝিতেছি যে ইহা আকারে কিঞ্চিৎ গোল এবং ইহার ওজন অতি সামান্য।

কিন্তু আমরা জানি যে চোখ দিয়া দেখিয়া বা হাত দিয়া স্পর্শ করিয়া আমরা যাহা পাই তাহা সংবেদন ব্যতীত আর কিছুই নহে। দর্শন সংবেদন, স্পর্শ সংবেদন—সবই সংবেদন, এবং সংবেদন মাত্রই মনের জিনিষ, জড় জিনিষ নহে। এইভাবে বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যাইবে যে ফলটির কোন স্বতন্ত্রসত্তা নাই; ইহা কতগুলি সংবেদনের সমষ্টি মাত্র। মোটকথা, ইহার সম্বন্ধে যাহাই আমরা বলি না কেন—সবই সংবেদন-লব্ধ মানসিক তথ্য মাত্র। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে বহির্জগৎ বা জড়জগৎ বলিয়া কোন কিছু নাই, যাহা কিছু আছে সবই আমাদের মনের মধ্যে ভাবধারা রূপে বিরাজ করিতেছে।

সমালোচনা

এইভাবে ভাববাদিগণ বহির্জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহার অস্তিত্ব উড়াইয়া দেওয়া তত সহজ নহে। প্রথমতঃ, মানিয়া লওয়া যাউক যে সংবেদন ব্যতীত বহির্জগতের কোন খবরই আমরা পাই না; সবই সংবেদন। কিন্তু বাহিরে কিছু না থাকিলে আমরা সংবেদন পাইব কোথা হইতে? আমি তো বাগানে বসিয়া নিজে গান করিতেছি না, আমি চুপ করিয়া বসিয়া আছি; তাহা সত্ত্বেও আমি পাখীর গান শুনিতেছি অর্থাৎ শব্দ সংবেদন পাইতেছি। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে আমার বাহিরে এমন কিছু আছে যাহা আমাকে জোর করিয়া গান শুনাইতেছে, তাই আমি বাধ্য হইয়া শুনিতেছি। তখন আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে আমা ছাড়াও অপর জিনিষ আছে যাহা আমার মনে সংবেদন সৃষ্টি করিয়া স্বীয় সত্তা জ্ঞাপন করিতেছে। দ্বিতীয়তঃ, বাগানে বসিয়া কেবল যে আমি একাকী গান শুনিতেছি, তাহা নহে; রাম শ্যাম যদু হরি যাহারা বসিয়া আছে সকলেই বলিতেছে যে তাহারাও পাখীর কলরব শুনিতেছে। আমি যদি শুধু একাকী গান শুনিতাম এবং আর কেহই শুনিতে না পাইত, তাহা হইলে না হয় বলা যাইত যে ইহা আমার মনের সৃষ্টি, বাহিরে কোথাও কিছু নাই। কিন্তু তাহা তো নহে; আমি যেমন পাখীর গান শুনিতেছি আর সকলেও তেমন পাখীর গান শুনিতে পাইতেছে। আমরা সকলেই যখন যুগপৎ একই জিনিষ শুনিতেছি তখন স্বীকার করিতে হইবে যে মনের বাহিরে এক স্বতন্ত্র জগৎ আছে যাহা আমাদের সকলকেই সমভাবে উদ্দীপিত করিয়া স্বীয় সত্তা জ্ঞাপন করিতেছে; তাই আমরা সকলেই একই রকম সংবেদন পাইতেছি,। তৃতীয়তঃ, শুধু যে একই রকম সংবেদন পাইতেছি, তাহা

নহে; সকলেই আমরা একই রকম প্রতিক্রিয়াও করিতেছি। বৃষ্টিকে আমরা সকলেই যে শুধু বৃষ্টি মনে করিতেছি, তাহা নহে; বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আমরা সকলেই ছাতা ব্যবহার করিতেছি। অর্থাৎ বহির্জগৎ শুধু একই রকমের সংবেদন সৃষ্টি করিয়া ক্ষান্ত নহে, একই ধরণের প্রতিক্রিয়াও আদায় করিয়া লইতেছে। এইভাবে বহির্জগতের নিকট নতিস্বীকার করিয়া আমরা প্রকারান্তরে ইহার স্বতন্ত্র সত্তা মানিয়া লইতেছি।

(VII) Objective Idealism (Hegel)

তাহা হইলে দেখা গেল যে বহির্জগতের তথা জড়জগতের অস্তিত্ব মোটেই অস্বীকার যায় না; অর্থাৎ মনোজগৎ যেমন সত্য, জড়জগৎও তেমন কঠোর সত্য; দুইটিই সত্য। ইহাদের একটিকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিলে আমাদের ব্যাখ্যা সহজ হয় বটে, কিন্তু Materialism এবং Idealism আলোচনা করিয়া দেখিলাম যে ইহাদের একটিকেও অবহেলা করা যায় না; দুইটিকেই গ্রহণ করিতে হইবে। Hegel ঠিক তাহাই করিয়াছেন; তাঁহার এই মতবাদের নাম Objective Idealism. ইহাতে জড়বস্তু (Matter) এবং ভাববস্তু (Mind) দুইটিরই অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে; তিনি বলেন ব্রহ্ম কখন সৃষ্টি ছাড়া থাকিতে পারেন না, সৃষ্টির মধ্য দিয়াই তিনি নিরন্তর আত্মপ্রকাশ করিয়া চলিয়াছেন। হেগেলের এই ব্রহ্মকে আমরা বেদান্তের ভাষায় 'চিৎ' (Reason, Consciousness) বলিয়া অভিহিত করিতে পারি, তিনি অনন্ত জ্ঞান-স্বরূপ। তিনি শুধু মানুষের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, তাহা নহে; সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি অচেতন পদার্থ এবং পশুপক্ষী, নর-নারী প্রভৃতি চেতন পদার্থ—সকল জিনিসের মধ্য দিয়াই তিনি আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। অতএব জড়পদার্থ ও অচেতন পদার্থ —সকল পদার্থেরই মূলে আছেন তিনি। কবিদের ভাষায় বলা যায় যে, যখন তিনি সূর্য চন্দ্র বা গ্রহনক্ষত্রে বিরাজ করেন, তখন তিনি জড়রূপে শোভা পান। আর যখন তিনি মানুষের মনে ক্রিয়া করেন তখন তিনি চেতনারূপে বিরাজ করেন।

ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে চেতন ও অচেতন পদার্থের মধ্যে কোন মূলগত পার্থক্য নাই; বরং মূলে তাহারা একই, একই ব্রহ্মের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। এই ব্রহ্মের যদি জীবন ইতিহাস লেখা সম্ভব হয়, তবে বলিতে হইবে যে, তিনি প্রথমে প্রকাশিত হন জড়রূপে, পরে প্রকাশিত হন আমাদের মন-

রূপে। যখন তিনি জড়রূপে বিরাজ করেন তখন তিনি আত্মবিস্মৃত থাকেন, আর যখন তিনি মনরূপে বিরাজ করেন তখন তিনি আত্ম-চেতনা লাভ করেন। এইভাবে বিবেচনা করিলে বুঝা যাইবে যে দেহ ও মনের যে দ্বন্দ্বের কথা আমরা বলিয়াছি এবং যে দ্বন্দ্ব সমাধানের জন্য বিভিন্ন মতবাদ আলোচনা করিয়াছি, সে দ্বন্দ্ব প্রকৃত দ্বন্দ্ব নহে; মিথ্যা দ্বন্দ্ব। কারণ, যাহাদিগকে প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া মনে করা হইয়াছে—তাহারা তো বাস্তবিক প্রতিদ্বন্দ্বী নহে, তাহারা একই ব্রহ্মের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। ইহাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকিতে পারে না; কারণ ব্রহ্ম কি করিয়া ব্রহ্মের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে?

ষষ্ঠ অধ্যায়

আত্মার স্বরূপ

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে মনের সহিত দেহের গভীর সম্বন্ধ আছে। পূর্ব প্রবন্ধে এই সম্বন্ধের কথা আলোচনা করা হইয়াছে, সেখানে আমরা মন লইয়া আলোচনা করিয়াছি বটে, কিন্তু সে মন দেহ-বিমুক্ত মন নহে, দেহ সংযুক্ত মন। এখন মনকে আমরা শুধু মনের দিক দিয়াই আলোচনা করিব, দেহের সহিত ইহার কি সম্বন্ধ সে কথা এখানে উত্থাপনই করা হইবে না, অর্থাৎ দেহের কথা বাদ দিয়া শুধু মনের কথা আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এই প্রসঙ্গে আমরা কখন ইহাকে মন আর কখন বা আত্মা বলিয়া উল্লেখ করিব।

মন বলিতে আমরা কি বুঝি তাহাই প্রথমে আলোচনা করা যাউক। মনকে আমরা সাধারণতঃ দুইরকম ভাবে অনুশীলন করিতে পারি। প্রথমতঃ, আমরা শুধু ইহার ক্রিয়া-প্রক্রিয়া লক্ষ্য করিতে পারি; আর দ্বিতীয়তঃ, ক্রিয়া-প্রক্রিয়া লক্ষ্য না করিয়া, এই ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার যে কর্তা, শুধু সেই কর্তার কথাই চিন্তা করিতে পারি। প্রথমে ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার কথা লওয়া যাউক। তুমি যদি তোমার মনের মধ্যে অবলোকন কর তবে দেখিতে পাইবে সেখানে নানাপ্রকার ক্রিয়া-প্রক্রিয়া চলিতেছে। তুমি স্মরণ করিতেছ বা দর্শন করিতেছ, চিন্তা করিতেছ বা কল্পনা করিতেছ, দ্বিধা করিতেছ বা সংকল্প করিতেছ—ইত্যাদি নানাপ্রকার মানসিক ক্রিয়া তোমার মনের মধ্যে ঘটিয়া যাইতেছে। কখন তুমি সুখ বোধ করিতেছ আর কখন বা দুঃখ বোধ করিতেছ, কখন রাগ করিতেছ আর কখন বা ভয় পাইতেছ—ইত্যাদি নানাপ্রকার মানসিক অবস্থা তোমার মনের মধ্যে উদিত হইতেছে এবং ক্ষণ পরে বিলান হইয়া যাইতেছে। মনোবিজ্ঞান অনুশীলনের জন্য

এই ক্রিয়া-প্রক্রিয়াগুলি যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন; তাহা হইলে মনের সম্বন্ধে আমরা অনেক তথ্যই জানিতে পারি।

এইভাবে ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার কথা আলোচনা করিতে করিতে স্বভাবতঃই ইহার কর্তার কথা আসিয়া পড়ে। আমাদের মনের মধ্যে চিন্তা স্মৃতি কল্পনা প্রভৃতি ক্রিয়া তো আছে; কিন্তু মন বলিতে এই বিভিন্ন ক্রিয়াগুলি ব্যতীত আর কিছুই বুঝি না কি? ক্রিয়াগুলি ছাড়াও মনের মধ্যে এমন কোন "অতিরিক্ত কিছু" নাই কি—যাহা নিজেকে এই ক্রিয়াগুলির কর্তা বলিয়া দাবী করে? তোমার নিজের মনের ভিতরে তাকাও, তাহা হইলেই এই প্রশ্নের উত্তর পাইবে; তুমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে যে, এই সকল ক্রিয়া ব্যতীত তোমার নিজের এক স্বামিত্ববোধ বা কর্তৃত্ববোধ আছে; ইহাই তোমার Ego বা অহং বোধ। এই অহং বোধ আছে বলিয়াই তুমি বুঝিতে পারিতেছ যে, তোমার মনে যে সকল চিন্তা, কামনা বা কল্পনা আসিতেছে, তাহারা শূন্য হইতে খসিয়া পড়িতেছে না বা বন্যার জলে ভাসিয়া আসিতেছে না; ইহারা সবই তোমার নিজস্ব জিনিস; সবই তোমার অহং হইতে উদ্গত হইতেছে। আমার চিন্তা আমার অহং হইতে আসিতেছে, তোমার চিন্তা তোমার অহং হইতে আসিতেছে। আমার মনে আমি চিন্তা করিতেছি, তোমার মনে তুমি চিন্তা করিতেছ; এইভাবে বিভিন্ন মানসিক ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া আমাদের নিজ নিজ অহং আত্মরূপ প্রকাশ করিতেছে।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল যে মন বলিতে আমরা শুধু কতকগুলি মানসিক ক্রিয়া বুঝি না; যে এই মানসিক ক্রিয়াগুলি সম্পাদন করিতেছে সেই কর্তাকেও বুঝি। অর্থাৎ মনকে সম্পূর্ণভাবে অনুশীলন করিতে হইলে কেবল ক্রিয়াগুলির কথা লইয়া আলোচনা করিলে চলে না, সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের কর্তার কথাও বিবেচনা করিতে হয়। এই কর্তা হইতে ক্রিয়াগুলি উদ্গত হইতেছে, ইহাই তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে এবং ইহাই তাহাদিগকে একত্র ধারণ করিয়া রাখিয়াছে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে মন বলিতে আমরা শুধু মানসিক ক্রিয়া বুঝি না, এইসব মানসিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়া যে কর্তা আত্মপ্রকাশ করিয়া চলিয়াছে—তাহাকেও বুঝি। অতএব আমাদের মতানুসারে আত্মা মানে শুধু ক্রিয়া নহে, বা শুধু কর্তা নহে; আত্মা মানে কর্তা+ক্রিয়া। ক্রিয়া বাদ দিয়া কর্তার কথা চিন্তা করা যায় না। আবার কর্তা বাদ দিয়াও ক্রিয়ার কথা চিন্তা করা যায় না। কর্তা ও ক্রিয়া লইয়া আত্মা।

দর্শনশাস্ত্রের কোন বিষয়েই যখন মতৈক্য নাই, তখন এবিষয়ও যে মতৈক্য থাকিবে না, তাহা বলাই বাহুল্য। আমরা উপরে যে মতবাদ ব্যাখ্যা করিলাম, উহাই একমাত্র মতবাদ নহে; আরও দুইপ্রকার মতবাদ আছে। (১) অনেকে বলেন যে আত্মা মানে ক্রিয়াশূন্য কর্তা, এই কর্তা হইতেই মানসিক ক্রিয়া-সমূহ উদ্গত হইতেছে বটে, কিন্তু ক্রিয়াসমূহের কথা বাদ দিয়াও আমরা ইহার এক স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সত্তা কল্পনা করিতে পারি। ইহাকে ইংরাজীতে Noumenal Self বলে। (২) আবার অনেকে বলেন যে কর্তা বলিয়া কোন স্বতন্ত্র সত্তাই নাই, সবই ক্রিয়া প্রক্রিয়া। এই কর্তাশূন্য ক্রিয়া সমষ্টিকেই তাঁহারা আত্মা বলিয়া অভিহিত করেন; ইহাকে ইংরাজীতে বলে Empirical Self। (৩) আর তৃতীয় মতবাদের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, এই মতানুসারে আত্মা মানে শুধু ক্রিয়া নহে বা শুধু কর্তা নহে; আত্মা মানে কর্তা+ক্রিয়া। ক্রিয়া বিহীন কর্তা বা কর্তা বিহীন ক্রিয়া সম্ভব নহে। কর্তা থাকিলেই ক্রিয়া চাই, আর ক্রিয়া থাকিলেই কর্তা চাই। ইহাকে ইংরাজীতে Idealistic Self বলে। আমরা এখন একে একে এই মতবাদগুলি লইয়া আলোচনা করিব।

I. Noumenal Self

আমাদের মনের ভিতরে অবলোকন করিলে আমরা কি দেখি? দেখি, আমাদের মনের মধ্যে চিন্তাধারা অনুক্ষণ আসিতেছে ও যাইতেছে; কিন্তু কোন চিন্তাই বেশীক্ষণ ধরিয়া বিরাজ করিতেছে না। যাহা আসিতেছে তাহা খানিকপরেই চলিয়া যাইতেছে; উহার পরিবর্তে আবার নূতন চিন্তা বা নূতন ভাব আসিয়া জমা হইতেছে। সিনেমার পর্দার উপরে যেমন দৃশ্যের পর দৃশ্য পরিবর্তন হইয়া চলিয়াছে, আমাদের মনের পটেও সেইরূপ ক্রিয়ার পর ক্রিয়া পরিবর্তন হইয়া চলিয়াছে। মনের এই প্রবাহের সহিত সাধারণতঃ নদী-প্রবাহের তুলনা করা হইয়া থাকে। নদীর জল এক মুহূর্তও স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া নাই; যে জল আসিতেছে তাহা পরমুহূর্তেই সরিয়া যাইতেছে, তখন আবার অন্য জল আসিয়া সে স্থান পূর্ণ করিতেছে। নদী-প্রবাহের ন্যায় আমাদের চিন্তাপ্রবাহও এইরূপ নিরন্তর গতিতে প্রবাহিত হইতেছে। সবই ঠিক, কিন্তু ইহা ছাড়াও চেতনার মধ্যে এমন এক অতিরিক্ত কিছু আছে—যাহা স্রোতের সঙ্গে ভাসিয়া যাইতেছে না, যাহা সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যেও অপরিবর্তনীয় রহিয়া বিরাজ করিতেছে। এই অপরিবর্তনীয় সত্তাকেই ইংরাজীতে Noumenal Self বলা হয়। এই আত্মাই

আমাদের সকল চিন্তা প্রবাহের উৎস বা আধার। বস্তুতঃ আধার না থাকিলে যেমন জল থাকিতে পারে না, আত্মা না থাকিলেও তেমন চিন্তাধারা বিরাজ করিতে পারে না। ভাবিয়া দেখ তো, কোন আধারের মধ্যে আধৃত না থাকিলে জল থাকিতে পারে কি ? সেইরূপ কোন আত্মার মধ্যে আবৃত না থাকিলে ভাবরাশিই বা থাকিবে কেমন করিয়া ? তাই বলিতে হয় যে ইহারা সবই আত্মা হইতে উদ্গত হইয়া আত্মার মধ্যেই আধৃত রহিতেছে। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, এই আত্মা চিরন্তন ; ইহার কোন পরিবর্তন নাই ; যতকিছু পরিবর্তন দেখি সবই উহার উদ্গত ভাবরাশির মধ্যে।

সমালোচনা

(১) আমরাও আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করি, কিন্তু উপরোক্ত মতবাদে আত্মার যে স্বরূপ (Noumenal Self) ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহা গ্রহণ করা যাইতে পারে না। আত্মা হইতে ভাবরাশি উদ্গত হয়, আত্মার মধ্যেই ইহারা আবৃত থাকে—সবই স্বীকার করি। কিন্তু ইহা হইতে কেহ যদি অনুমান করেন যে ভাবরাশি ছাড়াও আত্মার এক স্বতন্ত্র সত্তা বিদ্যমান আছে, তাহা হইলে ঠিক হইবে না। উপরে আমরা যে জলাধারের উপমা দিয়াছি, সেইটি ব্যাখ্যা করিলেই আমাদের বক্তব্য বুঝা যাইবে। জল না থাকিলেও শূন্য আধার পড়িয়া থাকিতে পারে ; কারণ আধারের অস্তিত্বের জন্য জলের প্রয়োজন অপরিহার্য নহে। তাই দেখি জল বিহনেও আধারের এক স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সত্তা বজায় থাকে। কিন্তু আত্মার সম্বন্ধে একথা মোটেই প্রযোজ্য নহে ; কারণ আত্মার মধ্যে ভাবরাশি শুধু আধৃত থাকে, তাহা নহে, ভাবরাশির মধ্য দিয়া ইহা আত্মপ্রকাশও করিয়া থাকে। সুতরাং ইহার সত্তা এবং সার্থকতার জন্য ভাবরাশি অপরিহার্যরূপে প্রয়োজন। তাই ভাবরাশি বাদ দিলে ইহার কোন অস্তিত্বই থাকিতে পারে না। এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে জলাধার নিষ্ক্রিয় দ্রব্য ; ইহার জীবন নাই, চেতনা নাই, আত্মবিকাশ নাই ; ইহা জড়পদার্থ মাত্র। কিন্তু আত্মা জড় পদার্থ নহে ; ইহার জীবন আছে, বিকাশ আছে, ইহা সক্রিয়, চৈতন্যময় পদার্থ। বস্তুতঃ ইহাকে পদার্থ বা দ্রব্য (Substance) বলা সঙ্গত নহে ; ইহা Spirit। Spirit এবং Substance-এর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। Substance স্থিতিশীল নিষ্ক্রিয় দ্রব্য ; ইহার মধ্যে নানাপ্রকার গুণ থাকে বটে, কিন্তু গুণগুলি বাদ দিলেও ইহার অস্তিত্ব লুপ্ত হয় না ; গুণগুলির পশ্চাতে গুণশূন্য হইয়া ইহা বিরাজ করিতে পারে। যেমন, আমার

টেবিল আর উহার কালো রং; টেবিল দ্রব্য, আর রং ইহার গুণ। তবে এই গুণটি বাদ দিলেও টেবিলটির অস্তিত্ব লুপ্ত হয় না; গুণবিহীন হইয়াও ইহার সত্তা বজায় থাকিতে পারে। কিন্তু Spirit সম্বন্ধে একথা প্রযোজ্য নহে; ইহা কতকগুলি গুণের নিষ্ক্রিয় সমষ্টিমাত্র নহে। বস্তুতঃ গুণগুলির মধ্যে দিয়াই ইহা আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে; সুতরাং গুণগুলি ইহার পক্ষে অপরিহার্যরূপে প্রয়োজন, তাই গুণগুলি বাদ দিলে ইহার অস্তিত্বই লুপ্ত হইয়া যায়। যেমন আত্মা ও চেতনা, চেতনা বাদ দিলে আত্মার অস্তিত্ব সম্ভব নহে, কারণ চেতনার মধ্যেই আত্মার অস্তিত্ব, আবার আত্মার মধ্যেই চেতনার অস্তিত্ব। টেবিল আর উহার রংকে যেমন পৃথক করা যায়— আত্মা ও তাহার চেতনাকে তেমন পৃথক করা যায় না। তাহা হইলে দেখা গেল যে Noumenal Self বা চেতনাতীত অপ্রকট আত্মা বলিয়া কোন দ্রব্য থাকিতে পারে না। জলশূন্য জলাধার সম্ভব, কিন্তু গুণশূন্য আত্মা সম্ভব নহে।

(২) উপরোক্ত মতবাদের যিনি সর্বপ্রধান বিরোধী তাহার নাম David Hume; তাঁহার যুক্তি খুবই সবল। তিনি বলেন আমরা যত নিবিড় ভাবেই আমাদের মনের মধ্যে অবলোকন করি না কেন, আমরা কোথাও কোন আত্মার অস্তিত্ব লক্ষ্য করিতে পারি না। আমরা যখন আমাদের মনের মধ্যে অবলোকন করি, তখন কি দেখি? দেখি, একের পর এক চিন্তাধারা আসিতেছে ও যাইতেছে কখন সুখ আর কখন বা শোক, কখন কামনা আর কখন বা কল্পনা বুদবুদের মত আমাদের মনের মধ্যে উদিত হইতেছে আর ক্ষণপরে বিলীন হইয়া যাইতেছে। কোথাও কোন চিরন্তন আত্মার সন্ধান পাই না। তাই Hume বলেন যে সত্যই যদি চিরন্তন সত্তার অস্তিত্ব থাকিত তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা মনের মধ্যে উহার সন্ধান পাইতাম। কিন্তু এরকম কোন সত্তার সন্ধান আমরা পাই না, আমরা যখনই যাহা পাই তাহা নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী চিন্তা-কণা মাত্র—পদ্মপত্রে শিশিরবিন্দুর ন্যায় ক্ষণিকের জন্য আবির্ভূত হইয়া পরক্ষণেই ইহারা অন্তর্হিত হইয়া যায়। যাহাকে চিরস্থায়ী সত্তা বলিয়া বিবেচনা করা হয়, উহাকে তোমার মনের মধ্যে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিয়া দেখ, দেখিবে উহাকে ধরা যায় না; যাহা তোমার মনের মধ্যে ধরা পড়ে, তাহা কোন চিরন্তন সত্তা নহে, তাহা তোমার তদানীন্তন ভাবকণা বা চিন্তা কণা মাত্র। এইসকল প্রবহমান ভাবরাশি ও চিন্তারাশি লইয়াই আমাদের মন; এগুলি বাদ দিলে মনের আর কিছুই থাকে না; মনের ভাণ্ডার তখন শূন্য, উজাড় হইয়া পড়ে। সেইজন্য Hume বলেন যে গতিশীল ক্রিয়া ব্যতীত মনের মধ্যে স্থিতিশীল আত্মা বলিয়া কিছুই নাই।

II. Empirical Self

এখন আমরা Empirical Self সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এই মতবাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক David Hume। উপরোক্ত সমালোচনা হইতে বুঝা যাইবে যে তিনি কোন চেতনাতীত সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহার মতানুসারে মনের মধ্যে ক্রিয়া-প্রক্রিয়া ব্যতীত কিছুই নাই। অথচ অনেকে বলেন যে, এই সকল ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার পশ্চাতে এক অপ্রকট আত্মা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। তাঁহারা বলেন ঝর্ণা, হইতে যেমন জল উদ্গত হয়, ঠিক তেমন আত্মা হইতেও মানসিক ক্রিয়া প্রক্রিয়া উদ্গত হইয়া থাকে, উদ্গত ভাবরাশি ব্যতীত ঝরণার যেমন এক স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, ঠিক তেমন আত্মারও এক স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। উহাকেই Noumenal Self বলে। কিন্তু Hume এই প্রকার কোন স্বতন্ত্র আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তিনি বলেন আমরা মনের মধ্যে যত গভীরভাবেই প্রত্যক্ষ করি না কেন, কোথাও কোন আত্মার সন্ধান পাই না। আমরা যাহার সন্ধান পাই, তাহা ক্রিয়া প্রক্রিয়া মাত্র—নদীর স্রোতের ন্যায় মনের মধ্যে আসিতেছে ও চলিয়া যাইতেছে।

সমালোচনা

(১) Hume বলেন যে মনের মধ্যে কোথাও নাকি তিনি আত্মার সন্ধান পান না। কিন্তু ইহা কি ঠিক? তোমার নিজের মনের ভিতরে তাকাও, তাহা হইলেই এই প্রশ্নের উত্তর পাইবে। তুমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে যে কে যেন তোমার অন্তস্থলে আছে; কে যেন সর্বদাই বলিতেছে "আমি" "আমি" "আমি"। আমার মনে "আমি" আছি, তোমার মনে 'তুমি' আছ; এইরূপ প্রত্যেক লোকের মনেই এই আমিত্ব বোধ আছে; এই "আমিই" আমার আত্মা। ধর, আমার মনে এখন অনুতাপ আসিয়াছে, কিন্তু এই অনুতাপ বোধ করিতেছে কে? কাহার অনুতাপ? তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমি কি একেবারে অজ্ঞ? অবশ্য আমি আমার এই সত্তা সম্বন্ধে এখন যে খুব বিশেষ ভাবে চিন্তা করিতেছি বা ইহার স্বরূপ উপলব্ধি করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছি, তাহা নহে; আমি হয়ত অন্য কথা ভাবিতেছি—কেন রাগ করিলাম, কেন বন্ধুর প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিলাম ইত্যাদি অনুতাপ সম্বন্ধীয় কথাই হয়ত চিন্তা করিতেছি, "আমার" কথা ভাবিতেছি না। তবে "আমার" সম্বন্ধে একটুও ভাবিতেছি না বলিলে ভুল হইবে; কারণ আমার অবচেতন মনে ইহার সত্তা যে কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতেছি তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। আমার অনুতাপের পশ্চাতে "আমি" তো আছি; তাই ইহার সম্বন্ধে

খুব স্পষ্ট না হউক অন্ততঃ আবছায়া ধরনের এক অস্পষ্ট ধারণা আমার মনের মধ্যে তখন বিরাজ না করিয়া পারে না। এইভাবে অভিজ্ঞতার দিক দিয়াও আমরা Hume-এর মতবাদ খণ্ডন করিতে পারি। তিনি বলেন আত্মা সম্বন্ধে আমাদের কোন সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা নাই ; কিন্তু আমরা দেখিলাম আছে।

(২) সত্যই যদি আত্মা না থাকে, তবে আমাদের পক্ষে কোন প্রকার জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় না। মানিয়া লইলাম যে আমাদের মনের মধ্যে কোন চিরন্তন সত্তা নাই, আছে শুধু চিরপ্রবহমান চিন্তাধারা। ইহাদের কোন মালিক নাই, ইহারা নিরবলম্ব হইয়া আমাদের মনের মধ্যে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। তাহা হইলে, জিজ্ঞাসা করি, এইসব ভাবরাশির অস্তিত্ব আমরা জানিতে পারি কেমন করিয়া? একটি উদাহরণ দিয়া বুঝান যাউক। ক, খ, গ, ঘ—ইত্যাদি ভাবরাশি একের পর এক ভাসিয়া চলিয়াছে। যখন 'ক' আসে, তখন 'ঘ'-এর উৎপত্তি হয় নাই, অতএব "ক"-এর পক্ষে "ঘ"-এর কথা জানা সম্ভব নহে। আবার যখন "ঘ" আসে, তখন দেখি "ক" মনের তলে কোথায় ডুবিয়া গিয়াছে, অতএব "ঘ"-এর পক্ষেও "ক"-এর কথা জানা সম্ভব নহে। মোটকথা, ইহারা সকলেই যখন পরিবর্তনশীল তখন ইহাদের কাহারো পক্ষেই পরস্পরের সংবাদ জানা সম্ভব নহে। ইহাদের খবর জানা কেবল তাহার পক্ষেই সম্ভব যাহার নিজের কোন পরিবর্তন নাই। যে 'ক' আসিলে 'ক'-কে লক্ষ্য করিতে পারে আর 'ক' এর পর "ঘ" আসিলে "ঘ"-কেও লক্ষ্য করিতে পারে, এইরূপ একজন স্থায়ী সাক্ষী থাকিলেই তবে পরিবর্তন লক্ষ্য করা সম্ভব হইতে পারে ; নতুবা সবই যদি পরিবর্তন হইতে থাকে, তবে পরিবর্তন চক্র লক্ষ্য করিবে কে? তাই আমরা বলিয়াছি যে প্রবহমান ভাবধারা লক্ষ্য করিবার জন্য একজন অপরিবর্তনীয় সাক্ষীর প্রয়োজন। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের প্রত্যেকের মনের মধ্যে এইরকম একজন সাক্ষী আছে—তাই আমাদের পক্ষে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হইতেছে। কিন্তু Hume এইরকম কোন সাক্ষী বা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, ফলে তিনি আমাদের পক্ষে জ্ঞানলাভের সম্ভাবনাই অস্বীকার করিতেছেন বলিতে হইবে।

(৩) সাক্ষীর অভাবে আমরা শুধু যে বর্তমান ভাবরাশির কথা জানিতে পারি না, তাহা নহে, অতীতের কথাও স্মরণ করিতে পারি না। ধর, তুমি এখন সিনেমায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছ। এক্ষেত্রে সিনেমা দেখিবার জন্য তোমার ইচ্ছা বা কামনা আছে। কিন্তু কেন তুমি সিনেমা দেখিতে ইচ্ছা করিতেছ? কারণ, তুমি কিঞ্চিৎ সুখ বা আনন্দ উপভোগ করিতে চাও। কিন্তু সিনেমা দেখিলে যে আনন্দ হইতে পারে তাহা তুমি কি

করিয়া জানিলে ? ইহার উত্তর সহজ ; তুমি অতীতে কয়েকবার সিনেমা দেখিয়াছিলে এবং তখন আনন্দও উপভোগ করিয়াছিলে, ইহা তোমার স্মরণ আছে। সেইজন্য তুমি ভাবিতেছ যে আবার যদি সিনেমায় যাও তাহা হইলে পুনরায় সেইরূপ আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবে। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, অতীতে যে তুমি সুখ ভোগ করিয়াছিলে আজ সেই তুমিই পূর্ব অভিজ্ঞতা স্মরণ করিতেছ ; নতুবা তোমার পক্ষে স্মরণ করাই সম্ভব হইত না। যে সত্তা অতীতে সিনেমা প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং যে সত্তা বর্তমানে উহার কথা চিন্তা করিতেছে—উহারা যদি সম্পূর্ণ পৃথক হইত তবে বর্তমান সত্তার পক্ষে অতীত সত্তার অভিজ্ঞতা স্মরণ করা মোটেই সম্ভব হইত না। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে এক অপরিবর্তনীয় সত্তা বা আত্মা না থাকিলে আমাদের পক্ষে স্মরণ ক্রিয়া সম্ভব নহে।

(৪) আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে আমাদের কোন স্থায়ী সত্তা থাকে না, এবং স্থায়ী সত্তা না থাকিলে জীবনে দায়িত্ব বোধের উদ্রেক হইতে পারে না। তোমার বন্ধু যখন জীবিত ছিল তখন তুমি তাহার প্রতি অন্যায় আচরণ করিয়াছিলে। আজ তাহার মৃত্যুবার্ষিকে তুমি সেই কথা বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছ এবং সেজন্য অনুতাপ বোধ করিতেছ। ইহার অর্থ কি ? ইহার অর্থ এই যে, অতীতে যে অন্যায় করিয়াছে এবং বর্তমানে যে অনুতাপ বোধ করিতেছে—তাহারা এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি, ইহা তুমি স্বীকার করিতেছ। উহারা যদি একই ব্যক্তি না হইয়া পৃথক ব্যক্তি হইত, তাহা হইলে তোমার অনুতাপের কোন অর্থই হইত না। যে অন্যায় করিয়াছে, সে যদি তুমি না হইয়া অন্য কেহ হয়, তবে তাহার জন্য তুমি অনুতাপ বোধ করিবে কেন ? অতএব তুমি যখন অনুতাপ বোধ করিতেছ, তখন বুঝিতে হইবে তুমিই অন্যায় করিয়াছ, অপর কেহ নহে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে তোমার সত্তার স্থায়িত্ব স্বীকার না করিলে অতীত কার্যের জন্য তোমাকে বর্তমানে দায়ী করা যায় না। ফলে এই হয় যে, আমরা যখনই যে কাজ করি না কেন, কিছুতেই উহার দায়িত্ব এড়াইতে পারি না, কারণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ বিভিন্ন হইলেও কার্যকর্তা তো অভিন্ন রহিয়া যাইতেছে। অতএব কার্যের দোষগুণ লক্ষ্য করিয়া আমরা যদি কার্যকর্তার নৈতিক চরিত্র বিচার করি, তাহা হইলে কোনই অন্যায় হয় না। বলা বাহুল্য, কার্যকর্তা এক্ষেত্রে অপরিবর্তিত রহিতেছে বলিয়াই আমাদের পক্ষে নৈতিক বিচার করা সম্ভব হইতেছে, নতুবা হইত না।

III. Idealistic Self

আত্মা সম্বন্ধে আমরা দুইপ্রকার মতবাদ ব্যাখ্যা করিলাম। (১) Empirical Self; এক্ষেত্রে আত্মা বলিয়া জিনিষ নাই; যাহা আছে সবই আমাদের মানসিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া—আসে এবং যায়। (২) Noumenal Self; এক্ষেত্রে মানসিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া আছে বটে, কিন্তু উহাই "সব" নহে; উহার পশ্চাতেও এক স্থিতিশীল কর্তা আছে, তাহাকেই আত্মা বলা হয়। বলা বাহুল্য, দুইটিই চরমপন্থী মতবাদ, উহাদের একটিকেও আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। প্রবন্ধের প্রারম্ভে আমরা যে আত্মার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছি তাহাকে Idealistic Self বলে; এই মতবাদই আমরা সমর্থন করি। এই মতানুসারে আত্মা আছে; কিন্তু উহা ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন রহিয়া বিরাজ করে না, উহা ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করিয়া বিরাজ করে। এক কথায়, ইহা substance নহে, ইহা spirit, ইহা নিষ্ক্রিয় নহে, ইহা সক্রিয়। ক্রিয়া এবং গুণরাশি বাদ দিলেও substance থাকিতে পারে, কিন্তু ক্রিয়া এবং গুণরাশি বাদ দিলে spirit থাকিতে পারে না। আত্মপ্রকাশই spirit-এর ধর্ম, তাই আমরা ক্রিয়াশূন্য নির্বিকার আত্মা স্বীকার করি না, আবার আত্মা-শূন্য ক্রিয়াকেও যথাসর্বস্ব বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না।

এই প্রসঙ্গে ক্যাণ্ট যাহা বলেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন শুধু চিন্তা রাশি বা ভাবরাশি থাকিলেই হয় না, ইহাদিগকে যথাযথভাবে সম্বদ্ধ করিবার জন্য আত্মার প্রয়োজন। একটি উদাহরণ দিয়া বুঝান যাউক। আমি দেখিলাম একটি লোক গাছের দিকে বন্দুক ছুড়িল, পরমুহূর্তেই দেখিলাম একটি পাখি গুলি বিদ্ধ হইয়া পড়িয়া গেল। এইভাবে আমার মনের মধ্যে দুইটি বিভিন্ন দৃশ্যের উদয় হইল, প্রথমে গুলি ছোড়ার দৃশ্য, পরে পাখী পড়ার দৃশ্য। শুধু এই দৃশ্য দুইটির উপর যদি নির্ভর করিতে হয় তাহা হইলে আমরা ঘটনাটির তাৎপর্য্য পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করিতে পারি না। পরিষ্কার ভাবে উপলব্ধি করিতে পারি তখন, যখন বুঝি এই দুইটি ব্যাপারের মধ্যে এক কার্যকারণ সম্বন্ধ নিহিত আছে। তখন বুঝি যে পাখীর মৃত্যু "কার্য" (Effect) এবং গুলির আঘাত "কারণ" (Cause); এই কারণের জন্যই একটি কার্য সংঘটিত হইতেছে, নতুবা অকারণ পাখীর মৃত্যু হইত না। এখন আমরা জিজ্ঞাসা করি—এই কার্যকারণ সম্বন্ধীয় ধারণা আমরা পাইলাম কোথা হইতে? মনের ভিতরে যে দুইটি দৃশ্য উদিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে তো কোন কার্য কারণের নির্দেশ নাই; তাহারা কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র, একের পর এক আমার মনের মধ্যে আসিয়া উদিত

হইয়াছে। তবে বিচ্ছিন্ন হইলেও আমি কিন্তু তাহাদিগকে মোটেই বিচ্ছিন্ন ভাবে উপলব্ধি করিতেছি না, কার্যকারণ সূত্রে গ্রথিত করিয়া তাহাদিগকে আমি অবিচ্ছিন্নরূপে উপলব্ধি করিতেছি; তাই একটিকে বলিতেছি কারণ, আর অন্যটিকে বলিতেছি "কার্য"। কিন্তু এই কার্যকারণ সূত্র আসিল কোথা হইতে? দৃশ্য দুইটির মধ্যে যখন ইহার উৎপত্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তখন ইহার উৎপত্তি খুজিতে হইবে অন্যত্র। তাই ক্যাণ্ট বলেন ইহার উৎপত্তি আছে আত্মার মধ্যে। আত্মার মধ্যে জ্ঞান আহরণের উপযোগী অনেক সূত্র (categories) আছে; এই সকল সূত্রের সাহায্যে আমরা বিভিন্ন চিন্তাগুলিকে নানাভাবে সম্বদ্ধ করিয়া জ্ঞান আহরণ করিয়া থাকি, নতুবা আমাদের চিন্তা বা ভাবগুলি পরস্পর হইতে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন রহিয়া যায়, তদবস্থায় জ্ঞানোদয় হয় না; জ্ঞানের জন্য ইহাদিগকে সংযুক্ত করা দরকার। যেমন ধর, আমি একটি মালা রচনা করিতে চাই, ইহার জন্য কয়েকটি ফুল সংগ্রহ করিলেই হয় না; ফুলগুলিকে একত্রে গ্রথিত করিবার জন্য সূত্রেরও প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে প্রত্যেকটি ফুলই স্বতন্ত্র এবং বিভিন্ন; কিন্তু বিভিন্ন হইলেও ইহারা মালার মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে বিরাজ করে না। ইহাদের প্রত্যেকটির মধ্যে একই সূত্র বিদ্যমান থাকাতে ইহারা পরস্পর সংযুক্ত ও সম্বদ্ধ হইয়া এক অবিচ্ছিন্ন মালার রূপ পরিগ্রহ করে। সূত্রই এই সমষ্টি সাধন করে। ক্যাণ্টের মতানুসারে আমাদের আত্মার মধ্যেও এইরূপ কয়েকটি সংযোগ-সূত্র নিহিত আছে, উহাদের একটির নাম আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, যথা 'কার্যকারণ সূত্র'। এই সব সূত্রের সাহায্যে আমাদের মনের বিভিন্ন চিন্তাগুলিকে সম্বদ্ধ করিয়া 'জ্ঞান-মাল্য' রচনা করা হয়।

তাহা হইলে দেখা গেল যে শুধু ফুল দিয়া যেমন মালা রচনা করা যায় না, শুধু ভাবরাশি বা চিন্তারাশি দিয়াও তেমন জ্ঞান লাভ করা যায় না। ইহাদিগকে সম্বদ্ধ করিবার জন্য সূত্রের প্রয়োজন। এইখানেই আত্মার প্রয়োজনীয়তা, কারণ আত্মার অবদানেই এইসব ভাবরাশি সম্বদ্ধ হইতে পারে। অতএব আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করাতে Hume-এর দর্শনশাস্ত্রে আমরা শুধু ফুলই পাই, মালা পাই না। বহিজগৎ আসিয়া মনের মধ্যে যেসব ক্রিয়া-প্রক্রিয়া সৃষ্টি করে, উহাদের যেমন প্রয়োজন, আত্মার অবদানও তেমন প্রয়োজন; আত্মাইতো উহাদিগকে সংঘবদ্ধ করিয়া 'জ্ঞান-সৌধ' রচনা করে। আত্মার এই সংগঠনী শক্তিকে ক্যাণ্ট Synthetic unity of Apperception নামে অভিহিত করিয়াছেন।

আত্মা ও চেতনা

ক্রিয়া বাদ দিয়া শুধু যে আত্মার কথা কল্পনা করা হয়, তাহা অপূর্ণ সত্তা (abstract self), আর আত্মা বাদ দিয়া শুধু যে ক্রিয়ার কথা উল্লেখ করা হয়, উহাও অপূর্ণ সত্তা। পূর্ণ সত্তা (concrete self) পাই তখন, যখন এই আত্মাকে ক্রিয়ার মধ্যেই বিকাশমান দেখি। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই এইপ্রকার আত্মা বিদ্যমান আছে, তাই মানুষকে ইংরাজীতে Person বলিয়া বর্ণনা করা হয়। এই person শব্দের অর্থ কি—তাহাই এখানে ব্যাখ্যা করা যাউক। Person মাত্রেরই চেতনা আছে, তবে চেতনা থাকিলেই person হয় না, যেমন পশুপক্ষীর চেতনা আছে, কিন্তু তাহাদিগকে আমরা person বলি না। অতএব বুঝিতে হইবে যে, মানুষের চেতনার মধ্যে আরো কিছু আছে যাহার জন্য তাহাকে person বলিয়া অভিহিত করা হয়। উহাকে আমরা তাহার বুদ্ধিশক্তি বা বিচারশক্তি (Reason) বলিতে পারি। পশুপক্ষীদের বুদ্ধিশক্তি নাই, তাই তাহারা বিচার বিবেচনাপূর্বক কাজ করিতে পারে না, তাহারা প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া কাজ করে, তাই তাহাদের জীবন প্রবৃত্তি সর্বস্ব। কিন্তু আমাদের জীবন প্রবৃত্তি-সর্বস্ব নহে; প্রবৃত্তির সহিত বুদ্ধিও আমাদের যথেষ্ট আছে; এই বুদ্ধি আছে বলিয়াই আমরা মানুষ, ইহাই আমাদিগকে পশুপক্ষী হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে।

শুধু তাহাই নহে; বুদ্ধি বিবেচনা ব্যতীত আমাদের চেতনার মধ্যে আর একটি জিনিষ আছে—যাহা কেবল মানুষেরই আছে, পশুদের নাই, উহাকে আমরা আত্ম-চেতনা (Self-consciousness) বলিতে পারি। আমার মনের মধ্যে যখন কোন ভাব আসে, তখন আমি শুধু সেই ভাবের সম্বন্ধেই সচেতন থাকি, তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে আমার নিজের সম্বন্ধেও সজাগ থাকি। ধর, আমার মনের মধ্যে এখন সুখের ভাব আসিয়াছে; তখন আমি শুধু সুখের কথাই জানিতে পারি না, কেন সুখ পাইতেছি, আমার পক্ষে এই প্রকার সুখ বাঞ্ছনীয় কি না, আত্মোন্নতির পথে ইহা বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারে কি না, ইত্যাদি আত্মা সম্বন্ধীয় অনেক কথাই আমি চিন্তা করিতে পারি। ইহাকে আত্ম-চেতনা বলে। কিন্তু পশুপক্ষীর পক্ষে এইপ্রকার আত্ম-চেতনা সম্ভব নহে। বর্তমান মুহূর্তে তাহার মনের মধ্যে যদি সুখ-বোধ আসে তবে সেও মানুষের ন্যায় অনায়াসে উহার কথা উপলব্ধি করিতে পারে বটে, কিন্তু উহাকে অবলম্বন করিয়া সে আত্ম-চিন্তা করিতে পারে না, উহার ভবিষ্যৎ ফলাফল কি, উহাতে তাহার আত্মোন্নতি হইতে পারে কি না—ইত্যাদি কোন কথাই সে ভাবিতে পারে না। অর্থাৎ তাহার চেতনা

আছে, কিন্তু আত্ম-চেতনা নাই। এই আত্ম-চেতনাই মানুষের বৈশিষ্ট্য। তাহার জীবনের যে এক উদ্দেশ্য আছে, তাহা সে জানে; সেইজন্য ঐ উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সে তাহার কার্যাবলী পরিচালিত করে। তাই তাহাকে সর্বদাই আত্মবিচার করিতে হয়। এইভাবে নিজের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত থাকা, এবং সেই উদ্দেশ্য অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা—ইহা কেবল মানুষের পক্ষেই সম্ভব। ইহার জন্য যে আত্ম-চিন্তা বা আত্ম-চেতনার প্রয়োজন—তাহা পশুদের পক্ষে সম্ভব নহে।

আত্ম-চেতনার সহিত সংশ্লিষ্ট আরও একটি শক্তি মানুষের আছে, তাহার নাম আত্ম-নিয়ন্ত্রণ (Self-determination)। যেহেতু মানুষ নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা সম্বন্ধে সম্যক অবহিত, সেইহেতু সে নিজেই নিজের কর্তব্য নির্ধারণ করিতে পারে। অপরের ইচ্ছা অনুসারে তাহার কার্য নিয়ন্ত্রিত হয় না; এক কথায়, সে স্বাধীন। পশুদের এই ইচ্ছা-স্বাধীনতা নাই; তাই তাহারা প্রবৃত্তির হাতে পুত্তলিকার ন্যায় কাজ করে। কিন্তু মানুষ নিয়তির হাতের পুত্তলিকা মাত্র নহে; সে যন্ত্র চালিতবৎ কাজ করে না, নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করিবার ক্ষমতা তাহার আছে; সে স্বাধীন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, মানুষের তিনটি বিশেষ গুণ আছে—যাহা পশুপক্ষীদের নাই, যথা বুদ্ধি-বিবেচনা, আত্ম-চেতনা এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণ। এই গুণগুলি আছে বলিয়াই মানুষকে Person নামে অভিহিত করা হয়।

উপসংহার

আমরা আত্মার স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলাম, ইহা জ্ঞানময় চৈতন্যময় সত্তা। আমাদের মানসিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া ইহা নিরন্তর আত্মপ্রকাশ করিতেছে। ইহার এক অদ্ভুত শক্তি আছে যাহার প্রভাবে ইহা আমাদের বিচ্ছিন্ন ভাবরাশি বা চিন্তারাশিকে সংগঠিত করিয়া এক নিরবচ্ছিন্ন সমষ্টিতে পরিণত করিতেছে। এইভাবে শুধু জ্ঞানের সৌধ রচিত হইতেছে, তাহা নহে; আমাদের ব্যক্তিত্বেরও পরিস্ফুরণ সাধিত হইতেছে। কথাটি ভাল করিয়া বুঝান যাউক। ব্যক্তিত্ব মানে Personality। পূর্ববর্ণিত Person হইতে Personality শব্দের উৎপত্তি। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি প্রত্যেক মানুষই একএকজন Person বা ব্যক্তি; অতএব প্রত্যেক মানুষেরই ব্যক্তিত্ব আছে। কিন্তু ready made ব্যক্তিত্ব বলিয়া কোন জিনিস নাই; নিজের চেষ্টায় এবং নিজের অধ্যবসায়ে ইহা অর্জন করিতে হইবে। পারিভাষিক সংজ্ঞায় বলা যায় যে প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই

ব্যক্তিত্বের সম্ভাবনা আছে বটে, কিন্তু এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে হইলে নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। তাই উপনিষদ বলিয়াছেন "নায়ম্ আত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"। এই আত্মোপলব্ধিই আমাদের জীবনের পরম শ্রেয়ঃ উহাতেই আমাদের শান্তি, ঋদ্ধি ও কল্যাণ। সুখের অন্বেষণে শান্তি নাই, কৃচ্ছ্রসাধনে কল্যাণ নাই, কল্যাণ আছে আমাদের অমূল্য জীবনের সম্যক পরিস্ফুরণে। উহার জন্য প্রথমেই আমাদের ইন্দ্রিয়, প্রবৃত্তি ও কামনা সমূহ নিয়ন্ত্রিত করা দরকার। ভাবরাশি বা চিন্তারাশিকে সংগঠিত করিয়া আমরা যেমন জ্ঞানলাভ করি, ঠিক সেইরূপ কামনাগুলিকে অধ্যাত্মশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিয়া আমরা আমাদের ব্যক্তিত্বের পরিস্ফুরণ সাধন করিতে পারি। Hegel বলেন আমাদের এই অধ্যাত্ম-শক্তিই ভগবৎ-শক্তি ; আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই এই ভগবৎ-শক্তি নিহিত আছে। বস্তুতঃ ঈশ্বরই আমাদের মধ্যে ক্রিয়া করিতেছেন ; তাহার অসীম জ্ঞানই (Reason) আমাদের চেতনার মধ্যে সসীমরূপে প্রকাশ পাইতেছে। তিনিই আমাদের হৃদয়াসনে অধিষ্ঠিত আছেন, এবং তাঁহার ঐশ্বর্যেই আমরা ঐশ্বর্যবান। কিন্তু ঐশ্বর্য শুধু থাকিলেই হয় না, ঐশ্বর্য যে আছে সে উপলব্ধিও থাকা চাই ; তবেই তো সেই ঐশ্বর্য ব্যবহার করিয়া আমরা সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারিব। ক্ষ্যাপার হাতে পরশমণি যে ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু উহা যে সত্যই পরশমণি তাহা সে জানিত না। এই উপলব্ধিটুকু ছিল না বলিয়াই সে ঐ মহামণি কোন কাজে লাগাইতে পারিল না ; ফলে তাহার সমস্ত জীবন বিফলে নষ্ট হইয়া গেল। আমাদের আত্মোপলব্ধি সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা প্রযোজ্য। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ভগবৎ-শক্তি নিহিত আছে বটে, কিন্তু উহা যদি আমরা উপলব্ধি করিতে না পারি, অর্থাৎ উহার সম্যক বিকাশ সাধন করিতে না পারি, তাহা হইলে উহা থাকিয়াই বা আমাদের লাভ কি হইবে ? ক্ষ্যাপার ন্যায় আমাদের জীবনও বৃথা নষ্ট হইয়া যাইবে। তাই Hegel বলেন যে সংযত ইন্দ্রিয় হইয়া নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদন করা এবং সমস্ত কাজের মধ্যে ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া পরিপূর্ণ জীবন উপলব্ধি করাই আমাদের পরম শ্রেয়।

"Be a person"

উপরোক্ত মতবাদের যিনি প্রধান প্রচারক তাহার নাম Hegel। এই মতবাদ সম্বন্ধে তাঁহার একটি বাণী ব্যাখ্যা করিয়া আমরা এই প্রসঙ্গ উপসংহার করিব। তিনি বলেন, "Be a person" অর্থাৎ মানুষ হও। তোমার মধ্যে যে ব্যক্তিত্ব (Personality) আছে তাহা উপলব্ধি কর। Hegel বলেন পশুদের

স্বাতন্ত্র্যবোধ (Individuality) আছে, কিন্তু তাহাদের ব্যক্তিত্ববোধ (Personality) নাই। কথাটি ভাল করিয়া বুঝান যাউক। প্রত্যেক পশুই অন্য পশু হইতে পৃথক এবং প্রত্যেকেই নিজের এই পৃথক সত্তা বজায় রাখিবার জন্য ব্যগ্র। তাহারা সকলেই স্বতন্ত্র ও পৃথক ; কেহই অপরের জন্য চিন্তা করে না। এক কথায় তাহাদের জীবন সংগ্রামময়; অপরকে পরাভূত করিয়া নিজেদের পৃথক সত্তা বজায় রাখাই তাহাদের চরম লক্ষ্য। মানুষের জীবনেও যে এই লক্ষ্য বিদ্যমান নাই, তাহা নহে ; তাহারাও নিজেদের পৃথক সত্তা বজায় রাখিবার জন্য ব্যগ্র। তাহাদের মধ্যেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে ; ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য, সাংসারিক সুখ সুবিধার জন্য তাহারাও পশুদের ন্যায় পরস্পরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। তবে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাই মানুষের জীবনের সবটুকু নহে, সহযোগিতার ভাবও তাহার জীবনে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। তাই সে একাকী থাকিতে পারে না ; সমাজের মধ্যে, সকলের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে চাহে। পরস্পরকে সাহায্য করিয়া, অপরের মধ্যে নিজেকে বিলাইয়া দিয়া সে জীবনের আত্মপ্রসারতা লাভ করিতে চায়। এইভাবে আত্মবিস্তৃতি লাভ করিয়া সকলের সঙ্গে একাত্মতা উপলব্ধি করাই মানুষ জীবনের বৈশিষ্ট্য, ইহাকেই আমরা তাহার ব্যক্তিত্ব (Personality) বলিতে পারি। সহযোগিতার মাধ্যমেই ইহা সম্ভব ; প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে নহে। প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে পশু যে জীবন যাপন করে তাহার মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ আছে বটে, কিন্তু একাত্মবোধ নাই। স্বাতন্ত্র্যবোধে সে শুধু নিজের সত্তা লইয়াই ব্যস্ত থাকে ; নিজের স্বার্থ ও নিজের সুখ সুবিধা লইয়া তাহার যে ক্ষুদ্র সত্তা গঠিত, উহারই স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবার জন্য সে সকলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মাতিয়া ওঠে, তখন সে তাহাদের সহিত একাত্মবোধ করিবে কেমন করিয়া ? একাত্মতা-বোধ করিতে হইলে প্রথমেই মানুষকে তাহার এই ক্ষুদ্র গণ্ডী হইতে বাহির হইয়া আসিতে হইবে, এবং অপরের সহিত মিলিয়া মিশিয়া সকলকে আপন করিয়া লইতে হইবে। এইভাবে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া, সকলের মঙ্গলের জন্য নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়া, সকলের মঙ্গলের মধ্যে নিজের মঙ্গল উপলব্ধি করিয়া আমরা জীবনে যখন পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারি, তখন "আমরা ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই ভেদ নাই।" আমরা তখন পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র বা বিচ্ছিন্ন নহি, আমরা তখন সকলেই ঈশ্বরের সত্তায় একাত্ম। এক কথায়, আমরা তখন পশু নহি, মানুষ। তাই Hegel বলেন "মানুষ হও ; Be a person".

সপ্তম অধ্যায়

আত্মার অমরত্ব ও ইচ্ছা-স্বাতন্ত্র্য

(Immortality of Soul and freedom of Will)

পূর্বেই বলিয়াছি যে আমাদের মন বা আত্মা দেহের মধ্যে অধিষ্ঠিত আছে; দেহকে সঞ্জীবিত করিয়া চেতনাস্বরূপ হইয়া ইহা আমাদের অন্তরের মধ্যে বিরাজ করিতেছে। তাহা হইলে স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে—দেহের মৃত্যুর পর এই আত্মার কি হয়? দেহ ভস্মীভূত হইলে আত্মাও কি বিনষ্ট হইয়া যায়? অথবা দেহের মৃত্যু হইলেও আত্মার কোনরূপ বিনাশ হয় না? ইহা কি তবে অমর? মানবাত্মা সম্বন্ধে আর একটি প্রশ্ন আছে—আমাদের ইচ্ছা-স্বাতন্ত্র্য আছে কি না? কি ইচ্ছা করিব আর কি ইচ্ছা করিব না—সহজ কথায়, কি কাজ করিব আর কি কাজ না করিব—এইরূপ চিন্তা-স্বাধীনতা আমাদের আছে কি না? পূর্ব প্রবন্ধে আমরা মানিয়া লইয়াছি যে মানুষের এইপ্রকার স্বাধীনতা আছে। কিন্তু দর্শন শাস্ত্রে মানিয়া লইলে চলে না, প্রমাণ করিতে হইবে। এখন আমরা ইহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিব।

প্রথমে আমরা ইচ্ছা-স্বাতন্ত্র্য লইয়া আলোচনা করিব, তারপরে অমরত্বের কথা আলোচিত হইবে।

ইচ্ছা-স্বাধীনতা (Freedom of Will)

মানুষ মাত্রেরই কর্মশক্তি আছে; আমরা সকলেই কোন না কোন কাজ করিয়া থাকি। কিন্তু কাজ সব সময়েই যে আমরা ইচ্ছাপূর্বক করি—তাহা নহে। অনেক কাজ আমরা ইচ্ছাপূর্বক করি, আর অনেক কাজ আমরা যন্ত্রচালিতবৎ করিয়া যাই, উহাতে আমাদের ইচ্ছার কোন অবকাশ নাই। যেমন, শিশু হাসে, কিন্তু সে ভাবিয়া চিন্তিয়া ইচ্ছা করিয়া হাসে না, তাহার হাসি পায় তাই সে হাসে। এইদিক দিয়া বিবেচনা করিলে আমরা আমাদের কার্যাবলী দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারি—ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক। বলা বাহুল্য, অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার সহিত ইচ্ছা-স্বাতন্ত্র্যের কোনই সম্বন্ধ নাই। যেক্ষেত্রে আমরা ইচ্ছা করিয়া কিছু করি না, সেক্ষেত্রে আমাদের আবার ইচ্ছা-স্বাধীনতা কি? যাহার মাথা নাই, তাহার আবার মাথা ব্যাথা কেন? তাই ইচ্ছা-স্বাতন্ত্র্য প্রসঙ্গে অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার কথা আলোচিত হয় না; এখানে আমাদের একমাত্র আলোচ্য বিষয়—ঐচ্ছিক ক্রিয়া। ঐচ্ছিক ক্রিয়া কি—মোটামুটি তাহা আমরা সকলেই জানি। যে কাজ আমরা

ইচ্ছাপূর্বক চেষ্টা সহকারে সম্পাদন করি—তাহাকেই ঐচ্ছিক ক্রিয়া বলে। তবে এক্ষেত্রে "কাজ" কিন্তু আসল ব্যাপার নহে; আসল ব্যাপার ইচ্ছা বা সংকল্প। তুমি ইচ্ছা করিতেছ যে ইতিহাসের একখানি বই কিনিবার জন্য দোকানে যাইবে; কোন্ দোকানে যাইবে তাহা ঠিক করিলে, কত টাকা লইবে তাহাও স্থির করিলে; কিন্তু বাহির হইবার সময় এমন ঝড় বৃষ্টি আসিল যে তোমার আর দোকানে যাওয়া হইল না। এক্ষেত্রে কাজ হইল না বটে, কিন্তু তাহাতে সংকল্পের কিছু আসে যায় না। সংকল্প আমাদিগকে কর্মে উদ্দীপিত করে মাত্র, কিন্তু সেই কর্ম সম্পাদিত হইবে কি না, তাহা সম্পূর্ণভাবে সংকল্পের উপর নির্ভর করে না; আংশিকভাবে পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপরেও নির্ভর করে। সেজন্য আমরা বলিয়াছি যে ঐচ্ছিক ক্রিয়ায় "কাজ" আসল ব্যাপার নহে, আসল ব্যাপার ইচ্ছা বা সংকল্প। এই ইচ্ছা বা সংকল্প প্রসঙ্গেই Freedom বা স্বাধীনতার কথা আলোচিত হইয়া থাকে। এই বিষয়ে দুইপ্রকার মতবাদ আছে।

(ক) অনেকে বলেন যে সংকল্প সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন: অর্থাৎ কোনো বিষয়ে কোন সংকল্প করা বা না করা—উহা আমাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন ব্যাপার। উদাহরণ: ধর, আমার দুইখানি বই দরকার, ইতিহাসের বই এবং ভূগোলের বই; অর্থাৎ দুইখানি বই-ই আমি সমভাবে কামনা করিতেছি। কিন্তু একই সঙ্গে দুইখানি বই ক্রয় করিবার ক্ষমতা আমার নাই; একখানি মাত্র ক্রয় করিতে পারি। তখন সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়া, প্রতিদ্বন্দ্বী কামনাদ্বয়ের তুলনামূলক বিচার করিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম যে আমার পক্ষে এখন ভূগোলের বই না কিনিয়া ইতিহাসের বই-ই কেনা উচিত। তাই আমি ইতিহাসের বই কিনিবার জন্য সংকল্প করিলাম এবং তদনুযায়ী কাজ করিবার জন্য বইএর দোকানে গেলাম। এক্ষেত্রে আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন; কেহই আমাকে ইতিহাসের বই কিনিবার জন্য জোর করিতেছে না বা ভূগোলের বই কিনিতে নিষেধ করিতেছে না; আমি নিজের ইচ্ছায় যাহা ভাল মনে করিতেছি তাহাই করিতেছি। ইহাকে Self-determination বা আত্মনিয়ন্ত্রণ বলে; আমি নিজেই আমার কার্যসূচী নির্ধারণ করিতেছি, অপরের দ্বারা পরিচালিত হইতেছি না। অপরের নির্দেশে কাজ করার মধ্যে পরাধীনতা আছে; কিন্তু যেখানে আমি নিজের ইচ্ছায় নিজের কর্তব্য নিরূপণ করিতেছি, সেখানে আবার পরাধীনতা কোথায়? সেখানে আমি স্বাধীন।

নিয়তিবাদ (Determinism)

(খ) অনেকে কিন্তু এই মতবাদ গ্রহণ করেন না; তাঁহারা বলেন যে আপাত-দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে আমরা সত্যই বুঝি স্বাধীনভাবে নিজেদের কর্মসূচী

নির্ধারণ করিয়া থাকি, কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে বাস্তবিক পক্ষে কোন কাজেই আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার অবকাশ নাই। আমরা যাহা সংকল্প করি তাহা বাধ্য হইয়াই করি; না করিয়া উপায় নাই, তাই করি। উপরোক্ত উদাহরণটি লওয়া যাউক। আমি ভূগোলের বই না কিনিয়া ইতিহাসের বই কিনিব বলিয়া সংকল্প করিয়াছি। এক্ষেত্রে মনে হইতে পারে যে আমি সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায় এবং স্বাধীন চিত্তেই আমার কর্মসূচী নির্ধারণ করিতেছি; কেহই আমাকে বাধ্য করিতেছে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। প্রথমতঃ দেখা যাউক আমি কেন বই কিনিবার কথা ভাবিতেছি? আমি একজন দরিদ্র ছাত্র; আমার পক্ষে তো বই কেনা সম্ভব নহে; তাই ইংরাজী বাংলা প্রভৃতি বই আমি অপরের নিকট হইতে চাহিয়া লইয়াছি। তাহা হইলে ইতিহাস ও ভূগোলের বই কেনার কথা ভাবিতেছি কেন? ইহার উত্তর এই যে, অনেক চেষ্টা করিয়াও আমি কাহারও নিকট হইতে ইতিহাস ও ভূগোলের বই যোগাড় করিতে পারি নাই; সুতরাং এই দুইখানি বই আমাকে কিনিতেই হইবে, উপায় নাই। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে আমি এক্ষেত্রে যাহা করিতেছি তাহা বাধ্য হইয়াই করিতেছি; অর্থাৎ আমি বাধ্য হইয়া বই কিনিবার কথা ভাবিতেছি, নতুবা ভাবিতাম না। এমতাবস্থায় আমার স্বাধীনতা রহিল কোথায়? আমি তো অবস্থার চাপে পড়িয়া কাজ করিতেছি, স্বাধীন ভাবে নহে। ইহার উত্তরে কেহ হয়ত বলিবেন যে, অবস্থার চাপে পড়িয়া আমি বই কিনিবার কথা ভাবিতেছি বটে, কিন্তু কি বই কিনিব—ইতিহাস কিনিব না ভূগোল কিনিব—সেই বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন। এক্ষেত্রে আমি যে কোন বই কিনিতে পারি; তাই ভূগোল না কিনিয়া ইতিহাস কিনিব বলিয়া সংকল্প করিয়াছি। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এখানেও আমি স্বাধীন নহি; এক্ষেত্রেও আমি অবস্থার বিপাকেই ইতিহাসের কথা ভাবিতেছি, নতুবা ইতিহাসের কথা ভাবিতাম কি না সন্দেহ। কারণ, আমাদের কলেজে ইতিহাস মোটেই ভাল পড়ানো হয় না, এবং অধ্যাপকের নিকট হইতে কোন রকম Note পাওয়া যায় না; অথচ ভূগোলের অধ্যাপক যেমন সুন্দর পড়ান তেমন ভাল নোটও দেন; উহাতেই কাজ চলিয়া যায়। অতএব এখন ভূগোলের বই না কিনিলেও চলে; কিন্তু ইতিহাসের বই না কিনিলে আর চলে না। তাই আমি ভূগোলের পরিবর্তে ইতিহাসের বই কিনিব বলিয়া মনস্থ করিয়াছি। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে এক্ষেত্রেও আমি স্বাধীনভাবে কোন কিছু মনস্থ করিতে পারিতেছি না; পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপেই আমাকে যথাকর্তব্য স্থির করিতে

হইতেছে। ফলে অবস্থা বিপরীত হইলে আমার চিন্তাধারাও বিপরীত হইত; তখন ইতিহাসের পরিবর্তে ভূগোলের বই-এর জন্যই আমি চিন্তা করতাম।

আর এক কথা, আমি আজ ইতিহাস ও ভূগোলের বিষয় ভাবিতেছি কেন? স্কুলে তো আমার ইতিহাস ও ভূগোল ভাল লাগিত না; তখন ঠিক করিয়াছিলাম কলেজে গিয়া Arts না পড়িয়া Science পড়িব। বেশ তো তবে Science লইলেই পারিতে; তাহা হইলে আজ আর ইতিহাসের কথা ভাবিতে হইত না। কিন্তু কি করিব? এ বিষয়েও আমার কোন স্বাধীনতা নাই। আমাদের মফঃস্বল কলেজে I. Sc. পড়ানো হয় না; অতএব I. Sc. পড়িতে হইলে আমাকে সহরে যাইতে হয়; কিন্তু সেরূপ আর্থিক ক্ষমতা আমার নাই, তাই আমাকে বাধ্য হইয়া I. A. পড়িতে হইতেছে, এবং I. A. পড়িতে হইতেছে বলিয়া বাধ্য হইয়াই ইতিহাসের কথা ভাবিতে হইতেছে। এক্ষেত্রেও সেই কথা, আমার নিজের ইচ্ছায় কর্মসূচী নির্ধারিত হইতেছে না। অবস্থার নির্দেশেই আমার কর্ম্মসূচী নির্দ্ধারিত হইতেছে। এই ভাবে যে কোন উদাহরণ লওয়া যাউক না কেন, একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাইবে সে আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন মূল্য নাই, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আমাদিগকে অবস্থার পরিচালনায় কাজ করিতে হইতেছে। সেইজন্য অনেকে বলেন যে আমাদের স্বাধীনতা বলিয়া বিশেষ কিছু নাই, অর্থাৎ আমরা নিজেরা নিজেদের কর্মসূচী নিয়ন্ত্রণ করি না, অপরের দ্বারা (বা অবস্থার চাপে) আমাদের কর্মসূচী নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। ইহাকে ইংরেজীতে Determinism বলে। Determinism—কেননা আমি কি করিব বা না করিব—তাহা আমি নিজের ইচ্ছায় নির্ধারণ করি না, অবস্থা বিপাকেই নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। যে ঘড়ি আমাকে সজাগ করিবার জন্য সকালে পাঁচটার সময় বাজিয়া ওঠে—সে ঘড়ি নিজের ইচ্ছায় ঐরূপ করে না, যন্ত্রের নির্দেশে করে; সেইরূপ মানুষও যন্ত্রবৎ নিজ নিজ নির্দিষ্ট কার্য করিয়া চলিয়াছে; উহাতে নিজেদের ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন অবকাশ নাই। ইহাকে Necessitarianism বা নিয়তিবাদও বলে; নিয়তির দ্বারাই আমাদের কর্ম পরিচালিত হইতেছে, নিজেদের দ্বারা নহে। যাহার অদৃষ্টে যেরূপ বিধান আছে তাহা ঘটিবেই; উহাতে আমাদের কোন কর্তৃত্ব বা কৃতিত্ব নাই; আমরা পারিপার্শ্বিক অবস্থার দাসমাত্র।

নিয়তিবাদ ও স্বাধীনতাবাদ

আমরা দুই প্রকার মতবাদ ব্যাখ্যা করিলাম—নিয়তিবাদ ও স্বাধীনতাবাদ। দুই মতবাদেরই স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বহুবিধ যুক্তি আছে। এখানে কয়েকটি

প্রধান যুক্তির কথা উল্লেখ করা দরকার। প্রথমে, নিয়তিবাদের স্বপক্ষে যে যুক্তি দেওয়া হয় তাহাই ব্যাখ্যা করা হইবে; এবং সঙ্গে সঙ্গে উহা খণ্ডন করিয়া স্বাধীনতাবাদ সমর্থন করা হইবে।

প্রথম যুক্তি

নিয়তিবাদ বা স্বাধীনতাবাদের প্রধান যুক্তি আসে মনোবিজ্ঞান হইতে। মনোবিজ্ঞান বলে যে কামনার দ্বারাই আমাদের কার্যসূচী নির্ধারিত হইয়া থাকে। মানুষের জীবন কামনা বহুল; বহুপ্রকার কামনা আমাদের মনের মধ্যে সর্বদাই উদিত হইতেছে। ইহাদের মধ্যে যে কামনাটি অন্য কামনাগুলিকে পরাভূত করিয়া অপ্রতিদ্বন্দ্বীরূপে বিরাজ করিতে পারে, তাহার শক্তি তখন দুর্জয় হইয়া ওঠে; এবং উহার আবেগে আমাদের সমস্ত মন যখন উদ্বেলিত হইয়া ওঠে, তখন ঐ কামনা অনুযায়ী কাজ করাই আমাদের পক্ষে খুব সহজ এবং স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে আমরা সর্বদাই কামনার পিছনে ছুটাছুটি করিতেছি। তাই আমরা বলিয়াছি যে কামনার দ্বারাই আমাদের কর্মজীবন পরিচালিত হইয়া থাকে; আমরা কামনার দাস। শুধু দাস নহি, কামনার দাসানুদাস। কারণ, এইসব কামনা আবার নানারূপ অবস্থার দ্বারা নির্ধারিত হইয়া থাকে। অতএব কামনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া আমরা প্রকারান্তরে এইসব অবস্থার দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত হইতেছি, বলিতে হইবে। এইসকল অবস্থাকে আমরা তিন শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারি; যথা—সামাজিক অবস্থা, ভৌগোলিক অবস্থা, এবং দৈহিক ও মানসিক অবস্থা।

(ক) প্রথমতঃ সামাজিক অবস্থার কথা লওয়া যাউক। আমরা যে সমাজে বা দেশে বাস করি তাহার প্রভাব মনের উপরে অপরিমেয়; উহার দ্বারা আমাদের চিন্তাধারা ও কর্মধারা প্রভূত পরিমাণে নির্ধারিত হইয়া থাকে। একজন ভারতবাসীকে কাশ্মীর সম্বন্ধে চিন্তা করিতে বল, আর একজন পাকিস্থানীকেও এই সমস্যা সম্বন্ধে ভাবিতে বল। দেখিবে তাহারা সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে চিন্তা করিতেছে। এক্ষেত্রে তাহারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতেছে—বলা যায় কি? মোটেই না; তাহারা নিজ নিজ রাষ্ট্র, সমাজ ও ধর্মের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া চিন্তা করিতেছে, স্বাধীনভাবে নহে।

(খ) দ্বিতীয়তঃ ভৌগলিক পরিবেশের দ্বারাও আমাদের চিন্তাধারা কম নিয়ন্ত্রিত হয় না। যেস্থানে আমরা বাস করি, সেই স্থানের আবহাওয়া, জল, বাতাস, নদী, পর্বত প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিষয়াবলী লইয়া উহার ভৌগোলিক

পরিবেশ গঠিত। আমাদের মনের উপর এই পরিবেশের প্রভাবও কম নহে। তাই দেখি আরব দেশের মরুভূমিতে যাহারা বাস করে তাহাদের মনের গঠন যেরকম, বাংলা দেশের শস্য-শ্যামল, উর্বর ভূমিতে যাহারা বাস করে তাহাদের মনের গঠন ঠিক সেই রকম নহে। মনের গঠন বিভিন্ন বলিয়া তাহাদের চিন্তা ধারাও বিভিন্ন হইতে বাধ্য। তাই অলস ও ভাবপ্রবণ বাঙালী যাহা কামনা করে, দুর্ধর্ষ পাঠান বা বেদুইন তাহা কামনা করে না। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে প্রাকৃতিক বা ভৌগলিক পরিবেশের দ্বারাও আমাদের কামনা সমূহ প্রভূত পরিমাণে নির্ধারিত হইয়া থাকে।

(গ) উপরোক্ত ভৌগলিক ও সামাজিক পরিবেশ (Environment) ব্যতীত বংশের (Hereditry) প্রভাবই কি আমাদের জীবনে কম? ইহার দ্বারা আমাদের শরীর ও মনের অবস্থা যে কি পরিমাণে নির্ধারিত হয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। নিজেদের দেহ যেমন আমরা নিজেরা সৃষ্টি করি নাই; নিজেদের মনও আমরা তেমন নিজেরা সৃষ্টি করি নাই; দুই-ই পিতৃ-পিতামহের নিকট হইতে পাইয়াছি। বংশানুক্রমে তাহাদের দৈহিক শক্তি পাইয়াছি, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মানসিক প্রবৃত্তিও লাভ করিয়াছি। এই সকল প্রবৃত্তির প্রভাব অতিক্রম করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। তাই দেখি, যে বালক মাতাপিতার সংগীত প্রবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে সে শিশুকাল হইতে গান গাহিতে ভালবাসে; আর যে বালক পূর্ব-পুরুষের অংকন প্রবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে সর্বদাই ছবি আঁকিতে ভালবাসে। এমতাবস্থায় তাহাদের স্বাধীনতা কোথায়? নিজেদের বংশগত প্রবৃত্তির বশে তাহারা কাজ করিতেছে; নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছার কোন অবকাশ তাহাদের নাই।

যুক্তি খণ্ডন

I. স্বাধীনতাবাদিগণ ইহার উত্তরে কি বলেন? তাঁহারা বলেন, মানুষের কর্মধারা ও চিন্তাধারা যে অনেকক্ষেত্রে তাহাদের বিভিন্ন অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের যে একটুও ইচ্ছা-স্বাধীনতা নাই—উহাও স্বীকার করা সম্ভব নহে। ইচ্ছা-স্বাধীনতা মানসিক ব্যাপার; এই মানসিক শক্তি আমার আছে কি না—তাহা কেহই বাহির হইতে লক্ষ্য করিতে পারে না; মানসিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া লক্ষ্য করিবার একমাত্র উপায়, অন্তর্দর্শন (Introspection)। আমি যখন আমার মনের ভিতর অবলোকন করিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, আমি নিজের ইচ্ছায় স্বাধীন-

ভাবে বিচার বিবেচনা করিতেছি, তখন এই স্বাধীনতার অস্তিত্ব একেবারেই অস্বীকার করা যায় না। আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি যে আমি নিজে প্রতিদ্বন্দ্বী কামনা সমূহের তুলনামূলক বিচার করিতেছি এবং পরিশেষে একটিকে বর্জন করিয়া অপরটিকে নির্বাচন করিতেছি। আমার এই সক্রিয়-বোধ এত স্পষ্ট এবং প্রখর যে ইহাকে একেবারে অলীক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

তারপরে, আর এক কথা। নিয়তিবাদিগণ বলেন যে আমরা সকলেই কামনার পিছনে ছুটিয়াছি ; কামনাই নাকি আমাদিগকে পরিচালিত করিতেছে। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি—এই কামনা আসিতেছে কোথা হইতে ? ইহা শূন্য হইতে খসিয়া পড়িতেছে না, বা বন্যার জলে ভাসিয়া আসিতেছে না ; ইহারা আমারই অহং হইতে উদ্গত হইতেছে : আমার কামনা আমার অহং হইতে আসিতেছে, তোমার কামনা তোমার অহং হইতে আসিতেছে। আমার মনে আমি কামনা করিতেছি, তোমার মনে তুমি কামনা করিতেছ। মোট কথা, কোন কামনাই জোর করিয়া আমার মনের উপব চাপান হয় না ; আমি নিজেই ইহা সৃষ্টি করি। এক কথায়, আমরা পরকীয় নির্দেশে কামনা করি না, স্বকীয় ইচ্ছানুসারে কামনা করি। অতএব আমরা কামনার দাস নহি, বরং কামনাই আমাদের দাস। আমরা যে কামনাটি অনুমোদন করি, শুধু সেই কামনাই আমাদের মানসপটে উপস্থিত হইতে পারে, নতুবা যে কোন কামনা আমাদের মনের মধ্যে আবির্ভূত হইতে পারে না। মোট কথা, কোন্ কামনা আমার মনের মধ্যে আসিবে আর কোন্ কামনা বাইবে—তাহা আমার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, কামনার দ্বারা নহে ; অর্থাৎ আমিই কামনাকে শাসন করি, কামনা আমাকে শাসন করে না। এমতাবস্থায় আমার পরাধীনতা কোথায় ? আমি তো স্বাধীন, আমিই কামনা সমূহের কর্তা ও নিয়ন্তা।

এতক্ষণ আমরা নিয়তিবাদের প্রথম যুক্তি খণ্ডন করিলাম। এখন ইহার দ্বিতীয় যুক্তির কথা আলোচনা করা যাউক।

দ্বিতীয় যুক্তি খণ্ডন

II. দ্বিতীয় যুক্তি আসে কার্যকারণ সম্বন্ধ হইতে। ইহা বিজ্ঞান জগতের একটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য ; প্রত্যেক কার্যেরই এক "কারণ" আছে ; "কারণ" (cause) না থাকিলে কোন "কার্যই" (effect) সংঘটিত হইতে পারে না। ইহা সকলেই স্বীকার করেন ; সকলেই বলেন যে বিনা কারণে কোন কার্যের উদ্ভব হওয়া সম্ভব নহে। অতএব নিয়তিবাদিগণ অনায়াসে বলিতে পারেন যে,

মানুষ যে কোন কাজই করুক না কেন—উহারও নিশ্চয়ই কোন এক সুনির্দিষ্ট "কারণ" আছে। মানুষের বিভিন্ন অবস্থাই উহার যথাযথ "কারণ"। ভৌগোলিক অবস্থা, সামাজিক অবস্থা এবং উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত দৈহিক ও মানসিক অবস্থার দ্বারা মানুষের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে; তাই তাহার কোন কার্যই অকারণ নহে। কিন্তু এই সকল অবস্থার প্রভাব স্বীকার না করিলে বলিতে হইবে যে তাহার কার্যের কোনই পূর্বনির্দিষ্ট "কারণ" নাই; হঠাৎ অকারণ উহা সংঘটিত হইতেছে। কিন্তু ইহা অসম্ভব।

ইহার উত্তরে স্বাধীনতাবাদিগণ বলেন যে তাহারাও "কার্যকারণ" সম্বন্ধ অস্বীকার করেন না। তবে সামাজিক এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা যে মানুষের সকল কাযের একমাত্র কারণ তাহারা স্বীকার করেন না। আমি যখন স্বেচ্ছায় ও স্বাধীনভাবে কাজ করি—তখন "আমিই" উহার 'কারণ'। অতএব আমার কার্য মোটেই অকারণ নহে। সেইজন্য তাঁহারা তাঁহাদের মতবাদকে সাধারণতঃ "আত্মনিয়ন্ত্রণ" (Self-Determination) নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। প্রত্যেক মানুষেরই এক নিজস্ব সত্তা বা অহং (Ego) আছে; এই অহংই আমাদের সকল মানসিক ক্রিয়ার কর্তা ও নিয়ন্তা। এই আত্মসত্তার নিয়ন্ত্রণে আমরা যে কাজ করি তাহাকে "অকারণ" বলা যাইতে পারে না; বাহ্যবস্তু যদি আমাদের কাযের কারণ হইতে পারে, তবে অধ্যাত্ম বস্তুই বা কারণ হইতে পারিবে না কেন? এই অধ্যাত্ম বস্তু বা আত্মা বিভিন্ন বলিয়া ইহার কার্যাবলীও বিভিন্ন হইয়া থাকে। মনে রাখিতে হইবে আমাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান; প্রত্যেকেরই শিক্ষা-দীক্ষা ও অভিজ্ঞতা পৃথক; আমার রুচি ও তোমার রুচি, আমার স্বভাব ও তোমার স্বভাব ঠিক একরকমের নহে; সেইজন্য আমাদের কার্যাবলীও ঠিক একরকমের হইতে পারে না। তাই তুমি যেমন লোক তুমি সেইরকম কাজ কর, আর আমি যেরূপ লোক আমি সেইরূপ কাজ করি। এইভাবে নিজ নিজ স্বভাব ও চরিত্র অনুযায়ী কাজ করি বলিয়া আমাদের কার্যও বিভিন্ন হইয়া থাকে। এক কথায়, অধ্যাত্ম "কারণ" পৃথক, তাই উহার কার্যও পৃথক হইতে বাধ্য।

তৃতীয় যুক্তি খণ্ডন

III. নিয়তিবাদিগণের তৃতীয় যুক্তি এই যে, আমরা যেমন আগে হইতে প্রাকৃতিক ঘটনাবলী নিরূপণ করিতে পারি, ঠিক তেমন মানুষের কার্যাবলীও আমরা আগে হইতে নির্ধারণ করিতে পারি। সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ কবে হইবে,

কখন কোথায় ঝড় উঠিবে বা কখন বৃষ্টিপাত হইবে, আমরা বিজ্ঞানের সাহায্যে আগে হইতেই তাহা নিরূপণ করিতে পারি। প্রাকৃতিক ঘটনামাত্রেরই যথাযথ "কারণ" নির্দিষ্ট আছে ; সেই কারণটি নির্ধারণ করিতে পারিলেই আমরা উহার কার্যও অনুমান করিতে পারি। মানুষের কার্যাবলী সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা প্রযোজ্য। মানুষ সাধারণতঃ কত বৎসর বাঁচে বীমা কোম্পানী তাহা আগে হইতেই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন; তাহাদের গণনার মধ্যে ভুল থাকিলে তাহারা ব্যবসায়ে লাভ করিতে পারিতেন না। ডাক্তারেরা প্রায় সঠিক নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন—কোন্ অসুখে কত লোক মরে ; কলিকাতায় বৎসরে কত লোকের আত্মহত্যা করিবার সম্ভাবনা আছে বা কত লোকের মোটর দুর্ঘটনায় মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা আছে—তাহাও প্রায় সঠিক বলা যায়। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর ন্যায় মানুষের কার্যাবলী সম্বন্ধেও ভবিষ্যৎবাণী করা যায়। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রাকৃতিক ঘটনার ন্যায় মানুষের কার্যও কোন নির্দিষ্ট কারণের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। সেই কারণগুলি অনুমান করিতে পারি বলিয়া আমরা আগে হইতে মানুষের কার্যও নির্ধারণ করিতে পারি। ইহাকেই তো নিয়তিবাদ বলে। মানুষ কোন্ অবস্থায় কি কাজ করিবে তাহা পূর্ব হইতেই নির্দিষ্ট আছে। এমতাবস্থায় তাহার স্বাধীন ইচ্ছার মূল্য কোথায় ?

ইহার উত্তরে স্বাধীনতাবাদিগণ বলেন যে, একইরূপ অবস্থায় যদি দশজন মানুষ একইরূপ কাজ করে, তাহা হইলেই কি বলিতে হইবে যে তাহাদের কোন স্বাধীন ইচ্ছা নাই ? মোটেই না ; স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়াও আমরা দশজন ঠিক একইরূপ কাজ করিতে পারি। স্বাধীন হইলেই যে আমাদিগকে বিভিন্নভাবে কাজ করিতে হইবে—নতুবা স্বাধীনতা থাকিতে পারে না—ইহা নিতান্তই অযৌক্তিক কথা। আর এক কথা, এই বৎসরে কলিকাতায় কয়জন লোক আত্মহত্যা করিবে তুমি হয়ত ঠিক বলিতে পার, কিন্তু কে কে আত্মহত্যা করিবে, তাহা বলিতে পার কি ? কিছুতেই নয়। অথচ ইহাই আসল কথা, কারণ সমষ্টির সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করা কঠিন নহে, কিন্তু ব্যষ্টির সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করা খুবই কঠিন—যেহেতু ব্যষ্টির সম্বন্ধেই আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন ওঠে, সমষ্টি প্রসঙ্গে নহে।

নৈতিক যুক্তি

নিয়তিবাদের স্বপক্ষে সাধারণতঃ যে কয়টি প্রধান যুক্তি দেওয়া হয়—আমরা একে একে সেগুলি খণ্ডন করিয়া আত্মনিয়ন্ত্রণবাদ সমর্থন করিলাম।

আত্মনিয়ন্ত্রণবাদের স্বপক্ষে আর একটি যুক্তি উল্লেখ করিয়া আমরা এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। ইহাকে "নৈতিক যুক্তি" (Moral Argument) বলা যাইতে পারে, এবং ক্যাণ্ট ইহার উপর খুবই গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, আমাদের প্রত্যেকেরই মনের মধ্যে ঔচিত্য-বোধ আছে। আমার মন বলিতেছে "ইহা করা উচিত"; তবে কেন করা উচিত—তাহা হয়ত ঠিক বলিতে পারিব না; কিন্তু করা যে উচিত, সে বিষয়ে আমার কোনই সন্দেহ নাই। এখন আমাদের জিজ্ঞাস্য যে—এই ঔচিত্যবোধের সার্থকতা কি? ধরা যাউক যে, নিয়তিবাদ যাহা বলে তাহাই ঠিক, অর্থাৎ আমাদের নিজেদের কোন স্বাধীনতা নাই; আমরা নিয়তির হাতে পুত্তলিকামাত্র; যাহা কিছু করি, সবই অবস্থার বিপাকে করি, নিজেদের ইচ্ছায় নহে। ইহাই যদি ঠিক হয়, তবে ঔচিত্যবোধের সার্থকতা রহিল কোথায়? ধর, আমি এই কাজটি উচিত মনে করিতেছি বটে, অথচ উহা সম্পাদন করিবার কোন ক্ষমতা আমার নাই। তাহা হইলে এই ঔচিত্যবোধ থাকিলেই বা আমার কি লাভ, আর না থাকিলেই বা কি ক্ষতি? এক্ষেত্রে থাকা না থাকা দুই-ই সমান। সেইজন্য স্বাধীনতাবাদিগণ বলেন যে, যেহেতু আমরা উচিত মনে করিতেছি, সেইহেতু বুঝিতে হইবে যে উহা সম্পাদন করিবার ক্ষমতাও আমাদের আছে। তাই ক্যাণ্ট বলেন "Thou oughtest implies that thou canst" অর্থাৎ যাহা তুমি উচিত মনে কর তাহা তুমি নিশ্চয়ই সাধন করিতে পার; নতুবা এইরকম ঔচিত্যবোধ তোমার মনের মধ্যে উদয়ই হইত না। অতএব, যেহেতু আমাদের মনের মধ্যে এইরূপ ঔচিত্যবোধের উদয় হইতেছে, সেইহেতু বুঝিতে হইবে যে ইচ্ছা করিলে আমরা উহা নিশ্চয়ই সম্পাদন করিতে পারি, অর্থাৎ আমরা স্বাধীন।

উপসংহার

এখানে একটি বিষয়ে সাবধান করিয়া দেওয়া দরকার। স্বাধীনতা বলিতে আমরা সাধারণতঃ নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা বুঝি; তবে কেহ কেহ মনে করেন যে স্বাধীনতা মানে বুঝি অবাধ অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা। অবাধ স্বাধীনতাকে ইংরাজীতে Indeterminism বলে; Indeterminism, কারণ এক্ষেত্রে কোন প্রকার নিয়ন্ত্রণ নাই। কিন্তু আমাদের মতানুসারে এই প্রকার অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতার কোন অর্থই হয় না। কারণ, নিছক স্বাধীনতা বলিয়া কোন জিনিস নাই; স্বাধীনতা বলিলেই বুঝিতে হইবে "আমার" স্বাধীনতা বা "তোমার" স্বাধীনতা, অর্থাৎ কোন ব্যক্তি বিশেষের স্বাধীনতা। এক কথায়, ইহা নিরবলম্ব হইয়া ক্রিয়া

করে না; কোন ব্যক্তি বিশেষকে অবলম্বন করিয়া ক্রিয়া করে। ব্যক্তি বিশেষকে অবলম্বন করিয়া ক্রিয়া করে বলিয়া ইহা সেই ব্যক্তিবিশেষের বৈশিষ্ট্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত না হইয়া পারে না। একটি উদাহরণ দিয়া বুঝান যাউক। আমরা সকলেই জানি যে জল শূন্যে ভাসিয়া বেড়ায় না; কোন না কোন পাত্রের মধ্যে ইহা আধৃত থাকে। কিন্তু যে পাত্রেই ইহা আধৃত থাকুক না কেন, ইহা সেই পাত্রের রূপ পরিগ্রহ না করিয়া পারে না। অর্থাৎ সেই পাত্রের দ্বারা ইহার রূপ নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। মানুষের স্বাধীনতা সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা প্রযোজ্য। যাহার মধ্যে ইহা ক্রিয়া করে তাহার স্বভাব ও চরিত্রের দ্বারা ইহা কথঞ্চিৎ নিয়ন্ত্রিত না হইয়া পারে না। তাই দেখি আমার স্বাধীন ইচ্ছা ও তোমার স্বাধীন ইচ্ছা ঠিক একইরূপ নহে। আমরা দুইজনেই স্বাধীনভাবে কামনা করি বটে, তবুও আমি যাহা কামনা করি তুমি তাহা কামনা কর না; আমাদের কাম্য বস্তু বিভিন্ন। ইহার কারণ, আমাদের প্রত্যেকেরই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য আছে, এই বৈশিষ্ট্য অনুসারে আমাদের কামনাও কিঞ্চিৎ বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করে। তাই ইহাকে অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা বলা যায় না। অনিয়ন্ত্রিত হইবে কেমন করিয়া? কারণ, পূর্বেই তো বলিয়াছি, যে পাত্রের মধ্যে ইহা বিরাজ করে, তাহার আত্মরূপের দ্বারা ইহা কিঞ্চিৎ নিয়ন্ত্রিত না হইয়া পারে না।

ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, Freedom of will প্রসঙ্গে আমরা যে স্বাধীনতার কথা বলিয়াছি তাহা অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা (Indeterminism) নহে, নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা। তবে নিয়ন্ত্রিত হইলেও ইহাকে কিন্তু নিয়তিবাদ (Determinism) বলা যায় না। কারণ এক্ষেত্রে তো আমি বাহিরের কোন কার্যকলাপের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছি না, আমি নিজেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করিতেছি। অপরের নির্দেশে কাজ করিবার মধ্যে পরাধীনতা আছে; কিন্তু যেখানে আমি নিজের ইচ্ছায় নিজের রুচিমত কর্তব্য নিরূপণ করিতেছি, সেখানে আবার পরাধীনতা কোথায়? সেখানে আমি স্বাধীন। তাই ইহাকে আত্ম-স্বাধীনতা (Self determinism) বলে।

তাহা হইলে দেখা গেল যে আমাদের বিতর্কের বিষয় ঠিক অধীনতাবাদ বনাম স্বাধীনতাবাদ (Determinism V. S. Indeterminism) নহে; আমাদের বিতর্কের বিষয় অধীনতাবাদ বনাম আত্ম-অধীনতাবাদ (Determinism V.S. Self-determinism)। উভয়ক্ষেত্রে অধীনতা ঠিকই আছে; তবুও আত্ম-অধীনতাকে সাধারণতঃ স্বাধীনতা নামে অভিহিত করা হয়। তবে এই স্বাধীনতাকে যাহাতে অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা বলিয়া ভুল করা না হয়, সেইজন্য ইহাকে স্পষ্ট ভাষায়

আত্ম-স্বাধীনতা বলিয়া উল্লেখ করা বিধেয়। আমাদের মতানুসারে অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতার কোন অর্থ নাই; আত্ম-স্বাধীনতাই আসল স্বাধীনতা। এক্ষেত্রে আমরা অপরের দ্বারা পরিচালিত হইতেছি না, নিজেদের দ্বারা পরিচালিত হইতেছি।

আত্মার অমরত্ব (Immortality of Soul)

এখন আমরা আত্মা সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রশ্নের আলোচনা করিব। আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন এই: দেহের মৃত্যুর পর আত্মার কি হয়? দেহ ভস্মীভূত হইলে আত্মাও কি বিনষ্ট হইয়া যায়? অথবা দেহের মৃত্যু হইলেও আত্মার কোনরূপ বিনাশ হয় না? ইহা কি তবে অমর? আমরা সাধারণতঃ তাহাই বিশ্বাস করি। যথাযথ প্রমাণ থাকুক আর না থাকুক, আমরা যেমন বিশ্বাস করি যে ঈশ্বর আছেন, সেইরূপ যথাযথ প্রমাণ থাকুক আর না থাকুক আমরা বিশ্বাস করি যে আত্মা অমর। এই বিশ্বাসের পক্ষে বা বিপক্ষে কি বলিবার আছে, তাহাই আমরা এখানে আলোচনা করিব। অতএব আত্মার অমরত্ব বলিতে আমরা কি বুঝি—তাহাই প্রথমে বিচার করা যাউক। অনেকে বলেন যে দেহের মৃত্যুর পরে আত্মার মৃত্যু হয় না বটে, তবে ইহার কোন স্বতন্ত্র সত্তা থাকে না; ইহা পরমাত্মায় বিলীন হইয়া যায়। গঙ্গার জল যখন সমুদ্রে আসিয়া বিলীন হইয়া যায়, তখন কি ইহা বিনষ্ট হয়? মোটেই না, সমুদ্রের জলের মধ্যেই ইহা বিরাজ করে, তবে ইহার আর কোন স্বতন্ত্র সত্তা থাকে না, ইহার গঙ্গাত্ব নষ্ট হইয়া যায়। সেইরূপ আমাদের আত্মা যতদিন দেহের মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকে, ততদিন ইহার এক স্বতন্ত্র সত্তা থাকে; কিন্তু দেহের মৃত্যুর পরে ইহা যখন পরমাত্মায় বিলীন হইয়া যায়, তখন আর ইহার কোন নিজস্ব সত্তা থাকে না। তখন আমি আর আমি থাকি না, তুমিও আর তুমি থাক না; পরমাত্মার অনন্ত জীবনে আমরা সব একাকার হইয়া যাই। এইভাবে আমরা সকলেই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলি বটে, কিন্তু আমাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না। বিলুপ্ত হওয়া তো দূরের কথা, বরং অনেকে বলেন যে এইভাবেই আমরা আমাদের জীবনের পূর্ণতা লাভ করি, আমরা আমাদের ক্ষুদ্র জীবন বর্জন করিয়া অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হই, কূপমণ্ডূকত্ব পরিহার করিয়া অমরত্ব লাভ করি। ইহাকে আমরা Impersonal Immortality বলিতে পারি।

বলা বাহুল্য, এই প্রকার অমরতার কথা ভাবিয়া আমাদের মন তৃপ্ত হয় না। আমরা সাধারণ মানুষ; আমরা শুধু অমরতাই চাই না, আমরা চাই **"আমাদের"** অমরতা। এখানে 'অমরতা' আসল কথা নহে, আসল কথা

"আমাদের" অমরতা। আমি চাই, আমার বৈশিষ্ট্য লইয়া আমি বাঁচিয়া থাকিব; তুমি চাও, তোমার বৈশিষ্ট্য লইয়া তুমি বাঁচিয়া থাকিবে। কিন্তু ঈশ্বরের অনন্ত জীবনের মধ্যে আমরা যদি নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলি, তাহা হইলে অমরত্ব সত্ত্বেও আমাদের লাভ কি হইল? যে অমর জীবনের মধ্যে আমার আমিত্ব থাকে না, বা তোমার তুমিত্ব থাকে না, সে জীবন যতই পূর্ণ হউক না কেন, উহার জন্য আমাদের মন মোটেই আকুল হয় না। আমরা অমরত্ব চাই বটে, কিন্তু নৈর্ব্যক্তিক অমরত্ব চাই না; আমরা যে অমরত্ব চাই, তাহার মধ্যে নিজেদের ব্যক্তিত্বটুকুও বজায় রাখিতে চাই। ইহাকে আমরা Personal Immortality বলিতে পারি। এইপ্রকার অমরত্বের স্বপক্ষে যে কয়েকটি যুক্তি দেওয়া হয়, আমরা এখানে তাহা একে একে ব্যাখ্যা করিব; সঙ্গে সঙ্গে যথাযথ সমালোচনাও অন্তর্ভুক্ত করিব।

আত্মা—মৌলিক পদার্থ

প্রথমে প্লেটোর যুক্তি লওয়া যাউক। তিনি বলেন আত্মা মৌলিক পদার্থ; মৌলিক পদার্থের কখন ধ্বংস হয় না, শুধু যৌগিক পদার্থেরই ধ্বংস সম্ভব। যৌগিক পদার্থ, যেমন ঘর, টেবিল কি চেয়ার। কাঠের নানাপ্রকার অংশ লইয়া একটি টেবিল নির্মিত হইয়াছে; এই অংশগুলি বিচ্ছিন্ন করিলেই টেবিলটি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়; তখন অংশ পড়িয়া থাকে বটে, কিন্তু টেবিল থাকে না। সেইরূপ, আমাদের দেহও যৌগিক পদার্থ; তাই যে সব উপাদান লইয়া ইহা রচিত হইয়াছে, সেগুলি বিচ্ছিন্ন করিলেই আমাদের দেহও বিনষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু মৌলিক পদার্থ সম্বন্ধে একথা মোটেই প্রযোজ্য নহে। পৃথক পৃথক অংশ বা উপাদান লইয়া তো ইহা রচিত হয় নাই; অতএব ইহার উপাদানগুলিকে বিচ্ছিন্ন করিবার কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। এবং যেহেতু ইহাকে উপাদান বা অংশ-সমূহে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, সেইহেতু ইহার ধ্বংসও সম্ভব নহে। প্লেটোর মতে আমাদের আত্মাও এইরূপ এক মৌলিক পদার্থ; ইহার মধ্যে কোন বিচ্ছিন্ন অংশ বা উপাদান নাই। তাই ইহার ধ্বংস নাই, মৃত্যু নাই; ইহা নিত্য, শাশ্বত ও চিরন্তন; ইহা অজর এবং অমর।

সমালোচনা। প্লেটোর এই যুক্তি মোটেই গ্রহণযোগ্য নহে। তর্কের খাতিরে স্বীকার করা যাউক যে মৌলিক পদার্থের কোন ধ্বংস বা মৃত্যু নাই; কিন্তু আত্মা যে মৌলিক পদার্থ তাহার প্রমাণ কি? Plato তো সেরূপ

কোন প্রমাণ দেন নাই; তিনি শুধু মানিয়া লইয়াছেন যে আত্মার মধ্যে কোন অংশ বা উপাদান নাই; অতএব ইহা মৌলিক পদার্থ। কিন্তু এই মৌলিক পদার্থের স্বরূপ কি? কিভাবে আমরা ইহা উপলব্ধি করিতে পারি? অর্থাৎ উপলব্ধি করিলে ইহা আমাদের নিকট কিরূপ প্রতীয়মান হয়—সে-সব কোন কথাই Plato ব্যাখ্যা করেন নাই। তিনি শুধু বলিয়াছেন যে আত্মা যৌগিক পদার্থ নহে; কিন্তু কেন ইহা যৌগিক পদার্থ নহে, তাহার কোন কারণ ব্যাখ্যা করেন নাই। এমতাবস্থায় তাঁহার যুক্তির প্রতি আমরা বিশেষ কোন গুরুত্ব আরোপ করিতে পারি না।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ

বর্তমান কালে আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে দ্বিতীয় যুক্তি আসিতেছে Sir Oliver Lodge এবং William James প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকগণের নিকট হইতে। লণ্ডনের Society for Psychical Researchএর সহিত যে সকল মনীষী ব্যক্তি সংযুক্ত আছেন তাঁহারা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আত্মা সম্বন্ধে নানারূপ গবেষণা করিয়া এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন যে মৃত্যুর পরে আত্মার অস্তিত্ব এখন নাকি আর অস্বীকার করা যায় না; তাঁহারা উহার বহু প্রমাণ পাইয়াছেন। মৃত ব্যক্তির আত্মার নিকট হইতে তাঁহারা শুধু লিখিত বাণী পান নাই, কথিত বাণীও তাঁহারা শুনিতে পাইয়াছেন। গান এবং শব্দের মাধ্যমে, এবং নানারূপ জ্যোতির মাধ্যমেও তাঁহারা আত্মার সংবাদাদি পাইয়াছেন। তাই তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে মৃত্যুর পরেও আত্মা সক্রিয় থাকে; অর্থাৎ দেহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আত্মার মৃত্যু হয় না; আত্মা অমর।

সমালোচনা। আত্মার অমরত্ব প্রমাণ করিবার জন্য অধুনা যেসব বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা হইতেছে আমরা তাহার গুরুত্ব স্বীকার করি; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিতে বাধ্য যে উহাদের সিদ্ধান্তকে সকলেই প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই এবং এখনও করেন না। আমরা শুধু এইটুকু বলিতে চাই যে বৈজ্ঞানিকগণ যেসব প্রমাণাদি উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে আমাদের মনে ঔৎসুক্যের সৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু বিশ্বাস উৎপন্ন হয় না; অন্ততঃ এখনও তাঁহারা অনেকের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করিতে সমর্থ হন নাই। তবে বিশ্বাস না করিলেও হয়তো একেবারে অবিশ্বাস করা যায় না, তাহা আমরা স্বীকার করি। সেইজন্য তাঁহাদের সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করি না

আবার অগ্রাহ্যও করি না; আরও উপযুক্ত প্রমাণাদি চাই বলিয়া ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দেওয়াই অধুনা সঙ্গত।

নৈতিক যুক্তি

তৃতীয় যুক্তিকে নৈতিক যুক্তি (Moral argument) বলা যাইতে পারে। Kant ইহার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন যে আমরা সাধারণতঃ বিশ্বাস করি যে, মানুষ নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী সুখ বা দুঃখ ভোগ করে; যে সৎকাজ করে সে সুখ ভোগ করে, আর যে অসৎ কাজ করে সে দুঃখ ভোগ করে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা কি দেখি? আমরা অনেক সময়েই দেখি, যে লোক আজীবন সৎকাজ করিল এবং পরের উপকার করিয়া জীবন অতিবাহিত করিল, সে হয়তো শেষ জীবনে খুবই কষ্টে পড়িয়াছে; আর যে লোক চিরকাল অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করিল এবং অসৎ ভাবে জীবন যাপন করিল, সে শেষ পর্যন্ত বেশ সুখেই জীবন কাটাইয়া গেল; তাহার কোন দুঃখ কষ্ট হইল না। এক কথায়, সৎ জীবনের পরিণামে আমরা অনেক সময় দুঃখ ভোগ করি, আর অসৎ জীবনের পরিণামে আমরা অনেক সময় সুখ ভোগ করি। কিন্তু আমাদের বিবেক ইহাতে কিছুতেই সায় দেয় না; বিবেক স্পষ্ট বলিতেছে যে সৎ জীবনের পরিণাম কিছুতেই দুঃখজনক হইতে পারে না; ইহার পরিণাম সুখকর হইবেই। কিন্তু এ জীবনে যখন সুখকর ফল হইতেছে না তখন বুঝিতে হইবে যে এই জীবনই আমাদের শেষ জীবন নহে; ইহার পরেও জীবন আছে। তাই এ জীবনে যাহাই ঘটুক না কেন, পরবর্তী জীবনে সব ঠিক হইয়া যাইবে। এ জীবনে কেহ হয়তো সৎ কর্মের পরিণামে সত্যই দুঃখ ভোগ করে, কিন্তু তাহাতে ক্ষতি কি? এই জীবনেই তো আমাদের সব শেষ হইয়া যায় না; পরবর্তী জীবনেও ইহার রেশ চলিতে থাকে। তখন সৎ কর্মের ফলে সুখ এবং অসৎ কর্মের ফলে দুঃখ আসিবেই। মোট কথা, Kant বলিতে চাহেন যে, যদি এই জীবনেই আমরা আমাদের পাপ ও পুণ্যের যথাযথ ফল ভোগ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে হয়তো পরবর্তী জীবনের কথা ভাবিবার দরকার হইত না; কিন্তু যেহেতু এই জীবনে আমাদের যথাযথ ফল ভোগ হইতেছে না, সেই হেতু আমাদিগকে পরবর্তী জীবনের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে হয়, নতুবা সংসারে এক ঘোর অবিচার রহিয়া যায়। তাই Kant বলেন যে এই অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য পরবর্তী জীবনের অস্তিত্ব অপরিহার্যরূপে প্রয়োজন। এই জীবনে পাপের শাস্তি না হইলেও পরজীবনে হইবেই।

সমালোচনা

ক্যাণ্টের এই যুক্তি আমাদের নিকট বিশেষ জোরাল প্রতীয়মান হয় না। তিনি মানিয়া লইয়াছেন যে মানুষকে তাহার কৃতকর্মের ফল ভোগ করিতেই হইবে; পাপের শাস্তি আছে এবং পুণ্যেরও নিশ্চয়ই পুরস্কার আছে। কিন্তু তাঁহার এই বিশ্বাসের স্বপক্ষে তিনি কোন প্রমাণ দিতে পারেন কি? বরং সংসারের সর্বত্রই যাহা দেখিতেছি তাহাতে এইরূপ বিশ্বাস করা সত্যই খুব কঠিন নহে কি? দিনের পর দিন যে অন্যায় অবিচার চলিতেছে, তাহা দেখিয়াও যদি আমরা মনে করি যে একদিন না একদিন ইহার প্রতিকার হইবেই, তবে উটপাখীর সহিত আমাদের প্রভেদ রহিল কোথায়? উটপাখী ধুলার মধ্যে মুখ গুঁজিয়া ভাবে যে সব বিপদ বুঝি কাটিয়া গেল; সেইরূপ চতুর্দিকে অন্যায় দেখিয়াও আমরা ভাবিতেছি যে সব অন্যায় বুঝি একদিন ঠিক হইয়া যাইবে। কিন্তু ইহাকে তো প্রমাণ বলা যায় না, ইহার নাম অন্ধ বিশ্বাস। আর এক কথা, আমরা সাধারণতঃ জ্ঞাত বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া অজ্ঞাত বিষয় সম্বন্ধে অনুমান করিয়া থাকি; অর্থাৎ যাহা জ্ঞাত বস্তু সম্বন্ধে প্রযোজ্য তাহা অজ্ঞাত বস্তু সম্বন্ধেও অনেকাংশে প্রযোজ্য—ইহাই আমাদের অনুমানের ভিত্তি। জ্ঞাত জগতে দেখিতেছি যে পাপের কোন যথাযথ শাস্তি হইতেছে না; ইহা হইতে আমরা যদি অনুমান করি যে অনাগত জীবনেও ঐরূপ ঘটিবে, তাহা হইলে বিশেষ কোন দোষ হয় কি? বরং এইরূপ অনুমান করাই স্বাভাবিক হইবে। তৎপরিবর্তে আমরা যদি অনুমান করি যে বর্তমান জগতে যাহাই ঘটুক না কেন, অনাগত জীবনে ঠিক তাহার বিপরীত অবস্থা ঘটিবে—সে ক্ষেত্রে আমাদের অনুমানের ভিত্তি খুব দৃঢ় নহে। তাই আমরা বলিয়াছি যে ক্যাণ্টের এই যুক্তিকে খুব সহজে গ্রহণ করা যায় না।

তবে ইহাকে খুব সহজে অবহেলাও করা যায় না; কারণ নৈতিকতাই মানুষের জীবনের বৈশিষ্ট্য। শুধু মানুষের সম্বন্ধেই নীতিদুর্নীতির প্রশ্ন ওঠে, পশুপক্ষীর সম্বন্ধে সে প্রশ্ন ওঠে না। মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনা আছে, আত্মচেতনা আছে এবং ইচ্ছা-স্বাধীনতাও আছে; তাই কেবল তাহার পক্ষেই সদসৎ বিচারপূর্বক কাজ করা সম্ভব। কেবল মাত্র মানুষই নৈতিক জীবন যাপন করিতে পারে, অন্য কেহ নহে। অতএব এমন কোন তত্ত্বের কথা যদি কল্পনা করা যায় যাহার সত্যতা স্বীকার না করিলে আমাদের নৈতিক জীবন অযথার্থ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে অন্য কোন কারণে না হইলেও অন্ততঃ নৈতিকতার খাতিরেই সেই তত্ত্বকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া সঙ্গত। ক্যাণ্টের মতানুসারে আত্মার অমরত্বও

এই প্রকার এক অবশ্য স্বীকার্য তত্ত্ব; ইহার সত্যতা স্বীকার না করিলে আমাদের নৈতিক জীবনের কোন অর্থই থাকে না। তাই আমরা বলিতে পারি যে শুধু ন্যায় শাস্ত্রের দিক দিয়া বিচার করিলে ক্যাণ্টের যুক্তি হয়ত প্রামাণ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না; কিন্তু নীতিশাস্ত্রের দিক দিয়া বিচার করিলে ইহাকে একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না। এখন পরবর্তী যুক্তির কথা আলোচনা করা যাউক; ইহার সহিতও নৈতিক জীবনের যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে।

অনন্ত আদর্শ

আমরা বহুবার বলিয়াছি যে আত্মোপলব্ধিই মানব জীবনের চরম শ্রেয়। আত্মোপলব্ধি মানে আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করা। Hegel বলেন ঐশ্বরিক স্বরূপই আমাদের যথার্থ স্বরূপ; আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে আধ্যাত্মিক শক্তি নিহিত আছে, উহা ঐশ্বরিক শক্তিরই রূপান্তর মাত্র। বস্তুতঃ ঈশ্বরই আমাদের মধ্যে ক্রিয়া করিতেছেন; তাঁহার অসীম জ্ঞানই আমাদের চেতনার মধ্যে সসীমরূপে প্রকাশ পাইতেছে। এক কথায়, তিনিই আমাদের হৃদয়াসনে অধিষ্ঠিত আছেন; অতএব তাঁহাকে উপলব্ধি করাই আমাদের ধর্মজীবনের প্রধান কর্তব্য। বলা বাহুল্য ইহা খুব সহজ ব্যাপার নহে; ইহার জন্য বহু চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। কারণ ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিতে হইলে নিজেকে ঈশ্বরের ন্যায় শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত পুরুষে পরিণত করিতে হইবে। মানুষ তখন আর মানুষ থাকিবে না, দেবত্ব লাভ করিয়া ঈশ্বরের সহিত একাত্ম উপলব্ধি করিতে পারিবে। ইহা কি সহজ ব্যাপার? ইহার জন্য ইন্দ্রিয় সংযত করিতে হইবে, লালসা দমন করিতে হইবে, চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিতে হইবে; এক কথায় বহু প্রকারের সাধনা করিতে হইবে; তবেই তো আমাদের অন্তর্নিহিত দেবত্ব ধীরে ধীরে পরিস্ফুরিত হইতে পরিবে। কবির ভাষায় বলা যায় "সহস্র বৎসরের ইহা সাধনার ধন।" তাই দেখি ধর্মজীবনে যিনি যতই উন্নত ও সমৃদ্ধ হউন না কেন, তিনিও খুব দুঃখ করিয়া বলেন যে তাঁহার মানব জীবন বৃথাই নষ্ট হইয়া গেল; তিনি তাঁহার চরম লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারিলেন না, তাঁহার পরম শ্রেয় লাভ করিতে পারিলেন না। এইরূপ বলা খুবই স্বাভাবিক। কারণ ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি করা—ইহা এত মহৎ ও বৃহৎ আদর্শ যে শুধু একজীবনের চেষ্টায় মানুষ ইহা লাভ করিতে পারে না। সে যতই এই আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে ততই সে বুঝিতে পারে যে এই আদর্শ যেন আরও দূরে সরিয়া যাইতেছে; এই আদর্শ উপলব্ধি করা তাহার পক্ষে এজীবনে

যেন অসম্ভব। শুধু এজীবনে কেন, অনন্ত জীবনেও কেহ ইহা পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারিবে কিনা সন্দেহ; অন্ততঃ যতদিন সে সসীম থাকিবে ততদিন তাহার পক্ষে এই অসীমত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব নহে।

অথচ এই অসীম স্বরূপ উপলব্ধি করাই মানব জীবনের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য। কিন্তু উপরোক্ত আলোচনায় দেখা গেল যে আমাদের এই ক্ষুদ্র জীবনের কয়েক বৎসরের চেষ্টায় ইহা লাভ করা যায় না; অনন্ত উপলব্ধি করিবার জন্য অনন্ত জীবন দরকার। তাই অনেকে বলেন যে আত্মা যদি অমর না হয়, তাহা হইলে মানব জীবনের কোন বৈশিষ্ট্যই থাকে না। তাহার বৈশিষ্ট্য—ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি করা; ইহাই তাহার জীবনের আদর্শ। এই আদর্শ যখন তাহাকে দেওয়া হইয়াছে, তখন এই আদর্শ উপলব্ধি করিবার সুযোগও তাহাকে নিশ্চয়ই দেওয়া হইয়াছে;* অমর এবং অনন্ত জীবনই আমাদের এই সুযোগ। তাই অনন্ত জীবন উপলব্ধি করিবার জন্য আমরা অনন্তকাল ধরিয়া অগ্রসর হইতেছি; আমরা অমৃতের পুত্র, আমরা অমর।

অষ্টম অধ্যায়

মনের উৎপত্তি

মনের সম্বন্ধে আমরা এখানে আরও একটি বিষয় আলোচনা করিব; ইহার উৎপত্তি (Origin)। এই প্রসঙ্গে সাধারণতঃ তিন প্রকার মতবাদ আছে।

I. Creation

অনেকে মনে করেন যে কোন এক শুভ মুহূর্তে ঈশ্বর হঠাৎ আত্মার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এইভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছায় সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, আলো, জল, আকাশ, বাতাস প্রভৃতি সমস্ত পদার্থই সৃষ্ট হইয়াছে। "Let there be light and there was light"। তিনি ইচ্ছা করিলেন, আলোর সৃষ্টি হউক; অমনি পৃথিবীতে আলোর উদ্ভব হইল; তিনি ইচ্ছা করিলেন, জলের সৃষ্টি হউক, অমনি জলের উৎপত্তি হইল। সেইরূপ তিনি ইচ্ছা করিলেন, পৃথিবীতে মানুষের উদ্ভব হউক, অমনি মানুষের আবির্ভাব হইল। মানুষের জন্য যেমন তিনি চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কল্পনা করিলেন, সেইরূপ তাহার জন্য "মন" বা আত্মারও কল্পনা

---

* "তোমার পতাকা যারে দাও,
তারে বহিবারে দাও শকতি।"

করিলেন। তাই মানুষ শুধু তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লইয়া আবির্ভূত হইল না, আত্মা সমন্বিত হইয়া আবির্ভূত হইল। ইহাকে ইংরাজীতে Special Creation বলে। ঈশ্বর ইচ্ছাপূর্বক নিজেই আত্মার সৃষ্টি করিয়াছেন; যেমন তিনি জল বাতাস সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমন আত্মাও সৃষ্টি করিয়াছেন।

সমালোচনা। এই মতবাদকে সাধারণতঃ Deism নামে অভিহিত করা হয়; ঈশ্বর-তত্ত্ব প্রসঙ্গে আমরা ইহার আলোচনা করিয়াছি। এই মতানুসারে ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি অনাদিকাল হইতে একাকী বিরাজ করিতেছিলেন, তখন আর কিছুই ছিল না। একদিন তাঁহার হঠাৎ ইচ্ছা হইল তিনি এক বিশ্বসংসার সৃষ্টি করেন, তখন তাঁহার ইচ্ছা হইতেই (out of nothing) এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব হইল। এইভাবেই যথাযথ দেহ ও আত্মা সমন্বিত হইয়া নরনারীর সৃষ্টি হইল। এখন আমরা জিজ্ঞাসা করি—তিনি তো একাকী ভালই ছিলেন, তবে হঠাৎ এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিতে গেলেন কেন? মানব এবং মানবাত্মা সৃষ্টি না করিলে কি তাঁহার চলিত না? তাহা হইলে কি বলিতে হইবে যে যখন তিনি একাকী ছিলেন তখন তিনি পূর্ণ ছিলেন না? তাঁহার মধ্যে অপূর্ণতা ছিল বলিয়াই কি তিনি নরনারী সৃষ্টি করিয়া নিজের পূর্ণতা সাধন করিলেন? তাহাই যদি হয়, তবে তিনি আরও আগে সৃষ্টি করিলেন না কেন? বলা বাহুল্য, এরকম কোন প্রশ্নেরই সমুচিত উত্তর পাওয়া যায় না। আর এক কথা, ঈশ্বর ইচ্ছা করিয়া হঠাৎ এই দুনিয়া সৃষ্টি করিলেন—যাঁহারা এইরূপ বলেন তাঁহারা হয়ত মনে করেন যে এইভাবে তাঁহারা ঈশ্বরের অনন্ত মহিমা ব্যাখ্যা করেন। আপাততঃ তাহাই প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাঁহারা ঈশ্বরকে সীমায়িত করিয়া ফেলেন। কারণ, সৃষ্টির পরে সত্যই তিনি সসীম হইয়া পড়েন; একদিকে থাকেন ঈশ্বর স্বয়ং আর অন্যদিকে থাকে তাঁহার সৃষ্ট বিশ্বজগৎ; দুই-ই স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। এক্ষেত্রে ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয় সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহার পাশে আর একটি জিনিষ আছে, যাহা ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াও বস্তুতঃ ঈশ্বরকেই আবার সীমায়িত করিয়া ফেলিয়াছে। তাহা হইলে, দেখা যাইতেছে যে এই মতবাদে ঈশ্বরকে মহান করিতে গিয়া তাঁহাকে প্রকারান্তরে ক্ষুদ্রই করিয়া দেখান হইতেছে। বলা বাহুল্য, ঈশ্বরকে এইভাবে ক্ষুদ্র ও সীমায়িত করিয়া দেখিতে আমাদের মন চায় না। তাই যে মতবাদে ঈশ্বরকে এইরূপ সীমায়িত করিয়া দেখিতে হয়, সে মতবাদ গ্রহণ করিতে স্বতঃই আমরা দ্বিধা বোধ করি।

II. Evolution (Repetitive)

সৃষ্টিবাদের প্রধান ত্রুটি এই যে, ইহাতে সৃষ্ট বস্তুর বিকাশ বা ক্রমোন্নতির কোন অবকাশ নাই। কোটি কোটি বৎসর পূর্বে ঈশ্বর যে সূর্যচন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহারা আজও আকাশে ঠিক সেইরূপ ভাবেই বিরাজ করিতেছে। তিনি যাহা সৃষ্টি করেন তাহা পূর্ণাঙ্গরূপেই সৃষ্টি করেন; কোন জিনিষই তিনি অসম্পূর্ণভাবে সৃষ্টি করেন না; তাই উহার ক্রমোন্নতি বা ক্রম বিকাশের প্রয়োজন হয় না। আজ আমরা যেসব গাছপালা বা জীবজন্তু দেখিতেছি—সে সব ঈশ্বরই সৃষ্টি করিয়াছেন, তাই তাহারা আগে যেমন ছিল আজও ঠিক সেইরূপ ভাবেই আছে; ভগবানের কাজের উপর কাহারো কারসাজি নাই। সেইরূপ লক্ষ লক্ষ বৎসর আগে তিনি যেরূপ মন ও দেহ সমন্বিত মানুষ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, আজও তাহারা সেইরূপ দেহ ও মন লইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে। অর্থাৎ মানব দেহের বা মানব আত্মার কোনরূপ পরিবর্তন হয় নাই; সৃষ্টির সময়ে যেমন ছিল এখনও ঠিক সেইরূপ আছে; উহাদের কোনরূপ বিবর্তন হয় না।

বিবর্তনবাদিগণ ইহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন বর্তমানকালে আমরা যাহা যেমন দেখিতেছি পূর্বতনকালে তাহা ঠিক তেমন ছিল না। আমরা আজ যে পৃথিবীতে বাস করিতেছি, কোটি কোটি বৎসর আগে ইহার আকার ও গঠন ঠিক এইরূপ ছিল না। তখন সূর্যের তেজ খুব প্রচণ্ড ছিল এবং ফলে পৃথিবী এত উত্তপ্ত ছিল যে কোন প্রাণীই তখন এখানে বাস করিতে পারিত না। তারপরে নানাকারণে ধীরে ধীরে ইহা শীতল হইতে লাগিল এবং উপযুক্ত বায়ু ও জলের আবির্ভাবে প্রাণীরও উদ্ভব হইতে লাগিল। বলা বাহুল্য, তখন যেসব জীবজন্তুর উদ্ভব হইয়াছিল তাহারা ঠিক বর্তমানকালের জীবজন্তুর ন্যায় ছিল না। ভূগর্ভে আজকাল তাহাদের যেসব নমুনা ও কংকাল পাওয়া যাইতেছে তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে প্রাগ্ ঐতিহাসিক যুগের সেই সব জীবজন্তুর সহিত বর্তমানকালের জীবজন্তুর বিশেষ কোন সাদৃশ্য নাই। এইসব তথ্য সংগ্রহ করিয়া আধুনিক পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে চূড়ান্ত সৃষ্টি বলিয়া কোন জিনিস নাই। আদিতে যে সূর্য চন্দ্র ছিল তাহা বর্তমানকালের সূর্য-চন্দ্রের ন্যায় নহে; তবে সেই আদিযুগের সূর্য-চন্দ্রই নানাভাবে পরিবাতত হইয়া বর্তমান রূপ গ্রহণ করিয়াছে।

সেইরূপ, আদিকালের জীবজন্তু হইতেই বর্তমানকালের জীবজন্তুর উদ্ভব হইয়াছে; নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া রূপান্তরিত হইয়া বর্তমানকালের জীবজন্তুতে পরিণত হইয়াছে। মানুষের সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা প্রয়োজ্য।

হঠাৎ কোন পূর্ণাঙ্গ মানুষের সৃষ্টি হয় নাই; বর্তমান যুগে যেরূপ দেহ ও মন সমন্বিত মানুষ দেখা যাইতেছে, প্রাগ্‌-ঐতিহাসিক যুগেও ঠিক সেইরূপ দেহ ও মন সমন্বিত মানুষ ছিল না; আদিতে যেরূপ মানুষ ছিল তাহা ঠিক বর্তমানযুগের মানুষের মতন নহে। তবে সেই আদি যুগের বর্বর মানুষই বিবর্তিত হইয়া বর্তমান যুগের সভ্য মানুষের রূপ গ্রহণ করিয়াছে। আবার সেই বর্বর মানুষও এই পৃথিবীতে হঠাৎ আবির্ভূত হয় নাই; সেও পূর্বতন জীব হইতে বিবর্তিত হইয়া বর্বর মানুষরূপে আবির্ভূত হইয়াছিল। তাই বিবর্তন-বাদিগণ বলেন যে "হঠাৎ সৃষ্টি" বলিয়া কোন জিনিস নাই। মানুষও হঠাৎ মানুষরূপে আরম্ভ হয় নাই। Darwin মনে করেন যে লক্ষ লক্ষ বৎসর আগে আমাদের পূর্বপুরুষের আকার ঠিক মানুষের মত ছিল না, বানরের মতন ছিল। সেই বানর-আকার মানুষই বিবর্তিত হইয়া আজ বর্তমান আকার গ্রহণ করিয়াছে। বলা বাহুল্য, শারীরিক আকারের সঙ্গে সঙ্গে তাহার মানসিক শক্তিও পরিবর্তিত হইয়া চলিয়াছে। কারণ, বিভিন্ন পারি-পার্শ্বিক অবস্থায় তাহাকে বিভিন্নরূপে প্রতিক্রিয়া করিতে হইয়াছে; ফলে তাহার দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে, তাহার মানসিক প্রবৃত্তিও তেমন পরিবর্তিত রূপ গ্রহণ করিয়াছে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে বিবর্তনবাদিগণের মতে আমাদের মন বা আত্মার হঠাৎ সৃষ্টি হয় নাই। আমাদের পূর্বপুরুষ আদিম মানবের মনই বিবর্তিত হইয়া বর্তমান রূপ গ্রহণ করিয়াছে; আবার সেই আদিম মানবের মনও তাহার পূর্বতন জীবের মন হইতে বিবর্তিত হইয়াছে। এক কথায় পূর্বতন জীবজন্তুর মনই বিবর্তিত হইয়া মানুষের মনে পরিণত হইয়াছে।

সমালোচনা।

আমরা বিবর্তনবাদ অস্বীকার করি না, একটু পরেই তাহা বলিব। কিন্তু বিবর্তনবাদিগণ যখন বলেন যে পূর্বতন জীবজন্তুর মনই বিবর্তিত হইয়া মানুষের মনে রূপান্তরিত হইয়াছে, তখন আমরা আপত্তি না করিয়া পারি না। কারণ, স্মরণ রাখিতে হইবে যে জীবজন্তুর মন এবং মানুষের মন ঠিক একরকমের জিনিস নহে; ইহাদের মধ্যে অনতিক্রমণীয় পার্থক্য বিদ্যমান। মানুষের ন্যায় জীবজন্তুরও চেতনা আছে বটে, কিন্তু মানুষের চেতনার মধ্যে এমন অনেক জিনিষ আছে যাহা পশুদের চেতনার মধ্যে

নাই। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, মানুষের বুদ্ধি বিবেচনা, আত্ম-চেতনা ও ইচ্ছা-স্বাধীনতা আছে; কিন্তু পশুদের এসব জিনিস নাই; অথচ এই সব জিনিসই মানব মনের বৈশিষ্ট্য। (i) বুদ্ধি-বিবেচনা (Reason); আমরা ভাল মন্দ বিচার করিতে পারি, ভবিষ্যতের কথা কল্পনা করিতে পারি এবং অতীতের কথা চিন্তা করিতে পারি। কিন্তু পশুরা তাহা পারে না; তাহারা বর্তমানের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে; অতীত ও ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। (ii) দ্বিতীয়তঃ তাহাদের আত্ম-চেতনা (Self-consciousness) নাই; নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্য কি, তাহা তাহারা জানে না, ফলে কিভাবে আত্মোন্নতি সাধন করা যায় তাহা তাহারা কল্পনা করিতে পারে না। মোট কথা; পশুদের পক্ষে আত্মচিন্তা সম্ভব নহে। কিন্তু মানুষের পক্ষে আত্মচিন্তা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার; তাহার জীবনের উদ্দেশ্য কি, তাহা সে কল্পনা করিতে পারে এবং আত্মোপলব্ধির জন্য চেষ্টাও সে করিতে পারে। (iii) তৃতীয়তঃ মানুষের মনে যে ইচ্ছা স্বাধীনতা (Freedom of Will) আছে, পশুদের মনে তাহা নাই। পশুপক্ষী প্রকৃতির হাতে পুত্তলিকার ন্যায় কাজ করে; ভাবিয়া চিন্তিয়া স্বাধীনভাবে কাজ করিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। কিন্তু মানুষের সে ক্ষমতা আছে, মানুষ নিজের ইচ্ছায় কাজ করে অর্থাৎ সে পরাধীন নহে।

তাই আমরা বলিয়াছি যে পশুদের মন আর মানুষের মন ঠিক একই রকমের জিনিস নহে; ইহাদের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য বিদ্যমান। বিবর্তনবাদিগণও ইহা স্বীকার করেন। এইখানেই বিবর্তনবাদের বিপদ। কারণ, উপরোক্ত বিবর্তনবাদের মূলসূত্র হইতেছে পুনরাবৃত্তি (Repetition), যাহা পূর্বে অব্যক্ত থাকে, তাহাই পরে অভিব্যক্তি লাভ করে; কোন নূতন জিনিসের উদ্ভব হইতে পারে না। সেইজন্য এই বিবর্তনবাদকে ইংরাজীতে Repetitive Evolution নামে অভিহিত করা হয়। বীজের মধ্যে যাহা অব্যক্ত থাকে তাহাই পরে বৃক্ষরূপে ব্যক্ত হয়, এবং ডিমের মধ্যে যাহা প্রচ্ছন্ন থাকে তাহাই পরে ছানারূপে প্রকট হয়। তাই হাঁসের ডিম হইতে হাঁসই আসিতে পারে, মুরগী উৎপন্ন হইতে পারে না। ইহাই বিবর্তনবাদের মর্মকথা; যাহা পূর্বে সুপ্ত বা গুপ্ত থাকে তাহাই পরে স্পষ্টরূপে প্রকটিত হয়; নূতন কিছুর আবির্ভাব হইতে পারে না। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে পশুমন হইতে শুধু পশুমনেরই উদ্ভব হইতে পারে, পশুমন হইতে মানব মনের উদ্ভব হইতে পারে না।

III. Evolution (Emergent)

সৃষ্টিবাদের দ্বারা বা উপরোক্ত বিবর্তনবাদের দ্বারা মনের উন্মেষ ব্যাখ্যা করা গেল না। এখন আমরা তৃতীয় মতবাদ আলোচনা করিব; ইহারও মূলে আছে বিবর্তনবাদ; তবে ইহা পূর্বোক্ত Repetitive Evolution নহে; ইহার নাম Emergent Evolution। আমরা বলিয়াছি যে Repetitive Evolution মতে বিবর্তনের পরিণামে কোন নূতন জিনিষের উদ্ভব হইতে পারে না; কিন্তু Emergent Evolution মতে, নূতন জিনিষের উদ্ভব হওয়া সম্ভব। একটি উদাহরণ দিয়া বুঝান যাউক। ধর, আদিমকালে আমাদের এই পৃথিবীতে Hydrogen, Oxygen, Nitrogen প্রভৃতি অনেক রকমের গ্যাস ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। কিন্তু এইসব গ্যাস থাকিলেই তো বায়ু হয় না। যে বায়ুতে প্রাণী বাস করিতে পারে, সেই বায়ুর মধ্যেও পূর্বোক্ত গ্যাসগুলি আছে বটে, কিন্তু সেগুলি বায়ুতে এমন পরিমাণে মিশ্রিত থাকে যাহাতে প্রাণ ধারণের কোন অসুবিধা হয় না। আমরা মানিয়া লইলাম যে পূর্বোক্ত গ্যাসগুলির ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার পরিণামেই বায়ুর উদ্ভব হইয়াছে; বিষাক্ত গ্যাসগুলি পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং আবশ্যকীয় গ্যাসগুলি বিশিষ্ট পরিমাণে মিশ্রিত হইয়া বায়ুর সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাকে আমরা Repetitive Evolution বলিতে পারি; কারণ এক্ষেত্রে নূতন কিছু সৃষ্ট হইতেছে না; যে বায়ু সৃষ্টি হইতেছে তাহা গ্যাসেরই অনুরূপ। কিন্তু ধর, Hydrogen এবং Oxygen গ্যাস মিলিত হইয়া জল সৃষ্টি করিল, এক্ষেত্রে যাহা সৃষ্ট হইতেছে তাহা গ্যাস দুইটির অনুরূপ নহে; কারণ, গ্যাসের ধর্ম এবং জলের ধর্ম বিভিন্ন; গ্যাস ভাসিয়া বেড়াইতে পারে, জল ভাসিয়া বেড়াইতে পারে না; জলের দ্রবত্ব আছে, গ্যাসের দ্রবত্ব নাই; জল তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারে, গ্যাস তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারে না। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে এক্ষেত্রে গ্যাস হইতে এক নূতন জিনিষের উদ্ভব হইয়াছে। তাই ইহাকে Repetitive Evolution বলা যায় না; ইহার নাম Emergent Evolution। এই Emergent Evolution গ্রহণ করিলে আমাদের পক্ষে মানব মনের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা খুব কঠিন হয় না। কারণ, তখন আমরা অনায়াসে বলিতে পারি যে, পশুমন বিবর্তিত হইতে হইতে এমন এক পর্যায়ে আসিয়া পৌছায় যখন এক সম্পূর্ণ অভিনব জিনিষের উদ্ভব হয়; উহাকে আমরা "মানব মন" বলি।

এইভাবে বিবর্তনবাদের সাহায্যে আমরা মানব মনের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিতে পারি বটে, কিন্তু ব্যাখ্যাকে যুক্তি-যুক্ত করিতে হইলে ঈশ্বরের সাহায্য না লইয়া উপায় নাই। উপরোক্ত উদাহরণটি লওয়া যাউক। Hydrogen এবং Oxygen

মিলিত হইলেই জল হয় না ; ইহাদের পরিমাণ ঠিক হওয়া চাই ; Oxygen-এর পরিমাণ বেশী হইলে চলিবে না, Hydrogen এর পরিমাণ বেশী হওয়া চাই ; আবার Hydrogen-এর পরিমাণ শুধু বেশী হইলেই বলিবে না, এক নির্দিষ্ট পরিমাণে বেশী হওয়া চাই, অর্থাৎ Oxygen অপেক্ষা ইহার পরিমাণ ঠিক দ্বিগুণ হওয়া চাই, নতুবা জল হইবে না। শুধু তাহাই নহে ; আরো অনেক রকমের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা চাই, যেমন নির্দিষ্ট তাপ চাই, নির্দিষ্ট চাপ চাই, ইত্যাদি অনেক কিছুই চাই। এখন আমাদের প্রশ্ন এই : এইসব নির্দিষ্ট, পরিমিত এবং উপযুক্ত ব্যবস্থার আয়োজন হয় কি প্রকারে ? একজন মননশীল কর্তা না থাকিলে শুধু কি আকস্মিক ঘটনা প্রবাহেই এইসব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার সমাবেশ হইতে পারে ? মনে রাখিতে হইবে, এক্ষেত্রে Hydrogen-এর সহিত Oxygen গ্যাস "যেমন তেমন" ভাবে মিশ্রিত হইতেছে না। "যেমন তেমন" মিশ্রণ যে আকস্মিকভাবে সংঘটিত হইতে পারে, তাহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু জল নির্মাণের জন্য ইহারা যেভাবে এবং যে পরিমাণে মিশ্রিত হইতেছে—তাহাতে এক পূর্বনির্দিষ্ট পরিকল্পনার (Design ; Purpose) কথা চিন্তা না করিয়া আমরা পারি না। যিনি এই পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং যাঁহার ব্যবস্থাপনায় ইহা পরিচালিত হয়—তাঁহাকে আমরা ঈশ্বর বলি। তাই আমাদের মতানুসারে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব স্বীকার না করিলে Emergent Evolution-কে যুক্তিসঙ্গত ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না।

উদাহরণ ছাড়িয়া এখন আমাদের বক্তব্য বিষয়ে আসা যাউক ; আমাদের বক্তব্য বিষয়—মানব মনের উৎপত্তি। তৎপ্রসঙ্গে আমরা বলিয়াছি যে "পশুমন বিবর্তিত হইতে হইতে এমন এক পর্যায়ে আসিয়া পৌছায় যখন এক সম্পূর্ণ নূতন জিনিষের উদ্ভব হয়, উহাকে আমরা মানব মন বলি"। এখানে আমাদের বক্তব্য এই—যখন মানব মনের উদ্ভব হয়, তখন উহার সহিত অনেক নূতন জিনিসের উদ্ভব হয়, যথা—বুদ্ধি-বিবেচনা, আত্ম-চেতনা এবং ইচ্ছা-স্বাধীনতা। কিন্তু পূর্বে তো এসব কিছুই ছিল না ; এখন তবে আকস্মিকভাবে ইহাদের আবির্ভাব হইল কিরূপে ? কোন পূর্বনির্দিষ্ট পরিকল্পনা না থাকিলে হঠাৎ কি এইসব নূতন জিনিসের আবির্ভাব হইতে পারে ? তাই নূতন জিনিষ দেখিয়া আমরা স্বভাবতঃই খুব আশ্চর্য বোধ করি। কিন্তু ইহারা যদি পূর্ব হইতেই বিদ্যমান থাকিত এবং পরে শুধু রূপান্তর গ্রহণ করিয়া আবির্ভূত হইত, তাহা হইলে আমরা বিশেষ কিছু আশ্চর্য হইতাম না। যেমন দুইমাস ছুটির পরে আসিয়া যখন দেখি যে কলেজ-মাঠের ঘাসগুলি বড় হইয়া জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে, তখন আমরা আশ্চর্য বোধ করি না। কিন্তু যদি দেখি যে জঙ্গলের পরিবর্তে মাঠের মধ্যে একটি সুন্দর ফোয়ারা-ওয়ালা বাগান

রচিত হইয়াছে, তাহা হইলে আমরা আশ্চর্যান্বিত না হইয়া পারি না। তখন আমাদের স্বভাবতঃই প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করে—এইরকম নূতন জিনিষ আসিল কোথা হইতে? কে ইহা রচনা করিলেন এবং কেনই বা তিনি ইহা রচনা করিলেন? তারপর, যে নূতন জিনিষ আমরা দেখিতেছি, উহা কলেজের বাগানই হউক বা মানুষের মনই হউক, কোনটিই "যেমন তেমন" জিনিষ নহে; বাগানটি দেখিতে যেমন সুন্দর, আমাদের মনের রচনা-কৌশলও তেমন খুব সুন্দর। কোন এক মননশীল কর্তার পরিচালনা না থাকিলে হঠাৎ ইহাদের আবির্ভাব হইতেই পারে না। ইহাদের সৃষ্টির মূলে নিশ্চয়ই কোন গূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত আছে। তাই আমরা বলিয়াছি যে Emergent Evolution গ্রহণ করিলেই এক সৃষ্টি কর্তার কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে হয়—যিনি তাঁহার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য পুরাতন পন্থায় না গিয়া এক অভিনব পন্থায় নূতন জিনিষের সৃষ্টি করিতেছেন।

Evolution
(Mechanical & Teleological)

তাহা হইলে দেখা গেল যে Repetitive Evolution-এর দ্বারা আত্মার উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা যায় না। Repetitive Evolution-কে সাধারণতঃ **Mechanical Evolution** নামে অভিহিত করা হয়। কারণ এক্ষেত্রে মনের কোন পরিচালনা নাই; কোনরূপ মানসিক পরিচালনা ব্যতীত ঘড়ির কাঁটা যেমন নিরন্তর আবর্তিত হইয়া চলিয়াছে, তেমন জগৎ সংসারও কোনরূপ মানসিক পরিচালনা ব্যতিরেকে যন্ত্রবৎ বিবর্তিত হইয়া চলিয়াছে। এইরকম বিবর্তনের ফলে প্রথমে হয়ত কীটপতঙ্গের মন উৎপন্ন হইল, তারপরে পশুপক্ষীর মন, পরিশেষে আসিল মানুষের মন। এই ভাবে পরিবর্তন চক্র ঘুরিয়া চলিয়াছে, ইহার জন্য মানসিক নিয়ন্ত্রণ বা ভগবৎ নিয়ন্ত্রণের মোটেই প্রয়োজন হইতেছে না; এক কথায় সবই যন্ত্রবৎ সম্পাদিত হইতেছে, কোনো উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে নহে। উদ্দেশ্য-সিদ্ধিই যদি এই বিবর্তনের লক্ষ্য হইত, তাহা হইলে ইহাকে আর Mechanical Evolution বলা যাইত না; ইহা তখন Teleological Evolution হইয়া যাইত। Teleological Evolution মানে উদ্দেশ্যমূলক বিবর্তন; এই মতানুসারে প্রত্যেক বিবর্তনের মধ্যেই এক ভগবৎ উদ্দেশ্য নিহিত আছে, এবং সেই উদ্দেশ্য সাধন করাই বিবর্তনের লক্ষ্য; এইভাবে বিবর্তনের মধ্য দিয়া ঈশ্বর তাঁহার উদ্দেশ্য সাধন করিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু Mechanical

বিবর্তনের মধ্যে কোনরূপ ভগবৎ উদ্দেশ্য নিহিত নাই ; অর্থাৎ ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণে, ভগবৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ইহা পরিচালিত নহে। ইহা এক লক্ষ্যহীন যান্ত্রিক বিবর্তন মাত্র। তাই এইপ্রকার বিবর্তনকে নিরুদ্দেশ যাত্রার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে ; কোথায় যে এই যাত্রার শেষ হইবে, ইহার লক্ষ্য কি—তাহার কোন নির্দেশ নাই। তাই পশুমন কেন যে বিবর্তিত হইয়া হঠাৎ মানব মনে পরিণত হইল, তাহার কোন নির্দেশ পাওয়া যায় না ; এমন কি মানব মনে পরিণত না হইয়া ইহা যদি অন্য কিছুতে পরিণত হইত, তাহা হইলেও আমাদের আশ্চর্য হইবার কোন কারণ থাকিত না।

মানব মনে পরিণত না হইয়া ইহা অন্য কিছুতে পরিণত হইতে পারিত বটে, তবে যাহাতেই পরিণত হউক না কেন, তাহা পশুমনেরই সমতুল হইত। কারণ আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে পশুমন হইতে পশুমনই উৎপন্ন হইতে পারে, পশু মন হইতে সম্পূর্ণ নূতন ধরণের মানব মন উৎপন্ন হইতে পারে না। নূতনের উৎপত্তি (Emergent Evolution) ব্যাখ্যা করিতে হইলে আমাদিগকে ঈশ্বরের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। তাই আমাদের মতানুসারে পশুমন বিবর্তিত হইতে হইতে এমন এক পর্য্যায়ে আসিয়া পৌঁছায়, যখন আর যান্ত্রিক ক্রিয়ায় কোন ফল হয় না ; তখন ঈশ্বরের অবদান একেবারে অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে ; কারণ ঈশ্বর ছাড়া আর কে নূতন জিনিষ সৃষ্টি করিতে পারেন ? তাই বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঐশ্বরিক শক্তিরও প্রয়োজনীয়তা স্বীকার না করিয়া আমরা পারি না। ইহাকে তখন আর উদ্দেশ্যহীন যান্ত্রিক আবর্তন বলিয়া বর্ণনা করা যায় না ; ইহাকে তখন ঈশ্বরেরই এক উদ্দেশ্যমূলক অভিযান বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তাই ইংরাজীতে ইহাকে **Teleological Evolution** বলা হয়।

Teleology
(External & Internal)

তাহা হইলে দেখা গেল যে ভগবৎ উদ্দেশ্য লইয়াই Mechanical এবং Teleological মতবাদের প্রধান পার্থক্য। Mechanical মতবাদে ঈশ্বরের কোন স্থান নাই ; এবং যেহেতু ঈশ্বর নাই, সেইহেতু সৃজনেরও কোন অবকাশ নাই ; এক্ষেত্রে আছে শুধু যান্ত্রিক বিবর্তন। এই বিবর্তন আপনা আপনিই চলিতেছে ; ইহার মধ্যে ভগবৎ উদ্দেশ্য বলিয়া কিছুই নাই। ভগবৎ উদ্দেশ্য আছে Teleological মতবাদে ; এই মতানুসারে ঈশ্বর আছেন এবং তিনিই তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিশ্বসংসার সৃষ্টি করিতেছেন ; তবে তিনি শুধু সৃষ্টিই করেন

না, যাহা সৃষ্টি করেন তাহার ক্রমবিবর্তনও যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন। এক কথায় Mechanical মতবাদে বিবর্তন আছে, কিন্তু সৃজন নাই; আর Teleological মতবাদে সৃজন এবং বিবর্তন দুই-ই আছে। তবে সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলা দরকার যে সৃজন বা সৃষ্টি বলিতে আমরা এখানে যাহা সূচনা করিতেছি তাহা একটু অন্যরকমের; প্রবন্ধের প্রারম্ভে সৃষ্টিবাদ (Special Creation) প্রসঙ্গে আমরা ইহার যে সাধারণ ব্যাখ্যা দিয়াছি, ঠিক সেইরকমের নহে। সাধারণ মতে, সৃষ্টি একটি সাময়িক এবং আকস্মিক ঘটনা মাত্র, হঠাৎ একদিন কোনো এক শুভ মুহূর্তে ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি আরম্ভ করেন; তারপরে সৃষ্টি শেষ হইয়া গেলে তাঁহার কাজও শেষ হইয়া যায়। এক্ষেত্রে ক্রম-বিবর্তনের কোন অবকাশ নাই। কিন্তু আমাদের মতে সৃজন ও বিবর্তন—দুই-ই সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে। কারণ সৃষ্টির পরেই যদি ঈশ্বরের সম্পর্ক শেষ হইয়া যায়, তাহা হইলে ঈশ্বর ও তাঁহার সৃষ্ট জগৎ—ইহাদের মধ্যে কোনপ্রকার আভ্যন্তরীণ সম্বন্ধ থাকিতে পারে না; ইহাদের সম্বন্ধ নিতান্তই বাহ্য সম্বন্ধ হইয়া যায়। কথাটি ভাল করিয়া বুঝান যাউক। সাধারণ মতানুসারে, ঈশ্বর ও তাঁহার সৃষ্ট জগৎ—দুই-ই সম্পূর্ণ পৃথক এবং স্বতন্ত্র; অর্থাৎ ঈশ্বরের যেমন এক নিজস্ব স্বতন্ত্র সত্তা আছে, তেমন এই জগতেরও এক নিজস্ব স্বতন্ত্র সত্তা আছে। সাধারণ ভাষায় বলা যায় যে একদিকে আছেন ঈশ্বর আর অন্যদিকে আছে জগৎ; তাই ইহাদের সম্বন্ধ নিতান্তই বাহ্য সম্বন্ধ। যেমন ইঞ্জিনিয়ার এবং তাঁহার নির্মিত ইঞ্জিন; ইঞ্জিনিয়ার নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ইহা নির্মাণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাই বলিয়া ইঞ্জিনেরও এক স্বতন্ত্র সত্তা অস্বীকার করা যায় না; সেইজন্য দেখি, অবস্থা বিপাকে এই ইঞ্জিনের দ্বারাই ইঞ্জিনিয়ার হত হইতে পারেন। ইহার কারণ, ইঞ্জিনিয়ারের যে উদ্দেশ্য ইহার মধ্যে ক্রিয়া করিতেছে তাহা ইহার নিজস্ব আভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্য নহে; উহা বাহির হইতে জোর করিয়া অনুপ্রবিষ্ট করা হইয়াছে। সেইরূপ ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে বটে এবং তাঁহার উদ্দেশ্যই ইহার মধ্যে ক্রিয়া করিতেছে সত্য, কিন্তু এই উদ্দেশ্য ইহার নিজস্ব উদ্দেশ্য নহে, ইহা ভগবৎ উদ্দেশ্য (অর্থাৎ পরকীয় উদ্দেশ্য), বাহির হইতে ইহার মধ্যে সঞ্চারিত করা হইয়াছে। তাই ইহাকে External Teleology বলে। বলা বাহুল্য, সৃষ্টিবাদের এই সাধারণ অর্থ আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। আমাদের মতানুসারে ঈশ্বর ও তাঁহার সৃষ্ট জগতের সম্বন্ধ মোটেই বাহ্য সম্বন্ধ নহে, ইহা আভ্যন্তরীণ সম্বন্ধ। ঈশ্বর বাহির হইতে ক্রিয়া করিতেছেন না, জগৎ-সংসারের অভ্যন্তরে থাকিয়াই তিনি ইহার উদ্ভাবন ও পরিচালন করিতেছেন। এই বিশ্ব-জগৎ ঈশ্বরেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র; ঈশ্বরের সত্তাতেই ইহার সত্তা; তাঁহাকে

বাদ দিলে জগতের কোন সত্তাই থাকে না। অতএব ভগবৎ উদ্দেশ্য বাদ দিলে বিশ্ব সংসারের নিজস্ব কোন পৃথক উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না; বস্তুতঃ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য, এবং সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ করাই ইহার একমাত্র সার্থকতা। সেইজন্য আমরা বলিতে পারি যে, বিশ্বসংসারের মাধ্যমে যে ভগবৎ উদ্দেশ্য পূর্ণ হইতেছে, উহা পরকীয় উদ্দেশ্য নহে, বিশ্বেরই নিজস্ব অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য (Internal Teleology); অনন্তকাল ধরিয়া ইহা ধীরে ধীরে বিকশিত হইতেছে।

এইখানেই বিবর্তনবাদের তাৎপর্য্য। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি বিশ্বের কোন জিনিসই হঠাৎ পূর্ণাঙ্গভাবে রচিত হয় না; প্রথমে অপূর্ণ থাকে, পরে ধীরে ধীরে বিবর্তিত হইয়া পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। এই প্রকার বিবর্তনের ফলে সময় সময় এমন অবস্থার উদ্ভব হয়, যখন দেখি পূর্ব জিনিষের পুনরাবৃত্তি না হইয়া এক অভিনব জিনিষের উৎপত্তি হয়। যেমন Emergent Evolution প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি যে পশুমন বিবর্তিত হইতে হইতে এমন এক পর্য্যায়ে আসিয়া পৌছিল, যখন ইহা হইতে আর পশুমন উৎপন্ন হইল না, মানব মনের উদ্ভব হইল। কিন্তু কেন এইরূপ হইল? কেন এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হইল যে পরিস্থিতিতে মানব মনের আবির্ভাব না হইয়া পারিল না? আমাদের মতানুসারে কোন ঘটনাই অকারণ সংঘটিত হইতে পারে না; প্রত্যেক ঘটনারই যথাযথ কারণ আছে। অতএব যে পরিস্থিতিতে মানব মনের সৃষ্টি হইল, তাহাও অকারণ সংঘটিত হয় নাই; নিশ্চয়ই কোন গূঢ় কারণ ছিল; উহাকেই আমরা বিশ্বের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য (Internal Teleology) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই পশুমন ধীরে ধীরে এমন পর্য্যায়ে আসিয়া উপনীত হইল যখন উহা হইতে মানব মনের উদ্ভব না হইয়া পারিল না। সমস্ত বিবর্তনের মধ্য দিয়া এই উদ্দেশ্য কার্য করিয়া চলিয়াছিল; অবশেষে ইহা যখন উপযুক্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি করিতে পারিল তখন সিদ্ধিলাভের পথে আর কোন বিঘ্নই রহিল না; পশুমন ভেদ করিয়া মানব মনের উদ্ভব হইল।

দেহ ও আত্মা

ভারতীয় দর্শনে অনেক স্থলে আত্মাকে দেহী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। দেহকে আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান থাকে, সেইজন্য ইহাকে দেহী বলা হয়। দেহের সহিতই ইহার উৎপত্তি হয়, এবং দেহের বৃদ্ধির সহিতই ইহার বিকাশ ও উন্নতি হইয়া থাকে। বস্তুতঃ দেহের সহিত মনের সম্বন্ধ এত গভীর

ও ঘনিষ্ঠ যে দেহ বাদ দিয়া মনের সম্পর্কে আলোচনা করা সঙ্গত নহে। এইরূপ একটু অসঙ্গত কাজই আমরা এতক্ষণ করিয়াছি; কারণ মনের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছি, অথচ ইহার দৈহিক সম্বন্ধের প্রতি কোনরূপ নির্দেশ প্রদান করি নাই। কিন্তু মন তো দেহ ছাড়া থাকিতে পারে না; অতএব মনের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিতে হইলে ইহার দৈহিক সম্বন্ধের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই তাহা করা উচিত। দেহ, বিশেষতঃ মস্তিষ্কের সহিত ইহার সম্বন্ধ এত নিবিড় যে সাধারণ ভাষায় বলা যায় যে মস্তিষ্কের মধ্যেই মন অধিষ্ঠিত আছে, **মস্তিষ্কই মনের পীঠস্থল**। তাই দেখি মন যখন ক্রিয়া করে তখন মস্তিষ্ককে অবলম্বন করিয়াই ক্রিয়া করে; মস্তিষ্কের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া, অর্থাৎ একেবারে নিরবলম্ব হইয়া ইহা ক্রিয়া করিতে পারে না। মনের উৎপত্তি সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা প্রযোজ্য। মনের যখন উৎপত্তি হয় তখন এক যথাযথ মস্তিষ্ক অবলম্বন করিয়াই ইহার উৎপত্তি হয়; অর্থাৎ মস্তিষ্ক বাদে "শুধু মনের" আবির্ভাব হইতে পারে না। মনের যখন আবির্ভাব হয়, তখন বুঝিতে হইবে ইহার সহিত যথোপযুক্ত কোনো মস্তিষ্কেরও উৎপত্তি হইয়াছে; আবার মস্তিষ্কের যখন উদ্ভব হয় তখন বুঝিতে হইবে ইহার সহিত যথোপযুক্ত কোন মনেরও উৎপত্তি হইয়াছে।

এখন এই দৃষ্টি বিন্দু হইতে, অর্থাৎ মস্তিষ্কের দিক হইতে আমরা এখানে মনের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিব। **প্রথমতঃ Special Creation বা সৃষ্টিবাদ**। সৃষ্টিবাদিগণ বলেন যে মন সৃষ্টির জন্য ঈশ্বরকে উপযুক্ত মস্তিষ্কও সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। পশুপক্ষীর মনের জন্য পশুপক্ষীর মস্তিষ্ক, এবং মানব মনের জন্য মানব মস্তিষ্ক সৃষ্টি হইয়াছে; এবং যখন সৃষ্ট হইয়াছে, তখন একেবারে পূর্ণাঙ্গরূপেই ইহা সৃষ্ট হইয়াছে; ক্রম বিকাশ বা ক্রমোন্নতির কোন অবকাশ নাই। বলা বাহুল্য, আমরা এই মতবাদ গ্রহণ করিতে পারি না। ইতিহাস হইতে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে, বিশ্বের কোন জিনিষই পূর্ণাঙ্গভাবে রচিত হয় নাই; সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া পশু-পক্ষী নর-নারী সবই দেখি ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া ধীরে ধীরে তাহাদের বর্তমান অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে। অর্থাৎ চূড়ান্ত সৃষ্টি বা হঠাৎ সৃষ্টি বলিয়া কোন জিনিস নাই; কোন এক বিশেষ মুহূর্তে ঈশ্বরের কাজ আরম্ভ হয় নাই, আর কোন এক বিশেষ মুহূর্তে উহা শেষও হয় নাই। অনাদিকাল হইতে তাঁহার সৃষ্টি চলিয়াছে এবং অনন্তকাল ধরিয়া চলিবে।

দ্বিতীয়তঃ Repetitive Evolution বা যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ। বিবর্তনবাদিগণ বলেন যে পশু মস্তিষ্ক বা মানব মস্তিষ্ক—কোন জিনিষই পূর্ণাঙ্গভাবে আবির্ভূত হয় নাই; প্রত্যেক জিনিষই প্রথমে সরলরূপে দেখা দেয়, পরে বহু

বিবর্তনের মধ্য দিয়া আসিয়া জটিলরূপ গ্রহণ করে। এইভাবে কীট পতঙ্গের মস্তিষ্কই ধীরে ধীরে পশুপক্ষীর মস্তিষ্কে পরিণত হইয়াছে, এবং পরে পশুপক্ষীর মস্তিষ্ক হইতেই ধীরে ধীরে মানব মস্তিষ্কের আবির্ভাব হইয়াছে। এক্ষেত্রে ঈশ্বরের কোন পরিচালনা নাই; শুধু যান্ত্রিক বিবর্তনের ফলেই নিম্নস্তরের জিনিষ হইতে উচ্চস্তরের জিনিষের উদ্ভব হইতেছে। পূর্বেই বলিয়াছি আমরা এইরূপ যান্ত্রিক বির্বতনবাদ গ্রহণ করিতে পারি না। নিম্নস্তরের জিনিষ হইতে উচ্চস্তরের জিনিষ আসিতে পারে—স্বীকার করি, কিন্তু একেবারে সম্পূর্ণ নূতন জিনিষের উদ্ভব হইতে পারে না। পশুমন এবং মানবমন যেমন সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের জিনিষ, তেমন পশু-মস্তিষ্ক এবং মানব-মস্তিষ্কও সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের বস্তু। তাই আমরা বলি যে পশু মস্তিষ্ক হইতে পশু মস্তিষ্কই উৎপন্ন হইতে পারে, একেবারে অভিনব ধরণের মানব-মস্তিষ্ক উৎপন্ন হইতে পারে না। আমের বীজ হইতে আম গাছেরই উদ্ভব হইতে পারে, জাম গাছের উদ্ভব হইতে পারে না।

এইভাবে শুধু সৃষ্টিবাদ বা শুধু বিবর্তনবাদ পরিহার করিয়া আমরা যে মতবাদ গ্রহণ করিয়াছি—**তাহার নাম Emergent Evolution**; এই মতবাদে আমরা বিবর্তনে বিশ্বাস করি, আবার (একটু ভিন্ন অর্থে) সৃষ্টিবাদও গ্রহণ করি। বিবর্তনে বিশ্বাস করি, কারণ আমাদের মতানুসারে মানব মস্তিষ্ক হঠাৎ একদিন পূর্ণাঙ্গরূপে আবির্ভূত হয় নাই; বহু নিম্নস্তরের মস্তিষ্ক হইতে বিবর্তিত হইয়া অবশেষে মানব মস্তিষ্কের আর্বিভাব হইয়াছে। কিন্তু এইভাবে একেবারে নূতন জিনিষের উদ্ভব সম্ভব নহে। সেইজন্য বিবর্তনবাদের সহিত আমাদিগকে সৃষ্টিবাদও গ্রহণ করিতে হয়; তাই আমরা বলি যে বিবর্তিত হইতে হইতে পশু মস্তিষ্ক একদা এমন পর্য্যায়ে আসিয়া উপস্থিত হয়, যখন শুধু যান্ত্রিক ক্রিয়ায় আর কোন কাজ হয় না। তখন বিশ্ববিবর্তনের মধ্যে যে ভগবৎ উদ্দেশ্য প্রথম হইতেই নিহিত আছে, এবং যে উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য ঈশ্বর এই বিশ্ববিবর্তন পরিচালনা করিতেছেন, তাহা প্রকটিত হইয়া পড়ে এবং ফলে মানব মস্তিষ্কের ন্যায় এক অভিনব জিনিষের উদ্ভব দেখিয়া আমরা আশ্চর্যান্বিত হইয়া পড়ি। কিন্তু আশ্চর্য হইবার বিশেষ কোন হেতু নাই; কারণ বিবর্তনের মধ্যে ঈশ্বরের যে কি উদ্দেশ্য নিহিত আছে, তাহার স্বরূপ এখনও সম্পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত হয় নাই; নানা পর্য্যায়ের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিত হইতেছে মাত্র। অতএব ভবিষ্যতে ইহার যে কি শেষ পরিণতি হইবে,

তাহা আজ নির্ণয় করা সম্ভব নহে। তাই আমাদের মতে, বিবর্তনের ফলে আরো যে কতরকম মস্তিষ্কের উদ্ভব হইতে পারে—তাহার ইয়ত্তা নাই। আজ মানব-মস্তিষ্কের' উদ্ভব হইয়াছে, পরে হয়ত এই মস্তিষ্ক হইতেই একদিন অভিনব দেব-মস্তিষ্কের উদ্ভব হইবে; তখন সঙ্গে সঙ্গে মানব-মনও পরিবর্তিত হইয়া দেব-মনে পরিণত হইয়া যাইবে। আমাদের মতানুসারে যান্ত্রিক বিবর্তনের (Mechanical Evolution) দ্বারা ইহা সংঘটিত হইতে পারে না; ইহার জন্য ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণ (Teleological Evolution) প্রয়োজন—যাহাতে উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া তিনি তাঁহার উদ্দেশ্য অনুযায়ী অভিনব বস্তুর উদ্ভাবন করিতে পারেন (Emergent Evolution)।

তৃতীয় খণ্ড

প্রাণ-তত্ত্ব

নবম অধ্যায়

প্রাণের উৎপত্তি

মনের পরে প্রাণের কথা আলোচনা করা হইবে। যেখানে প্রাণ আছে, সেখানেই মন আছে। মানুষের প্রাণ আছে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনও আছে; পশুপক্ষীর প্রাণ আছে, আবার তাহাদের মনও আছে; গাছপালার প্রাণ আছে, তাই আমরা স্বভাবতঃই অনুমান করি যে তাহাদেরও মন আছে। অবশ্য আমরা বলিতে চাই না যে গাছপালার মন এবং মানুষের মন ঠিক একই রকমের জিনিষ; আমরা যে ভাবে চিন্তা করি তাহারাও ঠিক সেই ভাবেই চিন্তা করে, এইরকম বলিবার কোন সঙ্গত হেতু নাই; তবে তাহাদের মধ্যেও যে চেতনা বা অনুভূতি আছে—তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। সেইরূপ পশুপক্ষীর মধ্যেও মননশীলতা আছে, তাই বলিয়া তাহাদের মননশীলতা যে ঠিক মানুষের মননশীলতার সমতুল—তাহা আমরা স্বীকার করি না; তাই পূর্ব প্রবন্ধে আমরা পশু-মন ও মানব-মনের পার্থক্য ব্যাখ্যা করিয়াছি। মোট কথা, আমাদের বক্তব্য এই যে যেখানে প্রাণের ক্রিয়া আছে, সেখানেই কোন না কোন প্রকারের মননশীলতাও বিদ্যমান আছে।

মনের কথা ছাড়িয়া আমরা এখন প্রাণের কথা আলোচনা করিব। অনেকে বলেন যে প্রাণ বলিয়া কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই। তাঁহাদের মতানুসারে প্রাণের ক্রিয়া যে রকম, একটি যন্ত্রের ক্রিয়াও ঠিক সেই রকমের; ইহাদের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। একটি ঘড়ির কাঁটা নিরন্তর ঘুরিয়া চলিয়াছে এবং যথাযথভাবে সময় নির্দেশ করিতেছে; কিন্তু তাই বলিয়া কেহ কি বলিবে যে ইহার মধ্যে প্রাণ নামে কোন স্বতন্ত্র সত্তা আছে? একটি ইঞ্জিন প্রচণ্ড গতিতে, সশব্দে ছুটিয়া চলিয়াছে; পশুর ন্যায় ইহার চলৎশক্তি আছে, মানুষের ন্যায় ইহা চীৎকার করিতেছে; অর্থাৎ ইহা প্রাণীর ন্যায় আচরণ করিতেছে; তবুও ইহাকে কেহ প্রাণবন্ত বলিয়া মনে করে না। ইঞ্জিনের ক্রিয়া সম্পূর্ণ যান্ত্রিক ক্রিয়া, ইহার মধ্যে কোন প্রাণ নাই। সেইরূপ অনেকে মনে করেন যে পশুপক্ষীর মধ্যে (এমন কি মানুষের মধ্যেও নাকি) কোন প্রাণ নাই; তাহাদের ক্রিয়াও যান্ত্রিক ক্রিয়া মাত্র। ইঞ্জিনের মধ্যে জল ও আগুন দিলে ইঞ্জিন যেমন ক্রিয়া করে, আমাদের পাকস্থলীর মধ্যে খাদ্য দ্রব্য

আসিলে আমরাও সেইরকম ক্রিয়া করি; ইঞ্জিনের নলের মধ্য দিয়া বাষ্প যাতায়াত করে, সেইরূপ আমাদের নার্ভের মধ্য দিয়াও রক্ত চলাচল করে। তাহা হইলে প্রাণের কার্য ও যন্ত্রের কার্যের মধ্যে পার্থক্য রহিল কোথায়? বরং যন্ত্রের কার্যে অনেক সময়ে আমরা এমন সব কলা কৌশল দেখি যাহা প্রাণের কার্যের মধ্যে দেখিতে পাই না। যেমন, যন্ত্রের সাহায্যে আমরা বড় বড় যোগ বিয়োগের অঙ্ক করিতে পারি; কিন্তু শুধু প্রাণের সাহায্যে সেরূপ করা যায় না। এমতাবস্থায় প্রাণকে এক বিশিষ্ট গুণ সম্পন্ন স্বতন্ত্র সত্তা বলিয়া বিবেচনা করিবার কারণ কি? তাই অনেকে বলেন যে প্রাণের ক্রিয়ামাত্রই যান্ত্রিক ক্রিয়া। মানুষের মধ্যে, জীবজন্তুর মধ্যে, গাছপালার মধ্যে, এক কথায় প্রাণবন্ত জীবের মধ্যে যে সব জৈব ক্রিয়া চলিতেছে—সে সমস্তই নাকি যান্ত্রিক ক্রিয়া। যন্ত্রের সহিত তুলনা করিয়াই ইহাদের ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে; ইহার জন্য স্বতন্ত্র প্রাণ-সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করার প্রয়োজন নাই।

উপরোক্ত মতবাদকে ইংরাজীতে 'Mechanistic Theory' বলে। আমরা এই মতবাদ গ্রহণ করি না। আমাদের মতানুসারে প্রাণ ও যন্ত্রের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে; অর্থাৎ প্রাণের ক্রিয়াকে যান্ত্রিক ক্রিয়া বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না; প্রাণেরও এক স্বতন্ত্র সত্তা আছে; ইহাকে Vitalistic Theory বলে। আমাদের এই মতবাদ ব্যাখ্যা করিবার জন্য প্রথমেই প্রাণ ও যন্ত্রের পার্থক্য বিবেচনা করা দরকার।

প্রাণ ও যন্ত্র (Life & Machine)

(১) ঘড়ি একটি যন্ত্রবিশেষ; ইহার সহিত নানা অংশ সংযুক্ত আছে; অর্থাৎ নানা অংশ লইয়া ঘড়িটি গঠিত হইয়াছে। সেইরূপ একটি বৃক্ষও নানা শাখা প্রশাখা লইয়া গঠিত হইয়াছে। এক কথায়, ঘড়ি ও প্রাণী—দুই-ই অংশ সমূহের সমষ্টি। তবুও ইহাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। যেমন, বিভিন্ন অংশ লইয়া ঘড়িটি রচিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহার প্রত্যেকটি অংশই বাহির হইতে সংযুক্ত করা হইয়াছে; ইহার নিজস্ব এমন কোন অন্তর্নিহিত শক্তি নাই যাহার তেজে ইহা নিজেই অংশ সমূহ উদ্গত করিয়া নিজের বৃদ্ধি সাধন করিতে পারে। ইহা সম্পূর্ণ অপরের উপর নির্ভর করে; কারিগর যেমন ভাবে যে অংশ যোগ করিয়া দেন, তাহা লইয়াই ঘড়ি; অর্থাৎ ঘড়ির নিজস্ব কোন অবদান নাই। কিন্তু একটি চারাগাছ যখন ধীরে ধীরে বড় হইতে থাকে তখন বাহির হইতে চাপ দিয়া বা ডাল-পালা লাগাইয়া কেহ ইহার বৃদ্ধিসাধন করে না। ইহার ভিতরে যে অদ্ভুত শক্তি আছে, সেই শক্তি বলেই

ইহার শাখা প্রশাখা নির্গত হইতে থাকে। এক্ষেত্রে ইহার শাখা প্রশাখা বাহির হইতে সংযুক্ত হইতেছে না, ইহারা ভিতর হইতেই উদ্গত হইতেছে। তাহা হইলে দেখা গেল যে প্রাণীর ক্ষেত্রে অংশ আসে ভিতর হইতে, আর যন্ত্রের ক্ষেত্রে অংশ আসে বাহির হইতে।

(২) অংশ সমূহের সমষ্টি লইয়া ঘড়ি; আবার অংশ সমূহের সমষ্টি লইয়াই প্রাণী। তবে ঘড়ি নির্মাণে আগে আসে অংশ, তারপরে আসে সমষ্টি। আগে আমরা স্প্রিং কাঁটা, কাঁচ প্রভৃতি অংশ একত্রিত করি; পরে এই একত্রীকরণের ফলে আসে ঘড়ি। কিন্তু প্রাণীর ক্ষেত্রে দেখি ঠিক ইহার বিপরীত অবস্থা; এক্ষেত্রে আগে আসে সমষ্টি (unity), পরে আসে অংশ সমূহের বিস্তৃতি। যেমন বীজ হইতে আগে আসে গাছ, তারপরে আসে ডাল পালা, ফলফুল প্রভৃতি অংশ। সেইরূপ ডিম হইতে আগে ছানা আসে, তারপরে ইহার চোখ, ডানা এবং অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিস্ফুট হয়। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আগে আসে সমষ্টি বা সমগ্রতা, পরে আসে অংশ সমূহের বিস্তৃতি বা ব্যাপকতা। প্রাণী জীবনে এই সমষ্টির শক্তি এত বেশী যে কোন অংশ যদি এই সমষ্টি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, তবে তাহা সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যায়। যেমন ধর, গাছ হইতে যদি একটি শাখা কাটিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে শাখাটির সমূহ ক্ষতি হয়, উহা শুকাইয়া যায়। কিন্তু যন্ত্রের ক্ষেত্রে দেখি ঠিক ইহার বিপরীত অবস্থা; তাই ঘড়ি হইতে যদি ঘড়ির কাঁটাটি পৃথক করা হয়, তাহা হইলে কাঁটাটির কোনই ক্ষতি হয় না; যেমন ছিল তেমনই রহিয়া যায়। এক্ষেত্রে সমষ্টির কোন অতিরিক্ত শক্তি নাই; কিন্তু প্রাণী-জীবনে সমষ্টির এক অতিরিক্ত শক্তি আছে; সেইজন্য সমষ্টির শক্তি হইতে বঞ্চিত হইলেই ইহার অংশসমূহ নষ্ট হইয়া যায়।

(৩) আর এক কথা। প্রাণীদের আত্মরক্ষা করিবার এমন এক অদ্ভুত শক্তি আছে, যাহা যন্ত্রের মোটেই নাই। ঘড়ির একটি অংশ নষ্ট হইয়া গেলে, ঘড়ি নিজে সেই ক্ষতি একটুও পূরণ করতে পারিবে না; কারিগর যদি মেরামত করিয়া দেয়, তবেই ইহার সংস্কার হইবে, নতুবা যেমন ছিল তেমনই রহিয়া যাইবে। কিন্তু গাছের কোন শাখা যদি ভাঙিয়া যায়, তাহা হইলে আমার কি দেখি? দেখি, গাছ নিজেই নিজের ভগ্ন অংশ পূর্ণ করিয়া লয়, অপরের উপর নির্ভর করে না। এক্ষেত্রে মালী আসিয়া ডাল জোড়া দেয় না, বস্তুতঃ জোড়া দেওয়ার দরকারই হয় না; গাছের নিজের যে অন্তর্নিহিত শক্তি আছে তাহার প্রভাবে আপনা আপনিই আর একটি ডাল বাহির হইয়া আসে এবং ইহার ক্ষতি পূর্ণ হইয়া যায়। শুধু তাহাই

নহে; একটি গাছ হইতে আর একটি গাছ উৎপন্ন হয়; একটি প্রাণী হইতে আর একটি প্রাণীর জন্ম হয়; এইভাবে প্রত্যেক প্রাণীই নিজ নিজ বংশ রক্ষা করিতে পারে। কিন্তু কোন যন্ত্রেরই এই প্রজনন শক্তি নাই; একটি ঘড়ি হইতে অন্য কোন ঘড়ির জন্ম হইতে পারে না।

(৪) প্রত্যেক যন্ত্রের মধ্যে এক উদ্দেশ্য নিহিত আছে। যেমন, ঘড়ি সময় নির্দেশ করে, অতএব সময় নির্দেশ করাই ঘড়ির উদ্দেশ্য; এবং এই উদ্দেশ্যটি যাহাতে ঘড়ি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারে, সেজন্য ইহার মধ্যে যথাযথ ব্যবস্থা করিয়া রাখা হইয়াছে। সেইরূপ প্রত্যেক প্রাণীর জীবনেও কোন এক উদ্দেশ্য নিহিত আছে; যেমন মৌমাছি মৌচাক রচনা করে; মধু সংগ্রহ করাই ইহার জীবনের উদ্দেশ্য। তবুও যন্ত্র ও জীবের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। যন্ত্রের যে উদ্দেশ্য—তাহা উহার স্বকীয় উদ্দেশ্য নহে; তাহা পরকীয় উদ্দেশ্য—বাহির হইতে উহার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করা হইয়াছে। ঘড়ি নিজের উদ্দেশ্যে সময় নির্দেশ করে না; নির্মাতার উদ্দেশ্য অনুযায়ী সময় নির্দেশ করে। কিন্তু মৌমাছি নিজের উদ্দেশ্যে মধু সংগ্রহ করে, পরের উদ্দেশ্যে নহে; ইহা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া কাজ করে, পরের আদেশে নহে। এক কথায় প্রাণীর উদ্দেশ্য আভ্যন্তরীণ, ভিতর হইতে আসে; আর যন্ত্রের উদ্দেশ্য বহিরঙ্গীন, বাহির হইতে আসে।

যন্ত্রবাদ ও প্রাণবাদ (Mechanism & Vitalism)

উপরোক্ত আলোচনার ফলে দেখিলাম যে প্রাণী ও যন্ত্রের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। এক কথায় বলা যায় "A machine is made, but an organism grows"। যন্ত্র আমরা তৈয়ারী করি, কিন্তু প্রাণী আমরা তৈয়ারী করিতে পারি না। প্রাণী জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু যন্ত্রের কোন জন্ম নাই। যন্ত্রের বৃদ্ধি আছে কিন্তু বিকাশ নাই; বৃদ্ধি আছে, কারণ অংশের পর অংশ যোগ দিয়া আমরা যন্ত্র বৃহৎ ও সম্পূর্ণ করিতে পারি; কিন্তু ইহার নিজস্ব কোন অন্তর্নিহিত শক্তি নাই, যাহার প্রভাবে ইহা নিজেই নিজের ভিতর হইতে বিকশিত হইয়া সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারে। এইভাবে সমৃদ্ধি লাভ করিবার শক্তি আছে শুধু প্রাণীর, যন্ত্রের নহে। তাই দেখি গাছ নিজেই নিজের তেজে ভিতর হইতে ফুটিয়া উঠিতেছে এবং ডালপালা ফলফুলে বিকশিত হইয়া বিস্তার লাভ করিতেছে। প্রাণী ও যন্ত্রের মধ্যে এই যে পার্থক্য ইহাকে আমরা প্রকৃতিগত পার্থক্য (Qualitative difference) না বলিয়া পারি না;

ইহারা সম্পূর্ণ পৃথক (different in kind)। এই মতবাদের ইংরাজী নাম Vitalism.

বিরুদ্ধবাদীগণ ইহা স্বীকার করেন না; তাঁহাদের মতের নাম 'Mechanism'। এই মতানুসারে প্রাণ বলিয়া কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই; প্রাণের ক্রিয়া মাত্রই যান্ত্রিক ক্রিয়ার সমতুল। অতএব প্রাণ এবং যন্ত্রের মধ্যে কোন প্রকৃতিগত পার্থক্য নাই, ইহাদের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তাহা পরিমাণগত পার্থক্য (Quantitative difference)। যেমন তাঁহারা বলেন যে প্রাণের ক্রিয়া অত্যন্ত জটিল, কিন্তু সেই অনুপাতে যন্ত্রের ক্রিয়া তত জটিল নহে; অর্থাৎ এই জটিলতার কম বেশী লইয়াই ইহাদের মধ্যে পার্থক্য (different in degree); নতুব অন্য কোনরকম পার্থক্য ইহাদের মধ্যে নাই। সেইজন্য যে পদ্ধতি অনুসারে তাঁহারা যন্ত্রের ক্রিয়া প্রক্রিয়া অনুশীলন করিয়া থাকেন, ঠিক সেই পদ্ধতি অনুসারেই তাঁহারা প্রাণের ক্রিয়া প্রক্রিয়া অনুশীলন করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহারা বলেন, সূর্য ওঠে, বৃষ্টি হয়; জোয়ার, ভাটা, ঋতু পরিবর্তন প্রভৃতি কত কি ঘটনা ঘটে; কিন্তু কৈ? এসব ব্যাখ্যা করিবার জন্য কোনপ্রকার প্রাণসত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করিবার দরকার হয় না; আকর্ষণ, বিকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ প্রভৃতি নৈসর্গিক নিয়মাবলীর দ্বারাই অমরা এইসব ঘটনা সুচারুরূপে ব্যাখ্যা করিয়া থাকি। সেইরূপ, গ্যাস মিশ্রিত হইয়া জল হইতেছে, জল কখন বাষ্প হইতেছে, আর কখনও বা জমিয়া গিয়া বরফে পরিণত হইতেছে, এইরূপ কত রকমের ক্রিয়া প্রক্রিয়া সংঘটিত হইতেছে। এই সকল ক্রিয়া প্রক্রিয়া যদি আমরা রসায়ন ও পদার্থ-বিজ্ঞানের নিয়মাবলীর দ্বারা সুচারুরূপে ব্যাখ্যা করিতে পারি, তবে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস, রক্ত চলাচল, শরীর সঞ্চালন প্রভৃতি জৈব ক্রিয়াসমূহ সেইরূপভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারিব না কেন? বস্তুতঃ জীবন বা প্রাণ মানে তো কোন এক অদ্ভুত রহস্যময় পদার্থ নহে। "Life means what it does" অর্থাৎ জৈব আচরণকেই জীবন বলে; নিঃশ্বাস প্রশ্বাস, রক্ত চলাচল, শরীর সঞ্চালন প্রভৃতি ক্রিয়া-প্রক্রিয়া লইয়াই আমাদের জৈব আচরণ। ইহাদের অনেক ক্রিয়া প্রক্রিয়াই আজকাল ভৌত ও রাসায়নিক (Physical and Chemical) ক্রিয়ারূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে; সেইজন্য আমরা আশা করিতে পারি যে ভবিষ্যতে সমস্ত জৈব ক্রিয়াই পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়নশাস্ত্র দ্বারা সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যা করা যাইবে। অতএব, প্রাণতত্ত্বের ন্যায় কোন অতিরিক্ত তত্ত্ব কল্পনা করার প্রয়োজন নাই; কারণ তথাকথিত প্রাণের ক্রিয়া বা জৈব ক্রিয়ার সহিত অন্যান্য ভৌত রসায়নিক ক্রিয়ার কোনই পার্থক্য নাই।

সেইজন্য যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আমরা এইসব ক্রিয়াকে যান্ত্রিক ক্রিয়ারূপে ব্যাখ্যা করিয়া থাকি, ঠিক সেইপ্রকার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রাণের ক্রিয়াকেও যান্ত্রিক ক্রিয়ারূপে ব্যাখ্যা করাই আমাদের পক্ষে সঙ্গত।

উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, প্রাণের ক্রিয়া ও যন্ত্রের ক্রিয়ার মধ্যে এত গুরুতর পার্থক্য বর্তমান যে ইহাদিগকে সমজাতীয় বলিয়া বর্ণনা করা অসম্ভব। পার্থক্য যে কত গুরুতর—তাহা আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি; সেখানে দেখিয়াছি যে প্রাণের ক্রিয়াকে কিছুতেই যান্ত্রিক ক্রিয়ারূপে ব্যাখ্যা করা যায় না। যাঁহারা প্রাণের ক্রিয়াকে রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞানের দ্বারা ব্যাখ্যা করেন, তাঁহারা শুধু "ক্রিয়াই" ব্যাখ্যা করেন, "প্রাণ" ব্যাখ্যা করেন না। প্রাণের যে বৈশিষ্ট্য আছে, যেমন ইহার ঐক্য-সাধন শক্তি, আত্মরক্ষণ শক্তি এবং প্রজনন শক্তি —অর্থাৎ ইহার অন্তর্নিহিত জৈব শক্তি—উহার কোন ব্যাখ্যাই তাঁহারা দেন না। তাঁহারা শুধু কতকগুলি ক্রিয়া প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করেন, কিন্তু এই সকল ক্রিয়া প্রক্রিয়ার পশ্চাতে যে জৈব উদ্দেশ্য নিহিত আছে—এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অদ্ভুত ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়া যে উদ্দেশ্য ধীরে ধীরে পরিণতি লাভ করিতেছে—সেই অদৃশ্য উদ্দেশ্যের কোন ব্যাখ্যাই তাঁহারা দিতে পারেন না। অথচ এই উদ্দেশ্য-সাধনের প্রচেষ্টাকেই প্রাণ বলা হয়; শুধু কতকগুলি ক্রিয়াকে প্রাণ বলা হয় না। প্রত্যেক জীবের মধ্যে যে সুনির্দিষ্ট দৈহিক ব্যবস্থা (Organisation) আছে, এবং ঐ ব্যবস্থার মাধ্যমে আজীবন যে কর্ম-প্রচেষ্টা চলিতেছে—উহাই তো আসল জিনিষ; উহাকেই আমরা প্রাণ বলি; ক্রিয়া উহার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। তাই আমাদের মতানুসারে, যে উৎস হইতে জল উদ্গত হইতেছে, সেই উৎসের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া শুধু নদীকেই যথাসর্বস্ব মনে করা যেমন অসঙ্গত, প্রাণ-তত্ত্ব বাদ দিয়া শুধু কতকগুলি ক্রিয়াকে "প্রাণ" বলিয়া বর্ণনা করাও তেমন অসঙ্গত।

প্রাণের উৎপত্তি (Origin of Life)

প্রাণের স্বরূপ ব্যাখ্যা করা হইল, এখন আমরা ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এই প্রসঙ্গে সাধারণতঃ দুই প্রকার মতবাদ আলোচনা করা হইয়া থাকে; যথা Abiogenesis Theory এবং Biogenesis Theory; নিম্নে ইহাদের কথা একে একে আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ Abiogenesis Theory। এই মতানুসারে আদিতে যাহা কিছু বিদ্যমান ছিল সবই জড়পদার্থ। প্রাণহীন চেতনাহীন অসংখ্য অণুপরমাণু

সর্বত্র ভাসিয়া বেড়াইতেছিল; কোথাও কোন প্রাণের লক্ষণ ছিল না। এই সকল পরমাণু পরস্পরের উপর ক্রিয়া করিতেছিল; কখন উহারা একত্র মিলিত হইতেছিল, কখনও ভাঙিয়া যাইতেছিল আর কখনও বা অসীম জগতে ছুটিয়া চলিয়াছিল। এই প্রকার মিলন ও ভাঙন, আকর্ষণ ও বিকর্ষণ প্রভৃতি পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে পরমাণু সমূহের আভ্যন্তরীণ গঠন ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইতে লাগিল। শুধু তাহাই নহে; বিবিধ নৈসর্গিক কারণেও ইহাদের মধ্যে নানারূপ আলোড়ন সৃষ্টি হইতে লাগিল; শীতে ইহারা আকুঞ্চিত হইয়া পড়িত, এবং তাপে প্রসারিত হইয়া পড়িত। এই রকম আকুঞ্চন, প্রসারণ, আকর্ষণ বিকর্ষণ প্রভৃতি ক্রিয়ার ফলে পরমাণু সমূহের মধ্যে যে সক্রিয়তা দেখা গেল, তাহাই পরে ধীরে ধীরে প্রাণরূপে প্রকাশ লাভ করিল। যাহা প্রথমে ছিল যান্ত্রিক উত্তেজন মাত্র তাহাই পরিশেষে প্রাণের স্পন্দন রূপে পরিণতি লাভ করিল। এইভাবে পরমাণুর মধ্যে জীবনের আবির্ভাব হইল। নতুবা আদিতে প্রাণ বা জীবন বলিয়া কোথাও কিছু ছিল না। ছিল শুধু অণুপরমাণু; যুগযুগান্তের ক্রিয়ার ফলে ইহারা প্রাণ-সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল; জড়ের মধ্যে জীবন প্রতিষ্ঠিত হইল।

ইহাকে Abiogenesis বলে; অর্থাৎ অপ্রাণ হইতে প্রাণের উৎপত্তি। যাঁহারা এই মতবাদে বিশ্বাস করেন তাঁহারা বলেন যে কেবল অতীত যুগে কেন, বর্তমান কালেও অপ্রাণ হইতে প্রাণের উৎপত্তি হইতে পারে এবং হইয়া থাকে। প্রমাণ স্বরূপ তাঁহারা বলেন যে পুকুর হইতে এক গ্লাস জল আনিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দাও; কয়েকদিন পরে দেখিতে পাইবে গ্লাসের মধ্যে অনেক পোকা ভাসিয়া বেড়াইতেছে। এই পোকা কোথা হইতে আসিল? জলের মধ্যে তো কোন পোকা ছিল না; জল জড় পদার্থ; তৎসত্ত্বেও যখন পোকা আসিয়াছে তখন বুঝিতে হইবে যে অপ্রাণ পদার্থ হইতেই প্রাণের উৎপত্তি হইয়াছে। আর একটি উদাহরণঃ আজ দেখ মাঠে শুধু গোবর পড়িয়া আছে, আর কিছুই নাই; কিন্তু দুইদিন পরে দেখিবে ইহার মধ্যে পোকা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে গোবর হইতেই পোকার উৎপত্তি হইয়াছে। অথচ গোবর জড় পদার্থ, ইহার কোন প্রাণ নাই; তথাপি ইহা হইতেই যখন প্রাণের উদ্ভব হইতেছে, তখন স্বীকার করিতে হইবে যে অপ্রাণ হইতেই প্রাণের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

Biogenesis Theory

ইহার বিপরীত মতবাদের নাম Biogenesis। যাঁহারা এই মতবাদে বিশ্বাস করেন তাহারা বলেন যে প্রাণ হইতেই প্রাণের উৎপত্তি হইতে পারে, অপ্রাণ

হইতে প্রাণের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব নহে। সুপ্রসিদ্ধ মনীষী পাস্তুর (Pasteur) এ বিষয়ে বহু গবেষণা করিয়াছেন ; তিনি পরীক্ষণ সহকারে প্রমাণ করিয়াছেন যে পূর্বে কোন জীবাণু না থাকিলে গ্লাসের জলে কোনপ্রকার পোকার উদ্ভব হইতে পারে না। জল সিদ্ধ করিয়া গ্লাসের মধ্যে ঢাকিয়া রাখ, দেখিবে জলে কোন প্রকার পোকার আবির্ভাব হইবে না। কারণ, সিদ্ধ করাতে জলের মধ্যে যেসব জীবাণু ছিল তাহারা মরিয়া যায়, এবং ভাল করিয়া ঢাকিয়া রাখাতে বাতাস হইতেও কোনপ্রকার জীবাণু আসিতে পারে না ; সেইজন্য বহুদিন পরেও জলের মধ্যে কোন পোকা দেখা যায় না। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে জীবাণুগুলি জীবিত থাকিলেই পোকার উদ্ভব হয়, জীবাণুগুলি জীবিত না থাকিলে পোকার জন্ম হয় না। সেইরূপ, গোবরকে মাঠে পচিতে না দিয়া বায়ুশূন্য কাঁচের গ্লাসে ঢাকিয়া রাখ ; দেখিবে কোনই পোকার উদ্ভব হইবে না। কিন্তু মাঠে পড়িয়া থাকিলেই পোকার উদ্ভব হয় ; কারণ, ইহার আশে পাশে এবং বাতাসে যেসব জীবাণু ঘুরিয়া বেড়ায় তাহারা আসিয়া গোবরের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে, এবং পরে পোকায় পরিণত হয়। তাহা হইলে দেখা গেল যে প্রাণ হইতেই প্রাণের উৎপত্তি হয় ; সেইজন্য যে ক্ষেত্রে পূর্বেই প্রাণের অস্তিত্ব বিনষ্ট করা হইতেছে সে ক্ষেত্রে কোন প্রাণের উদ্ভব হইতেছে না।

এইসকল সাক্ষ্য প্রমাণ দেখিয়া আজকাল অনেক বৈজ্ঞানিকই Biogenesis মতবাদ গ্রহণ করেন। আমরা কিন্তু সম্পূর্ণ দ্বিধাশূন্য চিত্তে এই মতবাদ গ্রহণ করিতে পারি না। কেন করিতে পারি না, তাহাই এখন ব্যাখ্যা করা যাউক। প্রাণ হইতে যে প্রাণের উদ্ভব হইতে পারে, তাহা কেহই অস্বীকার করে না ; বস্তুতঃ সর্বত্রই ইহা ঘটিতেছে এবং সর্বদাই আমরা ইহা দেখিতেছি। কিন্তু উহা তো আসল কথা নহে ; আসল কথা, **প্রথম প্রাণের** উদ্ভব হইল কেমন করিয়া ? একবার এক প্রাণের উৎপত্তি হইয়া গেলে, আর কোনই ভাবনা নাই ; তখন সেই প্রাণ হইতে আর এক প্রাণ—এইভাবে প্রাণের পর প্রাণ উৎপত্তি হইতে পারে ; ইহাতে কোনই মুশ্‌কিল নাই ; মুশ্‌কিল হইতেছে **প্রথম প্রাণের** উৎপত্তি লইয়া। কারণ, **প্রথম প্রাণের** আগে তো কোন প্রাণ ছিল না ; তৎসত্ত্বেও যখন ইহার উদ্ভব হইয়াছে, তখন আমরা কি করিয়া বলিতে পারি যে প্রাণ হইতেই প্রাণের উদ্ভব হইয়া থাকে ? এক্ষেত্রে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে অপ্রাণ হইতেই প্রাণের উৎপত্তি হইয়াছে, প্রাণ হইতে নহে। এমতাবস্থায়

Biogenesis ত্যাগ করিয়া Abiogenesis গ্রহণ করা ছাড়া আর উপায় নাই।

Mechanical Evolution

কিন্তু Abiogenesis গ্রহণ করিলেই যে আমাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান হইয়া যায়—তাহাও নহে। কারণ, উপরে আমরা ইহার যে ব্যাখ্যা দিয়াছি, তাহা পড়িলেই বুঝা যাইবে যে ইহা Mechanical Evolution বা যান্ত্রিক বিবর্তনবাদেরই প্রকারান্তর মাত্র। Mechanical Evolution কি—তাহা পূর্ব অধ্যায়ে যথাস্থানে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এই মতানুসারে আদিকালে প্রাণ বা জীবন বলিয়া কোথাও কিছু ছিল না; ছিল শুধু অণুপরমাণু; যুগযুগান্তের ক্রিয়ার ফলে ইহারা প্রাণ সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে; জড়ের মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এক কথায় লক্ষ লক্ষ বৎসরের বিবর্তনের ফলে জড়শক্তি প্রাণশক্তিতে বিবর্তিত হইয়াছে; এই বিবর্তনের মধ্যে কোথাও কোন ভগবৎ উদ্দেশ্য নিহিত নাই; সবই যন্ত্রবৎ সংঘটিত হইয়াছে। কিন্তু সত্যই যদি ইহাতে ঈশ্বরের পরিচালনা না থাকিত, তাহা হইলে এই জড়শক্তি তো যে কোন শক্তিরূপেই বিবর্তিত হইতে পারিত; কিন্তু তাহা না হইয়া উহা উচ্চতর প্রাণ-শক্তিতে পরিণত হইতে গেল কেন? ইহার কারণ কি? যান্ত্রিক মতবাদে ইহার কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না; বরং আমরা দেখিয়াছি যে, যান্ত্রিক মতানুসারে জড়শক্তি হইতে শুধু জড়শক্তিই উৎপন্ন হইতে পারে; জড়শক্তি ব্যতীত অন্য কোন প্রকার শক্তির উৎপত্তি হওয়া সম্ভব নহে। তাই যান্ত্রিক মতবাদকে ইংরাজীতে Repetitive Evolution বলে; এই মতানুসারে যাহা পূর্বে বিদ্যমান ছিল তাহাই একটু অন্যরূপে পুনরায় আবির্ভূত হয়; কিন্তু উহা হইতে এক সম্পূর্ণ নূতন ধরণের জিনিষ উৎপন্ন হইতে পারে না। এমতাবস্থায় জড় হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী প্রাণের উদ্ভব হইবে কেমন করিয়া?

তাহা হইলে দেখা গেল যে Biogenesis বা Abiogenesis—যে কোন মতবাদই গ্রহণ করি না—উহার দ্বারা আদিম প্রাণ বা প্রথম প্রাণের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা যায় না। আমাদের মতানুসারে এই সমস্যা সমাধানের জন্য ঈশ্বরের সাহায্য গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন উপায় নাই। তবে আমরা দুইভাবে ঈশ্বরের সাহায্য কল্পনা করিতে পারি। (i) ঈশ্বর যেমন জড়বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমন স্বতন্ত্রভাবে প্রাণসত্তাও সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাকে ইংরাজীতে Special Creation বলে। (ii) তিনি স্বতন্ত্রভাবে প্রাণ-সত্তা সৃষ্টি করেন

নাই ; কিন্তু জড়বস্তুকে এমনভাবে বিবর্তিত করিয়াছেন যাহাতে ইহা প্রাণশক্তিতে পরিণত না হইয়া পারে নাই। ইহাকে Teleological Evolution বলে। এখন এই দুইটি মতবাদ একটু সবিশদ ব্যাখ্যা করা যাউক।

(i) Special Creation

অনেকে মনে করেন যে ঈশ্বর যেমন কোন এক শুভ মুহূর্তে জড়বস্তু সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ঠিক তেমন এক শুভ মুহূর্তে প্রাণ-সত্তাও সৃষ্টি করিয়াছিলেন। "Let there be light, and there was light ;" তিনি ইচ্ছা করিলেন, আলোর সৃষ্টি হউক, অমনি পৃথিবীতে আলোর উদ্ভব হইল ; তিনি ইচ্ছা করিলেন জলের সৃষ্টি হউক, অমনি জলের উৎপত্তি হইল। সেইরূপ তিনি ইচ্ছা করিলেন পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব হউক, অমনি প্রাণের উদ্ভব হইল। ইহাকে Special Creation বলে ; ঈশ্বর ইচ্ছাপূর্বক নিজেই প্রাণের সৃষ্টি করিয়াছেন ; যেমন তিনি জল বাতাস সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমন তিনি প্রাণও সৃষ্টি করিয়াছেন। এক্ষেত্রে প্রাণ হইতে প্রাণের সৃষ্টি হয় নাই (Biogenesis), বা অপ্রাণ হইতেও প্রাণের সৃষ্টি হয় নাই (Abiogenesis) ; এক্ষেত্রে ঈশ্বর হইতেই প্রাণের সৃষ্টি হইয়াছে।

সমালোচনা। এই ব্যাখ্যা খুবই সহজ এবং সরল ব্যাখ্যা বটে, কিন্তু খুব সহজে গ্রহণ করা যায় না। ভগবৎ-তত্ত্ব প্রসঙ্গে আমরা ইহার কথা আলোচনা করিয়াছি। এই মতানুসারে ঈশ্বর **এক** এবং **অদ্বিতীয়**। তিনি অনাদিকাল হইতে একাকী বিরাজ করিতেছিলেন; তখন আর কিছুই ছিল না। একদিন তাঁহার হঠাৎ ইচ্ছা হইল তিনি এক বিশ্বসংসার সৃষ্টি করেন ; তখন তাঁহার ইচ্ছা হইতেই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব হইল ; এইভাবে যেমন জড়পদার্থ সৃষ্ট হইল তেমন প্রাণ-সত্তারও সৃষ্টি হইল। এখন আমরা জিজ্ঞাসা করি—তিনি তো একাকী ভালই ছিলেন, তবে হঠাৎ এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিতে গেলেন কেন ? প্রাণ ও মন সৃষ্টি না করিলে কি তাঁহার চলিত না ? তাহা হইলে কি বলিতে হইবে যে যখন তিনি একাকী ছিলেন তখন তিনি পূর্ণ ছিলেন না ? তাঁহার মধ্যে অপূর্ণতা ছিল বলিয়াই কি তিনি এই সব সৃষ্টি করিয়া নিজের পূর্ণতা সাধন করিলেন ? তাহাই যদি হয়, তবে তিনি আরও আগে সৃষ্টি করিলেন না কেন ? বলা বাহুল্য, এ রকম কোন প্রশ্নেরই সমুচিত উত্তর পাওয়া যায় না। আর এক কথা ; ঈশ্বর ইচ্ছা করিয়া হঠাৎ এই দুনিয়া সৃষ্টি করিলেন—যাঁহারা এইরূপ বলেন তাঁহারা হয়তো মনে করেন যে এইভাবে তাঁহারা ঈশ্বরের অনন্ত মহিমা

ব্যাখ্যা করেন। আপাততঃ তাহাই প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাঁহারা ঈশ্বরকে স্বৈরাচারী পুরুষে পরিণত করিয়া ফেলেন। কারণ স্বৈরাচারী বলিয়াই তিনি যখন ইচ্ছা এবং যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করিতে পারেন; কোনই বাধা বিঘ্ন নাই। তাহা হইলে বলিতে হইবে যে ইচ্ছা করিলে তিনি পাপকেও পুণ্য করিতে পারেন, আবার পুণ্যকেও পাপ করিতে পারেন; একই মুহূর্তে তিনি দরজাটিকে খুলিয়াও বন্ধ করিয়া রাখিতে পারেন। কিন্তু উহা কি সম্ভব? ঈশ্বরও নিয়মের অধীন; তিনিও যথানিয়মে কাজ করিয়া থাকেন। অবশ্য বাহির হইতে এসব নিয়ম তাঁহার উপর চাপান হয় নাই; অর্থাৎ তাঁহার জীবনে কোন পরকীয় শাসন নাই। কিন্তু তাই বলিয়া স্বকীয় স্বভাব-নিয়ন্ত্রণও কিছু নাই, তিনি যথেচ্ছাচার করিতে পারেন—ঈশ্বরের সম্বন্ধে এরূপ কল্পনা করা সঙ্গত নহে।

(ii) Teleological Evolution

এই মতানুসারে ঈশ্বর হঠাৎ প্রাণ সৃষ্টি করেন নাই। আদিতে যে সব অনুপরমাণু বিদ্যমান ছিল, উহা হইতেই ধীরে ধীরে প্রাণের উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু কি করিয়া হইয়াছে—একটি উদাহরণ দিয়া তাহা বুঝান যাউক। জলন্ত উনানের উপর জল রাখিলে কিছুক্ষণ পরে এমন অবস্থা হয় যখন জল আর জল থাকে না, বাষ্পে পরিণত হইয়া যায়। এখন আমাদের প্রশ্ন এই: হঠাৎ বাষ্প কোথা হইতে আসিল? আমরা যদি বলি যে জলের মধ্যেই বাষ্প ছিল; তবে ঠিক বলা হয় না; কারণ জল ও বাষ্প একই জিনিষ নহে। আবার যদি বলি যে জলের মধ্যে বাষ্প ছিল না, তবে তাহাও ঠিক বলা হয় না; কারণ জল হইতেই তো বাষ্প আসে, পাথর হইতে আসে না। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে জলের মধ্যে বাষ্প ছিল, অথচ ছিলও না। ইহা দ্ব্যর্থবোধক শব্দ, কিন্তু কঠোর সত্য। জলের মধ্যে বাষ্প ছিল সত্য, কিন্তু যতক্ষণ জল ছিল ততক্ষণ বাষ্প ছিল না; জলের মধ্যে যখন আলোড়ন সৃষ্টি হইল, তখনই বাষ্পের উদ্ভব হইল। প্রাণের উৎপত্তি সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা প্রযোজ্য। জড়ের মধ্যে প্রাণ ছিল না; কিন্তু যুগযুগান্তের বিবর্তনের ফলে জড়ের মধ্যে এমন আলোড়নের সৃষ্টি হইল যখন ইহা হইতে প্রাণ উৎপন্ন না হইয়া পারিল না। তবে জলের ক্ষেত্রে উদ্দীপনা আসিতেছে বাহির হইতে; কিন্তু এক্ষেত্রে উদ্দীপনা বাহির হইতে আসিতেছে না—উদ্দীপনা আসিতেছে ভিতর হইতে। **এই উদ্দীপনাকেই আমরা পূর্ব অধ্যায়ে ভগবৎ উদ্দেশ্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছি।** সমস্ত

বিবর্তনের মধ্যেই এই ভগবৎ উদ্দেশ্য নিহিত আছে। জড় হইতে জীব হইতেছে, জীব হইতে মন হইতেছে—এইভাবে যুগযুগান্ত ধরিয়া বিশ্বজগৎ বিবর্তিত হইয়া চলিয়াছে, কিন্তু কোথাও ইহা যথেচ্ছভাবে বা অনিয়ন্ত্রিতভাবে বিবর্তিত হইতেছে না; সর্বদাই ইহা ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই পরিচালিত হইতেছে। এই বিশ্বসংসারের মাধ্যমে তিনি যে উদ্দেশ্য সাধন করিতে চান—সেই উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রখিয়াই তিনি এই বিশ্ব-বিবর্তন পরিচালিত করিতেছেন। তাই ইহাকে আমরা ঈশ্বরের অভিযান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি; ইহা মোটেই নিরুদ্দেশ যাত্রা নহে; ইহা **উদ্দেশ্যমূলক ক্রিয়া** (Teleological Evolution)। উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যখনই যেরূপ প্রয়োজন হইয়াছে তখনই তদনুযায়ী ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যখন প্রাণ-উৎপত্তির প্রয়োজন হইয়াছে, তখনই জড়ের মধ্যে এক অভিনব আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছে; ফলে জড় হইতে এক অভিনব জিনিষের উদ্ভব হইয়াছে; তাহাকেই আমরা প্রাণ বলি। এই প্রকার উদ্দেশ্যমূলক বিবর্তনকে পূর্ব অধ্যায়ে আমরা Emergent Evolution বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছি।

উপসংহার

প্রাণের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমরা যে বিভিন্ন মতবাদ আলোচনা করিয়াছি, এখানে তাহার এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া এই প্রসঙ্গ উপসংহার করা যাউক।
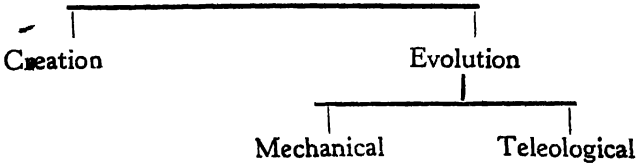
I. সৃষ্টিবাদ (Creation)। এই মতানুসারে ঈশ্বর স্বতন্ত্রভাবে প্রাণ সত্তার সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি যেমন হঠাৎ জড়বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমন হঠাৎ প্রাণও সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব ইহা উদ্দেশ্যমূলক সৃষ্টি—তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু এই উদ্দেশ্য বাহির হইতে আসিয়াছে, ভিতর হইতে আসে নাই; ঈশ্বর বাহির হইতে ইহা আরোপ করিয়াছেন, বিশ্ব-সংসারের অভ্যন্তর হইতে এই উদ্দেশ্য উদ্গত হয় নাই। তাই ইহাকে External teleology বলে, Internal teleology নহে। দ্বিতীয়তঃ, এক্ষেত্রে বিবর্তনের কোন সম্ভাবনা নাই; যাহা কিছু ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন, সবই পূর্ণাঙ্গ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন; ইহাদের ক্রমবিকাশ বা ক্রমোন্নতির কোন

অবকাশ নাই। তাই ইহাকে Creation বলা হয়, ইহাকে Evolution বলা যায় না।

II. যান্ত্রিক বিবর্তন (Mechanical Evolution)

এই মতানুসারে জড় অণুপরমাণু হইতেই প্রাণের উৎপত্তি হইয়াছে। যুগযুগান্ত ধরিয়া যে বিবর্তন চলিয়াছে, উহারই ফলে জড় পরমাণুর মধ্যে প্রাণের উদ্ভব হইয়াছে। এক্ষেত্রে হঠাৎ সৃষ্টি বা পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টি বলিয়া কিছু নাই; আদিকালে যে জড়পরমাণু বিদ্যমান ছিল তাহাই ক্রম বিকশিত হইয়া প্রাণে পরিণত হইয়াছে। তাই ইহাকে বিবর্তন বলে; কিন্তু ইহা যান্ত্রিক বিবর্তন; এক্ষেত্রে ঈশ্বরের কোন স্থান নাই; সবই যন্ত্রবৎ বিবর্তিত হইয়া চলিয়াছে; ভগবৎ পরিচালনার প্রয়োজন নাই।

III. উদ্দেশ্যমূলক বিবর্তন (Teleological Evolution)

এই মতেও হঠাৎ সৃষ্টি বা পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টি বলিয়া কিছু নাই। আদিকালে যে জড় পরমাণু বিদ্যমান ছিল তাহাই ক্রমবিকশিত হইয়া প্রাণে পরিণত হইয়াছে। তাই এই মতবাদকেও বিবর্তন বলা হয়, তবে ইহা যান্ত্রিক বিবর্তন নহে, ইহা উদ্দেশ্যমূলক বিবর্তন। এই বিবর্তনের মধ্যে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য নিহিত আছে। তবে এই উদ্দেশ্য বাহির হইতে আরোপ করা হয় নাই, বিশ্বসংসারের অভ্যন্তর হইতেই ইহা ক্রিয়া করিতেছে; তাই ইহাকে Internal Teleology বলে, External Teleology নহে। এই আভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্যের নিয়ন্ত্রণে যে বিবর্তন পরিচালিত হয়, তাহার ফলে জড়পরমাণু হইতেই ধীরে ধীরে প্রাণের আবির্ভাব হইতে পারে। জড় পরমাণুর মধ্যে এমন এক অবস্থা সৃষ্ট হয়, যখন উহা হইতে প্রাণের অভ্যুদয় না হইয়া পারে না।

ইহাই আমাদের মত। কিন্তু ইহাকে তো Biogenesis বলা যায় না; কারণ Biogenesis মতে প্রাণ হইতেই প্রাণের উৎপত্তি হইতে পারে, অপ্রাণ হইতে নহে। কিন্তু আমরা বলিতেছি যে অবস্থা বিশেষে অপ্রাণ হইতেও প্রাণের উৎপত্তি হইতে পারে; এবং Abiogenesis মতবাদও ঠিক সেই কথাই বলে। তাই বলিয়া আমাদের মতবাদকে কিন্তু Abiogenesis নামেও অভিহিত করা যাইতে পারে না। কারণ, আমাদের মতানুসারে শুধু যান্ত্রিক ক্রিয়া প্রক্রিয়ার ফলেই প্রাণের উৎপত্তি হইতে পারে না; ঈশ্বরের অবদানও থাকা চাই। ভগবৎ উদ্দেশ্য ক্রিয়া করিতেছে বলিয়াই প্রাণের উদ্ভব হইতেছে, নতুবা অপ্রাণ হইতে প্রাণ আসিতে পারে না।

দশম অধ্যায়

প্রাণীর উৎপত্তি (পূর্বাভাষ)

প্রাণের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা হইল, এখন প্রাণীর উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে। মন সম্পর্কে আমরা যাহা বলিয়াছি, প্রাণ সম্পর্কেও ঠিক সেই কথা প্রযোজ্য। মন নিরবলম্ব হইয়া বিরাজ করে না, কোন দেহ (তথা মস্তিষ্ক) আশ্রয় করিয়া বিরাজ করে, অতএব মনের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিতে গেলে, উহার দৈহিক আশ্রয়ের কথাও উল্লেখ করিতে হয়। সেইরূপ প্রাণও নিরবলম্ব হইয়া বিরাজ করে না, পশু-পক্ষী বা মানুষকে অবলম্বন করিয়া ক্রিয়া করে। অতএব প্রাণের উৎপত্তি আলোচনা করিতে হইলে প্রকারান্তরে প্রাণীর উৎপত্তিই আলোচনা করিতে হয়। প্রাণের যখন উৎপত্তি হয়, তখন এক যথাযথ প্রাণী বা জীবকে অবলম্বন করিয়াই ইহার উৎপত্তি হয়; অর্থাৎ প্রাণী বাদে শুধু প্রাণের উদ্ভব হইতে পারে না। অতএব প্রাণের যখন আবির্ভাব হয় তখন বুঝিতে হইবে কোন যথোপযুক্ত প্রাণীর মধ্যেই ইহা আবির্ভূত হয়। সেইজন্য আমরা এখানে বিভিন্ন প্রাণীর উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিব; বিভিন্ন প্রাণী, যথা সিংহ, ব্যাঘ্র, কাক, কাকাতুয়া, বানর, মানুষ প্রভৃতি। ইহাদিগকে পারিভাষিক সংজ্ঞায় প্রজাতি (Species) বলা হয়।

প্রজাতি উৎপত্তি প্রসঙ্গে সাধারণতঃ তিন প্রকার মতবাদ আছে; যথা Creation, Mechanical Evolution এবং Teleological Evolution। আমরা একে একে ইহাদের কথা আলোচনা করিব।

(1) Creation

অনেকে মনে করেন যে কোন এক শুভ মুহূর্তে ঈশ্বর নানাবিধ জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন। এইভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছায় সিংহ ব্যাঘ্র, হরিণ শৃগাল, কাক কাকাতুয়া, বানর মানুষ প্রভৃতি সমস্ত জীবই সৃষ্ট হইয়াছে। "Let there be light and there was light" তিনি ইচ্ছা করিলেন আলোর সৃষ্টি হউক, অমনি পৃথিবীতে আলোর উদ্ভব হইল; তিনি ইচ্ছা করিলেন জলের সৃষ্টি হউক, অমনি জলের উৎপত্তি হইল। সেইরূপ তিনি ইচ্ছা করিলেন পৃথিবীতে সিংহ, ব্যাঘ্র, কাক কাকাতুয়া, বানর, মানুষ প্রভৃতি জীবের উদ্ভব হউক, অমনি এই সকল জীবের আবির্ভাব হইল। ইহাকে ইংরাজীতে Special Creation বলে। ঈশ্বর ইচ্ছা পূর্বক এইসব জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন; যেমন তিনি জল, বাতাস সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমন তিনি বিভিন্ন জীবও সৃষ্টি করিয়াছেন।

সমালোচনা। ভগবৎ-তত্ত্ব প্রসঙ্গে আমরা এই মতবাদের কথা আলোচনা করিয়াছি। *এই মতানুসারে অনাদিকাল হইতে ঈশ্বর একাকীই বিরাজ* করিতেছিলেন; কিন্তু হঠাৎ তাঁহার একদিন ইচ্ছা হইল তিনি বিশ্বসংসার সৃষ্টি করেন; তখন তাঁহার ইচ্ছা হইতেই বিভিন্ন জীবজন্তুর উদ্ভব হইল। তাহা হইলে আমরা জিজ্ঞাসা করি—ঈশ্বর তো একাকী ভালই ছিলেন, তবে হঠাৎ এই বিশ্বসংসার সৃষ্টি করিতে গেলেন কেন? তবে কি বলিতে হইবে যে যখন তিনি একাকী ছিলেন তখন তিনি পূর্ণ ছিলেন না? তাই এইসব সৃষ্টি করিয়া তিনি নিজের পূর্ণতা সাধন করিলেন? তাহাই যদি হয়, তবে তিনি আরও আগে সৃষ্টি করিলেন না কেন? বলা বাহুল্য, এরকম কোন প্রশ্নেরই সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ ঈশ্বর ইচ্ছা করিয়া হঠাৎ এই সংসার সৃষ্টি করিলেন, যাঁহারা এইরূপ মনে করেন তাঁহারা ঈশ্বরকে অত্যন্তই সীমায়িত করিয়া দেখেন। কারণ, সৃষ্টির পরে সত্যই তিনি সসীম হইয়া পড়েন; একদিকে থাকেন ঈশ্বর স্বয়ং আর অন্যদিকে থাকে তাঁহার সৃষ্ট বিশ্বজগৎ; দুই-ই স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। এক্ষেত্রে ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহার পাশে আর একটি জিনিষ থাকে, যাহা ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াও বস্তুতঃ ঈশ্বরকেই আবার সীমায়িত করিয়া ফেলে। তৃতীয়তঃ, তিনি শুধু সীমায়িত হন না, এই মতবাদে তিনি এক স্বৈরাচারী পুরুষে পরিণত হন। স্বৈরাচারী, কারণ এই মতানুসারে তিনি যখন ইচ্ছা এবং যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করিতে পারেন, কোন বাধা নিষেধ নাই। কিন্তু উহা কি সম্ভব? ঈশ্বরও নিয়মের অধীন; তিনিও যথা নিয়মে কাজ করিয়া থাকেন। অবশ্য বাহির হইতে এসব নিয়ম তাঁহার উপরে চাপান হয় নাই; অর্থাৎ তাঁহার জীবনে কোন পরকীয় শাসন নাই। কিন্তু তাই বলিয়া স্বকীয় স্বভাব-নিয়ন্ত্রণও তাহার জীবনে কিছু নাই—তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন, পাপকে পুণ্য এবং পুণ্যকে পাপ করিতে পারেন—ঈশ্বরের সম্বন্ধে এইরূপ কল্পনা করিলে ঈশ্বরকে মহৎ করা হয় না; তাঁহাকে ক্ষুদ্রই করা হয়।

(II) Mechanical Evolution.

সৃষ্টিবাদের প্রধান ত্রুটি এই যে, ইহাতে সৃষ্ট বস্তুর বিকাশ বা ক্রমোন্নতির কোন অবকাশ নাই। কোটি কোটি বৎসর পূর্বে ঈশ্বর যে সূর্য-চন্দ্র গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহারা আজও আকাশে ঠিক সেইরূপ ভাবেই বিরাজ করিতেছে। তিনি যাহা সৃষ্টি করেন তাহা পূর্ণাঙ্গরূপেই সৃষ্টি করেন। কোন জিনিসই তিনি অসম্পূর্ণভাবে সৃষ্টি করেন না, তাই উহার ক্রমোন্নতি

বা ক্রমবিকাশের প্রয়োজন হয় না। লক্ষ লক্ষ বৎসর আগে তিনি যেরূপ জীবজন্তু সৃষ্টি করিয়াছিলেন, আজও তাহারা সেইরূপ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ লইয়া জন্ম গ্রহণ করিতেছে; তাঁহার কাজের উপর আর কাহারও কারসাজি চলে না। বিবর্তনবাদিগণ ইহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন বর্তমানকালে আমরা যাহা যেমন দেখিতেছি পূর্বতনকালে তাহা ঠিক তেমন ছিল না। আমরা আজ যে পৃথিবীতে বাস করিতেছি, কোটি কোটি বৎসর আগে ইহার আকার ও গঠন ঠিক এইরূপ ছিল না। তখন সূর্যের তেজ খুব প্রচণ্ড ছিল এবং ফলে পৃথিবী এত উত্তপ্ত ছিল যে কোন প্রাণীই তখন এখানে বাস করিতে পারিত না। তারপর নানা কারণে ধীরে ধীরে ইহা শীতল হইতে লাগিল এবং উপযুক্ত বায়ু ও জলের আবির্ভাবে প্রাণীরও উদ্ভব হইতে লাগিল। বলা বাহুল্য, তখন যে সব জীবজন্তুর উদ্ভব হইয়াছিল তাহারা ঠিক বর্তমান কালের জীবজন্তুর ন্যায় ছিল না। ভূগর্ভে আজকাল তাহাদের যেসব নমুনা ও কংকাল পাওয়া যাইতেছে তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে প্রাগ্‌ঐতিহাসিক যুগের সেই সব জীবজন্তুর সহিত বর্তমানকালের জীব-জন্তুর বিশেষ কোন সাদৃশ্য নাই। এইসব তথ্য সংগ্রহ করিয়া আধুনিক পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে চূড়ান্ত সৃষ্টি বলিয়া কোন জিনিস নাই। আদিতে যে সূর্যচন্দ্র ছিল তাহা বর্তমান কালের সূর্যচন্দ্রের ন্যায় নহে; তবে সেই আদিযুগের সূর্যচন্দ্রই নানাভাবে পরিবর্তিত হইতে হইতে বর্তমানরূপ গ্রহণ করিয়াছে। সেইরূপ আদিকালের জীবজন্তু হইতেই বর্তমানকালের জীব-জন্তুর উদ্ভব হইয়াছে; নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া রূপান্তরিত হইয়া বর্তমান কালের জীবজন্তুতে পরিণত হইয়াছে। মানুষের সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা প্রযোজ্য। বর্তমান যুগে যেরূপ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমন্বিত মানুষ দেখা যাইতেছে, প্রাগ্‌ঐতিহাসিক যুগেও ঠিক সেইরূপ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমন্বিত মানুষ ছিল না। Darwin মনে করেন যে লক্ষ লক্ষ বৎসর আগে আমাদের পূর্বপুরুষের আকার ঠিক মানুষের মত ছিল না, বানরের মতন ছিল। সেই বানর আকার মানুষই বিবর্তিত হইয়া আজ বর্তমান আকার গ্রহণ করিয়াছে।

এখানে আমাদের এক প্রশ্ন আছে। অনাদিকাল হইতে এই যে বিবর্তন চলিয়াছে—ইহার পশ্চাতে কি কোন মননশীল কর্তার পরিচালনা নাই? ইহা কি আপনা আপনিই বিবর্তিত হইয়া চলিয়াছে, না কোন মননশীলকর্তার নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হইতেছে? ইহার উত্তরে কেহ বলেন যে বিবর্তন ক্রিয়া যন্ত্রবৎ পরিচালিত হইতেছে, ইহার মধ্যে কোন ভগবৎ উদ্দেশ্য নিহিত নাই। আর কেহ

বলেন যে ইহার মধ্যে ভগবৎ উদ্দেশ্য নিহিত আছে, এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ঈশ্বর ইহা পরিচালিত করিতেছেন। প্রথম মতবাদের নাম Mechanical Evolution; আর দ্বিতীয় মতবাদের নাম Teleological Evolution। আমরা দ্বিতীয় মতবাদ গ্রহণ করি; একটু পরেই উহার কথা উত্থাপন করা হইবে। কিন্তু তাহার পূর্বে Mechanical Evolution কি, এবং উহার স্বপক্ষে কি বলিবার আছে—তাহাই এখন আলোচনা করা যাউক। Mechanical Evolution-কে আমরা বাংলায় যান্ত্রিক বিবর্তন বলিতে পারি; এক্ষেত্রে মনের কোন পরিচালনা নাই। কোনরূপ মানসিক পরিচালনা ব্যতীত ঘড়ির কাঁটা যেমন নিরন্তর আবাতত হইয়া চলিয়াছে, ঠিক এই জগৎ-সংসারও তেমন কোনরূপ পরিচালনা ব্যতিরেকে যন্ত্রবৎ বিবর্তিত লইয়া চলিয়াছে। এইরকম বিবর্তনের ফলে প্রথমে হয়ত কীটপতঙ্গ উৎপন্ন হইল, তরপরে সেই কীটপতঙ্গ হইতে পশু-পক্ষীর উদ্ভব হইল, অবশেষে পশু হইতে মানুষের আবির্ভাব হইল। এইভাবে পরিবর্তন-চক্র ঘুরিয়া চলিয়াছে; ইহার জন্য মানসিক নিয়ন্ত্রণ বা ভগবৎ নিয়ন্ত্রনের প্রয়োজন হইতেছে না।

Biological Evolution : (Mechanical)

এই যান্ত্রিক মতবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সমর্থক Darwin এবং Lamarck; এখানে তাঁহাদের মতামত পৃথকভাবে আলোচনা না করিয়া একই সঙ্গে ব্যাখ্যা করা হইবে। তাঁহাদের বক্তব্যের সারমর্ম এই যে, আদিতে সিংহ ব্যাঘ্র, হরিণ শৃগাল বানর মানুষ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রজাতি (species) ছিল না; আদিতে যাহা ছিল তাহাকে এক ক্ষুদ্র কর্দম পিণ্ডের সহিত তুলনা করিয়া প্রাণপিণ্ড বলা যাইতে পারে। ইহার মধ্যে শুধু প্রাণই ছিল; চক্ষু কর্ণ বা হস্ত পদ প্রভৃতি কোন প্রকার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছিল না। সহস্র সহস্র বৎসরের বিবর্তনের ফলে ইহার মধ্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উদ্ভব হইল, অর্থাৎ পশু সদৃশ জীবের আবির্ভাব হইল। কিন্তু বিবর্তনের তো শেষ নাই; সময় বহিয়া চলিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে পশুদেহও বিবর্তিত হইয়া চলিয়াছে। এইভাবে ধীরে ধীরে বিবিধ প্রকারের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উৎপন্ন হইল; ফলে হরিণ শৃগাল প্রভৃতি নানাবিধ প্রজাতির আবির্ভাব হইল। ইহাকে বিবর্তন বলে। এই বিবর্তনের মূল সূত্রগুলি নিম্নে বিবৃত করা হইতেছে।

জীবন সংগ্রাম (Struggle for existence)

জীবের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে তাহাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও ততই প্রবল হইতে থাকে। সকলেই বাঁচিতে চায়, কেহই মরিতে চায় না। কিন্তু সকলের

পক্ষেই বাঁচিয়া থাকা সম্ভব নহে; কারণ, পৃথিবীতে যে খাদ্য দ্রব্য আছে তাহা সকলের পক্ষে যথেষ্ট নহে। বিশেষতঃ যে হারে পশুপক্ষীর বৃদ্ধি হইতে পারে, সে হারে খাদ্য দ্রব্যের বৃদ্ধি হইতে পারে না। একটি মাত্র ব্যাঙ্ই তাহার জীবনকালে বহু সহস্র ডিম প্রসব করিতে পারে; যদি সবগুলি ছানাই বাঁচিয়া থাকে, তবে পৃথিবী তো ব্যাঙেই ভর্তি হইয়া যাইবে; তখন ইহাদের খাদ্য যোগাড় হইবে কেমন করিয়া? সেইরূপ, এক মৌরাণী যে কত লক্ষ মৌমাছির জন্ম দিতে পারে, তাহার ইয়ত্তা নাই, ইহাদের সবগুলিই যদি বাঁচিয়া থাকে, তবে তাহাদের খাদ্য সংকুলান হইতে পারে না। শুধু তো খাদ্যের অভাব নহে; স্থানের অভাব, আশ্রয়ের অভাব, জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সর্ববিধ বস্তুরই অভাব। যেখানে সর্বত্রই অভাব, সেখানে "প্রাণ রাখিতে প্রাণান্তকর" অবস্থার সৃষ্টি না হইয়া পারে না। ফলে জীবজন্তুর মধ্যে প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হইয়া যায়, কে কাহাকে পরাভূত করিয়া নিজের জন্য খাদ্য ও আশ্রয় যোগাড় করিতে পারিবে—তাহা লইয়া পরস্পরের সহিত প্রবল সংগ্রামের সূত্রপাত হয়। বলা বাহুল্য, এই জীবন মরণ সংগ্রামে যাহারা পরাজিত হয়, তাহাদের অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়া যায়; আর যাহারা জয়লাভ করে তাহারাই শুধু বাঁচিয়া থাকিতে পারে। অতএব স্বভাবতঃই আমাদের প্রশ্ন করিতে হয়, যাহারা জয়লাভ করিল, তাহারা জয়লাভ করিল কেন? অন্য সকলে তো পরাজিত হইল; তবে ইহাদের জয়লাভের কারণ কি? ইহার উত্তরে বিবর্তনবাদিগণ যে সূত্রের উল্লেখ করেন তাহার নাম—**দৈহিক পরিবর্তন**।

দৈহিক পরিবর্তন (Bodily Modifications)

তাহারা বলেন যে, যেহেতু দেহ লইয়াই জীবজন্তুকে সংগ্রাম করিতে হয়, সেইহেতু সংগ্রামের ফলে তাহাদের দেহে নানারূপ পরিবর্তন সংঘটিত না হইয়া পারে না। এই পরিবর্তন বা প্রকারণগুলি সব সময়েই যে সংগ্রামের পক্ষে অনুকূল হয়, তাহা নহে; কখন কখন প্রতিকূলও হইয়া থাকে। যাহাদের দেহে এইরূপ প্রতিকূল পরিবর্তন উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাদের পক্ষে জয়লাভ করা সম্ভব নহে; জীবনসংগ্রামে তাহারা পরাভূত হইয়া যায়। আর যাহাদের দৈহিক পরিবর্তন সংগ্রামের পক্ষে অনুকূল হইয়া থাকে, তাহাদের জয়লাভ সুনিশ্চিত হইয়া পড়ে। সংগ্রামের ফলে যে নানারূপ দৈহিক পরিবর্তন সংঘটিত হইয়া থাকে—তাহা সকল বিবর্তনবাদীগণই স্বীকার করেন। কিন্তু কিভাবে এই পরিবর্তন সংঘটিত হয়—সে বিষয়ে তাহাদের মধ্যে

মতৈক্য নাই। এই প্রসঙ্গে প্রথমে লামার্কের (Lamarck) মতবাদ ব্যাখ্যা করা যাউক ; তারপরে ডারউইনের (Darwin) মতবাদ ব্যাখ্যা করা হইবে।

(I) **লামার্কের মতে** বাহ্য পরিবেশের প্রভাবে পশুপক্ষীর দেহে নানাবিধ পরিবর্তনের উদ্ভব হয়। একটি উদাহরণ দিয়া বুঝান যাউক। লামার্ক বলেন যে জিরাফের পূর্বপুরুষ বর্তমান জিরাফের ন্যায় দীর্ঘগ্রীব ছিল না ; হরিণের ন্যায় হ্রস্বগ্রীব ছিল। সেইজন্য তাহাদিগকে পুরাকালে খুবই অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। কারণ, তাহারা গাছের পাতা খাইয়া ক্ষুধা নিবৃত্ত করিত ; কিন্তু অন্যান্য জীবও যদি পাতা খাইয়া যায়, তবে তাহাদের ভাগ্যে তো কিছুই জোটে না। সেইজন্য তাহাদিগকে আরও উঁচু ডালের দিকে লক্ষ্য করিতে হইত। এইভাবে ক্রমাগত উপরের পাতা খাইবার চেষ্টা করাতে তাহাদের গ্রীবা ধীরে ধীরে দীর্ঘ হইতে লাগিল। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে পরিবেশের প্রভাবেই জিরাফের আঙ্গিক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। জাগতিক পরিবেশের সহিত সঙ্গতি রাখিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইয়াছে বলিয়াই তাহার গ্রীবাবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। সেইরূপ, যে সকল জীবজন্তুকে শীতপ্রধান দেশে বাস করিতে হয়, তাহাদের দেহের উপরিভাগ গরম লোমে আবৃত না হইয়া পারে না ; কারণ বাহ্য পরিবেশের সহিত সংগ্রামে জয়ী হইতে হইলে তাহাদের শরীরে এইরূপ প্রকারণ (modification) অপরিহার্যরূপে প্রয়োজন ; নতুবা শীতের প্রকোপে তাহারা জীবন ধারণ করিতে পারিত না।

(II) কিন্তু **ডারউইনের মতে** এইসকল শারীরিক পরিবর্তনের মূল কারণ বাহিরে নাই, ভিতরে আছে। পরিবেশের প্রভাবে আমাদের আঙ্গিক পরিবর্তন ঘটে না, আঙ্গিক পরিবর্তন ঘটে স্বতঃস্ফূর্তভাবে, দেহের অভ্যন্তর হইতে। সেইজন্য Darwin ইহাকে Spontaneous Variation বলেন। তিনি বলেন যে জীবজন্তু যখন সংগ্রামে লিপ্ত থাকে, তখন তাহাদের দেহাভ্যন্তরে স্বতঃই নানারূপ পরিবর্তন সংঘটিত হইতে থাকে। একটি উদাহরণ লওয়া যাউক। ধর, লক্ষ লক্ষ বৎসর আগে প্রাণীদেহে শুধু ত্বকই ছিল ; চক্ষু কর্ণ নাসিকা প্রভৃতি অন্য কোন ইন্দ্রিয় ছিল না ; সেইজন্য তখন ত্বক সংবেদন ব্যতীত অন্য কোনরূপ সংবেদন কেহ পাইত না। কিন্তু বিবর্তনের ফলে কাহারো দেহাভ্যন্তরে হয়ত এমন সব পরিবর্তন ঘটিতে লাগিল যাহার পরিণামে তাহার দেহকাণ্ডে ধীরে ধীরে চোখের উদ্ভব হইল। ইহাতে তাহার যে বিশেষ সুবিধা হইল, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। সে অনায়াসে তাহার অন্ধ প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাভূত করিয়া জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিতে

পারিল। এক্ষেত্রে চোখের আবির্ভাবে তাহার খুবই সুবিধা হইল বটে, কিন্তু Darwin বলেন এই চোখ আবির্ভাবের মূলে পরিবেশের কোন প্রভাব নাই; পশুদেহের অভ্যন্তরে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়—সেই আলোড়নের ফলেই চোখের উদ্ভব হয়। এইভাবে শুধু চোখ কেন, অন্যান্য ইন্দ্রিয়েরও উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। যেমন, বিবর্তনবাদিগণ বলেন যে সময়ের স্রোতে এবং বিবর্তনের ফলে দেহের মধ্যে এমন সব পরিবর্তন হইতে পারে যাহার জন্য দেহের কোন এক অংশবিশেষ প্রবলভাবে আলোড়িত হইয়া ওঠে; তখন উহারই তেজস্কর ক্রিয়ায় সেখান হইতে কানের উদ্ভব হয়। তাই Darwin বলেন যে জীবজন্তুর শরীরে যত কিছু প্রকারণ বা পরিবর্তনের উদ্ভব হইয়াছে—উহার মূলে আছে আভ্যন্তরীণ উত্তেজনা, জাগতিক উদ্দীপনা নহে। এক কথায়, ইহা অন্তরের অবদান, পরিবেশের পরিণাম নহে।

[এই প্রসঙ্গে লামার্ক কি বলেন, তাহাও একটু শোনা যাউক; তাহা হইলে লামার্ক এবং ডারউইনের মধ্যে কি লইয়া মতানৈক্য হইয়াছে—তাহা খুব পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইবে। ডারউইনের ন্যায় লামার্ক আভ্যন্তরীণ আলোড়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন না; তাঁহার মতানুসারে জাগতিক পরিবেশের (Environment) প্রভাবেই জীবজন্তুর দেহে আবশ্যকীয় পরিবর্তন সংঘটিত হইতে পারে। তাই তিনি বলেন যে চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি অঙ্গের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিতে হইলে জাগতিক উদ্দীপনার সাহায্য লইতেই হইবে।] লক্ষ লক্ষ বৎসর আগে প্রাণীদেহে যখন ত্বক ব্যতীত আর কোন অঙ্গই ছিল না, তখন বহির্জগতের যেখান হইতে যে কোন উদ্দীপনা আসিত না কেন, সমস্তই আসিয়া শুধু এই ত্বকের উপর আঘাত করিত। বাতাসের তরঙ্গ, ইথারের কম্পন, ফুলের অণুপরমাণু—কাহারও জন্য কোন স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয় ছিল না; সকলেই আসিয়া ত্বকের উপর ক্রিয়া করিত। সেইজন্য তখন ত্বক-সংবেদন ব্যতীত অন্য কোন সংবেদন পাইতাম না। কিন্তু সময়ের স্রোতে আমাদের এই ত্বকের ক্রমবিবর্তন হইতে লাগিল। ত্বকের যে অংশ বায়ু-তরঙ্গের দ্বারা অধিক পরিমাণে আক্রান্ত হইয়াছিল, বায়ুতরঙ্গ তখন হইতে সর্বদা সেখানেই আঘাত করিতে লাগিল; ইহাতে ধীরে ধীরে সেই অংশটি বায়ুতরঙ্গের পক্ষে অনুকূল অঙ্গে পরিণত হইতে লাগিল। ইহার পর হইতে বায়ুতরঙ্গ আসিয়া শরীরের অন্য কোথাও আক্রমণ করে না; যে অংশটি ইহার আক্রমণের পক্ষে সহজ এবং অনুকূল হইয়া পড়িয়াছে, শুধু সেই অংশেই ইহা পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিতে থাকে। এইভাবে ইহা বায়ুতরঙ্গ

দ্বারা ক্রমশঃ সম্পূর্ণভাবে অধিকৃত হইয়া পড়িল, এবং পরিণামে ইহারই নিজস্ব ইন্দ্রিয়ে পরিণত হইয়া গেল। এইভাবে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। এই মতবাদে বাহিরের উদ্দীপনার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়, অন্তরের উত্তেজনার উপরে নহে।]

এতক্ষণ আমরা বিবর্তনের দুইটি সূত্র আলোচনা করিলাম, যথা—জীবন সংগ্রাম এবং দৈহিক পরিবর্তন। এখন আমরা ইহার তৃতীয় সূত্রের কথা আলোচনা করিব,যথা—বংশানুগতি (Heredity)।

বংশানুগতি (Heredity)

আমরা দেখিলাম যে জীবন সংগ্রামে লিপ্ত থাকাতে জীব-জন্তুর দেহে নানারূপ পরিবর্তন সংঘটিত হয়। তবে যাহার শরীরে এইরূপ পরিবর্তন সংঘটিত হয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু সব কিছু নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যায় না, উহা তাহার উত্তর পুরুষের মধ্যেও সংক্রমিত হইয়া থাকে। তাই পিতামাতা বা বংশের কোন পূর্বপুরুষ বহু পরিশ্রমে যাহা অর্জন করে, তাহা তাহাদের সন্তান বিনা পরিশ্রমে লাভ করিয়া থাকে; কারণ উত্তরাধিকার সূত্রে উহা তাহাদের মধ্যে সংক্রমিত না হইয়া পারে না। এইভাবে বংশ-পরম্পরা বা বংশানুক্রমে যাহার গতি--তাহাকে বংশানুগতি বলে। তাই দেখি পূর্বপুরুষের শরীর বলিষ্ঠ ও পূর্ণাঙ্গ হইলে তাহাদের সন্তান-সন্ততির শরীরও বলিষ্ঠ ও পূর্ণাঙ্গ হইয়া থাকে; আবার পূর্বপুরুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কোন ত্রুটিবিচ্যুতি থাকিলে, তাহাদের দেহেও উহা অনুক্রমিত হয়। উপরোক্ত দৈহিক পরিবর্তন সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা প্রযোজ্য। পূর্বপুরুষের দৈহিক পরিবর্তন প্রথমে তাহার সন্তানের মধ্যে অনুক্রমিত হয়; পরে সন্তানের নিকট হইতে উহা আরও অধঃস্তন পুরুষের মধ্যে সংক্রমিত হয়। এইভাবে বংশানুক্রমে চলিতে চলিতে পরিবর্তন এতই গুরুতর রূপ পরিগ্রহ করে যে তখন আর সেই পরিবর্তিত জীবকে পূর্ব পুরুষের সমজাতীয় জীব বলিয়া মনে হয় না, তাই ইহাকে তখন এক ভিন্ন প্রজাতি (Species) বলিয়া অভিহিত করা হয়। এইভাবে প্রজাতির উৎপত্তি হইয়া থাকে।

এখন এই প্রসঙ্গের উপসংহার করা যাউক। বিবর্তনবাদিগণ বলেন যে প্রজাতি উৎপত্তির মূলে আছে জীবন-সংগ্রাম। সর্বদাই সংগ্রামে লিপ্ত থাকিতে হয় বলিয়া জীবজন্তুর দেহে নানাবিধ পরিবর্তন সংঘটিত হয়। এই সকল পরিবর্তন শুধু তাহাদের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে না, তাহাদের সন্তান সন্ততির মধ্যেও সংক্রমিত হইয়া পড়ে। তবে এই পরিবর্তনগুলি সব সময়েই যে সংগ্রামের পক্ষে অনুকূল হয়, তাহা নহে। যখন অনুকূল হয় না, তখন

তাহাদের পরাভব অবশ্যম্ভাবী, ফলে তাহাদের অস্তিত্বই লুপ্ত হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু পরিবর্তনগুলি যদি উহাদের পক্ষে অনুকূল হয়, তাহা হইলে উহারা অনায়াসে প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাভূত করিয়া নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারে। এইভাবে যাহারা জয়ী হয়, তাহারাই জীবন ধারণের পক্ষে যোগ্যতম বলিয়া বিবেচিত হয়; ইংরাজীতে ইহাকে বলে Survival of the fittest; অর্থাৎ যাহারা বাঁচিবার যোগ্য তাহারাই শুধু বাঁচিবে, অন্য সকলে ধরাপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইয়া যাইবে। ইহাই প্রকৃতির বিধান (Natural selection)। সংগ্রামের মাধ্যমে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে যে, কে বাঁচিবার যোগ্য আর কে নহে। সংগ্রামে যে জয়লাভ করে তাহাকেই যোগ্য বলিয়া নির্বাচন করা হয় এবং তাহাকেই বাঁচিবার অধিকার দেওয়া হয়; আর যে পরাজিত হয় তাহাকে যোগ্য বলিয়া গণ্য করা হয় না, অতএব তাহার বাঁচিবার অধিকারও থাকে না। এক কথায়, যাহার জয় তাহার জীবন, যাহার পরাজয় তাহার মরণ।

সমালোচনা।

প্রজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে উপরে যে বিবর্তনবাদ ব্যাখ্যা করা হইল তাহাকে ইংরাজীতে Mechanical Evolution বলে। এক্ষেত্রে কোথাও কোন ঐশ্বরিক উদ্দেশ্য নিহিত নাই; সবই যন্ত্রবৎ সংঘটিত হইয়া চলিয়াছে। অতএব প্রজাতির উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিবার জন্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব কল্পনা করিবার প্রয়োজন হয় না। আমরা উপরে যে সব সূত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছি—উহাদের সাহায্যেই ইহা সম্যক্‌রূপে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ইহা যান্ত্রিক ক্রিয়া; উদ্দেশ্য প্রণোদিত নহে। তবে অন্যান্য ক্ষেত্রে আমরা যখন এই যান্ত্রিক মতবাদ গ্রহণ করিতে পারি নাই, তখন এক্ষেত্রেও যে ইহা গ্রহণ করিতে পারিব না—তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। কেন গ্রহণ করিতে পারি না—তাহাই নিম্নে ব্যাখ্যা করা যাইতেছে।

লামার্ক (Lamarck)

(১) লামার্ক ও ডারউইন উভয়েই বলেন যে প্রাণীদেহে যে সব পরিবর্তন সংঘটিত হয়, উহাই পরে সন্তান-সন্ততির মধ্যে পুঞ্জীভূত হইয়া প্রজাতির সৃষ্টি করে। তবে লামার্ক বলেন যে, পরিবর্তনের উদ্ভব হয় পরিবেশের প্রভাবে, আর ডারউইন বলেন যে পরিবর্তনের উদ্ভব হয় দেহের আভ্যন্তরীণ

ক্রিয়ার ফলে। প্রথমে লামার্কের কথা লওয়া যাউক। বহিঃস্থ পরিবেশের প্রভাবে প্রাণীদেহে যে বহুবিধ পরিবর্তন সংঘটিত হইতে পারে, তাহা সকলেই স্বীকার করেন কিন্তু এইভাবে যে প্রকারণের উদ্ভব হয় তাহা সন্তান-সন্ততির মধ্যে সংক্রমিত হইতে পারে কি না, সে বিষয়ে Weismann প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ বহু পরীক্ষা করিয়া যাহা নির্ধারণ করিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাঁহারা বলেন, পরিবেশের প্রভাবে যদি কাহারো দেহে কোন প্রকার পরিবর্তন সংঘটিত হয়, তবে উহা শুধু তাহারই মধ্যে আবদ্ধ থাকে, তাহার সন্তান-সন্ততির মধ্যে সংক্রমিত হইতে পারে না। আমরা জিরাফের যে উদাহরণ দিয়াছি, সেই উদাহরণটি লওয়া যাউক। লামার্ক বলেন যে উঁচু ডালের দিকে ঘন ঘন গ্রীবা বাড়াইতে হইয়াছে বলিয়া জিরাফের গ্রীবা আজ দীর্ঘ হইয়া গিয়াছে। বারে বারে চেষ্টা করিলে এবং বিশেষভাবে অভ্যাস করিলে জীবজন্তুর গ্রীবা যে কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হইতে পারে তাহা আমরা স্বীকার করি; কিন্তু উহার ফলে তাহার সন্তানের গ্রীবাও যে দীর্ঘ হইয়া যাইবে সেরকম কোন সম্ভাবনা নাই। যাহারা সার্কাস দেখায় তাহাদিগকে অনেক সময়ে নিজেদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে নানারূপ প্রকারণ সৃষ্টি করিতে হয়, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের সন্তান-সন্ততিও কি সেইরূপ দৈহিক প্রকারণ লইয়া জন্মগ্রহণ করে? মোটেই না; বরং দেখি, অন্যান্য সন্তানের ন্যায় তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও অবিকল সাধারণ রকমের হইয়া থাকে; উহার মধ্যে পূর্বপুরুষের দৈহিক প্রকারণের কোন লক্ষণই পাওয়া যায় না। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে এক্ষেত্রে পিতামাতা নিজের চেষ্টায় যাহা অর্জন করে সন্তান-সন্ততি উত্তরাধিকার সূত্রে তাহা লাভ করিতে পারে না; পিতা মাতার দৈহিক প্রকারণ লাভ করিতে হইলে তাহাকেও পিতামাতার ন্যায় চেষ্টা করিতে হয়। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে নিজ চেষ্টায় বা পরিবেশের প্রভাবে আমাদের দেহে যে প্রকারণ উৎপন্ন হয়, উহা বংশানুক্রমে সংক্রমিত হয় না; এবং বংশানুক্রমে সংক্রমিত হয় না বলিয়া উহা কাহারো মধ্যে পুঞ্জীভূত হইয়া প্রজাতিও সৃষ্টি করিতে পারে না। অতএব লামার্ক যেভাবে প্রজাতির উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করা যায় না।

ডারউইন (Darwin)

(২) লামার্কের পরে এখন ডারউইনের মতবাদ বিবেচনা করা যাউক। তিনি বলেন প্রাণীদেহে মধ্যে মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নানাবিধ প্রকারণের উদ্ভব

হইয়া থাকে। ইহাকে তিনি Spontaneous Variations বলেন; পরিবেশের প্রভাবে বা কাহারো চেষ্টার ফলে ইহা উৎপন্ন হয় না; দেহাভ্যন্তরে সময়ে সময়ে যে আলোড়নের সৃষ্টি হয় উহারই ফলে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উদ্গত হইয়া থাকে। এইভাবে দেহে যে পরিবর্তন সংঘটিত হয়, তাহা বংশানুক্রমে সংক্রামিত হয় এবং পরে পুঞ্জীভূত হইয়া এক নূতন প্রজাতির সৃষ্টি করে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও ইহা স্বীকার করেন। তাঁহারাও বলেন, পরিবেশের প্রভাবে বা চেষ্টার ফলে যে দৈহিক প্রকারণ উৎপন্ন হয়, উহা অর্জিত প্রকারণ, উহা সন্তানের মধ্যে সংক্রমিত হইতে পারে না। কিন্তু আভ্যন্তরীণ আলোড়নের ফলে দেহে যে প্রকারণ উৎপন্ন হয়, উহা স্বতঃস্ফূর্ত প্রকারণ; ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টায় উহা অর্জিত হয় না, উহা প্রাকৃতিক নিয়মে উদ্গত হয়; সেজইন্য প্রাকৃতিক নিয়মেই উহা সন্তানের মধ্যে সংক্রমিত হইয়া থাকে। বহু পরীক্ষা করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ ডারউইনের এই মত সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

আমরাও ইহা স্বীকার করি। কিন্তু এখানে আমাদের এক প্রশ্ন আছে—দেহের অভ্যন্তরে যে প্রকারণের উদ্ভব হয়, তাহা কেন হয়? Darwin বলেন ইহা তো কেহ চেষ্টা করিয়া সৃষ্টি করে না, ইহা স্বতঃই আমাদের দেহের মধ্যে উৎপন্ন হয়। সবই স্বীকার করি; কিন্তু যাহা স্বতঃই আমাদের দেহাভ্যন্তরে উৎপন্ন হয়, তাহার কি কোন কারণ নাই? স্বতঃসঞ্জাত হইলেই কি উহা অকারণ হইবে? বৃষ্টির পরে মাঠের মধ্যে যে তৃণ উৎপন্ন হয়, উহার জন্য কেহই চেষ্টা করে না; উহাও স্বতঃই উৎপন্ন হয়। কিন্তু তাই বলিয়া উহা কি বিনা কারণে উৎপন্ন হয়? আমাদের মতানুসারে পৃথিবীর কোন ঘটনাই অকারণ ঘটিতে পারে না; প্রত্যেক ঘটনারই যথাযথ কারণ আছে। অতএব যে পরিস্থিতিতে দেহাভ্যন্তরে পরিবর্তনের উদ্ভব হইতেছে, তাহাও অকারণ সংঘটিত হইতে পারে না; উহার মধ্যেও নিশ্চয়ই কোন গূঢ় কারণ নিহিত আছে। কিন্তু Darwin উহার কোন কারণ নির্দেশ করিতে পারেন নাই; তাই তিনি ইহাকে Chance Variation বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। Chance Variation অর্থাৎ আকস্মিক পরিবর্তন। তিনি বলেন এইসব পরিবর্তনের কোন নির্দিষ্ট কারণ নাই, হঠাৎ আকস্মিকভাবে শরীরের মধ্যে ইহা সংঘটিত হয়। কিন্তু আমাদের মতে এইরূপ ব্যাখ্যাকে মোটেই ব্যাখ্যা বলা যায় না; ইহা ব্যাপ্যার ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র; কারণ বৈজ্ঞানিক আলোচনায় আকস্মিকতার স্থান নাই। যাহা আকস্মিক বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহা বাস্তবিক আকস্মিক নহে, উহারও যথাযথ কারণ আছে। কিন্তু ঐ কারণটি নির্ধারণ করিতে না পারিলেই আমরা উহাকে আকস্মিক ব্যাপার

বলিয়া এড়াইয়া চলি। ডারউইনও ঠিক তাহাই করিতেছেন। দেহাভ্যন্তরে কেন পরিবর্তন ঘটে, উহার কোন কারণ উদ্ঘাটন করিতে পারিতেছেন না বলিয়াই তিনি উহাকে আকস্মিক বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। কিন্তু বলা বাহুল্য, দুনিয়ার কোন ঘটনাই যেমন আকস্মিক নহে, ইহাও তেমন আকস্মিক নহে; ইহারও নির্দিষ্ট কারণ আছে।

(iii) Teleological Evolution

Darwin উহা নির্দেশ করিতে পারিতেছেন না; কারণ, তিনি যে মতবাদে বিশ্বাস করেন, সেই মতানুসারে উহা নির্দেশ করা সহজ নহে, বোধ হয় সম্ভবই নহে। তাঁহার মতবাদকে Mechanical Evolution বলে। এই মতানুসারে পৃথিবীতে কোন এক সম্পূর্ণ নূতন জিনিষের উদ্ভব হইতে পারে না; যাহা অতীতে বিদ্যমান ছিল তাহাই কিঞ্চিৎ বিভিন্নরূপে আবির্ভূত হয়; একেবারে সম্পূর্ণ নূতন জিনিষের উদ্ভব হয় না। সমুদ্রের জল রৌদ্রে শুকাইলে লবণ হয়; এক্ষেত্রে জলই পরিবর্তিত হইয়া লবণ হইতেছে বটে, কিন্তু লবণের আবির্ভাব একেবারে অভিনব আবির্ভাব নহে। প্রথম হইতেই উহা জলের মধ্যে বিদ্যমান ছিল; এখন জমাট হইয়া একটু বিভিন্নরূপে আবির্ভূত হইয়াছে মাত্র। তাই ইহাকে "Repetitive Evolution নামেও অভিহিত করা হয়। এক্ষেত্রে যাহা পূর্বে ছিল তাহারই পুনরাবৃত্তি হয়; নূতনের আবির্ভাব হয় না। কিন্তু এমন অনেক পরিবর্তন আছে যাহা মোটেই সামান্য পরিবর্তন নহে; গুরুতর পরিবর্তন—যাহার ফলে সত্যই এক অভূতপূর্ব জিনিষের উদ্ভব হইতে পারে। Darwin যে দৈহিক পরিবর্তনের কথা বলিয়াছেন উহাও সেইরূপ এক গুরুতর পরিবর্তন; উহার মধ্যে শুধু পুরাতনের পুনরাবৃত্তি নাই; উহার মধ্যে এক নূতনের সূচনা আছে—উহা হইতে এক নূতন প্রজাতির উন্মেষ হইতেছে। উহাকে আমরা "যেমন তেমন" ব্যাপার বলিতে পারি না; উহা সত্যই এক অভিনব ব্যাপার। Mechanical Evolution-এর দ্বারা ইহা ব্যাখ্যা করা যায় না। মনে রাখিতে হইবে, যে ক্ষেত্রে পুরাতন হইতে পুরাতনের উদ্ভব হয়, সেক্ষেত্রেই শুধু যান্ত্রিক ব্যাখ্যা সম্ভব; সে ক্ষেত্রে আমরা অতীতের উপর নির্ভর করিতে পারি; অতীতের মধ্যে উহার কারণ অনুসন্ধান-পূর্বক যান্ত্রিক নিয়মানুসারে উহা ব্যাখ্যা করিতে পারি। কিন্তু যে ক্ষেত্রে পুরাতন হইতে নূতনের সূত্রপাত হয়, সে ক্ষেত্রে যান্ত্রিক ব্যাখ্যা সম্ভব নহে। সে ক্ষেত্রে তো আমরা অতীতের উপর নির্ভর করিতে পারি না; অতীতের মধ্যে ইহার কোন সূচনাই পাওয়া যায় না। তখন Teleological Evolution স্বীকার করা ছাড়া আর কোন উপায় নাই। Teleological Evolution মানে উদ্দেশ্যমূলক

বিবর্তন। এই মতানুসারে প্রত্যেক বিবর্তনের মধ্যেই এক ঐশ্বরিক উদ্দেশ্য নিহিত আছে, এবং ঐ উদ্দেশ্য সাধন করাই বিবর্তনের লক্ষ্য। এইরূপ বিবর্তনের ফলে পশুদেহ কখন কখন এমন পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছে যখন উহা হইতে কোন পূর্ব জিনিষের পুনরাবৃত্তি না হইয়া এক অভিনব প্রকারণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু কেন এমন হয়? কেন এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে পরিস্থিতিতে এইরূপ দৈহিক প্রকারণের আবির্ভাব না হইয়া পারে না? ইহার কারণ কি? আমাদের মতানুসারে ঈশ্বরের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যই উহার কারণ। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিবার জন্যই তিনি বিবর্তনের মাধ্যমে পশুদেহকে এমন পর্যায়ে আনিতেছেন যখন এক অভিনব পরিবর্তনের উদ্ভব না হইয়া পারে না; পরে উহাই সন্তান সন্ততিতে পুঞ্জীভূত হইয়া নূতন প্রজাতির সৃষ্টি করে। এইভাবে যে বিবর্তনের মাধ্যমে নূতনের উন্মেষ হইয়া থাকে তাহাকে উন্মেষধর্মী বিবর্তন (Emergent Evolution) নামেও অভিহিত করা হয়।

একাদশ অধ্যায়

প্রাণীর উৎপত্তি (পরিশিষ্ট)

পূর্ব অধ্যায়ে আমরা দেখিলাম যে Mechanical বিবর্তনবাদের দ্বারা প্রাণীর উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা যায় না। কিন্তু প্রাণী প্রসঙ্গে প্রাণীর উৎপত্তিই তো একমাত্র বিষয় নহে; আরও অনেক বিষয় আছে, যেমন উহার দৈহিক গঠন, অপর প্রাণীর সহিত উহার সঙ্গতি স্থাপন, ইত্যাদি। আমরা এখন এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া দেখাইব যে ইহাদের কোনটিই Mechanical বিবর্তনের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না; প্রত্যেক জিনিষের জন্যই Teleological বিবর্তনের উপর নির্ভর করিতে হয়। প্রথমে দৈহিক গঠনের কথা লওয়া যাউক। যে কোন মানুষের দিকে লক্ষ্য কর, দেখিবে উহার কত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে; হাত আছে, পা আছে, চোখ, কান, নাক প্রভৃতি ইন্দ্রিয় আছে; আর ভিতরে আছে নার্ভ, পেশী, মস্তিষ্ক, পাকস্থলী প্রভৃতি যে কত কি—তাহার ইয়ত্তা নাই। শুধু নার্ভের সংখ্যাই যে কত লক্ষ তাহা সঠিক বলা যায় না। কিন্তু আশ্চর্য! এত যে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, এবং এত যে বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রক্রিয়া—তবুও ইহাদের মধ্যে তো কোনপ্রকার অসঙ্গতি দেখা যায় না; বরং দেখি ইহাদের মধ্যে এক অদ্ভুত সামঞ্জস্য বিদ্যমান।

Mechanical বিবর্তনবাদিগণ বলেন যে ইহাতে কিছুই আশ্চর্য হইবার নাই ; প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন আকস্মিকভাবে উদ্ভূত হইয়াছে, উহাদের পারস্পরিক সঙ্গতিও তেমন আকস্মিকভাবেই সংঘটিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা কি বিশ্বাস করা করা যায় ? আমরা মানিয়া লইলাম যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি আকস্মিকভাবেই উদ্ভূত হইয়াছে, কোন পরিকল্পনা অনুযায়ী রচিত হয় নাই। কিন্তু পূর্ব হইতে কোন পরিকল্পনা না থাকিলে প্রাণীদেহে এতগুলি বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র অংশ কি পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কাজ করিতে পারে ? ইহা কি সম্ভব ? সেইজন্য Teleological মতবাদে বলা হয় যে কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই আকস্মিকভাবে রচিত হয় নাই, ইহাদের সৃষ্টির পশ্চাতে এক মননশীল কর্তার নিয়ন্ত্রণ আছে, এবং তাঁহারই উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত আছে বলিয়া ইহাদের কার্যকলাপের মধ্যে কোনরূপ অসঙ্গতির উদ্ভব হইতে পারে না। এইভাবে সকলেই একই উদ্দেশ্যসূত্রে গ্রথিত থাকাতে ইহাদের পরস্পরের মধ্যে এক অদ্ভুত সামঞ্জস্য দেখা যায়।

প্রাণীদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যেই যে শুধু এই প্রকার সামঞ্জস্য দেখা যায়, তাহা নহে ; প্রাণীদের পরস্পরের জীবনেও এক অদ্ভুত সঙ্গতি দেখা যায় ; মনে হয় প্রত্যেকেই যেন পরের তরে। মায়ের বুকে স্তন আছে ; Mechanical মতবাদি-গণ বলেন যে আকস্মিক ভাবেই তাঁহার দেহে স্তনোদ্গম হইয়াছে। তাহা না হয় হইল ; কিন্তু ইহার সহিত শিশুর জীবনের সঙ্গতি সাধিত হইল কেমন করিয়া ? তাহারা পৃথক, তাহাদের প্রত্যেকেরই পৃথক সত্তা আছে ; অথচ পৃথক হইয়াও তাহারা এক। অতএব মায়ের স্তনোদ্গম একেবারে আকস্মিক ব্যাপার হইতে পারে না ; ইহার মধ্যে এক মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত আছে, এবং সেই উদ্দেশ্য মায়ের জন্য নহে, শিশুর জন্য। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে এমন একজন মননশীল কর্তা আছেন যিনি এই দুই বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়াছেন ; নতুবা তাহাদের মধ্যে শুধু স্বাতন্ত্র্যই থাকিত, সামঞ্জস্য থাকিত না। আর এক কথা, শুধু প্রাণীদের মধ্যেই সামঞ্জস্য নাই ; তাহারা যেখানে বাস করে, সেই বসতির সঙ্গেও তাহাদের অদ্ভুত সামঞ্জস্য বিদ্যমান। পাখী আকাশে উড়ে ; তাই দেখি তাহার অস্থিগুলি হাল্কা, কারণ বেশী ভারী হইলে সে উড়িতে পারিত না। আবার দেখি, পাখীর পাখা আছে, মাছেরও পাখা আছে ; কিন্তু পাখীর পাখা ও মাছের পাখা বিভিন্ন কেন ? কারণ পাখীকে আকাশে উড়িতে হয়, আর মাছকে জলে ভাসিতে হয়। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে কোন এক নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই ইহাদের পাখাগুলি বিভিন্নভাবে গঠিত হইয়াছে। তাই আমরা বলি যে ইহা একেবারে আকস্মিক ব্যাপার হইতে পারে না ;

আকস্মিক হইলে প্রত্যেক প্রাণীরই বসতির সহিত তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এতাদৃশ সঙ্গতি থাকিতে পারিত না।

উদ্দেশ্য-কারণ (Final Cause)

তাহা হইলে দেখা গেল যে Mechanical বিবর্তনের দ্বারা আমরা প্রাণী জীবনের অনেক কথাই ব্যাখ্যা করিতে পারি না; ইহাদের উৎপত্তি যেমন ব্যাখ্যা করিতে পারি না, ইহাদের পারস্পরিক সঙ্গতিও তেমন সুষ্ঠু-ভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারি না। এই অসমর্থতা ব্যতীত Mechanical ব্যাখ্যার আর একটি প্রধান ত্রুটি, ইহার অসম্পূর্ণতা। মুখ্যতঃ অতীত ও বর্তমানের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই ইহা সব কিছু ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রাখে না। কথাটি ভাল করিয়া বুঝান যাউক। ধর একজন কারিগর বহুদিন পরিশ্রম করিয়া একটি ঘড়ি নির্মাণ করিলেন। এখন এই ঘড়ির উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা যাউক। Mechanical মতবাদিগণ বলেন যে ইহার জন্য কারিগরকে নানাবিধ আয়োজন করিতে হইয়াছে; নানাবিধ মালমশলা যোগাড় করিয়া নানাভাবে উহাদিগকে সংযুক্ত করিয়া, তাঁহাকে এই ঘড়িটি বানাইতে হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এসমস্তই অতীত ও বর্তমানের ব্যাপার; অতীতে তিনি মালমশলা যোগাড় করিয়াছেন এবং বর্তমানে তিনি উহাদের উপর নানাভাবে ক্রিয়া করিতেছেন। কিন্তু শুধু অতীত ও বর্তমানের কার্যাবলী দেখিয়াই কি ঘড়ি নির্মাণ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে? মোটেই না; তিনি কি নির্মাণ করিতে চান, তাঁহার রচনার উদ্দেশ্য কি, তাহাও তাঁহাকে মানস পটে উপস্থাপিত রাখিতে হইয়াছে। বস্তুতঃ সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই তিনি তাহার কার্যাবলী পরিচালনা করিতেছেন; নতুবা ঘড়ি নির্মাণ না করিয়া তিনি তো চশমা নির্মাণ করিতে পারিতেন। তিনি তাহা পারিতেন বটে, কিন্তু তাহা হইলে তাঁহাকে ঘড়ির দিকে লক্ষ্য নিবদ্ধ না রাখিয়া চশমার দিকে লক্ষ্য নিবদ্ধ রাখিতে হইত। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে ভবিষ্যতে আমরা কি চাই, আমাদের কার্যকলাপের উদ্দেশ্য কি—সে বিষয়ে সজাগ রহিয়াই আমাদিগকে কাজ করিতে হয়। কারিগরের সম্মুখে এই উদ্দেশ্যটি না থাকিলে, শুধু মালমশলায় ঘড়ি নির্মিত হইত না। তাই আমরা বলিয়াছি যে কেবল অতীত ও বর্তমান ক্রিয়া প্রক্রিয়া নির্ণয় করিতে পারিলেই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ হয় না; ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ করিতে হইলে তাহার উদ্দেশ্যের দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হয়; কিন্তু উদ্দেশ্য তো সর্বদাই সম্মুখে থাকে, পিছনে থাকে না; যতদিন উহা সাধিত না হয়

ততদিন উহা দূরে, ভবিষ্যতের গর্ভেই নিহিত থাকে। উহা দূর হইতে আমাদিগকে হাতছানি দিয়া ডাকে; আমরা তখন উহার পশ্চাতে ছুটিতে থাকি।

পূর্বেই বলিয়াছি Mechanical বিবর্তনে উদ্দেশ্যের কোন স্থান নাই। এই মতানুসারে সবই যন্ত্রবৎ পরিচালিত হইতেছে, উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ভাবে নহে। উদ্দেশ্যের কার্যকারিতা স্বীকার করে না বলিয়া শুধু অতীত ও বর্তমান ক্রিয়া কলাপের দ্বারাই ইহা বিশ্ববিবর্তন ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করে। তাই এই ব্যাখ্যাকে আমরা অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যা বলি, সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা পাই Teleological মতবাদে। সেক্ষেত্রে আমরা শুধু অতীত ও বর্তমান কার্যকলাপ লক্ষ্য করি না; যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই বিশ্বজগৎ নিরন্তর বিবর্তিত হইয়া চলিয়াছে, সেই উদ্দেশ্যের দিকেও লক্ষ্য করি। সেই উদ্দেশ্য এখনও সাধিত হয় নাই বটে, কিন্তু উহার প্রভাব তো অস্বীকার করা যায় না; বরং উহার দ্বারাই বিবর্তনের গতি নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। অতএব উহার কথা বাদ দিলে আমাদের ব্যাখ্যা কিছুতেই সম্পূর্ণ হইতে পারে না, অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। এই প্রসঙ্গে Aristotle যাহা বলেন তাহা উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি বলেন, যে কোন কার্যের (Effect) কথাই লওয়া যাউক না কেন, শুধু এক রকমের কারণের দ্বারা উহা ব্যাখ্যা করা যায় না, বিভিন্ন রকমের কারণ উল্লেখ করিতে হয়। যেমন ধর, কুম্ভকার একটি ঘট নির্মাণ করিতেছে; এক্ষেত্রে মাটি তাহার পক্ষে অপরিহার্য্যরূপে প্রয়োজন; মাটি না হইলে সে কি দিয়া ঘট নির্মাণ করিবে? অতএব মাটি ঘটের "কারণ"। কিন্তু মাটিই উহার একমাত্র কারণ নহে; তাহা হইলে মাটি তো নিজে নিজেই ঘট নির্মাণ করিতে পারিত; কিন্তু তাহা তো সম্ভব নহে। অতএব ঘট নির্মাণের জন্য যেমন মাটির দরকার, তেমন আবার কুম্ভকারেরও দরকার। এক্ষেত্রে মাটি Material cause; মাটি হইতে ঘটের উপাদান আসিতেছে; আর কুম্ভকার Efficient cause; সে মাটিকে যথাযথ ভাবে প্রয়োজনা করিতেছে। তবে শুধু এই দুই রকমের "কারণ" হইলেই হয় না; আর এক প্রকার কারণের প্রয়োজন; উহার নাম Final cause; কুম্ভকারের মনের মধ্যে ঘটের যে পরিকল্পনা বিরাজ করিতেছে—উহাকেই আমরা Final Cause বলিতেছি।* এই পরিকল্পনা

* এখানে **Final Cause** বলিতে আমরা **Aristotle** বর্ণিত **Formal Cause** এবং **Final Cause**—দুইই একসঙ্গে বুঝাইতেছি। **Formal Cause**—যেমন ঘট কিরূপ আকার পরিগ্রহ করিবে, ছোট হইবে কি বড় হইবে, সুন্দর হইবে কি সাধারণ হইবে, তৎসম্বন্ধীয় পরিকল্পনা। **Final Cause**—যেমন ঘট কি উদ্দেশ্যে রচিত হইবে, বিক্রয়ের জন্য কি উপহারের জন্য কি প্রদর্শনীর জন্য ইত্যাদি সম্বন্ধীয় পরিকল্পনা। বলা বাহুল্য, **Formal Cause** এবং **Final Cause**—দুই-ই

অনুসারেই সে কাজ করিতেছে। ঘট কিরূপ হইবে, ছোট হইবে কি বড় হইবে, সুন্দর হইবে কি সাধারণ হইবে, বিক্রয় করা হইবে কি উপহার দেওয়া হইবে—সবই সে মনের মধ্যে কল্পনা করিয়া রাখিয়াছে এবং তদনুসারে সে মাটির উপর ক্রিয়া করিতেছে। অতএব Final Cause না থাকিলেও ঘট হইতে পারিত না। একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে Material Cause এবং Efficient Cause আছে কার্যের পশ্চাতে, আর Final Cause আছে কার্যের সম্মুখে। কার্য অর্থাৎ Effect, যেমন ঘট ; ঘট-নির্মাণের পশ্চাতে আছে কুম্ভকার, আর সম্মুখে আছে কুম্ভকারের ইচ্ছাকৃত কল্পনা। কুম্ভকার পিছন হইতে মাটির উপর ক্রিয়া করিতেছে, আর কল্পনা সম্মুখ হইতে আকৃষ্ট করিয়া উহাকে এক বিশিষ্ট রূপদান করিতেছে। ইহাদের সমন্বয় না হইলে ঘট নির্মিত হইত না, অন্য কিছু নির্মিত হইত।

Emergent Evolution

এখন বুঝা যাইবে আমরা কেন Mechanical মতবাদকে অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি। এই মতানুসারে অণুপরমাণু হইতেই বিশ্বজগৎ বিবর্তিত হইয়াছে। আদিতে যে সব জড় পরমাণু ছিল তাহারাই আজ বিবর্তিত হইয়া জীবজন্তুতে পরিণত হইয়াছে। এক্ষেত্রে শুধু Material Cause অর্থাৎ উপাদান-কারণের দিকেই লক্ষ্য করা হইতেছে, কিন্তু Final Cause বা উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য করা হইতেছে না। শুধু উপাদান থাকিলেই ঘড়ি নির্মাণ হয় না ; একজন নির্মাণ-কর্তাও চাই যিনি তাঁহার উদ্দেশ্য অনুযায়ী ঘড়ি নির্মাণ করিতে পারেন। সেইরূপ শুধু অনুপরমাণু থাকিলেই বিশ্বজগৎ বিবর্তিত হয় না ; একজন সৃষ্টিকর্তাও চাই ; তিনিই তাঁহার উদ্দেশ্য অনুযায়ী এই বিশ্ব বিবর্তন পরিচালনা করিয়া থাকেন। কখন ঘড়ি হইবে আর কখন চশমা হইবে—উহা যেমন নির্মাণ-কর্তার উদ্দেশ্যের দ্বারাই নির্ধারিত হয়, সেইরূপ কখন্ কোন প্রাণীর আবির্ভাব হইবে, তাহাও ঐশ্বরিক উদ্দেশ্যের দ্বারাই নির্ধারিত হইয়া থাকে। তাই আমাদের মতানুসারে ঐশ্বরিক উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ না করিলে আমাদের ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়।

তবে এখানে একটি বিষয়ে সাবধান করিয়া দেওয়া দরকার। ঘড়ির মধ্যে উদ্দেশ্য নিহিত আছে, আবার বিশ্ব-বিবর্তনের মধ্যেও উদ্দেশ্য নিহিত আছে ; কিন্তু ঘড়ির মধ্যে যে উদ্দেশ্য নিহিত আছে তাহা বহিরঙ্গীন (External) উদ্দেশ্য ; আর বিশ্ব-বিবর্তনের মধ্যে যে উদ্দেশ্য নিহিত আছে তাহা আভ্যন্তরীন (Internal)

মানসিক ব্যাপার, দুই-ই ভবিষ্যৎমুখীন ; সেইজন্য পৃথকভাবে উল্লেখ না করিয়া আমরা এখানে দুইটিকেই একই নামে নির্দেশ করিতেছি।

উদ্দেশ্য। ঘড়ি নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করে না, ইহা কারিগরের উদ্দেশ্য অনুযায়ী কাজ করে। কারণ, কারিগর জোর করিয়া ইহার মধ্যে যে উদ্দেশ্য অনুপ্রবিষ্ট করিয়াছে, উহা তো ঘড়ির স্বকীয় উদ্দেশ্য নহে, পরকীয় উদ্দেশ্য; বাহির হইতে সঞ্চারিত করা হইয়াছে, তাই ইহাকে Transcendent বা External Teleology বলে। এক্ষেত্রে ঘড়ি ও কারিগরের সম্বন্ধ নিতান্ত বাহ্য সম্বন্ধ; একদিকে আছে ঘড়ি আর অন্যদিকে আছে কারিগর; দুই-এরই স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সত্তা বিদ্যমান। কিন্তু বিশ্বের সহিত ঈশ্বরের যে সম্বন্ধ তাহা মোটেই বাহ্য সম্বন্ধ নহে, আভ্যন্তরীণ সম্বন্ধ। ঈশ্বর বাহির হইতে ক্রিয়া করিতেছেন না; জগৎ সংসারের অভ্যন্তরে থাকিয়াই তিনি ইহার উদ্ভাবন ও পরিচালন করিতেছেন। এই বিশ্ব-জগৎ ঈশ্বরেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র; ঈশ্বরের সত্তাতেই ইহার সত্তা; তাঁহাকে বাদ দিলে জগতের কোন সত্তাই থাকে না। অতএব ঈশ্বরের-উদ্দেশ্য বাদ দিলে বিশ্ব-সংসারের নিজস্ব কোন পৃথক উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না; বস্তুতঃ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য, এবং সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ করাই ইহার একমাত্র সার্থকতা। সেইজন্য আমরা বলিতে পারি যে, বিশ্ব-সংসারের মাধ্যমে ঈশ্বরের যে উদ্দেশ্য পূর্ণ হইতেছে, উহা পরকীয় উদ্দেশ্য নহে; বিশ্বেরই নিজস্ব অন্তর্নিহিত চরম উদ্দেশ্য (Immanent Finality); অনন্তকাল ধরিয়া ইহা ধীরে ধীরে বিকশিত হইতেছে। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিবার জন্যই তিনি জীবদেহে সময় সময় এমন সব পরিবর্তন সাধন করেন যাহার ফলে নূতন নূতন জীবের উদ্ভব না হইয়া পারে না। Lloyd Morgan ইহাকে Emergent Evolution নামে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

সমালোচনা

আমরা লয়েড মর্গানের Emergent Evolution গ্রহণ করিয়াছি। পূর্বেই বলিয়াছি, Mechanical বিবর্তনের ন্যায় ইহা নিরুদ্দেশ অভিযান নহে; ইহার মধ্যে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য নিহিত আছে এবং সেই উদ্দেশ্য সাধন করাই ইহার লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি জীবদেহে সময় সময় এমন সব পরিবর্তন সাধন করেন যাহার ফলে নূতন নূতন জীবের উদ্ভব না হইয়া পারে না। এই প্রসঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত Bergson যাহা বলেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, ঈশ্বরের মধ্যে উদ্দেশ্য আরোপ করিলে, সৃষ্টি-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা সহজ হয় বটে, কিন্তু তাহাতে ঈশ্বরের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করা হয়; তাঁহার ইচ্ছা শক্তি নিয়ন্ত্রিত করিয়া তাঁহার কাজকে যান্ত্রিক কাজের সমতুল করিয়া দেওয়া হয়। কথাটি ভাল করিয়া বুঝান যাউক। ঘড়ি নির্মাণের উদাহরণটি লইলে আমাদের

পক্ষে বুঝান সহজ হইবে। পূর্বেই বলিয়াছি ঘড়ি নির্মাণের পশ্চাতে আছে ঘড়ির উপাদান, আর সম্মুখে আছে নির্মাতার উদ্দেশ্য। তিনিই ঐ উপাদান লইয়া স্বীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ঘড়ি নির্মাণ করেন। একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে এক্ষেত্রে পশ্চাতের দিকে যেমন শাসন আছে, সম্মুখের দিকেও ঠিক তেমন শাসন আছে। প্রথমে পশ্চাৎবর্তী শাসনের কথা লওয়া যাউক। পশ্চাতের দিকে যে শাসন আছে, তাহা আসিতেছে উপাদান হইতে। প্রত্যেক উপাদানেরই এক নিজস্ব গুণ বা প্রকৃতি আছে; যেমন উহা ভাল কি মন্দ, শক্ত কি নরম, ভারী বা হাল্কা ইত্যাদি। উপাদানসমূহের এইসকল গুণের দ্বারা কারিগরের কার্যশক্তি যথেষ্ট পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে; সেইজন্য খারাপ উপাদান দিয়া তিনি ভাল ঘড়ি নির্মাণ করিতে পারেন না, আর ক্ষুদ্র আকারের উপাদান দিয়াও বঁড় ঘড়ি নির্মাণ করিতে পারেন না। এক কথায় উপাদান যেরূপ হইবে তাহার ঘড়িও সেইরূপ হইবে। উপাদানের এই নিয়ন্ত্রণকে আমরা যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ বলিতে পারি। কারণ, উপাদানসমূহ যখন পরস্পরের উপর ক্রিয়া করে তখন তাহারা নিজ নিজ ধর্ম বা প্রকৃতি অনুযায়ী যান্ত্রিক পদ্ধতিতেই ক্রিয়া করে; আর কারিগর যখন এইসকল উপাদান লইয়া ঘড়ি নির্মাণ করেন তখন তিনিও তাহাদের প্রকৃতি অনুসরণ করিয়া যান্ত্রিক পদ্ধতিতেই কাজ করেন। যে ক্ষেত্রে কারিগরকে এইভাবে পদে পদে উপাদানের ধর্ম এবং উহাদের "কার্য কারণ সম্বন্ধ" মানিয়া কাজ করিতে হয়, সে ক্ষেত্রে তাঁহার যে কোন স্বাধীনতা থাকিতে পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য। তখন তিনি নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া কাজ করেন, যথেচ্ছভাবে করিতে পারেন না। ইহা তো গেল ঘড়ি নির্মাণের পশ্চাৎ দিকের কথা। আবার ইহার সম্মুখ দিকে তাকাইলেও দেখি সেই অবস্থা, সেখানেও সেই অনুশাসন। পূর্বেই বলিয়াছি সম্মুখের দিকে আছে নির্মাতার পরিকল্পনা। তিনি কি নির্মাণ করিবেন, কেন নির্মাণ করিবেন, উহা ছোট করিবেন কি বড় করিবেন, সবই পূর্ব হইতে স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, এবং তদনুসারেই উপাদানের উপর ক্রিয়া করিতেছেন। তাহা হইলে এক্ষেত্রেই বা তাঁহার কর্ম-স্বাধীনতা রহিল কোথায়? তাঁহাকে সর্বদাই পরিকল্পনার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া কাজ করিতে হইতেছে; পরিকল্পনা হইতে যে অনুশাসন আসিতেছে, অন্ধের ন্যায় তাঁহাকে উহা অনুসরণ করিতে হইতেছে। বলা বাহুল্য, যান্ত্রিক অনুশাসনের তুলনায় তাঁহার এই মানসিক অনুশাসনও কম কঠোর নহে। যাঁহাকে সর্বদাই উদ্দেশ্যের কথা স্মরণ রাখিয়া নির্দিষ্ট পন্থায় নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে হয়, কার্যক্ষেত্রে তাঁহার বিশেষ কোন কর্ম-স্বাধীনতা থাকিতে পারে কি? পূর্বকল্পিত পরিকল্পনার দ্বারাই তাঁহার কার্যাবলী পরিচালিত হয়, তাই

তিনি যথেচ্ছভাবে কাজ করিতে পারেন না ; ফলে তাঁহার পক্ষে হঠাৎ "নূতন কিছু" সৃষ্টি করা মোটেই সম্ভব নহে।

"Inverted Mechanism"

তাহা হইলে দেখা গেল যে ঘড়ি নির্মাণের জন্য কারিগরকে দুই প্রকার নিয়ন্ত্রণের সম্মুখীন হইতে হয়। প্রথম নিয়ন্ত্রণ আসে উপাদান হইতে, আর দ্বিতীয় নিয়ন্ত্রণ আসে উদ্দেশ্য হইতে। উপাদানের নিয়ন্ত্রণকে আমরা যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ বলিয়াছি ; অতএব উদ্দেশ্যের নিয়ন্ত্রণকে আমরা মানসিক নিয়ন্ত্রণ বলিতে পারি। কিন্তু যে প্রকারের নিয়ন্ত্রণই হউক না কেন, নিয়ন্ত্রণ সর্বদাই নিয়ন্ত্রণ মাত্র। তাই বিভিন্ন নামকরণ না করিয়া আমরা উহাদিগকে একই নামে অভিহিত করিতে পারি ; উভয়েই যান্ত্রিক-নিয়ন্ত্রণ। তবে উদ্দেশ্যের নিয়ন্ত্রণকে আমরা যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের বিপরীত সংস্করণ (Inverted Mechanism) বলিয়া অভিহিত করিতে পারি, কারণ পূর্বেই বলিয়াছি, উপাদানের নিয়ন্ত্রণ আসে পশ্চাৎ দিক হইতে, আর উদ্দেশ্যের নিয়ন্ত্রণ আসে ঠিক ইহার বিপরীত দিক হইতে। তবে যেদিক হইতেই আসুক না কেন, উহাদের কার্যফল একই ; কারিগরের কর্ম-স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত হইয়া পড়ে। বরং দুইদিক হইতে নিয়ন্ত্রণ আসাতে তাহার কর্ম-স্বাধীনতা দ্বিগুণভাবে সীমায়িত হইয়া পড়ে ; ফলে সত্যই নূতন কিছু করিবার ক্ষমতা তাহার থাকে না ; তাহাকে তখন যন্ত্রচালিতবৎ কাজ করিতে হয়। Bergson বলেন যে Emergent Evolution সম্বন্ধে ঠিক এই কথা প্রযোজ্য। এক্ষেত্রেও দুইদিক হইতে নিয়ন্ত্রণ আসে ; প্রথম নিয়ন্ত্রণ আসে উপাদান হইতে, আর দ্বিতীয় নিয়ন্ত্রণ আসে উদ্দেশ্য হইতে। উপাদানের নিয়ন্ত্রণ, কারণ Mechanical Evolution এবং Emergent Evolution উভয়েরই মতে বিবর্তনের মূল উপাদান—**অণুপরমাণু** ; এইসকল জড় উপাদানের যান্ত্রিক ক্রিয়ার ফলেই বিশ্বজগৎ বিবর্তিত হইতেছে ; ইহাদের ক্রিয়া প্রক্রিয়া নিবিড় কার্যকারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ ; কোন প্রকার ভৌত নিয়ম লঙ্ঘন করা ইহাদের পক্ষে অসম্ভব। শুধু ইহাদের পক্ষে কেন, ঈশ্বরের পক্ষেও এইসব নিয়ম লঙ্ঘন করা সম্ভব নহে। স্বীকার করা যাউক যে ঈশ্বরই এইসব অণুপরমাণু সৃষ্টি করিয়াছেন ; তবুও তাঁহাকে যখন এইসব উপাদান লইয়া বিশ্ব রচনা করিতে হয় তখন তাঁহাকেও ইহাদের গুণ ও ধর্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিতে হয়। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান বলিয়াই কি তিনি জলকে আগুনের ন্যায় ব্যবহার করিতে পারেন, বা আগুনকে জলের ন্যায় ব্যবহার করিতে পারেন? মোটেই না ; তাঁহাকেও উপাদান অনুযায়ী কাজ করিতে হয় ; অর্থাৎ যে উপাদান দিয়া তিনি কাজ করেন, সেই উপাদানের দ্বারা তাঁহার কর্ম-স্বাধীনতা কিঞ্চিৎ নিয়ন্ত্রিত না হইয়া পারে না।

তারপর Emergent মতবাদিগণ যখন ঈশ্বরের মধ্যে উদ্দেশ্য আরোপ করেন, তখন তাঁহার কর্ম-স্বাধীনতা আরও ক্ষুণ্ণ হইয়া যায়। পূর্বেই বলিয়াছি Emergent মতবাদিগণ যে বিশ্ববিবর্তন ব্যাখ্যা করেন তাহা মোটেই নিরুদ্দেশ অভিযান নহে; উহার মধ্যে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য নিহিত আছে, এবং তাঁহাদের মতে, এই উদ্দেশ্য সাধন করাই বিবর্তনের লক্ষ্য। এইভাবে উদ্দেশ্য আরোপ করাতে তাঁহাদের পক্ষে সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করা যে কিঞ্চিৎ সহজ নহে, তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ তাঁহারা অনায়াসে বলিতে পারেন যে শুধু অণুপরমাণু থাকিলেই বিশ্বজগৎ সৃষ্ট হয় না; একজন সৃষ্টিকর্তা চাই যিনি তাঁহার উদ্দেশ্য অনুযায়ী এই বিশ্ববিবর্তনের পরিচালন করিতে পারেন। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিনি জীবদেহে সময় সময় এমন সব পরিবর্তন সাধন করেন যাহার ফলে প্রয়োজন অনুযায়ী নূতন নূতন জীবের উদ্ভব হইয়া থাকে। ইহার উত্তরে Bergson বলেন যে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য স্বীকার করাতে Emergent মতবাদিগণ বিশেষ কিছু সুবিধা করিতে পারেন না; কারণ উদ্দেশ্যের কথা স্বীকার করিলে উহার নিয়ন্ত্রণ শক্তিও স্বীকার করিতে হয়; ফলে ঈশ্বরের কর্ম-স্বাধীনতা প্রভূত পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হইয়া পড়ে। তিনি কি রচনা করিবেন, কেন রচনা করিবেন, কখন রচনা করিবেন—সবই যদি পূর্ব হইতে স্থিরীকৃত থাকে তবে তাঁহার কর্ম-স্বাধীনতা রহিল কোথায়? তাঁহাকে সর্বদাই উদ্দেশ্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া কাজ করিতে হয়; উদ্দেশ্যের নির্দেশ মানিয়াই নিজ কার্যাবলী পরিচালনা করিতে হয়; সেইজন্য তাঁহার পক্ষে যথেচ্ছভাবে কাজ করা সম্ভব নহে। মনে রাখিতে হইবে উপাদানের যান্ত্রিক অনুশাসনের তুলনায় উদ্দেশ্যের মানসিক অনুশাসনও কম কঠোর নহে। যাঁহাকে সর্বদাই উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নির্দিষ্ট পন্থায় অগ্রসর হইতে হয়, তাঁহার স্বাধীনতা যে কতখানি নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে—উহার একটি উদাহরণ দেওয়া যাউক। একশত মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় বালকেরা যখন অংশ গ্রহণ করে তখন তাহাদের কি অবস্থা দেখি? আপাততঃ মনে হইতে পারে যে তাহারা স্বাধীনভাবে দৌড়াইতেছে; অর্থাৎ তাহাদের কর্ম-স্বাধীনতা আছে; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা নহে। তাহাদের গন্তব্য স্থান নির্দিষ্ট আছে, গতিরেখা নির্দিষ্ট আছে, উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট আছে; সেক্ষেত্রে তাহাদের পক্ষে যথেচ্ছভাবে কিছু করা সম্ভব নহে। অন্ধের ন্যায় যখন তাহারা উদ্দেশ্যের পিছনে ছুটিতে থাকে, তখন তাহাদের স্বাধীনতা থাকে কোথায়? সেইরূপ ঈশ্বরও যখন পূর্ব কল্পিত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বিশ্ববিবর্তন পরিচালন করিতে থাকেন, তখন তাঁহারও কোন স্বাধীনতা থাকিতে পারে না; তিনিও বালকদের মতন অন্ধের ন্যায় উদ্দেশ্যের পিছনে ছুটিতে থাকেন। ফলে

তাঁহার পক্ষে হঠাৎ নূতন কিছু সৃষ্টি করা সম্ভব নহে; অথচ প্রাণীজগতে আমরা প্রায়ই দেখিতেছি যে হঠাৎ নূতন নূতন জীবের উদ্ভব হইতেছে। কিন্তু Emergent Evolution মতে এইপ্রকার হঠাৎ সৃষ্টি একেবারে অসম্ভব; প্রথমতঃ উপাদানের নিয়ন্ত্রণে, তার উপর আবার উদ্দেশ্যের নিয়ন্ত্রণে ঈশ্বরকে এমন আষ্ঠে পৃষ্ঠে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে যে তাঁহার পক্ষে নূতন কিছু সৃষ্টি করা সম্ভব নহে। তাঁহাকে গতানুগতিকভাবে চলিতে হয়, স্বাধীনভাবে চলিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই।

Creative Evolution

তাই Bergson বলেন যে বিশ্ববিবর্তনে ভগবৎ উদ্দেশ্যের কোন স্থান নাই। উদ্দেশ্য থাকিলেই যদি উদ্দেশ্যের পিছনে ছুটিতে হয়, তাহা হইলে যদৃচ্ছভাবে নূতন নূতন জিনিষ সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না। সেইজন্য তিনি তাঁহার বিবর্তনবাদকে Emergent Evolution না বলিয়া Creative Evolution নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহা নিরুদ্দেশ অভিযানের সমতুল; ইহার কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নাই, কোন গন্তব্য স্থল নাই; নদীর স্রোতের মত ইহা শুধু অবিরাম গতিতে বহিয়া চলিয়াছে; কোথায় যে কি ভাসিয়া উঠিবে, কখন যে কি সৃষ্ট হইবে, তাহার কোনই স্থিরতা নাই। অন্যান্য বিবর্তনের ন্যায় এই Creative বিবর্তনের মাধ্যমেও নানা জীবজন্তুর সৃষ্টি হইতেছে বটে, কিন্তু ইহা উদ্দেশ্য প্রণোদিত সৃষ্টি নহে; ইহা আকস্মিক সৃষ্টি। কবির ভাষায় বলা যায়, "অকারণ পুলকে" আকস্মিক ভাবেই ইহাদের উৎপত্তি হইতেছে।

সমালোচনা। Bergson শুধু দার্শনিক পণ্ডিত নহেন; তিনি একজন স্বভাব কবি। তিনি কবিতা রচনা করেন নাই বটে, তবে তাঁহার দার্শনিক গ্রন্থগুলি পড়িতে কবিতার ন্যায়ই মনোহর, যেমন তাঁহার সাবলীল ভাষা তেমনই তাঁহার চমৎকার কল্পনা। কিন্তু কবির কল্পনা আর নৈয়ায়িকের যুক্তি ঠিক একই জিনিষ নহে। তাঁহার মতবাদ সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই আমরা বলিতে চাই। তিনি যে বিশ্ববিবর্তন কল্পনা করিয়াছেন উহা পড়িতে সুন্দর কিন্তু সমর্থন করা কঠিন। তাঁহার বিবর্তনে গতি আছে, প্রবাহ আছে, কিন্তু কোন উদ্দেশ্য নাই; কারণ তাঁহার মতানুসারে উদ্দেশ্য থাকিলেই নিয়ন্ত্রণ আসিয়া পড়ে; অতএব এই নিয়ন্ত্রণের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্যই তাঁহার এই কবি-কল্পনা। তিনি চান অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা। কিন্তু আমাদের মতানুসারে এই প্রকার অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতার কোন অর্থই হয় না; যদৃচ্ছ স্বাধীনতা বলিয়া কোন জিনিষ নাই। স্বাধীনতা বলিলেই বুঝিতে হইবে আমার স্বাধীনতা বা তোমার স্বাধীনতা, অর্থাৎ কোন ব্যক্তি-

বিশেষের স্বাধীনতা। এক কথায়, ইহা নিরবলম্ব হইয়া ক্রিয়া করে না; কোন ব্যক্তিবিশেষকে অবলম্বন করিয়া ক্রিয়া করে; এবং ব্যক্তিবিশেষকে অবলম্বন করিয়া ক্রিয়া করে বলিয়া ইহা সেই ব্যক্তিবিশেষের স্বভাব ও চরিত্রের দ্বারা প্রভাবান্বিত না হইয়া পারে না। ঈশ্বরের সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা প্রযোজ্য। তিনিও স্বাধীন বটে, কিন্তু তাঁহার স্বাধীনতাও যদৃচ্ছ স্বাধীনতা নহে; তিনিও যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারেন না; অর্থাৎ তাঁহার পক্ষেও স্বভাব ও স্বধর্ম অতিক্রমপূর্বক কোন কাজ করা সম্ভব নহে। ফলে তাঁহার কার্যাবলীও কিঞ্চিৎ নিয়ন্ত্রিত না হইয়া পারে না। তবে ইহাতে তাঁহার স্বাধীনতা কিঞ্চিৎমাত্রও ক্ষুণ্ণ হয় না। কারণ, স্বাধীনতা মানে স্ব+অধীনতা; নিজের অধীনে অর্থাৎ আত্মনিয়ন্ত্রণে কাজ করাকেই স্বাধীনতা বলে। পরাধীনতা আছে পরকীয় নিয়ন্ত্রণে; কিন্তু ঈশ্বর তো পরকীয় নির্দেশে কোন কাজ করেন না। পরকীয় উদ্দেশ্য পালন করিবার জন্য তিনি বিবর্তন পরিচালন করিতেছেন না, নিজের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্যই তাঁহার এই সৃষ্টি লীলা। ইহাতে আবার পরাধীনতা কোথায়?

আর এক কথা। Bergson বলেন, সৃষ্টি-লীলার মধ্যে আবার উদ্দেশ্য থাকিবে কেন? লীলা শুধু লীলা; ইহা এক উদ্দেশ্যহীন খেলা মাত্র। কিন্তু আমরা ইহা স্বীকার করি না। আমাদের মতানুসারে উদ্দেশ্য না থাকিলে কোন প্রকার সৃষ্টিই সম্ভব নহে। যে কোন মননশীল কর্তার দিকে লক্ষ্য করা যাউক না কেন, দেখা যাইবে যে তাহার প্রত্যেক সৃষ্টির মধ্যেই কোন এক উদ্দেশ্য আছে; উদ্দেশ্যের কথা না ভাবিয়া অকারণ কেহ কিছু রচনা করে না। বস্তুতঃ রচনা করিতে গেলেই উদ্দেশ্য অনুযায়ী রচনা করিতে হয়; নতুবা কি রচনা করিবে? Dr. Stephen বলেন "Why should things change at all? There must be some reason for it at the heart of the things themselves. The reason lies in the fact that the change is necessary for the attainment of a certain result; the result must, therefore, be present from the beginning of the change as the motive force which prompts it, as an end to be realised." পূর্বকল্পিত উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিবার জন্যই আমরা সাধনা করি; নতুবা সাধনা করার কোন অর্থই হয় না।

চতুর্থ খণ্ড

জড়-তত্ত্ব

(The Problem of Matter)

দ্বাদশ অধ্যায়

পরমাণুবাদ (Materialism)

মনের কথার পরে প্রাণের কথা আলোচনা করা হইল; এখন জড় পদার্থের কথা আলোচনা করা হইবে। জড়পদার্থ কাহাকে বলে? বাহ্য-জগতে অবস্থিত যে কোন বস্তুকেই জড়পদার্থ বলা যায়। যেমন, টেবিল, চেয়ার, কাগজ, পেন্সিল, গাছপাতা, ফলফুল, নদনদী সমস্তই জড়পদার্থ। ইহাদের সকলেরই একটু না একটু স্থান-ব্যাপ্তি আছে; একটু স্থান পূর্ণ করিয়া তাহারা বিস্তৃত রহিয়াছে। যে স্থানে অধুনা এক জড়পদার্থ বর্তমান আছে, তাহা সেস্থান ত্যাগ করিতে পারে বটে, কিন্তু যেখানেই থাকুক না কেন, তাহাকে কোন না কোন স্থান বিশেষে বিদ্যমান থাকিতেই হইবে; কিঞ্চিৎ স্থান দখল না করিয়া ইহা কিছুতেই অবস্থান করিতে পারে না। এইভাবে যাহা প্রত্যেক জড়পদার্থের মধ্যেই অপরিহার্যরূপে বিদ্যমান তাহাকে মুখ্য গুণ (Primary Qualities) বলা হয়। মুখ্যগুণ ব্যতীত জড়পদার্থের আরও একরকম গুণ আছে, যাহা মোটেই অপরিহার্য নহে। ধর, ইহার রূপ বা রং, প্রত্যেক জড়পদার্থেরই কি রং আছে? তাহা তো নহে; যেমন বাতাস; ইহার কোনই রং নাই, অথচ ইহার স্পর্শ আছে। আবার যাহার রং আছে—তাহার সে রংও হয়ত স্থায়ী নহে; অনায়াসে পরিবর্তিত হইতে পারে, যেমন মেঘের রং, কখন সাদা, কখন কাল আর কখন লাল; অর্থাৎ কোন রংই স্থায়ী বা অপরিবর্তনীয় নহে। আবার দেখ, ফুলের গন্ধ, কখন আছে আর কখন বা একেবারেই নাই। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, শব্দ, বর্ণ, গন্ধ প্রভৃতি গুণ অপরিহার্য নহে, অপরিবর্তনীয়ও নহে; সেইজন্য স্থান-ব্যাপ্তির তুলনায় ইহাদিগকে মুখ্য গুণ না বলিয়া গৌণ গুণ (Secondary Qualities) বলা হয়।

আমরা এখানে ইহার গৌণ-গুণের কথা উত্থাপন করিব না; শুধু ইহার মুখ্য-গুণের দিকে লক্ষ্য করিয়া আলোচনা আরম্ভ করিব। মুখ্য গুণ, যথা স্থান-ব্যাপ্তি; যাহার স্থান-ব্যাপ্তি আছে—অর্থাৎ কিঞ্চিৎ স্থান দখল করিয়া

যাহা বিস্তৃত রহিয়াছে, তাহাকে আমরা ইচ্ছা করিলেই টুকরা টুকরা করিয়া ভাঙিতে পারি। এইভাবে ভাঙিতে ভাঙিতে আমরা এমন এক ক্ষুদ্রতম অংশে আসিয়া পৌঁছিতে পারি, যাহাকে আর ভাঙা যায় না, জড়পদার্থের সেই ক্ষুদ্রতম অংশকে পরমাণু (Atom) বলা হয়। তবে এখানে একটি কথা সাবধান করিয়া দেওয়া দরকার। যৌগিক পদার্থের কোন পরমাণু নাই, শুধু মৌলিক পদার্থেরই পরমাণু সম্ভব। যৌগিক পদার্থ, যেমন জল; Hydrogen এবং Oxygen গ্যাসের সংযোগে জল প্রস্তুত করা হয়। অতএব যদি জলকে ভাঙিয়া ফেলা হয়, তাহা হইলে আমরা আর জল পাই না; ইহার উপাদানভূত মৌলিক দুইটি পদার্থ পাই। তখন আমরা আবার এই মৌলিক পদার্থ দুইটি ভাঙিতে পারি, এবং ভাঙিতে ভাঙিতে আমরা ইহাদের প্রত্যেকটিরই পরমাণু আবিষ্কার করিতে পারি। এইভাবে আজ পর্যন্ত ৯২টি মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে; ইহাদের মধ্যে Hydrogen পরমাণুর ওজন সর্ব্বাপেক্ষা কম, আর Uranium পরমাণুর ওজন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। এই সকল বিভিন্ন পরমাণু সংযোগে বিভিন্ন পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে; যেমন Hydrogen এবং Oxygen মিলিত হইয়া জল হইয়াছে, সেইরূপ Hydrogen, Oxygen, Nitrogen, Argon প্রভৃতি বহুবিধ গ্যাস মিশ্রিত হইয়া বায়ু সৃষ্টি হইয়াছে।*

Atomic Theory

পরমাণু সম্বন্ধে আমরা এখন দুইরকম মতবাদের কথা আলোচনা করিব। প্রথমটির নাম Atomic Theory এবং দ্বিতীয়টির নাম Electronic Theory বা Dynamic Theory। প্রথমটির সহিত সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক Dalton-এর নাম ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত আছে; তিনি পরমাণু সম্বন্ধে বহু গবেষণা করিয়াছেন, সেইজন্য এই মতবাদকে অনেক সময়ে Daltonic Theory নামেও অভিহিত করা হয়। বস্তুতঃ বর্তমান যুগে ইহাই পরমাণু সম্বন্ধীয় প্রাথমিক মতবাদ। তবে ইহা আজকাল অনেকাংশে পরিত্যক্ত হইয়াছে; ইহার পরিবর্তে যে মতবাদ গৃহীত হইয়াছে তাহার নাম Electronic

* গ্রীকদর্শনে এবং হিন্দুদর্শনে যে পরমাণুর কথা বলা হইয়াছে, তাহাকে ঠিক পরমাণু বলা যায় না। জলের ক্ষুদ্রতম অংশকে তাঁহারা জলের পরমাণু বলিয়াছেন, বায়ুর ক্ষুদ্রতম অংশকে তাঁহারা বায়ুর পরমাণু বলিয়াছেন। কিন্তু জল ও বায়ু তো মৌলিক পদার্থ নহে; ইহারা প্রত্যেকটীই যৌগিক পদার্থ; অতএব ইহাদিগকে ভাঙিয়া ফেলিলে জল বা বায়ুর পরমাণ পাওয়া যায় না, শুধু ইহাদের উপাদানের পরমাণু পাওয়া যায়।

Theory বা Dynamic Theory। এই মতবাদের সহিতই আধুনিক কালের অতি ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র 'আণবিক বোমার' নাম সংযুক্ত।

প্রথমে Atomic মতবাদ ব্যাখ্যা করা যাউক। Dalton বলেন যে মৌলিক পদার্থেরই পরমাণু আছে; ইহাই উহার সূক্ষ্মতম অংশ; ইহাকে আর কোন সূক্ষ্মতর অংশে ভাগ করা যায় না; অর্থাৎ এই পরমাণুর মধ্যে অন্য কোন পরমাণু বা অন্য কোন জিনিষ থাকিতে পারে না। তাঁহার দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, পরমাণু মাত্রই নিশ্চল, নিষ্ক্রিয় ও নিস্পন্দ। ইহাদের নিজস্ব এমন কোন তেজ বা শক্তি নাই যাহার প্রভাবে ইহারা স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিতে পারে। তাই যেখানে রাখা হয় সেখানেই ইহা-দিগকে পড়িয়া থাকিতে হয়, নিজেরা যে অন্যত্র সরিয়া যাইবে সে ক্ষমতা ইহাদের নাই। অর্থাৎ 'জাড্য' বা জড়তাই ইহাদের গুণ, ইহারা নিজেরা নড়িতে চড়িতে পারে না; সেইজন্যই ইহাদিগকে জড় পদার্থ বলা হয়।

কিন্তু এখানে একটি কথা আছে; ইহারা যদি নিজেরা নড়াচড়া করিতে না পারে, তবে ইহারা পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইবে কেমন করিয়া? অথচ ইহারা সংযুক্ত না হইতে পারিলে, পৃথিবীতে কোন যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হইত না; তখন আমরা দেখিতাম শুধু অসংখ্য পরমাণু নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু তাহা তো দেখি না; দেখি ইহাদের সংযোগের ফলে এক বিশাল বিশ্বজগৎ সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু যাহাদের নিজেদের কোনরূপ আভ্যন্তরীণ (Intra-atomic) শক্তি নাই, তাহারা কি করিয়া পরস্পরের নিকটে গিয়া পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইবে? উহা কি সম্ভব? ইহার উত্তরে জড়বাদিগণ বলেন যে ইহাদের নিজেদের কোন আভ্যন্তরীণ শক্তি নাই বটে, কিন্তু বাহির হইতে ইহাদের উপর শক্তি প্রয়োগ করা যায়। বহির্জগতের এই (Extra-atomic) শক্তির প্রভাবে তাহারা স্থানচ্যুত হইয়া পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইতে পারে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাউক। ঘরের মধ্যে তিনটি বল্ নিশ্চল হইয়া বিদ্যমান আছে, ইহাদের নিজেদের কোন আভ্যন্তরীণ শক্তি নাই, তাই কেহই নিজ নিজ স্থান ত্যাগ করিয়া অপরের নিকট যাইতে পারে না। কিন্তু ধর, আমি আসিয়া একটি বলকে ধাক্কা দিয়া আর একটির নিকট ঠেলিয়া দিলাম। তখন আর কোন মুশ্‌কিল হইল না; আমার শক্তিতে শক্তিমান হইয়া বল্‌টি তখন দ্বিতীয় বল্‌টির উপর আসিয়া পড়িল; এইভাবে শক্তি লাভ করিয়া দ্বিতীয় বল্‌টি আবার তৃতীয় বল্‌টির উপর গিয়া পড়িল। এক্ষেত্রে কাহারো কোন নিজস্ব শক্তি নাই বটে, কিন্তু বাহিরের শক্তির প্রভাবে ইহাদের মধ্যে গতি সঞ্চার (motion) হইতেছে, ফলে একটি আর একটির

নিকট গিয়া সংযুক্ত হইতে পারিতেছে। পরমাণু সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা প্রযোজ্য। ইহাদের নিজেদের কোন আভ্যন্তরীণ শক্তি নাই বটে, কিন্তু বাহিরের শক্তি আসিয়া ইহাদের উপর ক্রিয়া করিতে পারে; তখন সহজেই ইহাদের মধ্যে গতির সঞ্চার হয়, ফলে ইহারা অনায়াসে পরস্পরের নিকট গিয়া সংযুক্ত হইতে পারে।

সমালোচনা

ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই : স্বীকার করা যাউক যে বাহির হইতে শক্তি আসিয়া পরমাণুর মধ্যে সঞ্চারিত হইতে পারে। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি—বাহিরে শক্তি আছে কোথায়? কোথাও তো শক্তির কোন আধার দেখি না। সর্বত্রই দেখি, পরমাণু আর পরমাণু, আর কিছুই নাই; শুধু পরমাণুর পর পরমাণু ভিড় করিয়া বসিয়া আছে। ইহাদের প্রত্যেকটিই জড় পদার্থ, ইহাদের কাহারো মধ্যে কোন তেজ বা শক্তি নাই; তাহা হইলে কোথা হইতে শক্তি আসিবে? কোন স্থানে শক্তি থাকিলে তো সেই শক্তি আসিয়া পরমাণুর মধ্যে সঞ্চারিত হইবে; নতুবা শক্তি সঞ্চারের কোন প্রকার সম্ভাবনা নাই। এবং শক্তিই যদি না আসিতে পারিল তাহা হইলে এই বিশ্বজগতে গতি (Motion) আসিবে কেমন করিয়া? প্রত্যেক পরমাণুই তখন স্থাণু হইয়া, নিশ্চল হইয়া বসিয়া থাকিবে; কেহই কাহারো উপর ক্রিয়া করিবে না, কোথাও ইহাদের কোন সংযোগ সাধিত হইবে না; ইহারা প্রত্যেকেই পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র রহিয়া নিজ নিজ স্থানে বিরাজ করিতে পারিবে। তাহা হইলে ইহারা কী সৃষ্টি করিবে, আর কেমন করিয়াই বা সৃষ্টি করিবে? আদিকালে যেমন ছিল, উহারা ঠিক তেমনই রহিয়া যাইবে; উহাদের দ্বারা কোন প্রকার সৃষ্টি সম্ভব হইবে না। এই নিশ্চল নিস্পন্দ পরিস্থিতি হইতে রক্ষা পাইবার উপায়—Electronic Theory বা Dynamic Theory। এখন এই দ্বিতীয় মতবাদ ব্যাখ্যা করা যাউক।

Electronic Theory

পরমাণু সম্বন্ধে Dalton বলিয়াছেন যে উহাই জড় পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ, উহাকে আর কোন ক্ষুদ্রতর অংশে ভাগ করা যায় না; অর্থাৎ পরমাণুর মধ্যে আর কোন পরমাণু বা অন্য কোন জিনিষ থাকিতে পারে না। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ ইহা স্বীকার করেন না; তাঁহারা বলেন যে পরমাণুই ক্ষুদ্রতম অংশ নহে; পরমাণুকেও আবার ভাঙা যায়; পরমাণুর মধ্যেও নানাবিধ ক্ষুদ্রতর অংশ আছে। প্রত্যেক পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে আছে Proton, এবং ইহাকে ঘিরিয়া আছে এক বা একাধিক Electron। বৃহস্পতি, শুক্র, শনি প্রভৃতি গ্রহ যেমন সূর্যকে

কেন্দ্র করিয়া উহার চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, ইলেকট্রনগুলিও তেমন প্রোটনকে কেন্দ্র করিয়া উহার চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই ভাবে চিন্তা করিলে বুঝা যাইবে যে প্রত্যেক পরমাণুই এক একটি ছোটখাট সৌরজগৎ-বিশেষ ; উহার মধ্যবিন্দুতে আছে Proton, আর প্রোটন্‌কে প্রদক্ষিণ করিতেছে Electron।

এই প্রোটন ও ইলেক্‌ট্রন জিনিসগুলি কি ? বৈজ্ঞানিকগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে ইহারা এক একটি প্রচণ্ড শক্তি কেন্দ্র, অমিতপরাক্রম বৈদ্যুতিক শক্তি ইহাদের মধ্যে আধৃত আছে ; অথবা একটু ঘুরাইয়া বলা যায় যে ইহারা প্রত্যেকেই বৈদ্যুতিক শক্তির এক একটি পিণ্ড বিশেষ, পরমাণুর মধ্যে ইহারা আধৃত আছে। এই পরমাণুকে যদি ভাঙিয়া ফেলা হয়—তাহা হইলে কি হয়, উহাই এখন চিন্তা করা যাউক। Dalton বলিবেন, কিছুই হয় না ; কারণ তাঁহার মতানুসারে পরমাণু একটি নিষ্ক্রিয় জড় পদার্থ মাত্র ; উহার মধ্যে কিছুই নাই ; অতএব উহাকে ভাঙিয়া ফেলিলে কিছুই হইবে না। বরং তিনি বলেন যে উহাকে ভাঙাই সম্ভব নহে ; কারণ, উহাই তো ক্ষুদ্রতম অংশ, উহার মধ্যে আর কোন ক্ষুদ্রতর অংশ নাই ; তাহা হইলে উহাকে ভাঙা যাইবে কেমন করিয়া ? কিন্তু Electronic মতানুসারে, ইহাকে ভাঙিয়া ফেলা সম্ভব, কারণ, ইহার মধ্যে আরও ক্ষুদ্রতর অংশ আছে—প্রোটন আছে, ইলেকট্রন আছে। এবং আরও যে কিছু নাই তাহা এখনও কেহ জোর করিয়া বলিতে পারে না)। ইহারা প্রত্যেকেই এক একটি বৈদ্যুতিক শক্তি কেন্দ্র। অতএব পরমাণুকে ভাঙিয়া ফেলিলেই এইসব বৈদ্যুতিক কেন্দ্রগুলি ফাটিয়া যাইবে। তখন উহা হইতে যে কি প্রচণ্ড শক্তি নির্গত হইতে পারে তাহার নমুনা দেখা গিয়াছিল হিরোসিমায় আণবিক বোমা বিস্ফোরণে।

এই বোমা বিস্ফোরণের পরে এখন আর কেহই পরমাণুকে নিষ্ক্রিয় নিস্পন্দ জড় পদার্থ বলিয়া মনে করেন না ; সকলেই এখন স্বীকার করেন যে পরমাণুগুলি শক্তিতে পরিপূর্ণ। যখন পরমাণুর মধ্যেই শক্তি আছে স্বীকার করা হইতেছে, তখন আর উহাদের গতি ব্যাখ্যা করিবার জন্য বাহির হইতে শক্তি আমদানি করিবার প্রয়োজন হয় না। এখানেই Atomic মতবাদের সহিত Electronic মতবাদের প্রধান পার্থক্য। Atomic মতানুসারে পরমাণুর কোন আভ্যন্তরীণ শক্তি নাই ; সেইজন্য পরমাণুর মধ্যে গতি সঞ্চার করিবার জন্য বাহির হইতে শক্তি আনিবার প্রয়োজন হইতেছে ; এই বহিরাগত শক্তির প্রভাবেই পরমাণুসমূহ গতি সম্পন্ন হইয়া পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইতেছে এবং বিশ্বসৃষ্টি করিতেছে। কিন্তু পরমাণুর বাহিরে কোথায় শক্তি থাকিতে পারে ? কোথা হইতে শক্তি আসিবে ? Atomic

মতবাদিগণ ইহার কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন না ; সেইজন্য তাঁহাদের কল্পিত পরমাণুর দ্বারা বিশ্বসৃষ্টি ব্যাখ্যা করা যায় না। কিন্তু Electronic মতবাদে এরকম কোন সমস্যা নাই ; কারণ, তাঁহারা বলেন, পরমাণুসমূহের মধ্যে যে শক্তি আছে, সেই শক্তির প্রভাবেই উহারা পরস্পরের উপর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করিতে পারে। চুম্বকের মধ্যে যে শক্তি আছে, সেই শক্তির প্রভাবেই লোহার পেরেকটি উহার নিকট ছুটিয়া যায় ; সেইরূপ প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে যে শক্তি আছে, সেই শক্তির প্রভাবেই পরমাণুসমূহ পরস্পরের দিকে ছুটাছুটি করিতে থাকে। এইভাবে উহাদের পারস্পরিক সংযোগের ফলে বিশ্বজগৎ সৃষ্ট হইতেছে।

পরমাণুর শক্তি

একটু অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আমরা এখানে একটি প্রশ্ন বিচার করিতে চাই ; পরমাণুর মধ্যে এই যে শক্তি বিরাজ করিতেছে, ইহার স্বরূপ কি ? শক্তি বলিতে আমরা সাধারণতঃ তিন রকম শক্তি বুঝি, মনের শক্তি, প্রাণের শক্তি এবং যন্ত্রের শক্তি। দুর্বল শরীর লইয়াও আমি যখন প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হই, তখন আমি মানসিক শক্তি প্রয়োগ করি ; আর হাতী যখন বড় বড় গাছ উপড়াইয়া শুঁড় দিয়া লইয়া যায়, তখন আমরা প্রাণ-শক্তির পরিচয় পাই , এবং ইঞ্জিন যখন গাড়ী টানে তখন আমরা যান্ত্রিক শক্তির নমুনা দেখি। এখন আমাদের বক্তব্য এই : আমরা উপরে যে আণবিক শক্তির বর্ণনা দিয়াছি, উহা কি প্রকার শক্তি ? আপাততঃ মনে হয় যে উহা বিশুদ্ধ যান্ত্রিক শক্তি মাত্র, জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র হইতে যে রকম বৈদ্যুতিক শক্তি নির্গত হয়, ইহাও সেই রকম শক্তি। কিন্তু এ বিষয়ে আজকাল নানারূপ মতভেদ দেখা যাইতেছে , অনেকে বলেন ইহা যান্ত্রিক শক্তি নহে, ইহা প্রাণ-শক্তি। যে ব্যবস্থাতে আমাদের জীবন্ত দেহে প্রাণ শক্তির উদ্ভব হয়, অনেকটা সেই রকম ব্যবস্থাতেই পরমাণুর মধ্যে আণবিক শক্তি উদ্ভূত হইয়া থাকে। আমাদের দেহে বহু জীব-কোষ (cells) আছে ; একটি জীব-কোষ হইতে আর একটি জীব-কোষের উৎপত্তি হয় ; এই জীব-কোষগুলি পরস্পরের সহিত এমন ভাবে সংগঠিত থাকে যে সেই সংগঠন ব্যবস্থা (organisation) হইতেই প্রাণ ক্রিয়ার উদ্ভব হয়। সেইজন্য এই সংগঠন ব্যবস্থা নষ্ট হইয়া গেলেই আমাদের প্রাণ ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। পরমাণুর মধ্যেও ঠিক এইরূপ সংগঠন ব্যবস্থা দেখা যায়, প্রোটনের সহিত ইলেকট্রোন, এবং এক ইলেকট্রোনের সহিত অন্যান্য ইলেকট্রোনের সম্বন্ধ অতি গভীর এবং নিবিড়। জীবকোষগুলির ন্যায় ইহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ জীবন্ত ও প্রাণবন্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয় ; মনে হয় ইহারা পরস্পর পরস্পরকে

আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছে ; নিজেদের অন্তর্নিহিত শক্তির পুঞ্জীভূত ফলে ইহারা প্রাণচঞ্চল হইয়া কিসের জন্য যেন প্রস্তুত হইতেছে। ইঞ্জিনের বিভিন্ন অংশের ন্যায় পরমাণুর বিভিন্ন অংশগুলি মোটেই বিচ্ছিন্ন বা স্বতন্ত্র বলিয়া মনে হয় না; বরং মনে হয়, জীবকোষগুলি যেমন একই প্রাণের টানে ঐক্যবদ্ধ হইয়া আমাদের দেহে বিরাজ করে, ইলেকট্রোনগুলিও তেমন একই প্রাণের টানে ঐক্যবদ্ধ হইয়া পরমাণুর মধ্যে বিদ্যমান থাকে। তাই অনেকে আণবিক শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তির সহিত তুলনা না করিয়া প্রাণশক্তির সহিত তুলনা করেন। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত Leibnitz (লাইব্‌নিজ) আরও দূরে অগ্রসর হইয়াছেন ; তিনি ইহাকে "মনঃশক্তি" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলেন প্রত্যেক পরমাণু এক একটি মনবিন্দু বা Monad , মানুষের মধ্যে যেমন চেতন শক্তি আছে, পরমাণুর মধ্যেও তেমন চেতন শক্তি আছে। মনঃশক্তির পিণ্ড বলিয়া তিনি ইহাকে Monad নামে অভিহিত করিয়াছেন, আমরা ইহাকে মনবিন্দু বলিতে পারি।

লাইব্‌নিজের মতবাদ লইয়া আমরা এখানে আলোচনা করিতে চাই না; আমরা শুধু বলিতে চাই যে Dalton পরমাণুর যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা হইতে আজ আমরা বহুদূরে চলিয়া আসিয়াছি। তাঁহার মতানুসারে পরমাণুগুলি নিষ্ক্রিয় জড় পদার্থ মাত্র; ইহাদের নিজেদের কোনপ্রকার শক্তিসামর্থ্য নাই ; ইহারা কতগুলি মৃত জড়পিণ্ড বিশেষ। আর আজ আমরা যে পরমাণুর কথা চিন্তা করি তাহারা মোটেই জড়পিণ্ড নহে, তাহারা প্রত্যেকেই এক একটি প্রচণ্ড শক্তি-কেন্দ্র। চির-চঞ্চল, চির-অস্থির এই শক্তি-কেন্দ্রকে এখন আর কোনমতেই মৃত পিণ্ডের সহিত তুলনা করা যায় না , বরং প্রাণ শক্তির সহিত তুলনা করাই আমাদের মতানুসারে অধিকতর সঙ্গত। এমন কি, ইচ্ছা করিলে ইহাকে সচেতন শক্তি বলিয়াও অভিহিত করা যাইতে পারে, কিন্তু "জড়" বলিয়া ইহাকে আর কিছুতেই অভিহিত করা যাইতে পারে না। পরমাণু আজ আর জড় নহে ; ইহার জড়ত্ব অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে (Dematerialisation of matter) ; তাই ইহার মধ্যে আমরা এখন উচ্চস্তর শক্তির পরিস্ফুরণ দেখিতেছি।

Matter and Motion

পরমাণুর এই শক্তিকে আমরা দুইভাবে বিচার করিতে পারি—Fixed Energy এবং Free Energy ; উদাহরণ দিয়া বুঝান যাউক। (i) **Fixed Energy** ; শক্তি যখন পরমাণুর মধ্যে স্থির হইয়া থাকে, তখন পরমাণুর কোন গতি (motion) থাকে না ; পরমাণু তখন নিশ্চল হইয়া কোন এক স্থানে অবস্থান করে। তবে নিশ্চল থাকিলেও উহা কিন্তু শক্তিহীন থাকে না ; ফলে সহজে উহাকে

উহার স্থান হইতে সরান যায় না। টেবিলটি সরাইতে যাও—দেখিবে তোমার আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য টেবিলও নিজ শক্তি প্রয়োগ করিতেছে। অবশ্য মানুষ যেমনভাবে শক্তি প্রয়োগ করে টেবিল ঠিক তেমনভাবে শক্তি প্রয়োগ করে না; তবুও নিজের ভারে বলীয়ান হইয়া উহা নিজের স্থানটুকুতে জাঁকিয়া বসিয়া থাকিতে চায়, সহজে স্থানচ্যুত হইতে চায় না। শক্তি এক্ষেত্রে বদ্ধভাবে বিরাজ করিতেছে। এই বদ্ধ-শক্তিকেই Matter বলে; প্রতিরোধ ইহার প্রধান কাজ। (ii) **Free Energy**; শক্তি যে সকল ক্ষেত্রেই আবদ্ধ থাকে তাহা নহে, ইহা মুক্ত ভাবেও বিরাজ করিতে পারে; তখন ইহাকে Free Energy বলে। শক্তি যখন মুক্তভাবে ক্রিয়া করে, তখন পরমাণু আর নিশ্চল থাকিতে পারে না, শক্তির প্রভাবে সচল হইয়া ইহাকে স্থানান্তরে গমন করিতে হয়। তুমি যখন প্রবলভাবে টেবিলের উপর শক্তি প্রয়োগ কর, তখন আর টেবিলের পক্ষে নিশ্চল হইয়া বসিয়া থাকা সম্ভব নহে; ইহাকে নিজস্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিতে হয়। এইভাবে গমন বা গতির (Motion) উদ্ভব হয়। একটি বল্ যখন আর একটি বল্‌কে ধাক্কা মারে, তখনও ঠিক এইরকম অবস্থার সৃষ্টি হয়। প্রথম বলের শক্তি মুক্তি লাভ করিয়া যখন দ্বিতীয় বল্‌কে আক্রমণ করে, তখন প্রথম বলের জন্য স্থান ছাড়িয়া দিয়া দ্বিতীয় বলটিকে অন্য স্থানে যাইতে হয়। এইভাবে স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করাকে গতি বলে। বদ্ধশক্তি মুক্তি পাইলেই গতির সৃষ্টি হয়। তাই মুক্ত শক্তিকে ইংরাজীতে Motion বলে।

তাহা হইলে দেখা গেল যে Matter এবং Motion—ইহাদের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই, ইহারা বস্তুতঃ একই জিনিষের বিভিন্ন দিক। উপমার ভাষায় বলা যায় যে শক্তি যখন ঘনীভূত হইয়া নিশ্চল থাকে, তখন উহা Matter; আর শক্তি যখন তরল হইয়া চঞ্চল হইয়া পড়ে, তখন উহা Motion। উহারা একই শক্তির বিভিন্ন রূপ। অতএব পরমাণুকে শুধু Matter বা জড় বলা সঙ্গত নহে; উহাকে ঘনীভূত শক্তি বলাই অধিকতর সঙ্গত, অর্থাৎ **শক্তির ঘনীভূত রূপের নাম পরমাণু**। এই পরমাণুর সাহায্যে জড়বাদিগণ কিভাবে বিশ্বসৃষ্টি করেন, তাহাই আমরা এখন আলোচনা করিব। তাঁহারা বলেন, প্রত্যেক পরমাণুরই নিজ নিজ গুণ বা ধর্ম আছে; যেমন হাইড্রোজেন পরমাণুর একরকম গুণ, Oxygen-পরমাণুর আর একরকম গুণ; এইসব গুণ অনুযায়ী বিভিন্ন পরমাণু বিভিন্ন ভাবে ক্রিয়া করে। ইহাকে প্রাকৃতিক নিয়ম বলে। এইরূপ প্রাকৃতিক নিয়মের বশীভূত হইয়া পরমাণুগুলি অনন্তকাল ধরিয়া দিকে দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে; যখন মিলিত হইতেছে তখন পরস্পরের স্বভাব অনুযায়ী তাহারা যৌগিক পদার্থে

পরিণত হইতেছে; আর যখন বিচ্ছিন্ন হইতেছে তখন নিজ নিজ অন্তর্নিহিত তেজের প্রভাবেই তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে। বাহির হইতে কেহ উহাদিগকে জোর করিয়া মিলিত করিতেছে না, বা জোর করিয়া ভাঙিয়া দিতেছে না; ইহাদের মিলন ও ভাঙন, গতি ও স্থিতি, স্পন্দন ও উত্তেজন—সবই প্রকৃতির নিয়মে সংঘটিত হইতেছে। এইভাবেই জগৎ সৃষ্টি হইতেছে, শুধু জড়-জগৎ নহে, প্রাণী-জগৎ ও অধ্যাত্ম-জগৎ—সকলেরই মূলে রহিয়াছে এইসব অণুপরমাণুর ক্রিয়া প্রক্রিয়া অর্থাৎ এইসব পরমাণু হইতে সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রের ন্যায় শুধু যে অচেতন পদার্থই উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা নহে; জীব জন্তুর প্রাণ এবং মানুষের মনের ন্যায় সচেতন পদার্থেরও উদ্ভব হইতে পারে এবং উদ্ভব হইয়া থাকে। অতএব চেতন ও অচেতন সকল পদার্থেরই মূলে আছে এইসব জড় উপকরণ; ইহারাই নানাভাবে সংগঠিত হইয়া নানাবিধ রূপে আবির্ভূত হইতেছে। ইহাকে বিশুদ্ধ জড়বাদ (Materialism) বলে, ইহাতে ঈশ্বরের কোন স্থান নাই; পরমাণুই একমাত্র কারণ।*

Mechanical Evolution

পরমাণু হইতে সব সৃষ্টি হইতেছে বটে, তবে বলা বাহুল্য একদিনেই সব সৃষ্ট হয় নাই; কোটি কোটি বৎসরের বিবর্তনের ফলে ইহারা আজকাল বর্তমান আকার গ্রহণ করিয়াছে। এইভাবে বিশ্ব-জগৎ, জীব-জগৎ, অধ্যাত্ম-জগৎ প্রভৃতি বিভিন্ন জগতের উদ্ভব হইয়াছে। প্রথমে সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রের উদ্ভব হইয়াছে; তারপরে জীবজন্তু আসিয়াছে, সর্বশেষে মানুষের আবির্ভাব হইয়াছে। মানুষ বলিতে এখানে আমরা বিশেষভাবে তাহার মন বা আত্মা বুঝি; এই আত্মা কি করিয়া আবির্ভাব হইল তাহা আমরা অধ্যাত্ম-তত্ত্বে আলোচনা করিয়াছি; তৎপ্রসঙ্গে জড়বাদিগণ কিভাবে উহা ব্যাখ্যা করেন, তাহাও বলিয়াছি। তাঁহাদের মতবাদের নাম Mechanical Evolution of Mind, তাঁহারা বলিতে চান যে পরমাণুই বিবর্তিত হইয়া আত্মাতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু উহা যে সম্ভব নহে, তাহা আমরা যথাস্থানে প্রমাণ করিয়াছি। অতএব এবিষয়ে এখানে আর কিছু বলা

---

* আজকাল Materialism না বলিয়া অনেকে ইহাকে Naturalism নামে অভিহিত করিতেছেন। তাহার কারণ, পূর্বে Matter বলিতে যাহা বুঝাইত আজকাল ঠিক তাহা বুঝায় না। পূর্বে Matter বলিতে নিষ্ক্রিয় জড় পিণ্ড বুঝাইত; ইহার নিজের কোন অন্তর্নিহিত শক্তি ছিল না; ইহাকে পরিচালনা করিবার জন্য বাহির হইতে শক্তি আনিতে হইত। কিন্তু আজকাল Matter বলিতে আমরা ইহার অন্তর্নিহিত শক্তির উপরেই গুরুত্ব আরোপ করি বেশী। ইহার নিজস্ব শক্তি, ধর্ম বা গুণ আছে; এই শক্তি বা গুণ অনুযায়ী কাজ করাকেই প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী কাজ করা বলে। তাই এই মতবাদকে ইংরাজীতে আজকাল Naturalism বলা হয়।

হইবে না। তারপর "প্রাণ-তত্ত্বে" প্রাণ এবং প্রাণীর আবির্ভাব সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে জড়বাদিগণের মতবাদও (Mechanical Evolution of Life) ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। জড়বাদিগণ বলিতে চান যে পরমাণুই বিবর্তিত হইয়া প্রাণে পরিণত হইয়াছে। ইহা যে সম্ভব নহে তাহাও আমরা যথাস্থানে ব্যাখ্যা করিয়াছি।* অতএব এবিষয়েও এখানে আর কিছু বলা হইবে না। এক কথায় Mental Evolution এবং Biological Evolution সম্বন্ধে জড়বাদিগণ যাহা বলেন তাহা পূর্বেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এখানে আমরা শুধু তাঁহাদের Cosmological Evolution ব্যাখ্যা করিব, অর্থাৎ সূর্য চন্দ্র গ্রহ সমন্বিত এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কেমন করিয়া উদ্ভূত হইল, তাহাই আমরা এখন আলোচনা করিব।

এই প্রসঙ্গে Herbert Spencer এবং Laplace—এই দুইজন পণ্ডিতের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঈশ্বরকে বাদ দিয়া শুধু অণুপরমাণুর সাহায্যে তাঁহারা বিশ্ববিবর্তন ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, আমরা আজ যে পৃথিবীতে বাস করিতেছি, কোটি কোটি বৎসর আগে উহার আকার ও গঠন ঠিক এইরূপ ছিল না। তখন অসংখ্য অণুপরমাণু পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়া এক বিরাট কুজ্ঝটিকার ন্যায় মহাব্যোমে ভাসিয়া বেড়াইতে-ছিল; গভীর রাতে আকাশে ছায়াপথ (milky way) দেখিতে যেরকম লাগে, অনেকটা হয়ত সেইরকমই দেখিতে লাগিত। ইহাকে আমরা নীহারিকা (Nebula) বলিতে পারি। ইহার মধ্যে কোথাও কোন পার্থক্য বা বিভিন্নতা ছিল না, সমস্ত পরমাণু একত্রিত হইয়া এক বিশাল সমষ্টির সৃষ্টি করিয়াছিল। এই একত্রীভূত পদার্থটিকে Homogeneous body বলা যাইতে পারে। Homogeneous মানে সমসত্ত্ব; অর্থাৎ যে সব উপাদান লইয়া এই সমষ্টির সৃষ্টি হইয়াছিল তাহারা প্রথমে সবই সম-সত্তা সম্পন্ন ছিল; অর্থাৎ "ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই ভেদ নাই;" ইহাদের মধ্যে তখন কোন ভেদ ছিল না। ভেদ আসিল পরে। নিজেদের অন্তর্নিহিত শক্তির

* আমাদের মতানুসারে পরমাণু হইতে প্রাণের উৎপত্তি হইতে পারে না, মনেরও উৎপত্তি হইতে পারে না। পরমাণু হইতে পরমাণু সদৃশ পদার্থেরই উৎপত্তি হওয়া সম্ভব (Mechanical Evolution); মন ও প্রাণের ন্যায় একেবারে অভিনব পদার্থের উৎপত্তি হইতে পারে না। পরমাণু ও প্রাণ (বা পরমাণু ও মন) ইহাদের মধ্যে এত বৃহৎ ব্যবধান (gap; hitch) বিদ্যমান যে পরমাণুর পক্ষে উহা অতিক্রম করা সম্ভব নহে; অর্থাৎ পরমাণুর পক্ষে প্রাণ বা মনের ন্যায় এক সম্পূর্ণ বিভিন্ন জিনিষে পরিণত হওয়া অসম্ভব। যখন এক সম্পূর্ণ নূতন জিনিষের উদ্ভব হয় তখন Mechanical বিবর্তনবাদের দ্বারা উহা ব্যাখ্যা করা যায় না; তখন Emergent Evolution গ্রহণ করা ছাড়া আর উপায় নাই।

প্রভাবে এবং বাহিরের তাপে ও চাপে যখন এই সমষ্টির মধ্যে ভাঙন দেখা গেল, তখনই ভেদের সৃষ্টি হইল। যাহারা এতদিন একত্রে ছিল তাহারা এখন সমষ্টি হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া নানাভাবে পৃথক হইয়া পড়িল। এইভাবে একটি প্রকাণ্ড পিণ্ড বিচ্ছিন্ন হইয়া সূর্য রূপ গ্রহণ করিল; আর অন্যান্য অংশ পৃথক হইয়া শনি, মঙ্গল, পৃথ্বী প্রভৃতি গ্রহরূপে দেখা দিল। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব সমষ্টির সম-সত্ত্বা ধ্বংস হইয়া গেল; বিভিন্ন সত্ত্বার আবির্ভাবে তখন বিষম-সত্ত্বার (Heterogeneous body) উদ্ভব হইল, ইহারা আর ভাই ভাই এক ঠাঁই রহিল না; বিভিন্ন হইয়া বিভিন্ন সত্ত্বার সৃষ্টি করিল। তবে এইখানেই সব শেষ হইয়া গেল না; কারণ যে পৃথিবী সমষ্টি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিল, কিছুদিন পরে উহার মধ্যে আবার বিভেদের বিষ ক্রিয়া করিতে লাগিল; ফলে যে পৃথিবী প্রথমে একই রকম (Homogeneous) ছিল, তাহার মধ্যে ক্রমশঃ বিভিন্ন দৃশ্যের উদ্ভব হইতে লাগিল—পর্বত হইল, সমুদ্র হইল, বনজঙ্গল প্রভৃতি (Heterogeneous) কত কি হইল। প্রথমে যাহা সমষ্টিভূত (Integrated) থাকে, তাহাই পরে খণ্ডিত (disintegrated) হইয়া বিভেদের সৃষ্টি করে; প্রথমে যাহা সম-সত্ত্বা থাকে তাহা হইতেই বিষম সত্ত্বার উদ্ভব হয়। এইভাবে কোটি কোটি বৎসর ধরিয়া বিশ্ব-বিবর্তন চলিয়াছে, এবং তাহারই ফলে আজ এই সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ সমন্বিত বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে। এক্ষেত্রে ঈশ্বরের কোন স্থান নাই, অণুপরমাণুই ইহার একমাত্র কারণ; প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী বিবর্তিত হইয়াই ইহারা বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছে।

সমালোচনা

পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে ভগবৎ-তত্ত্ব প্রসঙ্গে আমরা এই মতবাদের যথাযথ সমালোচনা করিয়াছি; এখানে উহার পুনরুল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। শুধু এইটুকু বলিতে চাই যে আমরাও পরমাণুর অস্তিত্ব ও উহার কার্য-কারিতা স্বীকার করি; পরমাণু সংযোগেই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা মানি, এবং অনাদিকাল হইতে এই বিশ্ববিবর্তন চলিতেছে ও অনন্ত কাল ধরিয়া ইহা চলিতে থাকিবে—তাহাও স্বীকার করি। তথাপি আমরা জড়বাদিগণের মতবাদ গ্রহণ করিতে পারি না; কারণ তাঁহারা যেভাবে বিশ্ববিবর্তন ব্যাখ্যা করেন তাহা আমাদের নিকট মোটেই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। তাঁহারা বলেন যে এইসব অণুপরমাণু নিজেরাই পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইতেছে, এবং সংযুক্ত হইয়া নিজেরাই যন্ত্রবৎ

বিবর্তিত হইয়া চলিয়াছে; ইহা পরিচালনা করিবার জন্য কোন মননশীল কর্তার প্রয়োজন নাই। কিন্তু আমরা বলিতে চাই যে, এই বিবর্তনের পশ্চাতে যদি কোন মননশীল কর্তা না থাকে, তাহা হইলে আর যাহাই হউক না কেন, সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ সমন্বিত এই নিপুণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইতে পারে না। আমরা জিজ্ঞাসা করি—একটি সামান্য ঘড়ি যখন আপনা-আপনি সৃষ্ট হইতে পারে না, তখন এই সূর্য চন্দ্র গ্রহ তারাই বা আপনা-আপনি সৃষ্ট হইবে কেমন করিয়া? ধর, যে সব মালমসলা নিয়া একটি ঘড়ি নির্মিত হয়, যেমন কাচ, কাঁটা, স্প্রিং, স্টিল প্রভৃতি জিনিস সবই অনন্ত আকাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহা হইলেই কি ইহারা আপনা-আপনি সংযুক্ত হইয়া একটি সুন্দর ঘড়িতে পরিণত হইতে পারিবে? ঘুরিতে ঘুরিতে কাচ আসিয়া কাঁটার সহিত সংযুক্ত হইতে পারে, তাহা আমরা স্বীকার করি; এবং স্টিল ঘুরিতে ঘুরিতে স্প্রিং-এ পরিণত হইতে পারে, তাহাও আমরা মানিতে রাজী আছি। কিন্তু তাই বলিয়া কি এতগুলি বিভিন্ন জিনিস এমনভাবে সংযুক্ত হইতে পারে যাহার ফলে একটি সুন্দর ঘড়ি উৎপন্ন হইতে পারে? উহা কি সম্ভব? ঘড়ির বিভিন্ন অংশের মধ্যে যে শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য আছে—উহার উৎপত্তি হইল কেমন করিয়া? এক্ষেত্রে কোথাও কোন কারিগরের প্রয়োজনীয়তা নাই, সবই আকস্মিক ঘটনা প্রবাহে সৃষ্ট হইতেছে—ইহা কি সম্ভবপর ব্যাপার? ঘড়ির বিভিন্ন অংশের মধ্যে যে শৃঙ্খলা ও সঙ্গতি লক্ষ্য করি, তাহা অপেক্ষাও অধিকতর শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য দেখিতে পাই সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যে। যে আশ্চর্য শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা সহকারে এইসকল বিশাল গ্রহ উপগ্রহ নিরন্তর আবর্তন করিয়া চলিয়াছে, তাহা ভাবিলে আমরা অবাক হইয়া যাই। উহাদের অদ্ভুত শৃঙ্খলা ও পারস্পারিক সামঞ্জস্য আসিল কোথা হইতে? তাই আমরা বলি যে ঘড়ি নির্মাণের জন্য যেমন কারিগরের প্রয়োজন, বিশ্ববিবর্তনের জন্যও তেমন সৃষ্টি-কর্তার প্রয়োজন; অর্থাৎ ইহাদের কোনটিই আপনা-আপনি সাধিত হইতে পারে না; প্রত্যেকেরই মূলে আছে এক মননশীল কর্তার মানসিক নিয়ন্ত্রণ।

তাহা হইলে দেখা গেল যে ঈশ্বরকে বাদ দিয়া জড়বাদিগণ যেরূপ ভাবে বিশ্বসৃষ্টি ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করেন (Mechanical Evolution) তাহা মোটেই সন্তোষজনক নহে। আমাদের মতানুসারে ঈশ্বরকে বাদ দিয়া শুধু অণুপরমাণুর সাহায্যে বিশ্বসৃষ্টি ব্যাখ্যা করা যায় না। পরমাণুসমূহ বিবর্তিত হইয়া চলিয়াছে বটে, কিন্তু এই বিবর্তনের পশ্চাতে আছে ঈশ্বরের

নিয়ন্ত্রণ। তিনিই ইহাদিগকে স্বীয় উদ্দেশ্য অনুযায়ী পরিচালনা করিতেছেন —যাহাতে ইহারা ধীরে ধীরে বিবর্তিত হইয়া তাঁহারই পরিকল্পিত সূর্য চন্দ্রে রূপায়িত হইতে পারে। এইভাবে যে বিশ্ব বিবর্তন ব্যাখ্যা করা হয় তাহাকে উদ্দেশ্যমূলক বিবর্তন বা Teleological Evolution বলে। Mechanical বিবর্তনের ন্যায় ইহা মোটেই নিরুদ্দেশ অভিযান নহে; ইহার মধ্যে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য নিহিত আছে। বস্তুতঃ তাঁহার সেই উদ্দেশ্যকেই কার্যে রূপায়িত করিবার জন্য এই বিবর্তন-চক্র পরিচালিত হইতেছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

স্থান প্রসঙ্গ (The Problem of Space)

আমরা পূর্ব অধ্যায়ে বলিয়াছি যে, জড় পদার্থ মাত্রেরই একটু না একটু স্থান-ব্যাপ্তি আছি। যে স্থানে অধুনা এক জড় পদার্থ বর্তমান আছে তাহা সেস্থান ত্যাগ করিতে পারে বটে, কিন্তু যেখানেই থাকুক না কেন, তাহাকে কোন না কোন স্থান বিশেষে বিদ্যমান থাকিতেই হইবে। এইভাবে যাহা প্রত্যেক জড় পদার্থের মধ্যেই অপরিহার্যরূপে বিদ্যমান তাহাকে পারিভাষিক সংজ্ঞায় দেশ (Space) বলা হয়। দেশ-তত্ত্ব দর্শন শাস্ত্রের এক জটিল তত্ত্ব। এখানে সংক্ষেপে ইহার কথা কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইবে। দেশ সম্বন্ধে আমরা চারি প্রকার মতবাদ ব্যাখ্যা করিব; যথা—Objective View, Subjective View, Kantian View এবং Hegelion View। প্রথমতঃ

I. Objective View.

ইহাই স্থান সম্বন্ধীয় সাধারণ মতবাদ (Common sense view)। সাধারণ মতে আমরা কি ভাবে স্থান প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, তাহাই প্রথমে একটি উদাহরণ দিয়া বুঝান যাউক ; তুমি আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখিলে যে, অসংখ্য তারা ঝিক্‌মিক্ করিতেছে ; তুমি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছ যে ইহারা পাশাপাশি একই সঙ্গে বিদ্যমান রহিয়াছে। মনে রাখিতে হইবে, তারাগুলি একটির পর একটি আসিয়া উপস্থিত হইতেছে না; সবগুলি তারাই একই মুহূর্তে বিরাজ করিতেছে। ইহা কি করিয়া সম্ভব হয় ? স্থান-ব্যাপ্তিই ইহার একমাত্র কারণ; স্থান আছে এবং স্থানের মধ্যে ব্যাপ্ত আছে বলিয়াই তারাগুলি একই সঙ্গে অবস্থান করিতে

পারে, নতুবা সবগুলি তারা জড়সড় হইয়া এক কিম্ভূতকিমাকার পদার্থে পরিণত হইত ; এবং তাহাও হইতে পারিত কি না সন্দেহ ; কারণ, এক কিম্ভূতকিমাকার পদার্থে পরিণত হইলেও উহাকে তো কোন স্থান বিশেষে অবস্থান করিতে হইত, কিন্তু স্থান না থাকিলে অবস্থান করিত কোথায় ? এই অসম্ভব পরিণতি হইতে রক্ষা করিয়াছে—স্থান-ব্যাপ্তি। স্থান মানে সেই জিনিষ যাহার জন্য দুই বা ততোধিক পদার্থ একই মুহূর্তে একই সঙ্গে পাশাপাশি বিদ্যমান থাকিতে পারে (co-existence)। অতএব আকাশে তারাগুলিকে একই মুহূর্তে পাশাপাশি দেখিতে পাইয়া আমরা প্রকৃতপক্ষে স্থানই প্রত্যক্ষ করি—যাহা না থাকিলে ইহাদের একত্র অবস্থান সম্ভব হইত না। তাই স্থানকে সাধারণতঃ আমরা এক বিরাট আধার বলিয়া মনে করি, জল যেমন পাত্রের মধ্যে আধৃত থাকে, জড়পদার্থসমূহও তেমন স্থানের মধ্যে বিদ্যমান থাকে ; ইহা তাহাদের আধার।

এই আধার ছাড়া কোন জড় পদার্থই বিদ্যমান থাকিতে পারে না। ইহা স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে পারে বটে, কিন্তু যেখানেই যাউক না কেন, ইহাকে কোন স্থান বিশেষে বিদ্যমান থাকিতেই হইবে। কিঞ্চিৎ স্থান দখল না করিয়া ইহা কিছুতেই বিরাজ করিতে পারে না। এই স্থান-ব্যাপ্তি আছে বলিয়া প্রত্যেক জড় পদার্থেরই একটু না একটু দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা (Three Dimensions) আছে। কলম পেন্সিল, টেবিল চেয়ার, গাছ পাতা ফলফুল যে কোন পদার্থের দিকে লক্ষ্য করিলেই একথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবে ; দেখিতে পাইবে যে প্রত্যেক জিনিষই অল্পাধিক দীর্ঘ, প্রস্থ এবং উচ্চ। কোন পেন্সিল একটু বেশী দীর্ঘ আর কোন পেন্সিল একটু অল্প দীর্ঘ, কোন টেবিল বেশী প্রশস্ত আর কোন টেবিল অল্প প্রশস্ত, কোন গাছ অধিক উচ্চ আর কোন গাছ অল্প উচ্চ, কিন্তু এমন কোন জিনিষ দেখিতে পাইবে না যাহার মোটেই দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা নাই। ইহা সম্ভব নহে ; কারণ জড়পদার্থ মাত্রেরই স্থান ব্যাপ্তি আছে, এবং যাহার স্থান-ব্যাপ্তি আছে, তাহারই দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও উচ্চতা প্রভৃতি গুণ থাকিতে বাধ্য।

এই স্থানকে আমরা অসীম বলিয়া বিবেচনা করি। ইহার কোন সীমা নির্দেশ করা যায় না ; যদি মনে করা যায় যে কোন এক জায়গায় আসিয়া ইহা শেষ হইয়াছে, তাহা হইলে স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে—উহার পরে কি আছে ? হয় কিছু আছে, নতুবা কিছুই নাই ; যদি কিছু থাকে, তবে নিশ্চয়ই উহা স্থানের মধ্যেই বিদ্যমান আছে, নতুবা উহা থাকিবে কোথায় ? আর যদি কিছু না থাকে, তবে বলিতে হইবে শূন্যস্থান পড়িয়া আছে ; কিন্তু শূন্যস্থানও তো স্থান। সেইজন্য আমরা বলিয়াছি যে স্থানের কোন শেষ নাই, ইহা অনন্ত ও অসীম। তবে এই অসীম

স্থানকে আমরা কিন্তু অসীমরূপে প্রত্যক্ষ করিতে পারি না ; কারণ আমাদের ইন্দ্রিয় ক্ষুদ্র ও সীমাবদ্ধ ; এই প্রকার ক্ষুদ্র ও সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয়ের পক্ষে অসীম স্থানকে অখণ্ডরূপে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নহে ; তাই উহাকে আমরা খণ্ড খণ্ড করিয়া সসীমরূপে প্রত্যক্ষ করি। ঘরে বাহিরে, কান্তারে প্রান্তরে—যেখানে যাহা দেখি না কেন, সবই দেখি সেই অসীম স্থানের খণ্ডিত রূপ মাত্র ; উহার অনন্ত অখণ্ডরূপ তো কোথাও দেখিতে পাই না। প্রত্যক ক্ষেত্রেই উহা সীমায়িত হইয়া আমাদের সম্মুখে বিরাজ করে, অসীমরূপে নহে। *

Objective and Absolute

স্থান বলিতে আমরা সাধারণতঃ কি বুঝি তাহাই উপরে ব্যাখ্যা করা হইল। ইহাকে **Objective view** বলে। কারণ, এই মতানুসারে স্থানের এক স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। জড়পদার্থের যেমন অস্তিত্ব আছে স্থানেরও তেমন অস্তিত্ব আছে। আমরা কেহ লক্ষ্য করি আর না করি, বহির্জগতে যেমন সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র বিদ্যমান আছে, তেমন স্থানও সর্বত্র বর্তমান আছে ; কারণ পূর্বেই বলিয়াছি স্থান ছাড়া ইহারা থাকিতে পারে না। তাই ন্যায়-দর্শন বলেন যে, সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র ধ্বংস হইতে পারে, কিন্তু স্থান কখনও ধ্বংস হইতে পারে না। স্থান—নিত্য, শাশ্বত ও চিরন্তন। ঈশ্বর যেমন অনাদিকাল হইতে বিরাজ করিতেছেন স্থানও তেমন অনাদিকাল হইতে বিরাজ করিতেছে ; কেহ ইহা সৃষ্টি করে নাই ; কেহ ইহা ধ্বংসও করিতে পারে না। ইহাকে আমরা ঈশ্বরের অনন্ত কর্মক্ষেত্র বলিয়া বর্ণনা করিতে পারি। তাঁহার সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়—সমস্ত কার্যই এই অসীম স্থানের মধ্যে সম্পাদিত হইতেছে, নতুবা তিনি কার্য করিবেন কোথায়? আর যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস না করিয়া আমরা মনে করি যে জড়পরমাণুর ক্রিয়া-ফলেই বিশ্বজগৎ সৃষ্ট হইতেছে, তাহা হইলেও স্থানের প্রয়োজন অপরিহার্য ; কারণ, স্থান না থাকিলে পরমাণুগুলি ক্রিয়া করিবে কোথায়? কোথায় ইহারা ছুটাছুটি করিবে? কোথায় ইহারা পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিবে?

এই মতবাদকে আমরা **Absolute View** নামেও অভিহিত করিতে পারি। Absolute, কারণ, এই মতানুসারে স্থান এবং স্থান সম্বন্ধীয় গুণ মাত্রই জড়বস্তুর মুখ্য গুণ। মুখ্য গুণ মনের উপর নির্ভর করে না ; ইহা নিজের বলেই বলীয়ান

* অনেকে বলেন যে খণ্ড খণ্ড স্থানগুলি মনে মনে একত্র করিয়াই আমরা অসীমের কল্পনা করিয়া থাকি। কিন্তু আমাদের মতানুসারে, তাহা মোটেই সম্ভব নহে। খণ্ডগুলি একত্র করিয়া আমরা যে সমষ্টি পাই, তাহা খণ্ডেরই সমষ্টি মাত্র ; অতএব খণ্ডগুলি যখন সসীম, তখন উহাদের সমষ্টিও সসীম হইতে বাধ্য। সসীম যোগ করিয়া কখনো অসীম পাওয়া যায় না।

হইয়া, অর্থাৎ মনঃ নিরপেক্ষ হইয়া, স্বাধীন ভাবেই নিজের সত্তা বজায় রাখে। কথাটি ভাল করিয়া বুঝান যাউক। আমরা জড়বস্তুর দুই প্রকার গুণের কথা উল্লেখ করিয়াছি—মুখ্য-গুণ ও গৌণ-গুণ। প্রথমে গৌণ-গুণের কথা বলা যাউক। গৌণ-গুণ, যেমন শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস এবং গন্ধ। এই গুণগুলি মোটেই মনঃ নিরপেক্ষ নহে, দ্রষ্টা বা ভোক্তার মানসিক অবস্থার উপরে নির্ভর করে। যেমন ধর, স্বাদ ও গন্ধ; তুমি বর্মীদের "গ্নাপী" (পচা মাছের আচার) খাইতে পারিবে কি? আস্বাদ করা তো দূরের কথা, গন্ধেতেই তুমি বমি করিয়া ফেলিবে, অথচ বর্মীদের নিকট ইহা খুবই সুস্বাদু জিনিষ। বাঙালীরা সরিষার তেলে রান্না করে, নারিকেল তেলের রান্না তাহাদের নিকট বিস্বাদ লাগে; আর মাদ্রাজীরা সবই নারিকেল তেলে রান্না করে, সরিষা তেলের রান্নায় তাহারা মোটেই স্বাদ পায় না। আর একটি উদাহরণ, ধর একটু আগে আমি বরফ লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিলাম, তারপরেই যদি এক বালতি জলে হাত ডুবাইয়া দিই তাহা হইলে জল আমার নিকট শীতল বলিয়া মনে হইবে না, বরং একটু গরমই লাগিবে। অথচ শীতল জল হইতে শীতল সংবেদনই পাইবার কথা; কিন্তু আমার তদানীন্তন মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর করিতে হইতেছে বলিয়া ইহা শীতল হইয়াও শীতল রূপে অনুভূত হইতেছে না। পুনশ্চ, ধর, রসগোল্লা খাইয়া তুমি চায়ের পেয়ালায় মুখ দিলে; অন্য অবস্থায় চায়ের পেয়ালা হইতে তুমি নিশ্চয়ই মিষ্ট সংবেদন পাইতে; কিন্তু এখন তো একটুও মিষ্ট সংবেদন পাইতেছ না; তাই তুমি আরও চিনি চাহিতেছ। উপরোক্ত প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আমরা দেখিতেছি যে গৌণ-গুণগুলির কোন স্বাধীন স্বরূপ নাই; দ্রষ্টা বা ভোক্তার মানসিক অবস্থার উপরেই ইহার স্বরূপ নির্ভর করে। কিন্তু মুখ্য-গুণ সম্বন্ধে একথা মোটেই প্রযোজ্য নহে। মুখ্য গুণ—স্থান সম্বন্ধীয় গুণ, যেমন বস্তুটি কোনখানে আছে, উপরে আছে, না নীচে আছে, ইহার আকার কিরূপ, দীর্ঘ না ক্ষুদ্র, ইহার ওজন কত, কম না বেশী; ইত্যাদি। বস্তুবাদিগণ (Objectivism) বলেন যে এই গুণগুলি মনঃনিরপেক্ষ-গুণ; অর্থাৎ কোন দ্রষ্টার মানসিক অবস্থার উপরে নির্ভর করে না। তাই বর্মী, বাঙালী, মাদ্রাজী—সকলেই একই কথা বলে; সকলেই বলে মেঘ উপরে থাকে, নীচে থাকে না; আমার ছড়িকে সকলেই সোজা বলে, কেহই বাঁকা বলে না। সেইরূপ গোলাকার টাকাকে সকলেই গোলাকার বলে, হাতীকে সকলেই বৃহৎ বলে, এক পোয়া ওজনকে সকলেই অল্প ওজন বলে। এসব ক্ষেত্রে কোন মত-পার্থক্য নাই; সকলের মুখেই একই কথা। ইহার কারণ, প্রত্যেক মুখ্য-গুণেরই এক স্বাধীন সত্তা আছে; তাই সকলেই উহা সমান ভাবে প্রত্যক্ষ করিতে পারে। কাহারো মানসিক অবস্থার উপরে উহার সত্তা নির্ভর করে না।

II. Subjective View

অনেকেই উপরোক্ত মতবাদ গ্রহণ করেন না; তাঁহারা বলেন গৌণ-গুণ যেমন মনঃনিরপেক্ষ নহে, মুখ্য-গুণও তেমন মনঃনিরপেক্ষ নহে; মুখ্য গুণও দ্রষ্টার দৃষ্টি কোণ হইতে নির্ধারিত হইয়া থাকে। উদাহরণ; বর্মী, মাদ্রাজী, বাঙালী সকলেই বলে যে মেঘ উপরে থাকে, কিন্তু যাহারা প্লেনে চড়িয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহারাও কি ঠিক সেই কথা বলে? মোটেই না; তাহারা বলে মেঘ নীচে আছে। ইহার অর্থ এই যে, 'উপর' ও 'নীচ' স্থান সম্বন্ধীয় গুণ হইলেও দ্রষ্টা নিরপেক্ষ গুণ নহে। তাই একজনের দৃষ্টি কোণ হইতে যাহা উপরে বলিয়া মনে হয়, অন্যজনের দৃষ্টি কোণ হইতে তাহা নীচে বলিয়া মনে হয়। সেইরূপ, আমার ছড়ির আকার সকলের নিকটেই কি সোজা বলিয়া প্রতীয়মান হয়? চৌবাচ্চার জলের মধ্যে ছড়িটি অর্ধেক ডুবাইয়া দূর হইতে প্রত্যক্ষ কর—দেখিবে ছড়িটি আর সোজা বলিয়া মনে হইবে না, যেখানে ইহা জল স্পর্শ করিয়াছে সেখান হইতে ইহা বাঁকিয়া গিয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। তাহা হইলে দেখা গেল যে সরল রেখা ও বক্র রেখা—যদিও স্থান সম্বন্ধীয় ব্যাপার, তবুও ইহারা দ্রষ্টা নিরপেক্ষ নহে, তাই একজনের নিকট যাহা সরল আর একজনের নিকট তাহা সরল নহে। হাতী বৃহৎ হইতে পারে বটে, কিন্তু সকলের নিকটেই কি ইহা বৃহৎ? বিলাতে প্রাগ্‌ঐতিহাসিক জীবজন্তুর এক চিড়িয়াখানা আছে। প্রাণীতত্ত্ববিদগণ প্রাগ্‌ঐতিহাসিক জীবজন্তুর যে কাল্পনিক ছবি আঁকিয়াছেন তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া এইসব অতিকায় মূর্তি নির্মাণ করা হইয়াছে এবং চিড়িয়াখানায় রাখা হইয়াছে। এইসব ভীষণাকার জন্তুর নিকটে একটি হাতী লইয়া যাও, হাতীটি তখন আর তেমন বৃহদাকার বলিয়া মনে হইবে না, নিতান্তই ক্ষুদ্র জীব বলিয়া প্রতীয়মান হইবে; এক্ষেত্রেও সেই কথা; আকার বা আকৃতি স্থান সম্বন্ধীয় গুণ বটে, কিন্তু ইহা বৃহৎ কি ক্ষুদ্র তাহা বস্তুর উপরে নির্ভর করে না, উহা নির্ভর করে আমাদের মানসিক অবস্থার উপরে। পুনশ্চ, ধর, এক পোয়া ওজনের একটি বাটখারা তুমি তোমার হাতের উপরে লইলে; ফলে তুমি কিঞ্চিৎ ভার বোধ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে লোক এক মন ভারী বস্তা লইয়া যাইতেছে, তাহার সেই বস্তার উপরে এক পোয়া বাটখারা রাখিয়া দাও; দেখিবে সে বাটখারার ভার অনুভব করিতে পারিবে না। বলা বাহুল্য, এই ওজনও স্থান সম্বন্ধীয় মুখ্য গুণ। এইরূপ আর একটি মুখ্য-গুণের কথা লওয়া যাউক, যেমন দূরত্ব। একজন অশীতিপর বৃদ্ধের পক্ষে এক মাইল রাস্তা অনেক দূর; তিনি অতদূর হাঁটিতে পারেন না; কিন্তু একজন বালকের পক্ষে ইহা মোটেই দূর নহে; সে দৌড়াইয়া চলিয়া যায়।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে গৌণ-গুণের ন্যায় মুখ্য গুণও মনঃ নিরপেক্ষ নহে। তাই ইহাকে **Subjective** মতবাদ বলে। এই মতানুসারে গৌণ-গুণ ও মুখ্য-গুণের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। স্বাদ, স্পর্শ, গন্ধ, প্রভৃতি গুণের ন্যায় দূরত্ব, নৈকট্য, আকৃতি প্রভৃতি গুণও সংবেদনমাত্র। আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া ফলে আমরা এইসব সংবেদন পাইয়া থাকি। সংবেদন মাত্রই মানসিক ব্যাপার; সেইজন্য আমরা বলিয়াছি যে মুখ্য-গুণ বা গৌণ-গুণ সবই যখন সংবেদন-লব্ধ গুণ, তখন সবই মনঃসাপেক্ষ ব্যাপার। মনের বাহিরে কিছুই নাই; স্থানও মনের বাহিরে নাই।

উপরোক্ত প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আমরা সাক্ষাৎভাবে যে **স্থান** প্রত্যক্ষ করিতেছি—তাহাকে Perceptual space অর্থাৎ **প্রত্যক্ষীকৃত স্থান** বলা যাইতে পারে। কিন্তু এখানে একটি কথা আছে—আমরা কী প্রত্যক্ষ করি, স্থান প্রত্যক্ষ করি, না স্থানবদ্ধ কোন বস্তু প্রত্যক্ষ করি? একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করি তাহা স্থান নহে, তাহা বস্তু মাত্র, তবে তাহা স্থানহীন বস্তু নহে; স্থানযুক্ত বস্তু। কথাটি ভাল করিয়া বুঝান যাউক। আমরা গাছপাতা, ফলফুল, সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতি অসংখ্য জিনিষ অনবরত প্রত্যক্ষ করিতেছি; ইহারা একই সঙ্গে পাশাপাশি বিরাজ করিতেছে। ইহাদের কোনটি দীর্ঘ কোনটি হ্রস্ব, কোনটি উচ্চ কোনটি খর্ব, কোনটি গোল কোনটি ত্রিকোণ—ইত্যাদি প্রত্যেকেরই এক নিজ নিজ বিশিষ্ট রূপ বা আকার আছে।—এই বৈশিষ্ট্য সূচক গুণগুলিকে আমরা বস্তুর অপ্রধান গুণ বলিতে পারি; কারণ, প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই এই গুণগুলি বিদ্যমান নাই, কাহারো আছে কাহারো নাই; যেমন কোন বস্তু দীর্ঘ আর কোন বস্তু দীর্ঘ নহে; কোন বস্তু গোল আর কোন বস্তু ত্রিকোণ, অর্থাৎ সকল বস্তুই একরকমের নহে, উহাদের আকার বিভিন্ন। তবে যতই বিভিন্ন হউক না কেন, উহাদের সকলের মধ্যেই এক সাধারণ গুণ বিদ্যমান আছে, তাহার নাম বিস্তৃতি (Extension) বা স্থান ব্যাপ্তি (Space)। যে জিনিষ দীর্ঘ তাহারও বিস্তৃতি আছে, আর যে জিনিস হ্রস্ব তাহারও বিস্তৃতি আছে; গোল হউক ত্রিকোণ হউক, উচ্চ হউক, খর্ব হউক—সকলেই কিঞ্চিৎ স্থান অধিকার করিয়া বিস্তৃত রহিয়াছে। সকল জড় পদার্থের মধ্যেই এই গুণটি বিদ্যমান। তাই এই স্থান-ব্যাপ্তিকেই আমরা জড়বস্তুর প্রধান গুণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকি। প্রধান গুণ, কারণ এই গুণটি বাদ দিলে জড়বস্তুর আর অন্য কোন গুণই থাকিতে পারে না; যাহার স্থান-ব্যাপ্তি নাই তাহার আবার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ থাকিবে কেমন করিয়া?

যাহার বিস্তৃতি নাই—তাহার আবার দূরত্ব নৈকট্য কি ? মোট কথা, স্থান-ব্যাপ্তি আছে বলিয়াই ইহারা ছোট বড়, গোল ত্রিকোণ প্রভৃতি বিভিন্ন আকার গ্রহণ করিতে পারে ; নতুবা আকার গ্রহণ করা তো দূরের কথা, ইহাদের অস্তিত্বই সম্ভব হইত না।

Space : Perceptual and Conceptual

তাহা হইলে দেখা গেল যে, স্থান বা স্থান-ব্যাপ্তিই জড়বস্তুর প্রধান গুণ। যেমন মানুষের প্রধান গুণ Rationality, তেমন জড়বস্তুর প্রধান গুণ স্থান-ব্যাপ্তি। তবে প্রধান গুণ হইলে কি হয় ? প্রধান গুণ হইলেই যে ইহার এক নিজস্ব স্বাধীন সত্তা থাকিবে, তাহা নহে ; ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যেই ইহার অস্তিত্ব ; উহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র ভাবে ইহা বিরাজ করিতে পারে না। যেমন, ধর, Rationality ; প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ইহা বিদ্যমান আছে, ইহা মানুষের প্রধান গুণ। কিন্তু তাই বলিয়া ইহা কি মানুষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র ভাবে বিরাজ করিতে পারে ? তাহা অসম্ভব। Rationality থাকিলেই বুঝিতে হইবে ইহা কোন ব্যক্তি বিশেষকে আশ্রয় করিয়া বিরাজ করিতেছে ; ইহা নিরবলম্ব হইয়া ভাসিয়া বেড়াইতে পারে না। সেইরূপ প্রত্যেক জড় পদার্থের মধ্যেই স্থান-ব্যাপ্তি আছে বটে, কিন্তু জড়পদার্থ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীনভাবে ইহা থাকিতে পারে না ; সর্বদাই কোন জড়পদার্থকে আশ্রয় করিয়া ইহা বিরাজ করে। তাই যেদিকেই আমরা তাকাই না কেন, কোথাও কোন নিরবলম্ব স্থান দেখিতে পাই না ; দেখি ইহা কোন বস্তুকে অবলম্বন করিয়া বিস্তৃত রহিয়াছে। বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া, বস্তুর রূপে রূপায়িত হইয়া, ছোট বড ত্রিকোণ প্রভৃতি আকার গ্রহণ করিয়া বস্তুর মধ্যেই ইহা বিরাজ করে ; বস্তু হইতে বিচ্ছিন্ন ইহার কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই। তাই আমরা বলিয়াছি যে আমরা কখন "শুধু স্থান" প্রত্যক্ষ করি না, আমরা "**বস্তুযুক্ত স্থান**" প্রত্যক্ষ করি, যে **স্থান** বস্তুর মধ্যে বিস্তৃত রহিয়াছে—উহাই আমরা প্রত্যক্ষ করি, বস্তুহীন নিরবলম্ব **স্থান** কেহ কখন দেখিতে পারে না।

এইপ্রকার বস্তুহীন নিরবলম্ব স্থান আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না বটে, কিন্তু ইহার কথা আমরা সকলেই কল্পনা করিতে পারি। যেমন Rationality-এর উদাহরণটি লওয়া যাউক ; ইহা ব্যক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিরাজ করে না বটে, তবুও আমরা স্বতন্ত্রভাবে ইহার কথা চিন্তা করিতে পারি। ইহা যখন প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই বিদ্যমান আছে, তখন সেই ব্যক্তিগুলির কথা বাদ দিয়া শুধু তাহাদের এই সাধারণ গুণটির প্রতি মনোনিবেশ করিতে পারিলেই হইল ; তাহা

হইলে ব্যক্তিগুলি বাদ পড়িয়া যায়, শুধু তাহাদের গুণটিই আমাদের মনের মধ্যে একক ভাবে বিরাজ করিতে থাকে। ইহাকে আমরা Concept বা **ধারণা** বলি। স্থান সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা প্রযোজ্য। আমরা যেস্থান প্রত্যক্ষ করি তাহা সর্বদাই বস্তুর মধ্যে নিবদ্ধ থাকে বটে, কিন্তু একে একে সমস্ত বস্তুগুলি বাদ দিয়া যদি শুধু উহাদের সাধারণ গুণটির প্রতি মনঃসংযোগ করি, তাহা হইলে বস্তুর মূর্তিগুলি ধীরে ধীরে আমাদের মন হইতে সরিয়া যায়; তখন শুধু এক অমূর্ত ধারণা আমাদের মনের মধ্যে বিরাজ করিতে থাকে। ইহাকে আমরা Conceptual Space বা ধারণামূলক স্থান বলিতে পারি। তখন আমরা শুধু স্থানের কথাই চিন্তা করি, বস্তুর কথা চিন্তা করি না। এইভাবে বস্তু হইতে স্থানকে বিচ্ছিন্ন করিয়া "**শুধু স্থানের**" কথা চিন্তা করাকে "**ধারণা করা**" বলে। বলা বাহুল্য, "ধারণা করা" বিশুদ্ধ মানসিক ক্রিয়া। আমরা মনের মধ্যে যাহা ধারণ করিয়া রাখি তাহা মনোজগতের বিষয়বস্তু (Subjective), তাহাকে বহির্জগতের বিষয়বস্তু (Objective) বলা যায় না। অতএব আমরা যে ধারণামূলক স্থানের কথা বলিলাম তাহা জাগতিক পদার্থ নহে, তাহা মানসিক সৃষ্টি, মনের মধ্যেই ইহা বিরাজ করে।

এখন এই প্রসঙ্গের উপসংহার করা যাউক। আমরা দুইপ্রকার স্থানের কথা বলিলাম, Perceptual Space এবং Conceptual Space। Perceptual Space আমরা সকলেই প্রত্যক্ষ করি, বস্তুর মধ্যে ইহা নিবদ্ধ থাকে; ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বস্তু প্রত্যক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে এই স্থানও আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। অতএব ইহা দ্রষ্টা নিরপেক্ষ বা মনঃনিরপেক্ষ বস্তু নহে। দ্বিতীয়তঃ Conceptual Space; ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করি না; ইহা আমরা মনে মনে ধারণা করি। তবে প্রত্যক্ষীকৃত উপাদানের উপরেই আমাদের এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত; স্থান সংলগ্ন যে বস্তু প্রত্যক্ষ করি, সেই বস্তুকে বাদ দিয়া যখন শুধু স্থানের কথাই চিন্তা করি, তখন আমরা Conceptual Space বা ধারণামূলক স্থানের সৃষ্টি করি*; অতএব ইহাও মনঃনিরপেক্ষ জিনিষ নহে। মোট কথা Perceptual Space এবং Conceptual Space—উভয়েই মনঃসাপেক্ষ ব্যাপার।

---

* ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে প্রত্যক্ষীকৃত স্থান "এক" নহে "বহু"; এবং যেহেতু বহু, সেইহেতু প্রত্যেকেই ক্ষুদ্র এবং সীমাবদ্ধ। এক কথায়, যত বস্তু, তত স্থান; তাই প্রত্যেকটি স্থানই সসীম। কিন্তু ধারণামূলক স্থান সসীম নহে, অসীম; কারণ কোন বস্তুর দ্বারাই ইহা আবদ্ধ নহে। সকল বস্তু হইতে মুক্ত করিয়া আনিয়া আমরা ইহাকে "এক এবং অনন্ত" রূপে কল্পনা করি এবং মনে করি ইহাই যেন বস্তুগুলির মধ্যে সীমায়িত হইয়া বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করিয়াছে।

III. Kantian View

এখন আমরা মহামতি ক্যাণ্টের মতবাদ ব্যাখ্যা করিব। তাঁহার মতানুসারে Locke এবং Hume বর্ণিত উপরোক্ত মতবাদ গ্রাহ্য নহে, উহার গোড়াতেই গলদ। Subjective মতে স্থান মনঃসাপেক্ষ ব্যাপার; সংবেদনের মাধ্যমে আমরা ইহার কথা অবগত হইয়া থাকি। যেমন, তাহারা বলেন, আকাশের দিকে তাকাইয়া যখন আমরা অসংখ্য নক্ষত্র একই সঙ্গে পাশাপাশি দেখিতে পাই তখন আমরা স্থানের অস্তিত্ব অবগত হই; কারণ পাশাপাশি থাকা মানেই স্থানের মধ্যে থাকা; স্থান না থাকিলে তাহারা পাশাপাশি থাকিবে কেমন করিয়া? এক্ষেত্রে আমরা দর্শন সংবেদনের মাধ্যমে স্থানের অস্তিত্ব অবগত হইতেছি। আবার স্পর্শ সংবেদনের মাধ্যমেও আমরা স্থানের কথা জানিতে পারি; যেমন পাঁচটি মার্বেল একই সঙ্গে হাতের মুঠির মধ্যে ধরিলে আমরা বুঝিতে পারি যে উহারা একই মুহূর্তে একত্র বিরাজ করিতেছে, স্থান আছে বলিয়াই উহাদের একত্র অবস্থিতি সম্ভব। দর্শন ও স্পর্শন সংবেদন অপেক্ষা পেশী সংবেদনের মারফতেই আমরা অধিকতর স্পষ্টভাবে স্থানের অস্তিত্ব উপলব্ধি করি। হাত পা নাড়া এবং চলা ফেরার ফলে আমরা যে পেশী সংবেদন পাই—তাহা হইতে স্থানের দূরত্ব, নৈকট্য প্রভৃতি গুণ আমরা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিয়া থাকি। ইহার উত্তরে Kant বলেন যে উপরোক্ত প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আমরা এক মস্ত ভুল করিয়া বসিতেছি। আমরা বলিতেছি যে "তুমি আকাশে চাহিয়া অসংখ্য তারা দেখিতেছ, ফলে তুমি স্থানের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতেছ"। কিন্তু ক্যাণ্ট বলেন ইহা সম্পূর্ণ ভুল। তারাগুলি যে পাশাপাশি বিরাজ করিতেছে—তাহা তুমি বুঝিলে কেমন করিয়া? আগে হইতেই তোমার মনের মধ্যে স্থানের জ্ঞান আছে বলিয়া তুমি বুঝিতে পারিতেছ যে, ইহারা পাশাপাশি বিরাজ করিতেছে; নতুবা, তুমি ইহাদিগকে দেখিতে পাইতে বটে, কিন্তু ইহারা যে পাশাপাশি আছে—তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারিতে না। যাহার স্থান জ্ঞান নাই তাহার পক্ষে পাশাপাশি অবস্থানের কথা জানিতে পারা সম্ভব নহে। সহ-অবস্থান বুঝিতে হইলেই স্থানের জ্ঞান থাকা দরকার। সেইরূপ, যাঁহারা বলেন যে আমরা হাঁটিয়া গিয়া দূরত্ব বা নৈকট্য উপলব্ধি করি, তাহাদের উত্তরে ক্যাণ্ট বলেন যে হাঁটা বা হাত পা নাড়ার অর্থ কি? পূর্ব হইতে স্থানের জ্ঞান আছে বলিয়া তুমি হাঁটিতেছ বা হাত পা নাড়িতেছ। বস্তুতঃ হাত পা নাড়িয়া তুমি বুঝাইতেছ যে স্থান সম্বন্ধে তোমার কিঞ্চিৎ জ্ঞান আছে।

সেইজন্য ক্যাণ্ট বলেন যে লক্ এবং হিউমের মতবাদে গোড়াতেই গলদ আছে।

তাঁহারা বলেন যে অভিজ্ঞতার ফলে আমরা স্থান সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ করি ; কিন্তু ক্যাণ্ট বলেন যে অভিজ্ঞতার আগে হইতেই আমাদের মনের মধ্যে স্থান সম্বন্ধীয় জ্ঞান বিদ্যমান থাকে। একটু হেঁয়ালির ভাষায় বলা যায় যে স্থান প্রত্যক্ষ করিবার আগেই আমরা স্থান উপলব্ধি করিয়া বসিয়া থাকি। ক্যাণ্টের মতানুসারে আমরা কেহই একেবারে শূন্য মন লইয়া পৃথিবীতে আসি না ; প্রত্যেকের মনের মধ্যেই স্থান, কাল প্রভৃতি কতকগুলি জ্ঞানসূত্র (categories) বিদ্যমান থাকে। জ্ঞান-সূত্র—কারণ, এই সূত্রগুলির সাহায্যে আমরা নানাবিধ জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি। (অন্যান্য সূত্রের কথা পরে বলা যাইবে, এখানে শুধু স্থানের কথা বলা হইতেছে।) স্থান সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যেকের মনের মধ্যে এক প্রাক্‌সিদ্ধ (A priori) ধারণা বিদ্যমান আছে ; ইহা কেহই চেষ্টা করিয়া অর্জন করে না। আমরা যেমন চেষ্টা করিয়া মন অর্জন করি নাই, তেমন চেষ্টা করিয়া এই ধারণাও অর্জন করি নাই ; বিনা প্রচেষ্টায় যেমন মন পাইয়াছি, তেমন মনের সঙ্গে বিনা প্রচেষ্টায় এই ধারণাটিও আমরা লাভ করিয়াছি। তাই আমরা বলিয়াছি যে আমরা কেহ শূন্য মন লইয়া এ জগতে আসি না, মনের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি ধারণাও লইয়া আসি।

Space : A priori

স্থানও এইরকম এক ধারণা। ইহাকে আমরা জ্ঞান-সূত্র বলিয়াছি। এই কথাটির অর্থ বুঝান যাউক। পাঁচটি ফুল পাইলেই একটি মালা রচনা করা হয় না, এই বিচ্ছিন্ন ফুলগুলিকে একত্র গ্রথিত করিবার জন্য একটি সূত্রের প্রয়োজন। এই সূত্রই ফুলগুলিকে গ্রথিত করিয়া এক অবিচ্ছিন্ন মালায় পরিণত করে। সেইরূপ বহির্জগতে বস্তুর আবির্ভাব হইলেই জ্ঞানোদয় হয় না, এই বস্তুগুলিকে একই সূত্রে গ্রথিত করা দরকার। এই সূত্র আছে আমাদের মনের মধ্যে, এই সূত্র ব্যবহার করিয়া আমরা বহির্জগতের বস্তুগুলিকে স্থানবদ্ধ বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতে শিখি ; কারণ ইহাদিগকে স্থানবদ্ধ বলিয়া বিবেচনা না করিলে জ্ঞানলাভ করা তো দূরের কথা, আমাদের পক্ষে প্রত্যক্ষ করাই সম্ভব নহে। তাই বহির্জগতের কোন জিনিষ প্রত্যক্ষ করিবার আগেই আমরা আমাদের মনের মধ্য হইতে এই স্থান-সূত্রকে বহির্জগতে প্রক্ষিপ্ত করিয়া দিই ; স্থানের জালে ধরিয়া ফেলিয়া তখন ইহাদিগকে স্থানীয় (Spatial) রূপে প্রত্যক্ষ করি। নতুবা বহির্জগতে স্থান বলিয়া কোন জিনিষই নাই। ইহা এক মানসিক ছাঁচ মাত্র। ছানাকে সন্দেশে রূপায়িত করিতে হইলে ছানাকে যেমন ছাঁচের মধ্যে স্থাপিত করিতে হয়, সেইরকম জ্ঞান আহরণ করিতে হইলে জাগতিক

উদ্দীপনাকেও স্থানের মধ্যে আবদ্ধ করিতে হয়। এইভাবে স্থান-সূত্রের দ্বারা শৃঙ্খলিত করিয়া আমরা জাগতিক বস্তু প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি।

ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে স্থান বলিয়া বহির্জগতে কিছুই নাই; ইহা আমাদের মনের সূত্র মাত্র। প্রত্যেক মানুষের মনেই এই সূত্র বিদ্যমান আছে, ইহারই সাহায্যে আমরা জ্ঞান অর্জন করি, সেইজন্য ইহাকে আমরা জ্ঞান-সূত্র বলিয়াছি। ক্যাণ্টের এই মতবাদের সহিত Subjective মতবাদের পার্থক্য কোথায়—তাহা একটু ব্যাখ্যা করা যাউক। তাঁহাদের মতে, আমরা প্রথমে সংবেদন পাই, তারপরে সেই সংবেদনের মাধ্যমে স্থানের জ্ঞান আহরণ করি; অভিজ্ঞতার পরে আসে 'স্থান-জ্ঞান'—তাই ইহাকে 'A posteriori' বলে। কিন্তু ক্যাণ্টের মতানুসারে অভিজ্ঞতার পরে আমরা এই জ্ঞান লাভ করি না; অভিজ্ঞতার পূর্ব হইতেই ইহা আমাদের মনের মধ্যে সঞ্চিত থাকে। বস্তুতঃ এই সঞ্চিত বা প্রাকসিদ্ধ জ্ঞানের সাহায্যেই আমরা অভিজ্ঞতা লাভ করি; তাই ইহাকে A priori জ্ঞান বলে। এই পার্থক্য সত্ত্বেও এই দুই মতবাদের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। Subjective মতানুসারে স্থানের কোন জাগতিক সত্তা নাই; ইহা আমাদের মানসিক সৃষ্টি মাত্র। ক্যাণ্টের মতানুসারেও ইহার কোন জাগতিক সত্তা নাই, ইহার সত্তা মানসিক। তবে মানসিক হইলেও ইহাকে ঠিক মনের সৃষ্টি বলা যায় না, বরং ইহাকে সূত্র বলাই বিধেয়। কারণ, এই সূত্র আমরা তো সৃষ্টি করি না, যেমনভাবে মানসিক ক্রিয়াফলে ধারণা বা Conceptual Space সৃষ্টি করা হয়, সেইরকম ভাবে ইহা চেষ্টা সহকারে সৃষ্টি করা হয় না। ইহা সূত্ররূপে আমাদের "মনের মধ্যে" চিরকালই বিদ্যমান আছে। তবে লক্ষ্য করিতে হইবে, ইহা শুধু "মনের মধ্যেই" বিদ্যমান আছে, বহির্জগতে ইহার কোন অস্তিত্ব নাই। বহির্জগৎ প্রত্যক্ষ করিবার পক্ষে স্থান এক অপরিহার্য আকার (Form) মাত্র; এই ছাঁচে ঢালিয়া আমরা জাগতিক বস্তুকে স্থানবদ্ধ বলিয়া প্রত্যক্ষ করি। তাই ক্যাণ্ট বলিতে পারেন, যে পৃথিবী হইতে যদি আমাদের মনের অস্তিত্ব অবলুপ্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে পৃথিবীর কোথাও কোনও স্থান থাকিবে না; পৃথিবী একেবারে স্থানহীন নিরাকার পদার্থে পরিণত হইয়া যাইবে। কারণ, স্থান তো মনের অবদান মাত্র, যদি মনই না থাকিল, তবে স্থান থাকিবে কেমন করিয়া?

IV. Hegelian View

ক্যাণ্ট বলেন যে আমাদের মনের মধ্যে স্থান সম্বন্ধীয় এক প্রাকসিদ্ধ (A priori) ধারণা আছে। যখনই আমরা বহির্জগতের কোন বস্তু প্রত্যক্ষ করিতে চাই, তখনই উহাকে এই আধারের মধ্যে আধৃত করিয়া, অর্থাৎ স্থানবদ্ধ করিয়া প্রত্যক্ষ করি।

যাহাকে আমরা "স্থান" বলি তাহা জাগতিক বস্তু নহে ; মানসিক জাল মাত্র ; এই মানসিক জালের দ্বারাই আমরা সমস্ত জাগতিক বস্তু আবৃত করিয়া রাখিয়াছি। হেগেলও ইহা স্বীকার করেন ; তবে তিনি এই বিষয়টি আরও সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিয়া বলেন যে আমরা যখন সকলেই এইভাবে স্থানের ছাঁচে জাগতিক বস্তু প্রত্যক্ষ করি, তখন নিশ্চয়ই ইহার কোন যথাযথ কারণ আছে। কেবল আমার মনে বা তোমার মনে নহে, পৃথিবীর সকল মানুষের মনেই এই স্থান-সূত্র বিদ্যমান আছে, তাই আমরা সকলেই স্থানের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু ইহার কারণ কি ? কেন আমরা সকলেই একই ছাঁচে চিন্তা করি ? **ক্যাণ্ট** ইহার কোন উত্তর দেন নাই, ইহার উত্তর দিয়াছেন **হেগেল** ; তিনি বলেন মানুষ শুধু মানুষ নহে, তাহার মধ্যে ঈশ্বরের স্বরূপও নিহিত আছে, বস্তুতঃ ঈশ্বরই মানুষের মধ্যে সসীমরূপে প্রকটিত আছেন। মানুষের বুদ্ধি তাঁহারই বুদ্ধি, মানুষের চিন্তা তাঁহারই চিন্তা, শুধু মানুষের মধ্যে পরিমিত হইয়া একটু সসীম রূপ গ্রহণ করিয়াছে মাত্র। তাহা হইলে বলিতে হইবে যে আমরা যখন চিন্তা করি তখন যেমন তেমন ভাবে চিন্তা করি না, ঈশ্বরের বিধান অনুযায়ীই চিন্তা করি। ঈশ্বরের এই বিধানের যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিলেই আমরা বুঝিতে পারিব যে কেন আমরা স্থান ছাড়া জগতের কথা চিন্তা করিতে পারি না।

ঈশ্বরের বিধান কি ? সৃষ্টি করাই ঈশ্বরের বিধান, সৃষ্টি ছাড়া তিনি থাকিতে পারেন না, সৃষ্টিই তাঁহার ধর্ম। কিন্তু সৃষ্টি করিতে গেলেই তাঁহাকে স্থান ও কালের মাধ্যমে সৃষ্টি করিতে হয়। যাহা তিনি সৃষ্টি করিবেন উহাকে তো কোথাও অবস্থান করিতে হইবে, কিন্তু স্থান না থাকিলে উহা অবস্থান করিবে কোথায় ? তাই সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে স্থানের কথাও চিন্তা করিতে হইয়াছে। নতুবা যাহা তিনি সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা তাঁহার মনের মধ্যেই রহিয়া যাইত, উহার কোন বহিঃপ্রকাশ সম্ভব হইত না। শেক্‌স্‌পিয়রের ভাষায় বলা যায় যে, ঈশ্বরের মনে যাহা কল্পনা রূপে বিরাজ করে তাহার এক local habitation অর্থাৎ জাগতিক অবস্থানের ব্যবস্থা করিতে হইলেই স্থানের কথা চিন্তা করিতে হয়। তাই স্থানের মধ্যে অবস্থাপিত করিয়া, স্থানের দ্বারা সীমাবদ্ধ করিয়াই তিনি এই সসীম জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে কেন আমরা সবদাই স্থানের মাধ্যমে জাগতিক বস্তুর কথা চিন্তা করিয়া থাকি। কারণ, না করিয়া উপায় নাই, পূর্বেই তো বলিয়াছি ঈশ্বরই আমাদের মনের মধ্যে ক্রিয়া করিতেছেন ; তিনি যেভাবে চিন্তা করেন, আমরাও ঠিক সেইভাবেই চিন্তা করিয়া থাকি। ঈশ্বর নিজেই যখন স্থানের মাধ্যমে

জগতের কথা চিন্তা করেন, তখন আমরাও যে তদ্রূপ করিব, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কি আছে? তাই যখনই আমরা জাগতিক বস্তুর কথা চিন্তা করি, তখনই আমরা উহাকে কোন স্থানের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া চিন্তা করি। শুধু তুমি আর আমি এরূপ করি না, আমরা সকলেই এইরূপ করি; নিজেদের খুশীমত করি না, বাধ্য হইয়াই করি। কারণ ঈশ্বরের চিন্তা-ধারা অনুসরণ করিতে হইলে স্থানের মাধ্যমে চিন্তা করা ছাড়া গতি নাই।

উপসংহার

ক্যাণ্টের সহিত **হেগেলের** মতবাদের পার্থক্য বুঝাইয়াই আমরা এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। ক্যাণ্ট বলেন যে, প্রত্যেক মানুষের মনেই স্থান সম্বন্ধীয় এক ধারণা আছে; সেই ধারণা অনুযায়ীই আমরা জাগতিক বস্তু প্রত্যক্ষ করি। হেগেলও তাহাই বলেন; কিন্তু হেগেল আরও একটু অগ্রসর হইয়া বলেন যে এই স্থান-সূত্র শুধু মানুষের মনে নাই, ঈশ্বরের মনেও আছে; বস্তুতঃ ঈশ্বরের মনে আছে বলিয়াই মানুষের মনেও ইহা আছে। অতএব উভয়ের মতেই স্থান মনঃসাপেক্ষ ব্যাপার। সেইজন্য ক্যাণ্টের ন্যায় হেগেলের মতবাদকেও subjective বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। তবে ক্যাণ্ট বলেন, স্থানের মোটেই জাগতিক অস্তিত্ব নাই, ইহা মনের অবদান মাত্র; অতএব পৃথিবী হইতে মন যদি অবলুপ্ত হইয়া যায়, তবে সঙ্গে সঙ্গে স্থানও অবলুপ্ত হইয়া যাইবে। কিন্তু হেগেলের মতানুসারে ইহা সম্ভব নহে। তিনি বলেন স্থান-সূত্র আমাদের মানসিক সম্পদ বটে, কিন্তু ইহা শুধু আমাদের মনের সম্পদ নহে, ইহা ঈশ্বরেরও মনের সম্পদ। অতএব আমরা যদি পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাই, তবুও পৃথিবী হইতে স্থান অবলুপ্ত হইয়া যাইবে না; কারণ, ঈশ্বর তো অবলুপ্ত হইতে পারেন না; তিনি নিত্য ও অনন্ত। তাই তাহার সৃষ্টিরও অন্ত নাই; এই অনন্ত সৃষ্টির জন্য তাঁহাকে নিরন্তর স্থানের কথা চিন্তা করিতে হইতেছে, যেহেতু স্থান ব্যতিরেকে তিনি বহির্জগৎ সৃষ্টি করিতে পারেন না। অতএব এই স্থানকে একেবারে মনোগত ব্যাপার বলিয়া অভিহিত করা যায় না; অর্থাৎ ইহার বাস্তব সত্তা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। মনে রাখিতে হইবে ঈশ্বরের সৃষ্ট এই বহির্জগৎ একেবারে অলীক বা কাল্পনিক হইতে পারে না; তাহা হইলে ঈশ্বরকেই যে একেবারে অলীক হইয়া পড়িতে হয়। কারণ, এই জগতের মধ্য দিয়াই তো ঈশ্বর আত্ম-প্রকাশ লাভ করিতেছেন; অতএব এই জগৎ যদি মিথ্যা হয়,

তবে ঈশ্বরও শূন্য হইয়া পড়েন। সেইজন্য হেগেল স্থানকে একেবারে মানসিক ব্যাপার বলিয়া উড়াইয়া দেন নাই; ইহার বাস্তব সত্তা স্বীকার করিয়াছেন। তাহা হইলে দেখা গেল যে হেগেলের মতবাদ একেবারে Subjective বা একেবারে Objective নহে; ইহাতে উভয় মতেরই সমন্বয় সাধন করা হইয়াছে।

চতুর্দশ অধ্যায়

কাল প্রসঙ্গ (The Problem of Time)

জড়-তত্ত্ব প্রসঙ্গে আমরা শুধু স্থানের কথা উল্লেখ করি নাই, কালের কথাও উল্লেখ করিয়াছি। জড়পরমাণু শুধু স্থানের মধ্যে অবস্থিত নহে, কালের মধ্যেও অবস্থিত; কালের মধ্য দিয়া ইহা ধীরে ধীরে বিবর্তিত হইয়াছে এবং বিবর্তিত হইয়া এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিণত হইয়াছে (Cosmological Evolution)। তবে শুধু জড় পরমাণু সম্বন্ধেই কালের কথা প্রযোজ্য তাহা নহে, প্রাণ ও মন সম্বন্ধেও ইহা সমভাবে প্রযোজ্য। জড়বস্তু হইতেই ধীরে ধীরে জীবজন্তুর উৎপত্তি হইয়াছে (Evolution of life), এবং জীবজন্তু হইতেই অবশেষে মানব মনের উদ্ভব হইয়াছে (Evolution of mind)। বলা বাহুল্য, কালের মাধ্যমেই এই প্রকার বিবর্তন সম্ভব হইয়াছে; কাল না থাকিলে সমস্ত জিনিষই চিরস্থির হইয়া থাকিত; কোনপ্রকার বিবর্তন বা পরিবর্তন সম্ভব হইতে পারিত না। এখন এই কালতত্ত্ব সম্বন্ধে এখানে আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। কালতত্ত্ব সত্যই দর্শন শাস্ত্রের এক জটিল তত্ত্ব। ইহার সম্বন্ধে প্রধানতঃ চারি প্রকার মতবাদ আছে, যথা Objective View, Subjective View, Kantian View এবং Hegelian View ;স্থানতত্ত্ব সম্বন্ধেও আমরা এই চারি প্রকার মতবাদের আলোচনা করিয়াছি; এখানেও ঠিক তাহাই করা হইবে। ইহাতে স্বভাবতঃই অনেকস্থলে পুনরাবৃত্তি ঘটিবে; তবে ইহা যে মোটেই অনিচ্ছাকৃত নহে, তাহা আগেই স্বীকার করা ভাল, বিষয়বস্তুর জটিলতা বিবেচনা করিয়া আমরা ইচ্ছা করিয়াই এইরূপ পুনরাবৃত্তি করিতেছি, যাহাতে বিষয়টি সম্যকভাবে উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

I. Objective View

ইহাই কাল সম্বন্ধে সাধারণ মতবাদ (Commonsense View)। স্থান প্রসঙ্গে আমরা বলিয়াছি যে স্থান মানে সেই জিনিষ যাহার জন্য দুই বা ততোধিক বস্তু একই সঙ্গে অবস্থান করিতে পারে। আর, কাল মানে সেই জিনিষ যাহার জন্য

বস্তুগুলি একের পর এক আসিতে পারে। স্থান আছে বলিয়া "ক" এবং "খ" একই সঙ্গে থাকিতে পারে (Co-existence), আর কাল আছে বলিয়া "ক" এবং "খ" পরে পরে আসিতে পারে (Succession)। কাল না থাকিলে কোন প্রকার পরিবর্তন সম্ভব হইত না ; যে যেমন আছে সে তেমনই থাকিয়া যাইত। তাহা হইলে অবশ্য মৃত্যু থাকিত না, কিন্তু মৃত্যু না থাকিলে জন্মও তো থাকিতে পারিত না। বস্তুতঃ জন্ম মৃত্যু, ক্ষয় বৃদ্ধি কিছুই থাকিত না, সমস্ত উন্নতি, সমস্ত প্রগতি—সবই বন্ধ হইয়া যাইত। যে এখন শিশু, সে শিশুই থাকিয়া যাইত, সে আর যুবক হইতে পারিত না ; আর যে এখন রুগ্ন, সে রুগ্নই থাকিয়া যাইত, সে আর নিরাময় হইতে পারিত না। এক কথায়, কালের গতি বন্ধ হইয়া গেলে সকল গতিই বন্ধ হইয়া যাইত ; তখন একবার সূর্য অস্ত গেলে আর দুনিয়ায় সূর্য উঠিত না ; একবার শীত আসিলে জীবনে আর বসন্ত আসিত না। কিন্তু ইহাকে কি জীবন বলা যায় ? যেখানে গতি নাই, নূতন কোন প্রকাশ নাই—সেখানে আবার জীবন কোথায় ? এই গতিহীন অচল জীবনকে চঞ্চল করিবার একমাত্র উপায়—কালস্রোত। রুদ্ধ প্রবাহকে মুক্ত করিয়া দিয়া, সমস্ত পুরাতনকে ভাঙিয়া চুরিয়া—ইহা অবিরাম গতিতে বহিয়া চলিয়াছে। তাই পুরাতনের পরে নূতন আসে, শীতের পরে বসন্ত আসে এবং রাতের পরে সূর্য ওঠে। এই বিরামবিহীন পরিবর্তন—ইহাই চিরন্তন কালের অনন্ত লীলা।

স্থানের ন্যায় কালকেও আমরা অসীম বলিয়া বিবেচনা করি ; কবে যে ইহা আরম্ভ হইয়াছে তাহা কেহই জানে না, আর কবে যে ইহা শেষ হইবে, তাহাও কেহ বলিতে পারে না, এক কথায়, ইহা অনন্ত ও অসীম। তবে এই অসীম কালকে আমরা কিন্তু অসীমরূপে প্রত্যক্ষ করিতে পারি না ; কারণ আমাদের ইন্দ্রিয় ক্ষুদ্র ও সীমাবদ্ধ ; এই প্রকার ক্ষুদ্র ও সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয়ের পক্ষে অসীম কালকে অখণ্ডরূপে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নহে। তাই উহাকে আমরা খণ্ড খণ্ড করিয়া সসীমরূপে প্রত্যক্ষ করি। যেমন, স্থানকে ভাগ করিয়া বলি 'এখানে' বা 'সেখানে', উপরে বা নীচে, নিকটে বা দূরে, ইত্যাদি, সেইরূপ কালকেও বিভিন্নভাবে ভাগ করিয়া বলি 'আজ' বা 'কাল', ভূত বা ভবিষ্যৎ ইত্যাদি। যখনই যাহা দেখি না কেন, সবই দেখি সেই অসীম কালের খণ্ডিত রূপ ; উহার অনন্ত ও অখণ্ড রূপ তো কোথাও দেখিতে পাই না ; প্রত্যেক ক্ষেত্রেই উহা সীমায়িত হইয়া আমাদের সম্মুখে বিরাজ করে, অসীমরূপে নহে।

"কাল" বলিতে আমরা সাধারণতঃ কি বুঝি তাহাই উপরে ব্যাখ্যা করা হইল। ইহাকে Objective View বলে। কারণ, এই মতানুসারে, কালের

এক স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে; ঘটনাসমূহের যেমন অস্তিত্ব আছে, কালেরও তেমন অস্তিত্ব আছে। বহির্জগতে যেমন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত আছে, জন্ম মৃত্যু ক্ষয় ও বৃদ্ধি আছে, তেমন কালও বিদ্যমান আছে; কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি, কাল ছাড়া এইসব ঘটনা ঘটিতে পারে না। তাই ন্যায় দর্শন বলেন যে, কাল নিত্য, শাশ্বত ও চিরন্তন। ঈশ্বর যেমন অনাদিকাল হইতে বিরাজ করিতেছেন, কালও তেমন অনাদিকাল হইতে বিরাজ করিতেছে; কেহ উহাকে সৃষ্টি করে নাই, কেহ উহাকে ধ্বংসও করিতে পারে না। জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়—সমস্ত কার্যই এই অসীমকালের মধ্যে সম্পাদিত হইতেছে। এই মতবাদকে আমরা Absolute View নামেও অভিহিত করিতে পারি। Absolute, কারণ কালের অস্তিত্ব আমাদের মনের উপর নির্ভর করে না; ইহা নিজের বলে বলীয়ান হইয়া অর্থাৎ মনঃনিরপেক্ষ হইয়া স্বাধীন ভাবেই নিজের সত্তা বজায় রাখে। একটি উদাহরণ দিয়া বুঝান যাউক। তুমি তিন ঘণ্টা বসিয়া পরীক্ষা দিয়াছ, এখন বিশ্রাম করিতেছ; আমি আধ ঘণ্টা ধরিয়া বক্তৃতা দিয়াছি, আরও আধ ঘণ্টা বক্তৃতা দিব, ছাত্রেরা মন দিয়া শুনিতেছে। প্রত্যেকটিই একটি সাময়িক ঘটনা, কোন এক বিশেষ মুহূর্তে সংঘটিত হইতেছে এবং কোন এক বিশেষ মুহূর্তে উহার সমাপ্তি হইবে। অনন্তকাল-প্রবাহের মধ্যে বুদ্‌বুদের ন্যায় ইহারা ভাসিয়া উঠিতেছে এবং কিছুক্ষণ পরে বিলীন হইয়া যাইতেছে। এই যে কাল প্রবাহ—ইহা কি আমার বা তোমার দেখার উপরে নির্ভর করিতেছে? মোটেই না; তুমি পরীক্ষা কক্ষে না থাকিলেও সময় বহিয়া যাইত, আর ছাত্রেরা আমার বক্তৃতা না শুনিলেও সময়ের অস্তিত্ব লুপ্ত হইত না। "সময় বহিয়া যায় নদীর স্রোতের প্রায়", কেহ দেখুক আর না দেখুক—তাহাতে সময়ের কিছু আসে যায় না। এক কথায়, সময় মনঃনিরপেক্ষ বস্তু; কোন দ্রষ্টার মনন ক্রিয়ার উপর ইহার অস্তিত্ব নির্ভর করে না। অর্থাৎ ইহার এক স্বাধীন সত্তা আছে; তাই সকলেই উহা সমানভাবে প্রত্যক্ষ করিতে পারে, তবে কেহ প্রত্যক্ষ না করিলেও কোন ক্ষতি নাই, উহা যেমন ভাবে চলিতেছে তেমন ভাবেই চলিতে থাকিবে।

II. Subjective View

অনেকেই উপরি উক্ত মতবাদ গ্রহণ করেন না। তাঁহারা বলেন পৃথিবীর কোন জিনিষই মনঃনিরপেক্ষ নহে; সময়ও মনঃনিরপেক্ষ ব্যাপার নহে। আমাদের মনন ক্রিয়ার উপরেই যাবতীয় বস্তুর অস্তিত্ব নির্ভর করে। ধর, আমি একটি ফুল প্রত্যক্ষ করিতেছি; অতএব ইহা যে তখন এক ধারণারূপে বা মানসরূপে

আমার চেতনার মধ্যে প্রতিভাত থাকে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই; সকলেই ইহা স্বীকার করেন। কিন্তু বস্তুবাদিগণ (Objectivism) বলেন যে আমাদের এই চেতনার বাহিরেও উহার এক নিজস্ব সত্তা আছে। কেহ যদি উহাকে প্রত্যক্ষ করে ভাল, কিন্তু না করিলেও কিছু আসে যায় না। কিন্তু ভাববাদিগণ (Subjectivism) ইহা স্বীকার করেন না; তাঁহারা বলেন মনের বাহিরে ফুলের কোন অস্তিত্ব নাই। তুমি বলিতেছ বহির্জগতে ফুল আছে; কিন্তু কেহই যদি উহাকে প্রত্যক্ষ করিতে না পারে, তাহা হইলে উহার থাকা বা না থাকার মধ্যে পার্থক্য রহিল কি? যাহা আমার বা তোমার বা কাহারও চেতনার মধ্যে প্রতিভাত হয় না, তাহার অস্তিত্ব আমরা জানিতে পারিব কেমন করিয়া? আমাদের মনের মধ্যে উহার সত্তা উপলব্ধি করিতে পারিলে তো আমরা উহার অস্তিত্ব স্বীকার করিব? তাই অনেকে বলেন যে যাহা আমরা চেতনার মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারি, শুধু তাহারই অস্তিত্ব আমরা স্বীকার করি; অনুপলব্ধ জিনিষের অস্তিত্ব স্বীকার করা সম্ভব নহে। "**কাল**" সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা প্রযোজ্য। ফুল প্রত্যক্ষ করি বলিয়া আমরা ফুলের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি, সেইরূপ কাল প্রত্যক্ষ করি বলিয়া আমরা কালের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি। কাল প্রত্যক্ষ করিবার একমাত্র উপায়, শব্দ-সংবেদন। ধর, দেয়াল ঘড়ি টং টং করিয়া পাঁচবার বাজিল; শব্দগুলি যে একই সঙ্গে ধ্বনিত হইতেছে না, তাহা বলাই বাহুল্য; আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি যে শব্দগুলি পর পর আসিতেছে। এই পরম্পর বা পারম্পর্য কি করিয়া সম্ভব হয়? ইহার একমাত্র কারণ—কাল; কাল আছে এবং কালের স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে বলিয়াই পাঁচটি শব্দ পর পর আসিতে পারিতেছে। অতএব পর পর পাঁচটি শব্দ শুনিয়া আমরা প্রকৃত পক্ষে কাল-প্রবাহই প্রত্যক্ষ করিতেছি—যাহা না হইলে ইহারা পর পর আসিতে পারিত না। এইভাবে সংবেদনের মাধ্যমে আমরা কালের অস্তিত্ব অবগত হইয়া থাকি। কিন্তু সংবেদন মাত্রই মানসিক ব্যাপার। অতএব সংবেদনের মাধ্যমে আমরা যে কাল প্রত্যক্ষ করি, তাহা মোটেই মনঃনিরপেক্ষ নহে। ইহাও স্থানের ন্যায় মনঃসাপেক্ষ ব্যাপার।

উপরিউক্ত প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আমরা সাক্ষাৎভাবে যে কাল প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহাকে Perceptual Time বলে। কিন্তু এখানে একটি কথা আছে—আমরা কী প্রত্যক্ষ করি, কাল প্রত্যক্ষ করি, না কালবদ্ধ কোন ঘটনা প্রত্যক্ষ করি? একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করি, তাহা কাল নহে, **ঘটনা** মাত্র। কথাটি ভাল করিয়া বুঝান যাউক। আমরা দেখিলাম সকালে সূর্য উঠিতেছে, বার ঘণ্টা পরে দেখি উহা অস্ত যাইতেছে; একটি ছাত্র আজ কলেজে

ভর্ত্তি হইতেছে ; কয়েক মাস পরে দেখি সে অন্যত্র চলিয়া যাইতেছে ; আজ আমার জ্বর হইল কয়েক দিন পরে আমি ভাল হইয়া গেলাম ; ইত্যাদি। অসংখ্য ঘটনা আমরা অনবরত প্রত্যক্ষ করিতেছি ; ইহারা একের পর এক সংঘটিত হইতেছে। ইহাদের কোনটি দীর্ঘ স্থায়ী, কোনটি স্বল্প স্থায়ী, কোনটি অতীত আর কোনটি বা বর্তমান ; অর্থাৎ প্রত্যেক ঘটনারই কিঞ্চিৎ নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য আছে, তাই উহারা বিভিন্ন। তবে যত বিভিন্নই হউক না কেন, উহাদের সকলের মধ্যেই এক সাধারণ গুণ বিদ্যমান আছে, তাহার নাম **কাল-ব্যাপ্তি**। যে ঘটনা অধুনা সংঘটিত হইতেছে, তাহার মধ্যে কাল-ব্যাপ্তি আছে ; আর যে ঘটনা অতীতে সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যেও কাল-ব্যাপ্তি আছে ; দীর্ঘস্থায়ী হউক বা স্বল্পস্থায়ী হউক—প্রত্যেক ঘটনাই কিঞ্চিৎ **কাল** অধিকার করিয়া বিরাজ করিতেছে ; অর্থাৎ যে ঘটনাই ঘটুক না কেন, উহা কালের মধ্যেই সংঘটিত হয়।

Time—Perceptual and Conceptual

তাহা হইলে দেখা গেল যে দীর্ঘস্থায়ী বা স্বল্পস্থায়ী, অতীত বা বর্তমান —ইহা ঘটনাসমূহের সাধারণ গুণ নহে ; ইহাদের সাধারণ গুণ, কাল-ব্যাপ্তি—যাহা সকল ঘটনার মধ্যেই ব্যাপ্ত আছে। তবে সাধারণ গুণ হইলে কি হয় ? সাধারণ গুণ হইলেই যে ইহার এক নিজস্ব স্বাধীন সত্তা থাকিবে, তাহা নহে ; ঘটনাসমূহের মধ্যেই ইহার অস্তিত্ব ; ঘটনা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্রভাবে ইহা বিরাজ করিতে পারে না। যেমন, ধর, Rationality ; ইহা মানুষের প্রধান গুণ ; কিন্তু তাই বলিয়া ইহা কি মানুষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্রভাবে বিরাজ করিতে পারে ? তাহা অসম্ভব ; Rationality থাকিলেই বুঝিতে হইবে যে ইহা কোন ব্যক্তিবিশেষকে আশ্রয় করিয়া বিরাজ করিতেছে ; ইহা নিরবলম্ব হইয়া ভাসিয়া বেড়াইতে পারে না। সেইরূপ, প্রত্যেক ঘটনার মধ্যেই কালব্যাপ্তি আছে বটে, কিন্তু এই সব ঘটনা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীনভাবে ইহা থাকিতে পারে না ; সর্বদাই কোন ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া ইহা বিরাজ করে। তাই আমরা বলিয়াছি যে আমরা কখনও "শুধু কাল" প্রত্যক্ষ করি না, আমরা ঘটনাবদ্ধ কাল প্রত্যক্ষ করি ; যে কাল ঘটনার মধ্যে ব্যাপ্ত রহিয়াছে— উহাই আমরা প্রত্যক্ষ করি, ঘটনাবিহীন নিরবলম্ব কাল কেহ কখন দেখিতে পারে না।

এই প্রকার ঘটনাহীন "শুধু কাল" আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না বটে, কিন্তু ইহার কথা আমরা সকলেই কল্পনা করিতে পারি। যেমন

Rationality-র উদাহরণটি লওয়া যাউক। ইহা ব্যক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিরাজ করে না বটে, তবুও আমরা স্বতন্ত্রভাবে ইহার কথা চিন্তা করিতে পারি। ইহা যখন প্রত্যক ব্যক্তির মধ্যেই বিদ্যমান আছে, তখন সেই ব্যক্তিগুলির কথা বাদ দিয়া শুধু তাহাদের এই সাধারণ গুণটির প্রতি মনোনিবেশ করিতে পারিলেই হইল। তাহা হইলে ব্যক্তিগুলি বাদ পড়িয়া যায়; শুধু তাহাদের গুণটিই আমাদের মনের মধ্যে একক ভাবে বিরাজ করিতে থাকে। ইহাকে আমরা Concept বা ধারণা বলি। "কাল" সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা প্রযোজ্য। আমরা যে কাল প্রত্যক্ষ করি তাহা সর্বদাই ঘটনার মধ্যে নিবদ্ধ থাকে বটে, কিন্তু একে একে সমস্ত ঘটনাগুলি বাদ দিয়া যদি শুধু উহাদের সাধারণ গুণটির প্রতি মনঃসংযোগ করি, তাহা হইলে ঘটনার মূর্ত্তিগুলি ধীরে ধীরে আমাদের মন হইতে অপসৃত হইয়া যায়; তখন শুধু এক অমূর্ত ধারণা আমাদের মনের মধ্যে বিরাজ করিতে থাকে। ইহাকে আমরা Conceptual Time বা **ধারণামূলক কাল** বলিতে পারি। তখন আমরা শুধু কালের কথাই চিন্তা করি, ঘটনার কথা চিন্তা করি না। এইভাবে ঘটনা হইতে কালকে বিচ্ছিন্ন করিয়া "শুধু কালের" কথা চিন্তা করাকে "ধারণা করা" বলে। বলা বাহুল্য, "ধারণা করা" বিশুদ্ধ মানসিক ক্রিয়া। আমরা মনের মধ্যে যাহা ধারণ করিয়া রাখি তাহা মনোজগতের বিষয়বস্তু (Subjective), তাহাকে বহির্জগতের বিষয়বস্তু (Objective) বলা যায় না। অতএব আমরা যে ধারণা-মূলক কালের কথা বলিলাম, তাহা মোটেই জাগতিক বস্তু নহে; Perceptual Time বা **প্রত্যক্ষীকৃত কালের** ন্যায় ইহাও মানসিক ছবি মাত্র; আমাদের মনের মধ্যেই ইহাদের অস্তিত্ব; মনের বাহিরে ইহাদের কোন সত্তা নাই।

III. Kantian View

এখন আমরা মহামতি ক্যাণ্টের মতবাদ ব্যাখ্যা করিব। তাঁহার মতানুসারে উপরিউক্ত Subjective মতবাদ গ্রহণ করা যাইতে পারে না; উহার গোড়াতেই গলদ। Subjective মতে **কাল** মনঃসাপেক্ষ ব্যাপার; সংবেদনের মাধ্যমে আমরা ইহার কথা অবগত হইয়া থাকি। যেমন তাঁহারা বলেন, দেয়াল ঘড়ির টং টং শব্দগুলি আমরা যখন পর পর শুনিতে পাই, তখন আমরা কালের অস্তিত্ব অবগত হই; কারণ, পর পর আসা মানেই কালের মধ্যে বিরাজ করা; কাল না থাকিলে ইহারা পরপর আসিবে কেমন করিয়া? এইভাবে আমরা শব্দ সংবেদনের মাধ্যমে কালের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতেছি। ইহার উত্তরে ক্যাণ্ট বলেন যে এই প্রকার যুক্তির

মধ্যে এক মস্ত ভুল রহিয়া গিয়াছে। তাঁহারা বলিতেছেন "শব্দগুলি পর-পর শুনিয়া আমরা কালের অস্তিত্ব উপলব্ধি করি।" কিন্তু ক্যাণ্ট বলেন, ইহা সম্পূর্ণ ভুল। শব্দগুলি যে পর পর আসিতেছে তাহা আমরা জানিতে পারিলাম কেমন করিয়া? আগে হইতেই আমাদের মনের মধ্যে কালের জ্ঞান আছে বলিয়া আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে ইহারা পরপর আসিতেছে; নতুবা আমরা শব্দ শুনিতে পাইতাম বটে, কিন্তু ইহারা যে পর পর আসিতেছে তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারিতাম না। যাহার কাল জ্ঞান নাই তাহার পক্ষে পর পর আসার কথা জানিতে পারা সম্ভব নহে। পারম্পর্য বুঝিতে হইলেই কালের জ্ঞান থাকা দরকার। সেইজন্য ক্যাণ্ট বলেন যে Subjective মতবাদে গোড়াতেই গলদ আছে। তাঁহারা বলেন যে অভিজ্ঞতার ফলে আমরা কালের কথা জানিতে পারি, কিন্তু ক্যাণ্ট বলেন যে অভিজ্ঞতার আগে হইতেই আমদের মনে কাল সম্বন্ধীয় জ্ঞান বিদ্যমান থাকে। একটু হেঁয়ালির ভাষায় বলা যায় যে, কাল প্রত্যক্ষ করিবার আগেই আমরা কাল উপলব্ধি করিয়া বসিয়া থাকি। ক্যাণ্টের মতানুসারে আমরা কেহই কাল-জ্ঞানশূন্য হইয়া এই পৃথিবীতে আসি নাই; প্রত্যেকের মনের মধ্যেই কাল সম্বন্ধীয় এক প্রাক্‌সিদ্ধ (A priori) ধারণা আছে। ইহাকে আমরা পূর্ব অধ্যায়ে জ্ঞান-সূত্র (category) নামে অভিহিত করিয়াছি। এই সূত্র ব্যবহার করিয়াই আমরা জাগতিক ঘটনাগুলিকে কালবদ্ধ বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতে শিখি; নতুবা ঘড়ির ধ্বনিগুলিকে পরম্পরাগত বলিয়া প্রত্যক্ষ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হইত না। তাই ক্যাণ্ট বলেন প্রত্যক্ষ করিবার আগেই আমরা আমাদের মনের মধ্য হইতে এই কাল-সূত্রটি বহির্জগতে প্রক্ষিপ্ত করিযা দিই; এইভাবে কালের জালে ধরিয়া ফেলিয়া আমরা ধ্বনিগুলিকে তখন পরম্পরাগত বলিয়া উপলব্ধি করি।

ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে কাল বলিয়া বহির্জগতে কিছুই নাই। ইহা এক মানসিক ছাঁচ মাত্র। ছানাকে সন্দেশে রূপায়িত করিতে হইলে ছানাকে যেমন ছাঁচের মধ্যে স্থাপিত করিতে হয়, সেইরকম জ্ঞান আহরণ করিতে হইলে জাগতিক উদ্দীপনাকেও কালের মধ্যে আবদ্ধ করিতে হয়। এইভাবে কাল-সূত্রের দ্বারা শৃঙ্খলিত করিয়া আমরা জাগতিক বস্তু প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। ক্যাণ্টের এই মতবাদের সহিত Subjective মতবাদিগণের পার্থক্য কোথায়—তাহাই একটু ব্যাখ্যা করা যাউক। তাঁহাদের মতে আমরা প্রথমে সংবেদন পাই, তারপরে সেই সংবেদনের মাধ্যমে কাল-সম্বন্ধীয় জ্ঞান

আহরণ করি; অভিজ্ঞতার পরে আসে কাল-জ্ঞান—তাই ইহাকে A posteriori বলে। কিন্তু ক্যাণ্টের মতানুসারে, অভিজ্ঞতার পরে আমরা এই জ্ঞান লাভ করি না; অভিজ্ঞতার পূর্ব হইতেই ইহা আমাদের মনের মধ্যে সঞ্চিত থাকে। তাই ইহাকে A priori জ্ঞান বলে। এই পার্থক্য সত্ত্বেও এই দুই মতবাদের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। subjective মতানুসারে কালের কোন জাগতিক সত্তা নাই; ইহা আমাদের মানসিক সৃষ্টি মাত্র। ক্যাণ্টের মতানুসারেও ইহার কোন জাগতিক সত্তা নাই, ইহার সত্তা মানসিক। তবে মানসিক হইলেও ইহাকে ঠিক মনের সৃষ্টি বলা যায় না; কারণ কেহই চেষ্টা সহকারে ইহা সৃষ্টি করে নাই, সূত্ররূপে ইহা চিরকালই আমাদের "মনেব মধ্যে" বিদ্যমান আছে; অর্থাৎ মনের বাহিরে কালের কোন অস্তিত্ব নাই। তাই ক্যাণ্ট বলিতে পারেন যে পৃথিবী হইতে যদি আমাদের মনের অস্তিত্ব অবলুপ্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে কাল বলিয়া কোন জিনিষই পৃথিবীতে থাকিবে না। কারণ, কাল তো মনের অবদান মাত্র; যদি মনই না থাকিল, তবে কাল থাকিবে কেমন করিয়া?

IV. Hegelian View

ক্যাণ্ট বলেন যে আমাদের মনের মধ্যে কাল সম্বন্ধীয় এক প্রাকসিদ্ধ ধারণা আছে। যখনই আমরা কোন কিছু প্রত্যক্ষ করিতে চাই, তখনই উহাকে এই আধারের মধ্যে আধৃত করিয়া, অর্থাৎ কালবদ্ধ করিয়া প্রত্যক্ষ করি। হেগেলও ইহা স্বীকার করেন; তবে তিনি এই বিষয়টি আরও সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিয়া বলেন যে আমরা যখন সকলেই এইভাবে কালের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করি, তখন নিশ্চয়ই ইহার কোন যথাযথ কারণ আছে। কেবল আমার মনে বা তোমার মনে নহে, পৃথিবীর সকল মানুষের মনেই এই কাল-সূত্র বিদ্যমান আছে; তাই আমরা সকলেই কালের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু ইহার কারণ কি? কেন আমরা সকলেই একই ছাঁচে চিন্তা করি? ক্যাণ্ট ইহার কোন উত্তর দেন নাই; ইহার উত্তর দিয়াছেন হেগেল। তিনি বলেন মানুষ শুধু মানুষ নহে; তাঁহার মধ্যে ঈশ্বরের স্বরূপও নিহিত আছে; বস্তুতঃ ঈশ্বরই মানুষের মধ্যে সসীমরূপে প্রকটিত আছেন। মানুষের বুদ্ধি তাঁহারই বুদ্ধি, মানুষের চিন্তা তাঁহারই চিন্তা; মানুষের মধ্যে পরিমিত হইয়া শুধু একটু সসীম রূপগ্রহণ করিয়াছে মাত্র। তাহা হইলে বলিতে হইবে যে আমরা যখন চিন্তা করি তখন যেমন তেমন

ভাবে চিন্তা করি না; ঈশ্বরের বিধান অনুযায়ীই চিন্তা করি।* ঈশ্বরের বিধান কি? সৃষ্টি করাই ঈশ্বরের বিধান; সৃষ্টি ছাড়া তিনি থাকিতে পারেন না; সৃষ্টিই তাঁহার ধর্ম। তবে মনে রাখিতে হইবে যে সৃষ্টপদার্থ মাত্রই সসীম; এই প্রকার সসীম জগৎ সৃষ্টি করিতে হইলেই উহাকে স্থানবদ্ধ ও কালবদ্ধ করিয়া সৃষ্টি করিতে হয়; কারণ যাহা স্থানাতীত ও কালাতীত—তাহা তো সসীম হইতে পারে না। তাই ঈশ্বর যখনই এই জগৎ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছেন তখনই ইহাকে স্থানের মধ্যে আবদ্ধ করিয়াছেন এবং কালের মধ্যে খণ্ডিত করিয়া সসীমরূপেই চিন্তা করিয়াছেন।

এখন বুঝা যাইবে যে কেন আমরা সর্বদাই কালের মাধ্যমে চিন্তা করিয়া থাকি। কারণ, না করিয়া উপায় নাই। পূর্বেই তো বলিয়াছি, ঈশ্বরই আমাদের মনের মধ্যে ক্রিয়া করিতেছেন; তিনি যেভাবে চিন্তা করেন আমরাও ঠিক সেইভাবেই চিন্তা করিয়া থাকি। ঈশ্বর নিজেই যখন স্থানও কালের মাধ্যমে জগতের কথা চিন্তা করেন, তখন আমরাও যে তদ্রূপ করিব তাহাতে আশ্চর্য হইবার কি আছে? তাই যখনই আমরা কোন বিষয়ে চিন্তা করি, তখনই উহাকে স্থান ও কালের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া চিন্তা করি। শুধু তুমি আর আমি এরূপ করি না; আমরা সকলেই এইরূপ করি; নিজেদের খুশীমত করি না, বাধ্য হইয়াই করি। কারণ, ঈশ্বরের চিন্তাধারা অনুসরণ করিতে হইলে স্থান ও কালের মাধ্যমে চিন্তা করা ছাড়া অন্য গতি নাই।

ক্যাণ্টের সহিত হেগেলের মতবাদের পার্থক্য বুঝাইয়া আমরা এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। ক্যাণ্ট বলেন যে প্রত্যেক মানুষের মনেই কাল সম্বন্ধীয় এক ধারণা আছে; সেই ধারণা অনুযায়ীই আমরা ঘটনাসমূহ প্রত্যক্ষ করি। হেগেলও তাহাই বলেন; কিন্তু হেগেল আরও একটু অগ্রসর হইয়া বলেন যে এই কাল-সূত্র শুধু মানুষের মনে নাই, ঈশ্বরের মনেও আছে; বস্তুতঃ ঈশ্বরের মনে আছে বলিয়াই মানুষের মনেও ইহা আছে। অতএব উভয়ের মতেই কাল মনঃসাপেক্ষ ব্যাপার। সেইজন্য ক্যাণ্টের ন্যায় হেগেলের মতবাদকেও Subjective বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। তবে ক্যাণ্ট বলেন, কালের মোটেই জাগতিক অস্তিত্ব নাই; ইহা মনের অবদান মাত্র; অতএব পৃথিবী হইতে যদি মন অবলুপ্ত হইয়া যায়, তবে সঙ্গে সঙ্গে কালও অবলুপ্ত হইয়া যাইবে। কিন্তু হেগেলের মতানুসারে ইহা সম্ভব নহে। তিনি বলেন কালসূত্র আমাদের মানসিক সম্পদ বটে, কিন্তু ইহা শুধু আমাদের

* "We rethink what has already been thought out by God".

মনের সম্পদ নহে; ইহা ঈশ্বরেরও মনের সম্পদ। অতএব আমরা যদি পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাই, তবুও পৃথিবী হইতে কাল অবলুপ্ত হইয়া যাইবে না, কারণ, ঈশ্বর তো অবলুপ্ত হইতে পারেন না; তিনি নিত্য ও অনন্ত। তাঁহার সৃষ্টির অন্ত নাই, এই অনন্ত সৃষ্টির জন্য তাঁহাকে নিরন্তর কালের কথা চিন্তা করিতে হইতেছে, যেহেতু কাল ব্যতিরেকে তিনি কিছুই সৃষ্টি করিতে পারেন না, কালের মধ্যেই তাঁহার সৃষ্টি পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। অতএব এই কাল ব্যাপ্তিকে একেবারে মনোগত ব্যাপার বলিয়া অভিহিত করা যায় না, অর্থাৎ ইহার বাস্তব সত্তা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। মনে রাখিতে হইবে ঈশ্বরের এই সৃষ্ট জগৎ একেবারে অলীক বা কাল্পনিক হইতে পারে না, তাহা হইলে ঈশ্বরকেই যে একেবারে অলীক হইয়া পড়িতে হয়; কারণ এই জগতের মধ্য দিয়াই তো ঈশ্বর আত্মপ্রকাশ লাভ করিতেছেন, অতএব এই জগৎ যদি মিথ্যা হয়, তবে ঈশ্বরও শূন্য হইয়া পড়েন। সেইজন্য হেগেল কাল-ব্যাপ্তিকে একেবারে মানসিক ব্যাপার বলিয়া উড়াইয়া দেন নাই; ইহার বাস্তব সত্তা স্বীকার করিয়াছেন। তাহা হইলে দেখা গেল যে হেগেলের মতবাদ শুধু Subjective বা শুধু Objective নহে, ইহাতে উভয় মতেরই সমন্বয় সাধন করা হইয়াছে।

"Real" and "Rational'

এখন এই প্রসঙ্গের উপসংহার করা যাউক। আমরা একে একে স্থান ও কালের কথা আলোচনা করিলাম, ইহাদিগকে আমরা জ্ঞান-তত্ত্ব নামে অভিহিত করিয়াছি। এইরকম আরো অনেকটি জ্ঞান-তত্ত্ব আমাদের মনের মধ্যে নিহিত আছে, ইহাদের সাহায্যে আমরা জ্ঞান আহরণ করি। তবে আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে এইসব তত্ত্ব শুধু মনের সম্পত্তি নহে, বাহ্যজগতের মধ্যেও ইহারা বিদ্যমান আছে, অতএব ইহাদিগকে বাহ্যজগতেরও সম্পত্তি বলা যাইতে পারে অথবা আরও স্পষ্টভাবে বলা যায় যে উহা কাহারও নিজস্ব সম্পত্তি নহে, উহারা **ব্রহ্মেরই সম্পত্তি**। তবে তিনি নিজের মধ্যে উহা গচ্ছিত রাখেন নাই, সর্বত্রই বিলাইয়া দিয়াছেন—আমাদের মনের মধ্যে যেমন বিলাইয়া দিয়াছেন, বহির্জগতেও তেমন বিলাইয়া দিয়াছেন। যাহা বহির্জগতে আছে তাহাকে আমরা সাধারণতঃ বাস্তব (Real) বলি, আর যাহা মনোজগতে আছে তাহাকে আমরা মানস (Rational) বলি। এইভাবে আমরা উহাদিগকে পৃথক নামে অভিহিত করিতে পারি বটে, কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে উহারা সত্যই পৃথক

নহে, উহারা মূলতঃ এক ; একই ব্রহ্মের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। যে ব্রহ্ম বহির্জগতের মধ্যে প্রকটিত আছেন, তিনি আমাদের মনোজগতের মধ্যেও বিরাজ করিতেছেন। তাই হেগেল বলেন, আমরা যখন বাহ্যবস্তুর কথা চিন্তা করি, তখন কোন বিজাতীয় বস্তুর কথা চিন্তা করি না, ব্রহ্মেরই জড়রূপের কথা চিন্তা করি। আর আমরা যাহারা চিন্তা করি, আমরাও বিজাতীয় বস্তু নহি, আমরাও সেই ব্রহ্মেরই আর এক রূপ—তাঁহার 'চেতন রূপ'। এক কথায়, ব্রহ্মেরই চেতনরূপে আমারা ব্রহ্মেরই অচেতন রূপ প্রত্যক্ষ করি। তাহা হইলে চেতন (Rational) ও অচেতনের (Real) মধ্যে পার্থক্য রহিল কোথায়? ইহারা একই ব্রহ্মের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। সেইজন্য হেগেল বলেন "Whatever is real is rational, and whatever is rational is real", অর্থাৎ যাহার বাস্তব সত্তা আছে তাহার মানস সত্তাও নিশ্চয়ই আছে, আর যাহার মানস সত্তা আছে, তাহার বাস্তব সত্তাও নিশ্চয়ই আছে। মোট কথা, বাস্তব সত্তা এবং মানস সত্তা—ইহাদের মধ্যে কোন প্রকৃতিগত পার্থক্য থাকিতে পারে না, ইহারা সমজাতীয়।

পঞ্চম খণ্ড

মূল-তত্ত্ব

Ultimate Reality

পঞ্চদশ অধ্যায়

Materialism or Idealism

ভগবৎ-তত্ত্বের পরে অধ্যাত্ম-তত্ত্ব ও জড়-তত্ত্বের আলোচনা সমাপ্ত হইল। জড়বাদিগণ জড়পদার্থের উপরেই গুরুত্ব আরোপ করেন বেশী, তাঁহাদের মতানুসারে অণুপরমাণুর সংযোগেই বিশ্বজগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, উহাতে ঈশ্বরের কোন অবদান নাই। অতএব এইসব জড়পরমাণুকেই বিশ্বের মূলতত্ত্ব (Ultimate reality) বলা যাইতে পারে। তাহা হইলে মন বা চেতনা বা আত্মার কি অবস্থা হয়? জড়বাদিগণ ইহার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন না, তবে তাঁহারা বলেন যে মনের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই। জড়বস্তু হইতেই উহার উদ্ভব হইয়া থাকে, অতএব জড়বস্তু ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে আত্মাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় (Materialism)। অধ্যাত্মবাদিগণ ইহা স্বীকার করেন না, তাঁহারা বলেন মন বা চেতনাই বিশ্বের মূলতত্ত্ব (Ultimate Reality)। জড়বস্তুর উপরে তাঁহারা মোটেই গুরুত্ব আরোপ করেন না, অনেকে ইহার অস্তিত্ব পর্যন্ত অস্বীকার করেন, আর যাঁহারা ইহার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন না তাঁহারাও বলেন যে ইহার কোন স্বাধীন সত্তা নাই; মন বা চেতনার উপরেই ইহার অস্তিত্ব নির্ভর করে (Idealism বা Spiritualism)।

এইরকম মতানৈক্যই দর্শন শাস্ত্রের বৈশিষ্ট্য, যে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাউক না কেন, কোন বিষয়েই মতৈক্য পাওয়া যায় না। আমাদের প্রথম প্রশ্ন —বিশ্বের মূলতত্ত্বের স্বরূপ কি, উহা চেতন না অচেতন? দেখা গেল ইহার উত্তরে Materialism যাহা বলে Idealism ঠিক তাহার বিপরীত কথা বলে। এখন আর একটি প্রশ্ন করা যাউক, সেখানেও দেখিব ঠিক এই অবস্থা, বিভিন্ন মতবাদের পারস্পরিক বিরোধিতা। প্রশ্নটি এই :—মূলতত্ত্বের সংখ্যা কত, এক, না একাধিক (one or many)? ইহার উত্তরে কেহ বলেন, মূলতত্ত্ব এক; তিনি এক এবং অদ্বিতীয়, তিনিই সমস্ত বিশ্বজগতের মূল কারণ (Monism)। আবার কেহ বলেন, মূল-তত্ত্ব বহু (Pluralism); বহু অণুপরমাণুর সংযোগেই বিশ্বজগৎ

সৃষ্ট হইয়াছে, একের দ্বারা নহে। আবার অনেকে বলেন, মূল-তত্ত্ব একও নহে, বহুও নহে ; মূল-তত্ত্ব দুই (Dualism)। একদিকে আছে জড় পরমাণু, আর অন্যদিক আছেন ঈশ্বর ; উভয়েরই স্বাধীন সত্তা আছে, তাই কাহারও একক ক্রিয়ায় বিশ্বসৃষ্টি হইতে পারে না, উভয়ের সমন্বয়ের ফলেই বিশ্বসৃষ্টি হইতেছে।

তাহা হইলে এখানে দুইটি সমস্যা দেখা যাইতেছে, প্রথমতঃ জড়বাদ বনাম ভাববাদ ; আর দ্বিতীয়তঃ দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ বনাম বহুত্ববাদ। এই দুইটি সমস্যাকে পৃথকভাবে আলোচনা না করিয়া আমরা একই সঙ্গে আলোচনা করিব ; নতুবা আলোচনা জটিল হইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। এই জটিলতা পরিহার করিবার জন্য প্রথমেই আমাদের বিষয়বস্তুর একটি রেখা চিত্র দেওয়া যাউক।

আমরা এখন একে একে প্রত্যেকটি বিষয় লইয়া আলোচনা করিব।
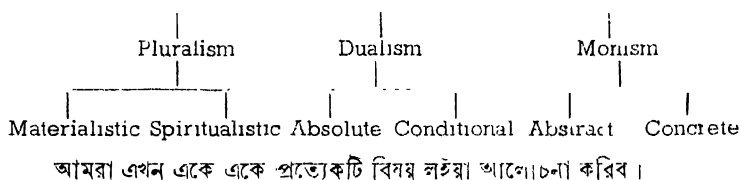
1. Pluralism (Materialistic : Atomism)

"জড়-তত্ত্ব" অধ্যায়ে আমরা এ বিষয়ে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি। জড়বাদিগণের মূল বক্তব্য এই যে, অনাদিকাল হইতে যে অসংখ্য অণুপরমাণু বিদ্যমান ছিল তাহারাই নানাভাবে সংযুক্ত হইয়া এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইতে গেলেই ইহাদিগকে স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে হয় ; তাহার জন্য গতি তথা শক্তির প্রয়োজন কিন্তু এই শক্তি আসিবে কোথা হইতে ? বাহিরে যদি কোন মননশীল কর্তা থাকিতেন তাহা হইলে তিনি হয়ত শক্তি সঞ্চার করিয়া ইহাদিগকে পরিচালিত করিতে পারিতেন। কিন্তু জড়বাদিগণ এইরূপ কোন মননশীল নিয়ন্তার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাহাদের মতানুসারে পরমাণুসমূহ আপনা-আপনিই পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইতেছে, ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণে নহে। তাই তাঁহারা বলেন যে পরমাণুর নিজস্ব শক্তি আছে, সেই অন্তর্নিহিত শক্তির প্রভাবেই উহারা পরস্পরের উপর ক্রিয়া করিতে পারে, বাহির হইতে শক্তি সঞ্চারণ করিবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু শুধু শক্তি থাকিলেই চলে না ; আরও কিছু চাই ; পরমাণুসমূহ যাহাতে দিগন্তে ছুটাছুটি করিতে পারে, তাহার জন্য **অসীম স্থান** চাই ; এবং যাহাতে ইহারা জগৎ সৃষ্টি করিতে পারে তাহার জন্য **অনন্ত কাল** চাই। অনন্তকাল ধরিয়া অসীম আকাশে ছুটাছুটি করিয়া তাহারা এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিতেছে ; ইহাতে ঈশ্বরের সাহায্য প্রয়োজন হইতেছে না।

সমালোচনা। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণ না থাকিলে, পরমাণু সমূহ আর যাহাই করুক না কেন, নিজে নিজে এইরূপ নিপুণভাবে বিশ্ব সৃষ্টি করিতে পারিত না; এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক অংশের মধ্যে যেরূপ অদ্ভুত শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়—তাহা আকস্মিকভাবে সংঘটিত হইতে পারে না; উহার জন্য কোন মননশীল কর্তার নিয়ন্ত্রণ চাই। কোন এক উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্যই তিনি পরমাণুগুলিকে যথাযথ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন; নতুবা ইহারা যেমন তেমন ভাবে সংযুক্ত হইয়া এক বিশৃঙ্খল কাণ্ড করিত। দ্বিতীয়তঃ, জড়বাদিগণ বলেন যে জড়পরমাণু হইতেই মন বা চেতনার উদ্ভব হইয়াছে; জড়বস্তুই বিবর্তিত হইয়া মনের আকার গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু আমাদের মতানুসারে ইহা মোটেই সম্ভব নহে; জড়বস্তু হইতে জড়বস্তুই উৎপন্ন হইতে পারে, মন বা চেতনার ন্যায় এক সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মাবলম্বী পদার্থের উৎপত্তি হইতে পারে না। চেতন ও অচেতন —ইহাদের মধ্যে এত বৃহৎ ব্যবধান বিদ্যমান যে, কোন অচেতন পদার্থের পক্ষে এই ব্যবধান অতিক্রম করা সম্ভব নহে; অর্থাৎ জড়ের পক্ষে মনের ন্যায় এক সম্পূর্ণ বিভিন্ন জিনিষে পরিণত হওয়া অসম্ভব।

I. Pluralism (Spiritualistic : Monadism)

উপরোক্ত সমালোচনা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত লাইব্‌নিজ (Leibnitz) বলেন যে পরমাণুসমূহ মোটেই জড়পদার্থ নহে। তিনি বলেন প্রত্যেক পরমাণুই এক এক মনোবিন্দু বা Monad; মানুষের মধ্যে যেমন চেতন শক্তি আছে, পরমাণুর মধ্যেও তেমন চেতন শক্তি আছে। মনঃ শক্তির পিণ্ড বলিয়া তিনি ইহাকে Monad নামে অভিহিত করিয়াছেন, আমরা ইহাকে মনোবিন্দু বলিতে পারি। মনোবিন্দু হইলেও ইহাদের সকলের মধ্যেই সমপরিমাণ মনঃ শক্তি নাই; কাহারও মধ্যে কম আছে আর কাহারও মধ্যে বেশী আছে। যেমন, মানুষের মধ্যে চেতনা আছে আবার আত্ম-চেতনাও আছে; কিন্তু পশুদের মধ্যে শুধু চেতনা আছে, আত্ম-চেতনা নাই। আবার গাছ পাতা ফল ফুলের মধ্যে যে চেতনা আছে তাহা ঠিক চেতনা নহে; অবচেতনার সমতুল। আর জল বায়ু অগ্নি প্রভৃতি তথাকথিত জড় পদার্থের মধ্যে যে চিৎশক্তি আছে—তাহাকে ঠিক অবচেতনাও বলা যায় না; উহাকে অচেতন চেতনা বলাই অধিকতর সঙ্গত। মোট কথা লাইব্‌নিজের মতে একেবারে অচেতন জড় পদার্থ বলিয়া কোন কিছু নাই; প্রত্যেক পদার্থের মধ্যেই কিছু না কিছু চিৎশক্তি আছে। এইভাবে তিনি জড় পদার্থের জড়ত্ব দূর করিয়া সর্বত্রই চিৎশক্তির প্রতিষ্ঠা করিবার

চেষ্টা করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে; তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বেও বিশ্বাস করেন। তাঁহার মতানুসারে ঈশ্বরই এইসব অসংখ্য মনোবিন্দুকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণপূর্বক বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন।

ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে লাইব্‌নিজের Monadism-কে মোটেই জড়বাদ বলিয়া অভিহিত করা যায় না। বহুতত্ত্বে বিশ্বাস করিয়াও তিনি জড়বাদ পরিহার করিতে পারিয়াছেন; পরমাণুগুলিকে মনোবিন্দুতে পরিণত করিয়া এবং ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করিয়া তিনি বস্তুতঃ অধ্যাত্মবাদ (Spiritualism) প্রচার করিতেছেন। ইহাতে তাঁহার প্রধান সুবিধা এই যে মন বা চেতনার উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা তাঁহার পক্ষে মোটেই অসুবিধাজনক নহে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে জড় হইতে শুধু জড় পদার্থই উৎপন্ন হইতে পারে, চেতনার উদ্ভব হইতে পারে না। তাহাতে লাইব্‌নিজের কিছুই অসুবিধা হয় না; কারণ, তাঁহার মূল-তত্ত্বগুলি (Monads) মোটেই জড়পদার্থ নহে, প্রত্যেকটিই চেতন পদার্থ, অতএব তিনি অনায়াসে বলিতে পারেন যে এক্ষেত্রে চেতন হইতেই চেতনার পরিস্ফুরণ হইতেছে, অচেতন পদার্থ হইতে নহে।

সমালোচনা

তবে ইহার অসুবিধাও যথেষ্ট আছে, কারণ, তাঁহার মতবাদ যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে ইটপাথরের মধ্যেও চিৎশক্তি আছে। কিন্তু কবিরা যাহাই বলুন না কেন, বৈজ্ঞানিকেরা এখনও পাথরের মধ্যে চেতনার সন্ধান পান নাই। যাহাদের জীবন আছে, নার্ভ আছে এবং মস্তিষ্ক আছে, শুধু তাহাদেরই চেতনা আছে, ইন্দ্রিয় ও জীবন বিরহিত পদার্থের মধ্যে চেতনা থাকিতে পারে না।

আর এক কথা; লাইব্‌নিজ যেমন ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তেমন সঙ্গে সঙ্গে মনোবিন্দুসমূহেরও স্বাধীন সত্তা স্বীকার করেন। এইখানেই তাঁহার বিপদ। কারণ, মনোবিন্দুসমূহের প্রত্যেকেই যদি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র হইয়া থাকে, তবে তাহাদের কার্যের মধ্যে সামঞ্জস্য উৎপন্ন হইল কেমন করিয়া? একটি উদাহরণ দিয়া বুঝান যাউক; মানব শরীরে শুধু দৈহিক মনোবিন্দু নাই, মানসিক মনোবিন্দুও আছে; সহজ কথায়, মানুষের দেহ আছে আবার মনও আছে। কিন্তু দুই-ই স্বতন্ত্র পদার্থ, অথচ উহাদের পারস্পরিক কার্যাবলীর মধ্যে কি অদ্ভুত সামঞ্জস্যই না পরিলক্ষিত হয়। যেমন দেখি, আমার মনের মধ্যে যেই সংকল্পের উদয় হয়, অমনি আমার হাত প্রসারিত হইয়া পড়ে, ফলে আমি হাত বাড়াইয়া ফুলটি তুলিয়া লই। এক্ষেত্রে

মানসিক ক্রিয়া ও শারীরিক ক্রিয়ার মধ্যে এই যে অদ্ভুত সম্পর্ক দেখা যায়—তাহা কেমন করিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে? লাইব্‌নিজের মতে ইহারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন; কেহই কাহারো উপর ক্রিয়া করিতে পারে না; তাহা হইলে ইহাদের কার্যের মধ্যে এইরূপ সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য থাকে কেমন করিয়া? ইহার উত্তরে লাইব নিজ বলেন যে ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণেই ইহা সম্ভব হয়। ঈশ্বর নাকি এমন নিখুঁত ভাবে আমাদের দেহ ও মন তৈয়ারি করিয়াছেন যে যখনই মন ক্রিয়া করে তখনই সঙ্গে সঙ্গে শরীরও ক্রিয়া করে, আবার যখন শরীর ক্রিয়া করে তখন সঙ্গে সঙ্গে মনও ক্রিয়া করে। প্রারম্ভ হইতেই ঈশ্বর এইরূপ সামঞ্জস্য সাধন করিয়া রাখিয়াছেন (**Pre-established Harmony**), তাই এখন আর দেহকে মনের উপর বা মনকে দেহের উপর ক্রিয়া করিতে হয় না। উদাহরণ; দুইটি ঘড়ি নিখুঁতভাবে তৈয়ারি করিয়া কারিগর দুইটিকেই একই সময়ে দম দিয়া চালু করিয়া দিলেন। তখন হইতে দুইটি ঘড়ি একই সময়ে টং টং করিয়া বাজিবে। এক্ষেত্রে বলা বাহুল্য কোন ঘড়িই অন্য ঘড়ির উপর ক্রিয়া করিতেছে না, অথচ অদ্ভুত সামঞ্জস্য রাখিয়া তাহারা কাজ করিতেছে। ইহার কারণ, প্রারম্ভেই তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করিয়া রাখা হইয়াছে; সেইজন্য কারিগরকে আর ইহাদের কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইতেছে না। শরীর ও মনের মধ্যেও ঠিক এইরূপ সম্বন্ধ বর্তমান। আদিতে তিনি ইহাদের মধ্যে যে সামঞ্জস্য বাঁধিয়া দিয়াছেন, এখনও ঠিক সেই সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া ইহারা কাজ করিয়া যাইতেছে। ইহার সমালোচনায় আমরা শুধু এইটুকু বলিতে চাই যে, লাইব্‌নিজের ন্যায় এত বড় পণ্ডিত যে কি করিয়া এমন হাস্যোদ্দীপক ব্যাখ্যা দিতে পারিলেন—তাহা সত্যই আশ্চর্য্যের বিষয়।

II. Dualism (Absolute)

দ্বৈতবাদিগণ দুই-ই চান; তাঁহারা ঈশ্বরকে চান আবার জড়পরমাণুও চান। যাঁহারা ঘোরতর জড়বাদী—তাঁহাদের মতে শুধু পরমাণুই সত্য, ঈশ্বর মিথ্যা; ঈশ্বরের কোন অস্তিত্ব নাই। আবার যাঁহারা ঘোরতর অদ্বৈতবাদী তাহাদের মতে শুধু ঈশ্বরই সত্য, জগৎ মিথ্যা, জড়জগতের কোন অস্তিত্ব নাই। দ্বৈতবাদিগণ মধ্যপন্থা অবলম্বন করেন, তাহাদের মতানুসারে ঈশ্বর আছেন আবার জড়বস্তুও আছে; দুই-ই সত্য; দুই-ই মূল-তত্ত্ব (ultimate reality), কাহাকেও বাদ দেওয়া যায় না।* এই দ্বৈতবাদ আবার দুই রকমের—Absolute Dualism

* অতএব Dualism একেবারে জড়বাদ নহে, বা একেবারে অধ্যাত্মবাদও নহে; ইহাতে উভয় মতবাদেরই স্পর্শ আছে: জড়বাদের স্পর্শ আছে, যেহেতু ইহা জড়পরমাণুর কার্যকারিতায় বিশ্বাস করে, আবার অধ্যাত্মবাদেরও স্পর্শ আছে, যেহেতু ইহা ভগবানের অস্তিত্বেও বিশ্বাস করে।

এবং Conditional Dualism। প্রথমে Absolute Dualism কি—তাহাই ব্যাখ্যা করা যাউক। ইহার শ্রেষ্ঠ নমুনা পাই আমাদের ভারতবর্ষীয় ন্যায়-শাস্ত্রে। ন্যায় মতানুসারে ঈশ্বরই এই বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা। কিন্তু সৃষ্টি করিতে হইলে তো উপাদানের প্রয়োজন হয়; এই উপাদান তিনি কোথা হইতে পাইলেন? ন্যায়-শাস্ত্রের উত্তর সহজ। ন্যায়-শাস্ত্র বলেন যে ঈশ্বর নিজে যেমন নিত্য ও শাশ্বত, প্রত্যেকটি পরমাণুও তেমন নিত্য ও শাশ্বত, অনাদি কাল হইতে ইহারা বিরাজ করিতেছে। এইসব উপাদান লইয়াই ঈশ্বর বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। এক্ষেত্রে মনে রাখিতে হইবে যে ঈশ্বর পরমাণু সৃষ্টি করেন নাই, তিনি ইহাদিগকে বিভিন্নভাবে সংযুক্ত করিয়াছেন মাত্র। ইহাদিগকে বিভিন্নভাবে সংযুক্ত করিয়া তিনি—সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতি বিভিন্ন পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন। একটি উপমা দিয়া বুঝান যাউক। কাঁটা আছে, কাচ আছে, Steel আছে, কল আছে—সবই আছে, কিন্তু এই উপাদানগুলি বিদ্যমান থাকিলেই তো ঘড়ি হয় না, ইহাদিগকে যথাযথভাবে সংযুক্ত করা দরকার, এই সংযোগ সাধন করাই কারিগরের কাজ। তিনি ইহাদিগকে যথাযথভাবে সংযুক্ত করিয়া ঘড়ি নির্মাণ করেন। ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, কারিগর না থাকিলে শুধু কাঁচ ও কাঁটাই পড়িয়া থাকিত, ঘড়ি নির্মিত হইত না। সেইরূপ ঈশ্বর না থাকিলে শুধু অণুপরমাণুই ভাসিয়া বেড়াইত, গ্রহ নক্ষত্র সৃষ্ট হইতে পারিত না। তিনিই ইহাদের সংযোগ সাধনপূর্বক গ্রহ নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই ইহাদের স্রষ্টা। তাহা হইলে দেখা গেল যে পরমাণুর জন্য সৃষ্টি কর্তার প্রয়োজন নাই বটে, কারণ, পরমাণু সমূহ নিত্য ও চিরন্তন, কিন্তু ইহাদের সমন্বয় সাধনের জন্য ঈশ্বরের প্রয়োজন।

উপরোক্ত মতবাদকে Absolute Dualism বলে। Dualism বা দ্বৈতবাদ, কারণ এক্ষেত্রে ঈশ্বর ও পরমাণু উভয়েরই সমান ও স্বতন্ত্র সত্তা আছে, সৃষ্টির জন্য দুই-ই সমানভাবে অপরিহার্য। আবার, এই দ্বৈতবাদ Absolute, বা চরম দ্বৈতবাদ, কারণ, এক্ষেত্রে ঈশ্বর যেমন নিত্য, শাশ্বত ও চিরন্তন, পরমাণুও ঠিক তেমন নিত্য, শাশ্বত ও চিরন্তন; ঈশ্বর ইহা সৃষ্টি করেন নাই, তিনি ইহা ধ্বংসও করিতে পারেন না। কেহই গৌণ নহে, কেহই কাহারো অধীনে নহে, উভয়ের মধ্যে চরম দ্বিত্ব-ভাব বিদ্যমান।

সমালোচনা

আমরা সাধারণতঃ ঈশ্বরকে অনন্ত ও অসীম বলিয়া ধারণা করি। কিন্তু উপরোক্ত মতে ঈশ্বর মোটেই অসীম নহেন; তাঁহার পাশে যে সব অণুপরমাণু বিদ্যমান আছে, উহাদের দ্বারা তিনি সীমায়িত হইয়া পড়িয়াছেন, অতএব তিনি

ক্ষুদ্র, তিনি সসীম। তিনি সর্ব-শক্তিমান নহেন; কারণ পরমাণু সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই, উহা ধ্বংস করিবার ক্ষমতাও তাঁহার নাই; তিনি কেবল উহাদিগকে নানাভাবে সংযুক্ত ও বিযুক্ত করিতে পারেন, আর কিছুই করিতে পারেন না। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি—উপাদানগুলি সংযুক্ত ও বিচ্ছিন্ন করার ক্ষমতা তাঁহার আছে, তবে সেগুলি উৎপন্ন করার ক্ষমতা তাঁহার থাকিল না কেন? কারিগর তাহার উপাদান উৎপন্ন করিতে পারেন না সত্য, কিন্তু উহা তাহার মহত্ত্বের পরিচয় নহে, উহা তাহার ক্ষুদ্রত্বের পরিচয়। সেইজন্য উপাদানের দ্বারা তাহার কার্যশক্তি সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে; তাই তিনি খুশীমত ঘড়ি নির্মাণ করিতে পারেন না; যে মাল মশলা দেওয়া হয় সেই মাল-মশলা অনুযায়ী তাহাকে ঘড়ি নির্মাণ করিতে হয়। মাল-মশলার উপর নির্ভর করিতে হয় বলিয়া কারিগরের সৃষ্টিক্ষমতা যেমন ক্ষুণ্ণ হয়, তেমন মূল উপাদানগুলির উপর নির্ভর করিতে হয় বলিয়া ঈশ্বরেরও সৃষ্টিশক্তি কিঞ্চিৎ ব্যাহত হয়—ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। তবে ঈশ্বরও কি মানুষের ন্যায় ক্ষুদ্র ও সসীম?

II. Dualism (Conditional)

ইহাকে সাধারণতঃ Deism নামে অভিহিত করা হয়। এই মতানুসারে ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি অনেকদিন হইতে একাকী বিরাজ করিতেছিলেন, তখন আর কিছুই ছিল না; অণুপরমাণু, জলবায়ু, আকাশ, আলো—কোথাও কিছু ছিল না; মহাশূন্যের মধ্যে ঈশ্বর একাকী বিরাজ করিতেছিলেন। একদিন তাঁহার হঠাৎ ইচ্ছা হইল তিনি বিশ্বসংসার সৃষ্টি করেন। তিনি ইচ্ছা করিলেন, আলো হউক, অমনি আলোর উদ্ভব হইল; তিনি ইচ্ছা করিলেন, জল হউক, অমনি জলের উদ্ভব হইল। এইভাবেই তাঁহার ইচ্ছা হইতেই (out of nothing) এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইল। সৃষ্টির জন্য যখনই যেরূপ উপাদানের প্রয়োজন হইয়াছে, তখনই তিনি উহা উৎপন্ন করিয়াছেন. যখন অণুপরমাণুর প্রয়োজন হইয়াছে, তখন তিনিই উহা সৃষ্টি করিয়াছেন, সৃষ্টির আগে উহারা বিদ্যমান ছিল না। এক কথায়, বিশ্বজগতের সকল পদার্থেরই সৃষ্টি কর্তা ঈশ্বর। ন্যায় শাস্ত্র বলেন যে ঈশ্বর পরমাণুগুলি সৃষ্টি করেন নাই; তিনি শুধু উহাদের সংযোগ সাধন করিয়াছেন; কিন্তু Deism ইহা স্বীকার করেন না; Deism মতে ঈশ্বর পরমাণুগুলির শুধু সংযোগ সাধন করিয়াছেন, তাহা নহে, পরমাণুগুলিও তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব ঘড়ি নির্মাতার সহিত ঈশ্বরের তুলনা করা যায় না। ঘড়ি-নির্মাতা steel নির্মাণ করেন নাই, কাঁচও নির্মাণ করেন নাই; তিনি

ইহাদের যথাযথ সংযোগ সাধন করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু ঈশ্বরকে সবই সৃষ্টি করিতে হইয়াছে; তাঁহাকে প্রত্যেকটি উপাদান সৃষ্টি করিতে হইয়াছে এবং উহাদের যে সমন্বয় সাধন—তাহাও তাঁহাকেই করিতে হইয়াছে, অর্থাৎ সবই তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন।

সমালোচনা

Deism মতে বলা হইতেছে যে আদিতে শুধু ঈশ্বর ছিলেন, বিশ্বজগৎ ছিল না। পরে এক শুভ মুহূর্তে তিনি এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিলেন। এখন আমরা জিজ্ঞাসা করি; তিনি তো একাকী বেশ ভালই ছিলেন, তবে হঠাৎ এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিতে গেলেন কেন? তাহা হইলে কি বলিতে হইবে যে যখন তিনি একাকী ছিলেন, তখন তিনি পূর্ণ ছিলেন না? তাঁহার মধ্যে অপূর্ণতা ছিল বলিয়াই কি তিনি বিশ্বসংসার সৃষ্টি করিয়া নিজের পূর্ণতা সাধন করিলেন? তাই যদি হয়, তবে তিনি আরও আগে সৃষ্টি করিলেন না কেন? বলা বাহুল্য, এইরকম কোন প্রশ্নেরই সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ, সৃষ্টির পরে তিনি বিশ্বসংসারের সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া দূরে অবস্থান করেন, ইহাই যদি ঠিক হয় তবে বলিতে হইবে যে ঈশ্বর বিশ্বজগতের দ্বারা সীমাবদ্ধ হইয়া থাকেন। এমতাবস্থায় তাঁহাকে অসীম ও অনন্ত বলিয়া বর্ণনা করা যায় না। এক্ষেত্রে তিনি সসীম; একদিকে আছেন ঈশ্বর স্বয়ং, আর অন্যদিকে আছে তাঁহার সৃষ্ট বিশ্বজগৎ, দুই-ই স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। সেইজন্য এই মতবাদকে আমরা Conditional Dualism বলিয়াছি। Dualism, কারণ, এক্ষেত্রে ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয় বটে, কিন্তু তিনি তো একাকী নহেন; তাঁহার পাশে আর একটি জিনিস আছে, যাহা তাঁহার দ্বারা সৃষ্ট হইয়াও বস্তুতঃ তাঁহাকেই আবার সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। এইভাবে প্রকারান্তরে ঈশ্বরের ন্যায় উহারও স্বাধীন সত্তা স্বীকার করা হইতেছে (Dualism)। তবে ইহাদের এই দ্বিত্ব-ভাব চরম নহে, আপেক্ষিক (Conditional), কারণ ঈশ্বর ইচ্ছা করিয়াছেন বলিয়াই এই দ্বিত্ব-ভাব সৃষ্ট হইয়াছে, নতুবা হইত না।*

III. Monism (Abstract)

অদ্বৈতবাদিগণ জড়বস্তুর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন না, তাঁহারা গুরুত্ব আরোপ করেন ঈশ্বরের উপর। তাঁহাদের মতানুসারে ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়;

* এই মতবাদকে আমরা Conditional Monism নামেও অভিহিত করিতে পারি; বস্তুতঃ "ভগবৎ-তত্ত্ব" প্রসঙ্গে আমরা তাহাই করিয়াছি। কারণ এক্ষেত্রে মূল-তত্ত্ব বা আদি-তত্ত্ব সত্যই "এক", তিনি ঈশ্বর; জড় পদার্থ তাঁহার সৃষ্ট পদার্থ মাত্র।

তিনিই একমাত্র সত্য ; তিনিই জগতের মূল-তত্ত্ব (ultimate reality)। তাহা হইলে জড়বস্তুর কি হয় ? ইহা কি তবে একেবারে মিথ্যা ? ইহার কি কোন স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সত্তা নাই ? বস্তুতঃ এই প্রশ্ন লইয়াই অদ্বৈতবাদিগণের মধ্যে বিশেষ মতভেদ দেখা যায় , কেহ কেহ বলেন যে, জড়জগতের কোনপ্রকার স্বাধীন সত্তা নাই, ইহা একেবারে মিথ্যা। আর কেহ কেহ বলেন যে জগৎকে একেবারে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না ; ব্রহ্মের ন্যায় ইহা ultimate reality (মূল-তত্ত্ব) নহে বটে, তবুও ইহাকে একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না ; ইহারও প্রয়োজনীয়তা আছে। যাহারা ইহার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতবাদের নাম Concrete Monism ; আর যাঁহারা ইহাকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চান, তাঁহাদের মতবাদের নাম Abstract Monism। প্রথমে Abstract Monism ব্যাখ্যা করা যাউক , উহাকে সাধারণতঃ Pantheism নামে অভিহিত করা হয়। Pan মানে All, আর Theos মানে God ; অতএব Pantheism মানে All is God অর্থাৎ সবই ঈশ্বর বা ঈশ্বরই সব ; ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই নাই। এই মতানুসারে "ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ", অর্থাৎ জগতে যাহা কিছু আছে, সবই ঈশ্বরের দ্বারা পরিব্যাপ্ত। এই জগৎ হইতে যদি ঈশ্বরকে পৃথক করিয়া ফেলা হয়, তাহা হইলে জগতের কোন অস্তিত্বই থাকে না। সমুদ্রের মধ্যেই তরঙ্গ অবস্থিত এবং তরঙ্গের মধ্যেই সমুদ্র পরিব্যাপ্ত। এমতাবস্থায় আমরা কি তরঙ্গগুলিকে সমুদ্র হইতে পৃথক করিয়া বিচ্ছিন্ন করিতে পারি ? মোটেই না , সমুদ্র ব্যতীত তরঙ্গের অস্তিত্ব যেমন সম্ভব নহে, সেইরূপ ঈশ্বর ব্যতীত বিশ্বেরও স্বতন্ত্র সত্তা সম্ভব নহে।

সমালোচনা

উপরোক্ত মতানুসারে সবই ঈশ্বর, ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই নাই। তাহা হইলে সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র সমন্বিত এই যে বিশ্বজগৎ আমরা প্রতি-মুহূর্তে প্রত্যক্ষ করিতেছি—উহাকে একেবারে মিথ্যা এবং অলীক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়। কিন্তু পণ্ডিতেরা যাহাই বলুন না কেন, আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতাকে আমরা একেবারে অস্বীকার করিতে পারি না। আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতায় বুঝি যে সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতি পদার্থ কঠোর বাস্তব পদার্থ ; উহাদিগকে একেবারে মিথ্যা ও মায়া বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ, বিশ্বের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে শুধু যে সূর্য চন্দ্রই মিথ্যা হইয়া যায়—তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অস্তিত্বও অবলুপ্ত

হইয়া যায়। কিন্তু মানুষের স্বাতন্ত্র্য অবলুপ্ত হইলে, পৃথিবী হইতে নীতিবোধ ও ধর্মবোধও অবলুপ্ত হইয়া যায়। কারণ, নৈতিক জীবন ও ধর্মজীবন শুধু মানুষের পক্ষেই সম্ভব—যাহার আত্ম-স্বাতন্ত্র্য আছে; কিন্তু মানুষই যদি মিথ্যা হইয়া গেল, তাহার স্বাতন্ত্র্যই যদি অবলুপ্ত হইয়া গেল, তাহা হইলে কে নৈতিক জীবন যাপন করিবে আর কেই বা ঈশ্বরকে পূজা করিতে যাইবে? মানুষের এই নীতিবোধ ও ধর্মবোধ—ইহাই তো অধ্যাত্মজীবনের অমূল্য সম্পদ, ইহাই যদি অবলুপ্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে আমরা জিজ্ঞাসা করি ঈশ্বরের মধ্যে আর থাকে কি? কোথাও কোন জীব নাই, মানুষ নাই, সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র কোথাও কিছু নাই—সবই অলীক, সবই মায়া। এমতাবস্থায় ঈশ্বরকে মহাশূন্য বলিয়া ব্যাখ্যা করা ছাড়া আর গতি কি? তিনিই একমাত্র সত্য পদার্থ, কিন্তু তাঁহার সহিত বিশ্বজগতের কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই, ইহাই যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের মধ্যে যে কোন প্রকার বিষয়বস্তুই থাকিতে পারে না; তিনি যে একেবারে একক, মহাশূন্য হইয়া পড়েন। বহুত্ব বর্জন করিয়া এই যে একত্ব, এই যে মহাশূন্যতা—ইহার কি কোন সার্থকতা আছে? তাই Pantheism সম্বন্ধে Dr. Stephen বলেন "It is **abstract** monotheism in the sense **that** it takes the One in abstraction from the Many, and regards it as constituting all reality by itself. But unity without plurality, the one apart from the many, is an unreal abstraction."

এই মতবাদের সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা যায়, ইহা বহুকে বাদ দিয়া শুধু এককেই গ্রহণ করিয়াছে, জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। জগৎ বাদ দেওয়াতে ব্রহ্মকে জড়ের স্পর্শ হইতে রক্ষা করা হইয়াছে বটে, তবে তিনি একেবারে মহাশূন্য (abstract) হইয়া পড়িয়াছেন। তাই ইহাকে আমরা Abstract Idealism বলিয়াছি, Idealism, কারণ এক্ষেত্রে সবই ঈশ্বরের চেতনায় বিরাজ করিতেছে, যে ক্ষেত্রে জড়ের অস্তিত্বই অস্বীকার করা হয়, সেক্ষেত্রে জড়বাদের (materialism) কোন কথাই উঠিতে পারে না।

III. Monism: (Concrete)

ইহার সাধারণ নাম Theism এবং ইহাই পাশ্চাত্য জগতে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা বলিয়া গৃহীত হয়। পারিভাষিক সংজ্ঞায় ইহাকে Panentheism নামে অভিহিত করা হয়। পূর্ববর্ণিত Pantheism-এর সহিত বর্তমান মতবাদের পার্থক্য বুঝিতে হইলে ইহাদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের দিকে

লক্ষ্য রাখা দরকার। (১) Pantheism : Pan = all ; theos = God ; অতএব Pantheism মানে All is God ; অর্থাৎ সবই ঈশ্বর। (২) Panentheism : Pan = all ; en = in ; theos = God ; অতএব Panentheism মানে All is in God, অর্থাৎ সবই ঈশ্বরের মধ্যে বিদ্যমান। একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে "সবই ঈশ্বর" এবং "সবই ঈশ্বরের মধ্যে বিদ্যমান"—ইহাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। "সবই ঈশ্বর" বলিলে বুঝিতে হইবে যে ঈশ্বর ছাড়া আর কাহারও কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। কিন্তু "সবই ঈশ্বরের মধ্যে বিদ্যমান"—ইহার অর্থ এই যে ঈশ্বর ছাড়াও আরও অনেক জিনিষ আছে, তবে তাহারা ঈশ্বরের বাহিরে নহে, ঈশ্বরের ভিতরে আছে। ঈশ্বরের ভিতরে থাকিলেই যে তাহাদের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিবে না, এমন কোন অর্থ নাই ; ভিতরে থাকিয়াও তাহারা নিজ নিজ স্বতন্ত্র সত্তা বজায় রাখিতে পারে এবং রাখিয়া থাকে। যেমন ধর, এখন আমি দুঃখ অনুভব করিতেছি ; অতএব এই দুঃখানুভূতি আমারই মধ্যে বিদ্যমান ; কিন্তু তাই বলিয়া কি বুঝিতে হইবে যে দুঃখ-বোধের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই? আমি ও দুঃখবোধ কি একই জিনিষ? মোটেই না ; সেইরূপ যখন বলা হয় যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সবই ঈশ্বরের মধ্যে বিদ্যমান, তখন ইহার অর্থ এই নহে যে বিশ্ব এবং ব্রহ্ম একই জিনিষ। ব্রহ্মের মধ্যে থাকিয়াও বিশ্বের এক স্বতন্ত্র সত্তা থাকিতে পারে ও থাকে। ইহাই Panentheism-এর মত।

তাহা হইলে দেখা গেল যে এই মতানুসারে "এক" (One) আছে, আবার বহুও (Many) আছে। "এক" অর্থাৎ ব্রহ্ম—তিনিও সত্য, আবার বহু অর্থাৎ বিশ্ব—উহাও সত্য। তবে এখানে এক প্রশ্ন করা যাইতে পারে ; ব্রহ্ম তো আছেন, কিন্তু বিশ্ব আসিল কোথা হইতে? ইহার উত্তরে Panentheism বলেন যে অনাদিকাল হইতেই ইহা ব্রহ্মের মধ্যে বিদ্যমান আছে। আমরা ঈশ্বরের জীবনে এমন কোন মুহূর্ত কল্পনা করিতে পারি না যখন তিনি শুধু একাকী থাকেন, অর্থাৎ তাঁহার সৃষ্টি থাকে না। ইহা সম্ভব নহে। নাড়ীর স্পন্দন ছাড়া যেমন মানুষের প্রাণ থাকিতে পারে না, সৃজন ছাড়াও তেমন ঈশ্বর থাকিতে পারেন না। তাঁহার সৃষ্টি কখনও আরম্ভ হয় নাই, আর কখনও শেষও হইবে না। সৃষ্টি মানে আত্মপ্রকাশ ; ইহাই ঈশ্বরের ধর্ম। তাই তিনি কখন আত্মগোপন করিয়া বা আত্মসংকুচিত হইয়া থাকিতে পারেন না। তিনি নিরন্তর আত্মপ্রকাশ করিয়া চলিয়াছেন ; জড়ের মধ্য দিয়া, মানুষের মধ্য দিয়া—চেতন অচেতন সকল

পদার্থের মধ্য দিয়া—তিনি নিজেকে প্রকাশ করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার এই কাজের আদি নাই, অন্তও নাই; তাঁহার সুপ্তি নাই, বিরাম নাই, তিনি চিরতৎপর। কবির ভাষায় বলা যায়, তিনি "চঞ্চল হে, তিনি সুদূরের পিয়াসী"। সুদূরের পিয়াসী, কারণ শুধু অতীত ও বর্তমান কর্মধারায় তিনি তৃপ্ত নহেন, তিনি অনন্ত কর্মধারায় নিমগ্ন; তিনি সুদূরের মধ্যে, অসীমের মধ্যে আত্মবিকশিত করিবার জন্য চিরচঞ্চল।

এই মতবাদে শুধু যে এক এবং বহুর সমন্বয় সাধন করা হইয়াছে, তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে জড়বাদ এবং ভাববাদেরও সামঞ্জস্য বিধান করা হইয়াছে। জড়বাদ যে অচেতন জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, এক্ষেত্রে তাহার সত্তা মোটেই অস্বীকার করা হয় না। আমরা স্পষ্টই বলিয়াছি যে ঈশ্বর শুধু চেতন পদার্থের মধ্য দিয়াই আত্মপ্রকাশ করেন না, অচেতন পদার্থের মধ্য দিয়াও তিনি আত্মবিকাশ সাধন করেন। তিনি শুধু মানুষের চেতনার মধ্যেই প্রতিভাত আছেন, তাহা নহে, সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যেও তিনি প্রকটিত আছেন। কবিদের ভাষায় বলা যায় যে, যখন তিনি সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রে বিরাজ করেন তখন তিনি জড়রূপে শোভা পান, আর যখন তিনি মানুষের মনে ক্রিয়া করেন তখন তিনি চেতনরূপে বিরাজ করেন। ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে চেতন ও অচেতন পদার্থের মধ্যে কোন মূলগত পার্থক্য নাই, বরং মূলে তাঁহারা একই, একই ব্রহ্মের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। তাই এই মতবাদকে Objective Idealism নামেও অভিহিত করা যাইতে পারে। Objective, কারণ ইহাতে জড়বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করা হইতেছে না; আর Idealism তো বটেই, কারণ সমস্ত বিষয়েরই মূলে আছে ভগবৎ-চেতনা—ইহাই এই মতবাদের সারকথা। এক্ষেত্রে কোন বিষয়বস্তুই বাদ দেওয়া হইতেছে না; সমস্তই ভগবৎ সত্তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হইতেছে। অতএব এক্ষেত্রে শূন্যতা নাই, পূর্ণতা আছে; তাই ইহাকে Concrete Monism বলে।

ষোড়শ অধ্যায়

আদর্শ ও মূল-তত্ত্ব

(Value and Reality)

আমাদের পুস্তকের প্রথম খণ্ডে আমরা ঈশ্বর সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি; দ্বিতীয় খণ্ডে আত্মা বা মনের সম্বন্ধে, তৃতীয় খণ্ডে প্রাণের সম্বন্ধে, এবং চতুর্থ খণ্ডে জড়পদার্থের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। দর্শন শাস্ত্রে এই চারিটিই প্রধান তত্ত্ব—**ভগবৎ-তত্ত্ব, অধ্যাত্ম-তত্ত্ব, প্রাণ-তত্ত্ব** এবং **জড়-তত্ত্ব**। একে একে ইহাদের আলোচনা শেষ করিয়া এই খণ্ডে আমরা মূলতত্ত্ব বিচার করিয়াছি। মূল-তত্ত্ব কি—চিৎশক্তি, না জড়শক্তি? আমরা চিৎশক্তি বা মনঃ শক্তিকেই মূল-তত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি; এবং বলিয়াছি যে যাহারা মনকে মূল-তত্ত্ব বলিয়া বিশ্বাস করে তাহাদিগকে Idealist বা ভাববাদী বলা হয়। সাধারণতঃ লোকে বিদ্রূপ করিয়া বলে যে ভাববাদীরা শুধু ভাবরাজ্যেই বিচরণ করেন, বাস্তব জগতের সহিত তাহাদের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। তাঁহারা কাব্যলোকের সৌন্দর্যধ্যানে মগ্ন থাকেন এবং স্বপ্নের মায়াজাল রচনা করিয়া পৃথিবীকে এক নতনরূপে রূপায়িত করেন তাঁহারা পার্থিব জগতে বাস করেন না, তাঁহারা অপার্থিব জগতের অধিবাসী। উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই: জড়বাদিগণ যদি মনে করেন যে সব সময়ে পাটের গুদাম এবং মাছের দর চিন্তা করাই মানুষের একমাত্র কর্তব্য তবে তাহারা মানব জীবনকে নিতান্তই তুচ্ছ ও হীন বলিয়া বিবেচনা করেন। বাজার দর এবং টাকা পয়সার হিসাব করিতে হইবে বৈকি, নতুবা আমাদের পক্ষে জীবন ধারণ করাই সম্ভব নহে, কিন্তু সর্বদাই এইপ্রকার চিন্তাতে মগ্ন থাকিলে মানুষের জীবন নিতান্ত পঙ্গু ও অপূর্ণ হইয়া পড়ে। তাই আমাদিগকে কবিতাও পড়িতে হইবে, এবং ফুলের সৌন্দর্যও উপলব্ধি করিতে হইবে। শেক্সপিয়ার বলেন, যে মানুষ গান শুনিয়া মুগ্ধ হয় না, সে অনায়াসে হত্যা করিতে পারে; আমরাও বলি, যে মানুষ স্বপ্ন রচনা করে না, সে কোন মহৎ কাজ করিতে পারে না। মহৎ কাজ করিতে হইলেই স্বপ্ন রচনা করা চাই, তবেই তো আমরা পার্থিব জগতের বহু উর্ধে অপার্থিব জগতের সন্ধান পাইতে পারি। মনে রাখিতে হইবে মানুষ শুধু পশু নহে, সে মানুষও বটে; সে শুধু নীচের দিকে তাকায় না, সে উপরের দিকেও তাকায়; সে গ্রহনক্ষত্র দেখিয়া মুগ্ধ হয়, এবং রামধনুর রং দেখিয়া পুলকিত হয়।

Fact Judgement and Value Judgment

তাহা হইলে দেখা গেল যে কেবল জড়জগৎ লইয়া আমরা তৃপ্ত থাকিতে পারি না, ভাবজগতের কথাও চিন্তা করি। অথবা আরও স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, আমরা জড়বস্তুকে কেবল জড়রূপেই প্রত্যক্ষ করি না, উহাকে অনুভূতির রঙে রঞ্জিত করিয়া কিঞ্চিৎ মনোহর রূপেও প্রত্যক্ষ করি। তাই গোলাপ দেখিয়া আমরা ইহাকে ফুল বলিয়াই ক্ষান্ত হই না, সঙ্গে সঙ্গে মুগ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠি "কি সুন্দর ফুল; ইহার কি মনোহর রূপ"। প্রথম ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুকে আমরা শুধু বিষয়-বস্তুরূপে বর্ণনা করি (Judgment of fact), ইহার উপরে কোন ভাবের রং প্রয়োগ করি না। কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, ইহাকে কিঞ্চিৎ ভাবরসে সিঞ্চিত করিয়া সুন্দর বা অসুন্দর বলিয়া বর্ণনা করি (Judgment of Value)। প্রথম ক্ষেত্রে আছে শুধু নগ্ন বিবরণ, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আছে ইহার মূল্য নিরূপণ। আমি যখন বলি যে আকাশে রামধনু উঠিয়াছে, তখন আমার বিবরণ একেবারে নগ্ন বিবরণ মাত্র, কোথাও একটু ভাবের আবেগ নাই। এক্ষেত্রে জিনিষটি যে কি এবং কোথায় আছে—তাহারই বিবরণ দিতেছি মাত্র, উহা দেখিয়া আমার মনে কি ভাবের উদ্রেক হইল, আমি কি ভাবে অভিভূত হইলাম—এসব কথা বলিয়া আমার বর্ণনাকে আমি মোটেই আবেগ রঞ্জিত করিতেছি না। তাই ইহাকে Fact Judgement বলে। কিন্তু যখন বলি "রামধনু দেখিতে কি সুন্দর", তখন আমি শুধু রামধনুর বর্ণনা দিই না; রামধনু দেখিয়া আমার মনে কিরূপ ভাবের উদয় হইয়াছে তাহার কথাও উল্লেখ করি। ফলে আমার বর্ণনা একেবারে নীরস বর্ণনা হয় না; ভাবের আবেগে রঞ্জিত হইয়া একটু সরস রূপ গ্রহণ করে। তাই ইহাকে Value Judgment বলে। এক্ষেত্রে আমি জিনিসটির কথা বলি না, জিনিষটি দেখিয়া আমার মনে কিরূপ ভাবের উদ্রেক হয়, তাহাই বর্ণনা করি। আমার এই মনোভাব অনুসরণ করিয়া আমি জিনিষটিকে সুন্দর বা অসুন্দর বলিয়া অভিহিত করি; এবং এইরূপে ইহার এক মূল্য (Value) নির্ধারণ করিবার চেষ্টা করি। আর একটি উদাহরণ; আমি বলিলাম "রাম মহৎ কাজ করিয়াছে"; এক্ষেত্রে রাম কি কাজ করিয়াছে, তাহা আমি বলিতেছি না, রামের কাজ দেখিয়া আমি কিভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছি, তাহার কাজকে কত উচ্চস্তরের কাজ বলিয়া মনে করি—সেই কথাই বলিতেছি। তাই ইহার নাম Value Judgment। কিন্তু আমি যখন বলি "রাম একটি জলমগ্ন বালককে উদ্ধার করিয়াছে," তখন আমি তাহার কাজের এক বিবরণ দিই মাত্র। তাহার কাজ দেখিয়া আমি বা তুমি বা কে বা কাহারা কি মনে করে—সে সব কোন কথাই উত্থাপন করি না।

এক্ষেত্রে আছে শুধু স্পষ্ট এবং রুক্ষ ভাষায় তাহার কাজের এক নগ্ন বিবরণ। তাই ইহাকে Fact Judgment বলা হয়। উপমার ভাষায় বলা যায় যে, Fact Judgment একটু গদ্যময় ব্যাপার; ইহার মধ্যে ভাবের কোন সংমিশ্রণ নাই; আর Value Judgment একটু রসঘন ব্যাপার, ইহার মধ্যে ভাবের সংমিশ্রণ আছে।

আদর্শ বিচার (Value Judgment)

আর এক কথা; যখন Value বিচার করি, তখন আমরা আমাদের মনের পুরোভাগে এক আদর্শ তুলিয়া ধরি; সেই আদর্শের সহিত তুলনা করিয়া আমরা বিষয়বস্তুর গুণাগুণ নির্ধারণ করি। কিন্তু যখন Fact বিচার করি, তখন কোন আদর্শের কথা চিন্তা করি না, বস্তুতঃ আদর্শের কথা চিন্তা করিবার কোন প্রয়োজনই হয় না; তখন শুধু বিষয়বস্তুটির প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ রাখি, অন্য কথা ভাবি না। উদাহরণ দিয়া বুঝান যাউক। শিল্পী যখন ছবি অংকন করেন, তখন তিনি তাঁহার মনের পুরোভাগে একটি আদর্শ ধরিয়া রাখেন। তাই তিনি শুধু ছবি আঁকিয়াই ক্ষান্ত হন না, সেই ছবিটি তাঁহার আদর্শ অনুযায়ী হইয়াছে কি না—তাহাও বিবেচনা করেন। সেইরূপ, আমরা যখন ছবি দেখি বা কবিতা পড়ি, তখন শুধু দেখিয়াই বা পড়িয়াই আমরা ক্ষান্ত হই না, কবিতাটি সুন্দর হইয়াছে কি না, ছবিটি মনোরম হইয়াছে কি না—ইত্যাদি বিচার করি। এইরূপ বিচারের জন্য এক মানদণ্ডের (Norm) প্রয়োজন; ইহাকে আমরা সৌন্দর্য-বিচারের মাপকাঠি বলিতে পারি। এই আদর্শের সহিত তুলনা করিয়া আমরা ছবিটিকে সুন্দর বা অসুন্দর বলি। মানুষের ক্রিয়া প্রক্রিয়া সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা প্রযোজ্য। তাহাদের ক্রিয়া প্রক্রিয়া শুধু লক্ষ্য করিয়াই আমরা ক্ষান্ত হই না, ইহা সৎ কি অসৎ, ন্যায় কি অন্যায়—তাহাও বিচার করি। এক্ষেত্রেও আমরা মনের পুরোভাগে এক নৈতিক আদর্শ ধরিয়া রাখি এবং এই আদর্শের সহিত তুলনা করিয়াই আমরা তাহাদের কাজকে উচিত বা অনুচিত বলিয়া বিবেচনা করি। যে কাজ আদর্শ অনুযায়ী, সেই কাজ উচিত, আর যে কাজ উহার পরিপন্থী সেকাজ অনুচিত। এইভাবে কাজের গুণাগুণ বিচার করাকে Judgment of Value বলে; কোন এক আদর্শ (Norm) বা মানদণ্ডের সহিত তুলনা করিয়া এইরূপ বিচার করা হয় বলিয়া ইহাকে Normative বিচার বলা যাইতে পারে। কিন্তু Fact বিচারের মধ্যে আদর্শের কোন বালাই নাই। বস্তুজগতে যাহা যেমন আছে তাহাকে ঠিক তেমনি ভাবে বিশ্লেষণ করাকেই Fact বিচার বলে; জিনিসটি সুন্দর কি অসুন্দর, উচিত কি অনুচিত ইত্যাদি কোন

প্রশ্নই উত্থাপন করা হয় না। এক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর এক যথাযথ বিবরণ দিয়াই আমরা আমাদের কাজ শেষ করি; কোনপ্রকার আদর্শের মাপকাঠিতে উহাকে বিচার করি না। তাই ইহাকে Normative বিচার না বলিয়া Positive বিচার বলা হয়। মোট কথা, Fact বিচারের দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তব; যাহা বাস্তবিক পক্ষে বিদ্যমান (what is)—তাহাই ইহার আলোচ্য বিষয়। কিন্তু Value বিচারের দৃষ্টিভঙ্গি আদর্শমূলক; যাহা আছে তাহা আদর্শ অনুযায়ী কি না (ought to be)—উহাই ইহার বিচার্য বিষয়।

Value Judgment—Subjective (ভাবগত)

Fact Judgment সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বলিবার নাই, Value Judgment ই আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। Value Judgment প্রসঙ্গে সাধারণতঃ যে প্রশ্ন করা হয়, তাহা এই: আমি যখন বলি "রামধনু দেখিতে সুন্দর"—তখন কি বুঝিতে হইবে যে রামধনুর মধ্যে সত্যই সৌন্দর্য বিদ্যমান আছে? রামধনুর মধ্যে যেমন নানাবিধ রং আছে, তেমন সৌন্দর্য বলিয়াও কি এক গুণ উহার মধ্যে নিহিত আছে? অনেকে বলেন যে তাহা মোটেই সম্ভব নহে। তাঁহাদের মতানুসারে রামধনু রামধনু মাত্র; ইহা সুন্দর নহে, অসুন্দরও নহে। তবুও যে আমি ইহাকে সুন্দর বলি, তাহা অন্য কারণে। আমি ইহাকে আমার মনের মধ্যে সুন্দর বলিয়া অনুভব করি, সেইজন্য আমি ইহাকে সুন্দর বলি, নতুবা বাস্তবিকপক্ষে ইহার মধ্যে সৌন্দর্য বলিয়া কোন জিনিস নাই। এক কথায়, সৌন্দর্য আমার মনের সৃষ্টি, তাই আমি যাহাকে সুন্দর বলিয়া মনে করি তুমি তাহাকে সুন্দর নাও বলিতে পার। কথাতেই বলে "ভিন্নরুচয়ঃ লোকা", প্রত্যেকেরই রুচি বিভিন্ন। তুমি যাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছ আমি হয়ত তাহাকে মোটেই সুন্দরী বলিয়া মনে করি না। আবার কিছুদিন পরে তোমার মোহ যখন কাটিয়া যাইবে তখন তুমি নিজেও তাহার মধ্যে কোন সৌন্দর্য খুঁজিয়া পাইবে না। আজ হয়ত উচ্চাঙ্গের (classical) গান শুনিতে তোমার মোটেই ভাল লাগে না, কিন্তু কিছুদিন উহা শিক্ষা করিয়া দেখ, তখন দেখিবে, উচ্চাঙ্গ গানই তোমার বেশী ভাল লাগিবে, আধুনিক গান তখন নিতান্তই নিম্নস্তরের গান বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। মেয়েদের গয়নার কথা ভাবিলে অবাক হইয়া যাই; আমাদের সময়ে যে গয়নাকে অতি সুন্দর বলিয়া অভিহিত করা হইত, আজকাল সেইরকম গয়নার প্রতি কেহ তাকাইয়াও দেখে না। কাপড়ের দোকানে গিয়া দেখ, মেয়েরা কি রকমের

শাড়ী কেনে; একজনের যাহা পছন্দ হয় অন্য জনের তাহা পছন্দ হয় না; প্রত্যেকেই নিজ নিজ রুচি অনুসারে শাড়ী কিনিতে চায়। কিন্তু রুচির তো শেষ নাই; তাই নানারকমের শাড়ী রাখিয়াও দোকানীরা সকলকেই সমানভাবে তৃপ্ত করিতে পারে না। মোট কথা, সৌন্দর্যবোধ সম্পূর্ণ রুচি-সাপেক্ষ ব্যাপার; নিজ নিজ রুচি ও চিন্তা অনুসারে আমরা জিনিসকে সুন্দর বা অসুন্দর বলিয়া অভিহিত করি। যেমন, মেমসাহেবদের নীল চোখ আমাদের নিকট সুন্দর লাগে না, আমরা চাই "তাহার কালো হরিণ চোখ"। সাহেবদের গান আমাদের নিকট ভাল লাগে না; মনে হয় ষাঁড়ের ন্যায় বিকট চীৎকার করিতেছে; আবার তাহারাও আমাদের রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনিয়া বলে "এ কি প্যানপেনে কান্না"। কেবল, সৌন্দর্যবোধ সম্বন্ধে কেন, নীতিবোধ সম্বন্ধেও আমাদের মধ্যে মতভেদের অন্ত নাই। মুসলমান সমাজে বহুবিবাহ ন্যায় সঙ্গত ও নীতিসম্মত, অথচ খৃষ্টান সমাজে উহা অমার্জনীয় অপরাধ। মুসলমানদের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রশংসনীয় কাজ, অথচ হিন্দুসমাজ এখনও ইহাকে প্রশংসার চোখে দেখিতে পারে না।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে নীতিবোধ বা সৌন্দযবোধ সম্বন্ধে আমাদের কোন সববাদিসম্মত ধারণা নাই, আমাদের নিজ নিজ শিক্ষা ও অভিরুচির উপর উহা নির্ভর করে। বলা বাহুল্য, শিক্ষা ও অভিরুচি সবই মানসিক ব্যাপার, সুতরাং সৌন্দর্যবোধ একেবারে মনঃসাপেক্ষ ব্যাপার। তাই আমরা বলিয়াছি যে রামধনু সুন্দর নহে, আবার অসুন্দরও নহে, উহা বস্তু মাত্র। উহার সৌন্দয বা অসৌন্দর্য নির্ভর করে আমাদের মনের উপরে। আমি যদি উহাকে সুন্দর বলিয়া মনে করি, তাহা হইলেই উহা সুন্দর; আর আমি যদি উহাকে সুন্দর বলিয়া না মনে করি, তাহা হইলে আর যে যাহাই বলুক না কেন, আমার নিকট উহা সুন্দর নহে। সেইরূপ মানুষের কাজও কাজ মাত্র, উহা ভালও নহে, খারাপও নহে; তবে আমরা আমাদের রুচি অনুসারে কোন কাজকে ভাল বলি আর কোন কাজকে খারাপ বলি। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে কাজের মধ্যে এমন কোন প্রকৃতিগত বা গুণগত বৈশিষ্ট্য নাই যাহার জন্য উহাকে ভাল বা খারাপ বলা যাইতে পারে। প্রত্যেক কাজই নির্গুণ; উহাকে গুণ সংযুক্ত করিয়া খারাপ বলা বা ভাল বলা—তাহা তোমার রুচির উপরে নির্ভর করে; তুমি ইচ্ছা করিলে খারাপ বলিতে পার, আর আমি ইচ্ছা করিলে ভাল বলিতে পারি। সেইরূপ গোলাপ ফুল—ফুল মাত্র; ইহার মধ্যে গন্ধ

আছে, রং আছে, পাপড়ি আছে, কিন্তু ইহার মধ্যে সৌন্দর্য বলিয়া কোন জিনিষ নাই। সৌন্দর্য আছে তোমার মনে; তুমি ইহাকে দেখিয়া সুন্দর বলিয়া মনে করিতেছ, তাই ইহা সুন্দর; তুমি যদি ইহাকে সুন্দর না বলিতে তাহা হইলে ইহার সৌন্দর্য থাকিত না।* মোট কথা, সৌন্দর্য আমাদের মনের সৃষ্টি (Subjective); আমরা নিজেরা নিজেদের মনের মধ্যে ইহা সৃষ্টি করিয়া দুনিয়াতে বিতরণ করিয়া দিয়াছি। ইহা আমাদের নিজেদের ধন, অপরকে বিলাইয়া দিয়াছি; এবং বিলাইয়া দিয়া ভাবিতেছি যে ইহা বুঝি সত্যই অপরের জিনিষ আমাদের নহে; অথচ ইহা যে প্রকৃতপক্ষে আমাদেরই সৃষ্টি এবং আমাদেরই দান, তাহা ভুলিয়া গিয়াছি।

Value Judgment : Objective (বস্তুগত)

উপরোক্ত মতানুসারে নৈতিক বোধ বা সৌন্দর্যবোধের কোন বাস্তব অস্তিত্ব নাই; ইহার অস্তিত্ব আমাদের মনোজগতে। যখন বলি "বাগানে ফুল ফুটিয়াছে" তখন আমরা বুঝি যে বাস্তব জগতে এক পদার্থ বিদ্যমান আছে; আর যখন বলি 'ফুলটি দেখিতে সুন্দর', তখন বুঝি যে আমার মনের মধ্যে এক ভাবের উদ্রেক হইয়াছে; সেই ভাবের আবেগে অনুপ্রাণিত হইয়া আমি ফুলটির মূল্য নির্ধারণ করিতেছি, অবশ্য আর্থিক মূল্য নহে, ইহার সৌন্দর্য সম্বন্ধীয় মূল্য বা কান্তমূল্য, সৌন্দর্য জগতে ইহার মূল্য কত, তাহাই আমি বিচার করি। এক কথায়, উপরোক্ত মতে, সৌন্দর্যবোধ সম্পূর্ণ মনঃসাপেক্ষ ব্যাপার, ইহার কোন বাস্তব সত্তা নাই। কিন্তু আমরা ইহা স্বীকার করি না, আমাদের মতানুসারে সৌন্দর্যবোধেরও বাস্তব কারণ আছে। আমরা ফুলের যে কান্তমূল্য নির্ধারণ করি, সে মূল্য একেবারে মনোজগতের উপর নির্ভর করে না, বাস্তব জগতের উপরেও বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। আমি যখন বলি যে রামধনু দেখিতে সুন্দর, তখন আমি কি শুধু আমার খেয়াল বশে ইহাকে সুন্দর বলি? নিশ্চয়ই না; রামধনুর মধ্যে সত্যই এমন কিছু আছে যাহার জন্য আমি উহাকে সুন্দর বলিতে বাধ্য হইতেছি। মনে রাখিতে হইবে, আমি একলাই উহাকে সুন্দর বলিতেছি না; সহস্র সহস্র লোকে উহাকে সুন্দর বলিতেছে। যদি আমি একাকী উহাকে সুন্দর বলিতাম, তাহা হইলে না হয় মনে করা যাইত যে ঐ সৌন্দর্য আমার কাল্পনিক সৃষ্টি মাত্র, বহির্জগতে উহার অনুরূপ কোন সত্তা নাই। কিন্তু তাহা তো নহে; রাম, শ্যাম, যদু, হরি সকলেই ইহাকে সুন্দর বলিতেছে, শুধু তাহাই নহে, সুন্দর বলিতে বাধ্য

* "Values are projections of our selves on a valueless reality."

হইতেছে। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে রামধনু সত্যি সত্যই সুন্দর; ইহার মধ্যে সৌন্দর্য নিহিত আছে বলিয়া আমরা সকলে একই সঙ্গে উহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছি; নতুবা আমরা সকলেই এবিষয়ে একমত হইতে পারিতাম না।*

Value Judgment—Subjective & Objective

তাহা হইলে দেখা গেল যে সৌন্দর্যবোধ একেবারে ভাবসর্বস্ব নহে; ইহার মধ্যে বস্তুর সংস্পর্শও যথেষ্ট আছে। আমাদের মতানুসারে, প্রথমে বস্তু হইতে উদ্দীপনা আসে, তারপরে সেই উদ্দীপনার উপর ভিত্তি করিয়া আমাদের মন সৌন্দর্য—সৌধ রচনা করে। প্রথমটি বস্তুবিষয়ক, দ্বিতীয়টি ভাববিষয়ক; সৌন্দর্যের যে প্রাথমিক উদ্দীপনা আসে, তাহা রামধনুর মধ্য হইতেই আসে। রামধনুর মধ্যে যেমন রং আছে, তেমন কিঞ্চিৎ সৌন্দর্যও নিহিত আছে। "সুন্দরের" এই উদ্দীপনা আসিয়া আমাদেব মনের উপর ক্রিয়া করে, তখন আমাদের মনও নিষ্ক্রিয় থাকে না। উহাকে কেন্দ্র করিয়া নানা দৃষ্টিবিন্দু হইতে উহার কথা আমরা চিন্তা করি এবং উহার চতুর্দিকে এক নিবিড় মায়াজাল রচনা করি। তখন আমাদেব চিত্তে যে রসঘন ভাবের উদ্রেক হয় তাহাকেই আমরা সৌন্দর্যানুভূতি বলি। মোট কথা, শুধু বাহিরের উপাদান থাকিলেই হয় না, মনের অবদানও থাকা চাই প্রচুর। যেমন, শুধু মণিমুক্তা ও মার্বেল পাথর যোগাড় করিলেই তাজমহল রচনা করা হয় না, ইহার জন্য কুশলী শিল্পী-মনও চাই—যিনি নিজের মনের মতন কল্পনা করিয়া এই সকল উপাদান দিয়া এক অদ্ভুত সৌন্দর্য সৌধ রচনা করিতে পারেন। তাঁহার মনের মধ্যে যে সোনার কাঠি আছে তাহার স্পর্শে এইসকল বিভিন্ন উপাদান নিজ নিজ খণ্ডরূপ পরিত্যাগ করিয়া এক পরমসুন্দর অখণ্ডরূপ পরিগ্রহ করে। এই সৌন্দর্য সৃষ্টিতে মনের অবদান যে কতখানি থাকিতে পারে তাহার একটি উদাহরণ দেওয়া যাউক। ধর, কোন এক সন্ধ্যায় তুমি আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখিলে কালো মেঘের বুকের উপর দিয়া এক ঝাঁক শাদা বক উড়িয়া চলিয়াছে। দৃশ্যটি যে বাস্তবিকই সুন্দর—তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এখন তুমি রবীন্দ্রনাথের "বলাকা" কবিতাটি একবার স্মরণ কর, দেখিবে তাঁহার পরিকল্পিত সেই অসাধারণ ছবিটি তোমার মানসচক্ষে ভাসিয়া উঠিবে; কবিতাটির ছন্দ, উহার শব্দঝংকার এবং ভাবধারা আসিয়া ধীরে ধীরে তোমার চিন্তা স্রোতের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতে থাকিবে।

---

* "Value Judgments are also in a sense descriptive, for values are in a sense factual"

তখন তোমার চিন্তা ধারা মার্জিত, পরিবর্ধিত ও সমৃদ্ধ হইয়া এমন রূপ গ্রহণ করিবে যাহার ফলে তোমার মনের মধ্যে উচ্চস্তরের ভাবাবেগ না আসিয়া পারিবে না। তোমার মন তখন এক গভীর রসঘন ভাবে আপ্লুত হইয়া যাইবে; পরিণামে যাহা পূর্বে সুন্দর বলিয়া অনুভূত হইয়াছিল, তাহা অধিকতর সুন্দর বলিয়া অনুভূত হইবে। এক্ষেত্রে তোমার মনের অবদানই যে এই সৌন্দর্য-বৃদ্ধির কারণ—তাহা বলাই বাহুল্য। তবে সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখা দরকার—এই সৌন্দর্যবোধের মূলে আছে এক বাস্তবিকই সুন্দর দৃশ্য (Objective); সেই বাস্তব গুণকেই ভিত্তি করিয়া তোমার চিত্ত এক পরম সুন্দর মানস (Subjective) ছবি রচনা করিয়াছে।*

Value : Extrinsic and Intrinsic

এইভাবে আমরা বাস্তব জগতের মান বা মূল্য (Value) নির্ধারণ করিয়া থাকি। সৌন্দর্যের দিক হইতে চিন্তা করিয়া আমরা কোন জিনিষকে অধিক সুন্দর বলি, কোন জিনিষকে অল্প সুন্দর বলি, আর কোন জিনিষকে একেবারেই সুন্দর বলি না। সেইরূপ নৈতিকতার দিক হইতে চিন্তা করিয়া মানুষের কোন কাজকে আমরা ভাল বলি, আর কোন কাজকে খারাপ বলি; আবার সত্যের দিক হইতে চিন্তা করিয়া কোন সিদ্ধান্তকে সঠিক বলি, আর কোন সিদ্ধান্তকে ভুল বলি। এইভাবে বিভিন্ন দৃষ্টিবিন্দু হইতে আমরা জিনিষের বিভিন্নরূপ মূল্য নির্ধারণ করিয়া থাকি। যেমন আশ্রয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, আমরা কোন বাড়ীকে বড় বলি, আর কোন বাড়ীকে ছোট বলি, ক্রয়-সামর্থ্যের দিকে লক্ষ্য করিয়া আমরা রৌপ্য অপেক্ষা স্বর্ণকেই অধিক মূল্যবান বলিয়া মনে করি, ইত্যাদি। তবে একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে ঘরবাড়ী বা সোনারূপার কোন স্বকীয় মূল্য নাই, বিভিন্ন প্রয়োজন সিদ্ধি করিতে পারে বলিয়াই ইহাদের দাম (Extrinsic value), নতুবা ইহাদের দাম কি? কেহ যদি কোন গয়না করিতে না চায়, বা কেহ যদি কোন জিনিস কিনিতে না চায়—তবে সোনা লইয়া কি হইবে? কিন্তু সত্য, শিব ও সুন্দরের সম্বন্ধে একথা মোটেই প্রযোজ্য নহে; ইহাদের প্রত্যেকেরই এক নিজস্ব স্বকীয় মূল্য (Intrinsic value) আছে। তুমি কবিতা পড়িয়া বা ছবি দেখিয়া যে সৌন্দর্য উপলব্ধি কর, তাহা কিসের জন্য কর? উহাতে তোমার কি প্রয়োজন সিদ্ধ হয়? বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রে তুমি অন্যেতর প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য সৌন্দর্য উপলব্ধি করিতেছ না; সৌন্দর্য উপলব্ধির

---

* "Values are subjectively conditioned objective qualities,"

জন্যই সৌন্দর্য উপলব্ধি করিতেছ। সেইরূপ, সত্য সন্ধানের জন্যই তুমি সত্য সন্ধান কর, মঙ্গল কাজ করিবার জন্যই তুমি মঙ্গল কাজ কর; অর্থাৎ সোনারূপার ন্যায় অন্যেতর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তুমি সত্য, শিব ও সুন্দরের সাধনা কর না।

সত্য, শিব, ও সুন্দর—প্রত্যেকটিই মানব জীবনের এক অমূল্য সম্পদ। নিজেদের মূল্যেই ইহারা মূল্যবান, অন্যেতর প্রয়োজন সিদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ইহাদের মূল্য নির্ধারিত হয় না। শুধু তাহাই নহে; ইহাদের প্রত্যেকটিই নৈর্ব্যক্তিক আদর্শ; কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যক্তি বা বস্তু বিশেষের মধ্যে ইহারা সীমাবদ্ধ নহে; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় অতিক্রম পূর্বক অতীন্দ্রিয় বিষয়ের দিকেই ইহাদের লক্ষ্য। কবি বা শিল্পী যখন সৌন্দর্য সম্বন্ধে চিন্তা করেন, তখন তিনি কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর কথা চিন্তা করেন না; তাঁহার চিন্তার বিষয়বস্তু অমূর্ত ও অতীন্দ্রিয়। সেইরূপ, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত যখন জ্ঞানের সন্ধানে ব্যাপৃত থাকেন, তখন কি তিনি কোন ব্যক্তি বা বস্তুর কথা চিন্তা করেন? তখন কোন ক্ষুদ্র বস্তুর প্রতি তাঁহার লক্ষ্য থাকে না; যাহা একমাত্র সত্য ও চিরন্তন সত্য—তিনি শুধু তাঁহারই ধ্যান করেন। গান্ধীজী যে সত্যের সন্ধান করিতেন—তাহা কি কোন মূর্ত বস্তু? সত্য ও সুন্দরের পর এখন শিবের আদর্শ লওয়া যাউক। শিব মানে শুভ, মঙ্গল। কবির ভাষায় বলা যায়

"মহাজ্ঞানী মহাজন, যে পথে করে গমন, হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়;
সেই পথ লক্ষ্য করে, স্বীয় কীর্তি ধ্বজা ধরে, আমরাও হব বরণীয়।"

মহাজনের সেই পথ, সেই আদর্শ কি—যাহা সম্মুখে রাখিয়া আমরা জীবন পথে অগ্রসর হইতে পারি? যে আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া বৌদ্ধ শ্রমণগণ দেশ দেশান্তরে পরিভ্রমণ করিয়া মানুষের কল্যাণ কার্যে আত্ম-আহুতি দিয়া গিয়াছেন—সেই আদর্শ কি? বলা বাহুল্য, সেই আদর্শের সহিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর কোন সম্পর্ক নাই; ইহা নৈর্ব্যক্তিক আদর্শ, কল্যাণ ও মঙ্গলই ইহার লক্ষ্য।

Value and Reality

আমরা উপরে তিন প্রকার আদর্শের কথা উল্লেখ করিলাম, সত্য শিব এবং সুন্দর (True, Good, and the Beautiful)। এই তিন আদর্শকে সমন্বিত করিয়া আমরা ভগবৎ আদর্শ নামে অভিহিত করিতে পারি। বস্তুতঃ উপনিষদে ভগবানকে সত্য শিব এবং সুন্দর বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এই সত্য শিব ও সুন্দরই মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। আমরা যখন সত্যের সন্ধান করি, তখন বাস্তবিক পক্ষে ঈশ্বরেরই সন্ধান করি; কারণ তিনি সত্যস্বরূপ (Truth)। আবার, আমরা যখন কাঞ্চনজঙ্ঘার অপরূপ শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হই বা উদীয়মান

সূর্যের জবাকুসুম সংকাশ মহাদ্যুতি দেখিয়া প্রণত হই, তখনও প্রকৃতপক্ষে সেই ঈশ্বরকেই প্রণাম করি। কারণ, সকল সৌন্দর্যেরই মূল উৎস তিনি, তিনি পরম-সুন্দর (Beautiful)। তাঁহারই রূপের কণামাত্র পাইয়া চাঁদের আলো পৃথিবীকে সুষমামণ্ডিত করিয়া তোলে; তাঁহারই সৌন্দর্যকণা বিকীর্ণ করিয়া গোলাপের কুঁড়ি পৃথিবীর বুকে ফুটিয়া উঠে। আবার, তিনিই আমাদের পরমশ্রেয় (The Highest Good)। তিনি শুভ, তিনি মঙ্গল। পৃথিবীর যেখানে যত মহাজ্ঞানী ও মহাজন আছেন—সকলেই তাঁহাকে শরণ করিয়া তাহারই নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করিতেছেন। তিনি সকল মহত্ত্বের প্রতীক, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই আমরা সৎ ও মহৎ হইবার চেষ্টা করি। তিনি পুণ্য, তিনি পবিত্র—তাঁহারই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া আমরা নিজদিগকে পুণ্য ও পবিত্র করিতে চেষ্টা করি।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহাই একটু বিভিন্ন ভাষায় বলা যাইতে পারে। আমাদের তিন প্রকার মানসিক বৃত্তি আছে, অবগতি, অনুভূতি ও কর্মপ্রবৃত্তি। অবগতির দ্বারা আমরা জ্ঞান আহরণ করি, অনুভূতির দ্বারা আমরা সৌন্দর্য উপলব্ধি করি, এবং কর্মপ্রবৃত্তির দ্বারা আমরা মহৎ কাজ করি। আমরা যখন জ্ঞান আহরণে প্রবৃত্ত থাকি, তখন স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে জ্ঞানের কোন সীমারেখা নাই; ইহা অসীম, অনন্তকাল ধরিয়া চেষ্টা করিলেও আমাদের জ্ঞান আহরণ শেষ হয় না। যতই পাই, ততই বুঝি যে কিছুই পাওয়া হইল না, সবই বাকী রহিয়া গেল; তাই আরো চাই, "আরো আলো চাই"। জ্ঞানের এই যে অনন্ত আদর্শ আমাদিগকে নিরন্তর আকর্ষণ করিতেছে—উহাই তো ঈশ্বর। তাই উপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন "অসতো মা সৎগময়", আমাকে মিথ্যা হইতে সত্যেতে লইয়া যাও। জ্ঞানের ন্যায় সৌন্দর্যের আদর্শও আমাদের মনের মধ্যে বিরাজ করিতেছে। পৃথিবীতে যত সুন্দর জিনিষই দেখি না কেন, আমাদের মন কিছুতেই তৃপ্ত হয় না; উহা অপেক্ষাও যাহা সুন্দরতর, সুন্দরতর অপেক্ষাও যাহা সুন্দরতম—সেই পরম সুন্দরকে দেখিবার জন্য আমাদের মন উন্মুখ হইয়া থাকে। সসীম জগতে যাহা কিছু সুন্দর দেখি না কেন, সবই সেই অসীম সুন্দরের আংশিক প্রকাশ মাত্র, কিন্তু আংশিক প্রকাশ দেখিয়া আমাদের মন তো তৃপ্ত হয় না; আমরা চাই সুন্দরের পরিপূর্ণ প্রকাশ। তাই উপনিষদের ঋষি বলেন অল্পেতে সুখ কোথায়? ভূমাতেই সুখ; অর্থাৎ অল্প লইয়া তৃপ্ত হইও না; যখন সৌন্দর্য চাও, তখন পরিপূর্ণ সৌন্দর্য উপলব্ধি কর, অপূর্ণ জিনিষে তৃপ্ত হইবে কেন? সুন্দরের পরিপূর্ণ জ্যোতিতে তোমার সমস্ত সত্তা উদ্ভাসিত করিয়া তোলো। সুন্দরের এই যে অনন্ত আদর্শ আমাদিগকে নিরন্তর আকর্ষণ করিতেছে, উহাই তো আমাদের ঈশ্বর। অনুভূতির পরে কর্মপ্রবৃত্তির

কথা লওয়া যাউক। আমরা কাজ করিতে চাই; তবে যেকোন কাজ করিয়াই আমরা সন্তুষ্ট হই না, আমরা মহৎ কাজ করিতে চাই, মহৎ কাজ করিয়া আমরা আমাদের চারিত্রিক উন্নতি সাধন করিতে চাই। তবে এবিষয়ে আমরা একেবারে পরিচালনাহীন নহি; কারণ এই মহৎ কার্যের এক পরম আদর্শ সর্বদাই আমাদের মনের মধ্যে বিরাজ করিতেছে। সেই আদর্শ অনুসরণ করিয়া আমরা আমাদের জীবন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিতে চেষ্টা করি। জ্ঞান ও সৌন্দর্যের আদর্শ যেমন অনন্ত ও অসীম, আমাদের এই মহত্ত্বের আদর্শও তেমন অনন্ত ও অসীম। মহত্ত্বের কোন সীমা নির্দেশ নাই; যে যতই মহৎ কাজ করুক না কেন, কেহই বলিতে পারে না যে, সে যাহা করিয়াছে তাহাই মহৎ-তম, উহা অপেক্ষ আর ভাল কিছু সম্ভব নহে। পুণ্য অপেক্ষাও পুণ্যতর সম্ভব, পবিত্র অপেক্ষাও পবিত্রতর হওয়া সম্ভব। তাই আমরা আমাদের মনের মধ্যে এক পবিত্রতম আদর্শ ধরিয়া রাখি এবং উহারই অনুসরণ করিবার চেষ্টা করি। উহাই আমাদের পরমশ্রেয় (Highest Good) ; উহাই আমাদের ঈশ্বর।

আদর্শের বাস্তবিকতা

তাহা হইলে দেখা গেল যে ঈশ্বর বলিতে আমরা কোন অদ্ভুত জিনিষ বুঝি না; তিনি কোন বস্তু নহেন, ব্যক্তিও নহেন; তিনি আমাদের আদর্শের প্রতীক মাত্র। একটু উপমার ভাষায় বলা যায় যে আমাদের অমূর্ত ও অতীন্দ্রিয় আদর্শই ঈশ্বরের মধ্যে অধিষ্ঠিত হইয়া কিঞ্চিৎ সরস রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। এখন একটি প্রশ্ন আলোচনা করা যাউক; আমরা এই যে ভগবৎ আদর্শের কথা বলিতেছি—উহা বাস্তব সত্য, না কাল্পনিক তথ্য মাত্র। এই আদর্শের অনুরূপ সত্যই কোন সত্তা আছে কি না? যদি কেহ কেহ বলেন যে ইহার কোন বাস্তবিকতা নাই, ইহা আমাদের কাল্পনিক সৃষ্টি মাত্র, তাহা হইলে আমাদের কি বলিবার আছে? ইহার উত্তরে আমরা বলিতে চাই যে, আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমরা যখন বিচার করি তখন আমাদের বিচারকে Value Judgment বলে। এই Value Judgment সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে ইহা আমাদের খেয়ালের উপর নির্ভর করে না। তোমার খেয়াল অনুসারে তুমি ফুলকে সুন্দর বল না; ফুলের মধ্যে সৌন্দর্য আছে বলিয়াই তুমি উহাকে সুন্দর বল। সেইরূপ আমার খেয়াল অনুসারে আমি হত্যা-কার্যকে অন্যায় বলি না, ইহার মধ্যে অন্যায় নিহিত আছে বলিয়াই আমি ইহাকে অন্যায় বলি। অর্থাৎ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বস্তুর মধ্যে এমন কোন জিনিষ দেখিতে পাইতেছি যাহার জন্য

ইহাকে সুন্দর বা অসুন্দর, ন্যায় বা অন্যায় বলিয়া অভিহিত করিতে বাধ্য হইতেছি। অতএব এই যে শিব বা সুন্দরের আদর্শ আমরা মনের মধ্যে পোষণ করিয়া রাখিয়াছি—উহাকে একেবারে কাল্পনিক আদর্শ বলা যায় না; বাস্তব জগতেও উহার অনুরূপ কিছু আছে—স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে ভগবৎ আদর্শকেই বা কি করিয়া কাল্পনিক তথা বলা যায়? কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি ঈশ্বর তো কোন এক অদ্ভুত জিনিস নহেন, ঈশ্বর মানে সত্য, শিব ও সুন্দর। এই আদর্শত্রয় যখন কাল্পনিক নহে, বাস্তব, তখন ঈশ্বরও কাল্পনিক হইতে পারেন না, তিনিও বাস্তব সত্য।

তবে এখানে একটু সাবধান করিয়া দেওয়া দরকার। যে অর্থে আমরা সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি জড় পদার্থকে বাস্তব বলি, ঠিক সে অর্থে ঈশ্বরকে বাস্তব বলা যায় না। সূর্যচন্দ্রকে আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করিতে পারি, উহারা অতীন্দ্রিয় নহে, কিন্তু ভগবান অতীন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। আমরা সাধারণতঃ মনে করি যে, যাহা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহাই শুধু বাস্তব ও সত্য, আর যাহা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করা যায় না, তাহা অবাস্তব ও অসত্য। কিন্তু ইহা নিতান্তই ভুল ধারণা, ইন্দ্রিয়াতীত হইয়াও উহা বাস্তব হইতে পারে; তবে অবশ্য উহা একটু ভিন্ন রকমের বাস্তবিকতা, জড়পদার্থের বাস্তবিকতা বলিতে যেরকম বুঝি ঠিক সেরকমের নহে। উহাকে আমরা আদর্শের বাস্তবিকতা বলিতে পারি। উদাহরণ দিয়া বুঝান যাউক। সীতা ও সাবিত্রীর আদর্শ—ভারতীয় নারীর চিরন্তন আদর্শ। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি—সত্যই কি সীতা ও সাবিত্রী বলিয়া কেহ কখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইতিহাসে তো ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, বরং অনেকেই বলেন ইহা কবির কল্পনা মাত্র। তাহা হইলে সীতা ও সাবিত্রীকে অনায়াসেই মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায়। কিন্তু এই দুই নামের সহিত যে মহান আদর্শ জড়িত আছে—উহাকেও কি এত সহজে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায়? ভারতবর্ষীয় নারীজীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এই আদর্শ প্রবেশ করিয়াছে, সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া এই আদর্শ অনুসারে তাহারা তাহাদের জীবন গঠন করিয়া আসিয়াছে; জন্ম হইতে তাহারা এই আদর্শ অনুসরণ করে এবং মৃত্যু-কালেও তাহারা এই আদর্শের কথা ভুলিতে পারে না। এই আদর্শকেই যদি এখন মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতে হয়, তাহা হইলে তাহাদের জীবনের আর থাকে কি? এই আদর্শ আছে বলিয়া তাহাদের জীবন আজ যে প্রকার রূপ গ্রহণ করিয়াছে, এই আদর্শ না থাকিলে সে প্রকার রূপ গ্রহণ করিতে পারিত না;

অনুরূপ গ্রহণ করিত। তাই তাহাদের জীবনকে আজ এই আদর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা যায় না। অতএব আমরা বলিতে পারি যে ভারতবর্ষীয় নারীজীবন যেমন মিথ্যা নহে, তাহাদের আদর্শও তেমন মিথ্যা নহে, কারণ এই আদর্শ অনুসারে তো তাহাদের জীবন গঠিত হইয়াছে।

খৃষ্টানদের সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা বলা যাইতে পারে। আজকাল কেহ কেহ বলিতে চান যে যীশু খৃষ্ট বলিয়া কেহ ছিলেন না; তাঁহার জন্ম ও মৃত্যু সম্পর্কে যাহা শোনা যায়, তাহা নিছক গল্প মাত্র, বাস্তব ঘটনা নহে। আমাদের উত্তর এই যে, ইচ্ছা করিলে যীশু খৃষ্টকে অবাস্তব বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায়, কিন্তু তাঁহার নামের সহিত যে আদর্শ জড়িত আছে, সেই আদর্শকে আজ কিছুতেই উড়াইয়া দেওয়া যায় না; অর্থাৎ যীশু খৃষ্ট অবাস্তব হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার আদর্শ অবাস্তব নহে। এই আদর্শকে যদি অস্বীকার করিতে হয়, তবে সমগ্র ইউরোপকেই অস্বীকার করিতে হইবে, কারণ, ইউরোপের সভ্যতা, সমাজ, ধর্ম ও সাহিত্য—সবই এই আদর্শের সহিত ওতপ্রোত ভাবে জড়িত আছে। আমরা বলিতে চাই না যে প্রত্যেক ইউরোপীয়ই যীশু খৃষ্টের আদর্শ অনুসরণ করিতেছে (বা প্রত্যেক ভারতীয় নারীই সীতা-সাবিত্রীর আদর্শ অনুসরণ করিতেছে), তবে এই আদর্শের প্রভাব তাহাদের জীবনে যে অপরিমেয় তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। ইহাকেই আমরা আদর্শের বাস্তবিকতা বলিতে চাই। জাগতিক পদার্থের বাস্তবিকতা অপেক্ষা আদর্শের বাস্তবিকতাও কম কঠোর নহে। বরং আমরা দেখিলাম যে কোন কোন ক্ষেত্রে জাগতিক ঘটনা অস্বীকার করা যায়, কিন্তু আদর্শের প্রেরণা অস্বীকার করা যায় না। ঈশ্বরও মানব জীবনের এইপ্রকার এক আদর্শ; তাঁহাকে অস্বীকার করিলে মানবজীবনের অনেক কিছুই অস্বীকার করিতে হয়; আমাদের ধর্মবোধ অবলুপ্ত হইয়া যায়, এবং নীতিবোধ পরিবর্তিত হইয়া যায়। তখন বিপদের সময়ে আমাদের কোন বন্ধু থাকে না, দুঃখের সময়ে কোন সহায় থাকে না; আমাদের জীবন তখন নিতান্ত নিঃসঙ্গ, নিঃসহায় ও নীরস হইয়া পড়ে। সেইজন্য একজন কবি বলিয়াছেন যে বহির্জগতে যদি ঈশ্বর নাও থাকেন, তবে অন্তর্জগতে আমাদিগকে এক ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়া লইতে হইবে; নতুবা আমাদের অন্তর্জগৎ একেবারে অন্তঃসারশূন্য হইয়া যাইবে।

উপসংহার

এখন এই প্রসঙ্গের উপসংহার করা যাউক। আমরা বহুবার বলিয়াছি যে ঈশ্বর বলিতে আমরা কোন অদ্ভুত জিনিষ বুঝি না। ঈশ্বর বলিতে আমরা বুঝি মানব জীবনের সর্বোত্তম আদর্শ—যাঁহার মধ্যে আমাদের সকল

আশা ভরসা, সকল আকাঙ্খা ও প্রার্থনা পুঞ্জীভূত হইয়া জীবন্ত রূপ গ্রহণ করিয়াছে। এই আদর্শের প্রতীক ব্যতীত ঈশ্বর আর কিছুই নহেন। অতএব এই আদর্শের বাস্তবিকতা যখন অস্বীকার করা যায় না, তখন ঈশ্বরের অস্তিত্বও অস্বীকার করা যায় না।

ঈশ্বরের-স্বরূপ উপলব্ধি করাই আমাদের জীবনের মহৎ ও বৃহৎ আদর্শ। বলা বাহুল্য ইহা খুব সহজ ব্যাপার নহে। মানুষ যতই এই আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, ততই সে বুঝিতে পারে যে এই আদর্শ যেন আরও দূরে সরিয়া যাইতেছে, এই আদর্শ সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা তাহার পক্ষে যেন অসম্ভব। শুধু এ-জীবনে কেন, অনন্ত জীবনেও কেহ ইহা পূর্ণ-ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিবে কিনা সন্দেহ; অন্ততঃ যতদিন সে সসীম থাকিবে ততদিন তাহার পক্ষে এই অসীমত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব নহে। কিন্তু এমনই মানুষের স্বভাব যে সে কিছুতেই অল্পে তুষ্ট থাকিতে পারে না; তাহার মধ্যে যে Divine discontentment আছে, উহা তাহাকে নিরন্তর উদ্বুদ্ধ করিতে থাকে। তাই সে কিছুতেই নিরস্ত হয় না, সে কেবলই অগ্রসর হইয়া চলে। যে অসীমের আকর্ষণে সে বাহির হইয়াছে, সে আকর্ষণের প্রভাব অস্বীকার করা তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। পূর্বেই বলিয়াছি, ইহা জাগতিক বস্তুর আকর্ষণ নহে, ইহা আদর্শের আকর্ষণ; ফল-ফুল, ঘর-বাড়ী আমাদিগকে যেভাবে আকর্ষণ করে, ঈশ্বর আমাদিগকে ঠিক সেভাবে আকর্ষণ করেন না। তিনি আকর্ষণ করেন জীবনের আদর্শরূপে, বাস্তব পদার্থরূপে নহে। তাই দূরে রহিয়াও তিনি আমাদের নিকটে থাকেন, আবার নিকটে থাকিয়াও তিনি দূরে রহেন; দূর হইতে, নিকট হইতে, বাহির হইতে, ভিতর হইতে, সর্বদাই তিনি আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছেন। আমাদের নয়ন তাঁহাকে দেখিতে পায় না, অথচ আমাদের নয়নে নয়নেই তিনি বিরাজ করিতেছেন। আমাদের সকল কার্যে, সকল চিন্তার মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি আমাদিগকে নিরন্তর আকর্ষণ করিতেছেন। বলা বাহুল্য, ইহা বাস্তব পদার্থের আকর্ষণ নহে, ইহা আদর্শের আকর্ষণ।

সপ্তদশ অধ্যায়

সত্য ও মূল-তত্ত্ব

(Truth and Reality)

পূর্ব অধ্যায়ে আমরা দুই প্রকার Judgment-এর নাম উল্লেখ করিয়াছি; যথা (১) Fact Judgment, যেমন, আকাশে রামধনু উঠিয়াছে, (২) Value Judgment, যেমন, রামধনু দেখিতে সুন্দর। প্রথম ক্ষেত্রে আমরা যে সত্য আবিষ্কার করি তাহাকে বাস্তব সত্য বলা হয়; আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আমরা যে সত্য আবিষ্কার করি তাহাকে আদর্শগত সত্য বলা যাইতে পারে। তবে যে প্রকার সত্যই হউক না কেন, সত্য সব সময়েই সত্য। এই অধ্যায়ে আমরা এই সত্যের স্বরূপ আলোচনা করিব। কবিগুরু বলিয়াছেন, "সত্য মুদে আছে দ্বিধার মাঝখানে।" এই দ্বিধা উদ্ঘাটিত করিতে পারিলে সত্যের যে স্বরূপ আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়, উহাই এখন আমাদের আলোচ্য বিষয়। আমরা যদি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হই, তবে সেই সিদ্ধান্ত সত্য কি না—তাহা নির্ধারণ করিবার উপায় কি? এই প্রসঙ্গে সাধারণতঃ চারিপ্রকার উপায়ের কথা উল্লেখ করা হয়। আমরা একে একে প্রত্যেকটি এখানে ব্যাখ্যা করিব।

I. Correspondence Theory

একটি উদাহরণ দিয়া আরম্ভ করা যাউক। তুমি বলিলে "আকাশে রামধনু উঠিয়াছে", আমি বলিলাম "ওঠে নাই"। কাহার কথা সত্য? ইহার উত্তরে অনেকে বলিবেন যে ইহা লইয়া তর্ক বিতর্ক করিবার প্রয়োজন কি? ঘরের ভিতর হইতে বারান্দায় আসিয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখ, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে কাহার কথা সত্য, আর কাহার কথা মিথ্যা। বহির্জগতে যদি সত্যই রামধনু থাকে তবে তোমার সিদ্ধান্ত ঠিক, আর যদি না থাকে তবে তোমার সিদ্ধান্ত ভুল। ইহাকে Commonsense Theory বা সাধারণ মতবাদ বলা যাইতে পারে। আমরা মনে মনে যে ধারণা করি, সেই ধারণা অনুযায়ী যদি কোন পদার্থ বাস্তবিকই বিদ্যমান থাকে, তবে আমাদের ধারণা সত্য, আর যদি তদনুরূপ কোন জিনিষ না থাকে, তবে উহা মিথ্যা। এইভাবেই আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সত্য মিথ্যা নির্ধারণ করিয়া থাকি; আমাদের মানসিক ধারণার অনুরূপ (Corresponding) কোন জাগতিক পদার্থ আছে কি না—ইহা নির্ধারণ করিতে পারিলেই সত্য মিথ্যা নির্ধারিত হইয়া যায়।

সমালোচনা

এই মতবাদকে সহজে অগ্রাহ্য করা যায় না। অনেকে বলেন যে সত্য নির্ধারণের পক্ষে ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। তবে সাধারণতঃ ইহা যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয় তাহার মধ্যে যথেষ্ট অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়।

(১) প্রথমতঃ, এই মতানুসারে জগৎকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়, বহির্জগৎ ও মনোজগৎ, এবং বলা হয় যে, যাহা বহির্জগতে আছে তাহা মনোজগতে নাও থাকিতে পারে, আর যাহা মনোজগতে আছে তাহা বহির্জগতে নাও থাকিতে পারে। যেমন ধর, শনিগ্রহে কে বাস করিতেছে সে সম্বন্ধে আমার কোনই ধারণা নাই, অর্থাৎ সেখানে যে বাস্তব সত্তা আছে, তদনুরূপ কোন মানস সত্তা আমার মনের মধ্যে বিদ্যমান নাই। আবার যাহার মানস সত্তা আছে, তাহার হয়ত কোন বাস্তব সত্তা নাই; যেমন ধর, আমার মনের মধ্যে পরীর অস্তিত্ব আছে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া বহির্জগতে তদনুরূপ কোন সত্তার অস্তিত্ব আছে কি? আমরা তো অনেকেই স্বর্গ নরক, দেব দানব প্রভৃতি সম্বন্ধে ধারণা করিয়া থাকি, অথচ বহির্জগতে তদনুরূপ কোন বস্তুর অস্তিত্ব পাই না, এইসব ক্ষেত্রে মানস সত্তা আছে, কিন্তু বাস্তব সত্তা নাই। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখিলাম, বাস্তব সত্তা আছে, কিন্তু মানস সত্তা নাই।

এইভাবে জগৎকে দুইভাগে ভাগ করিয়া বলা হয় যে, যেক্ষেত্রে মানস সত্তার অনুরূপ কোন বাস্তব সত্তা পাওয়া যায় না, সেক্ষেত্রে সত্য থাকিতে পারে না; সত্য আছে সেখানে, যেখানে আমরা মানস সত্তার অনুরূপ এক বাস্তব পদার্থ প্রত্যক্ষ করিতে পারি। তাই আকাশে তাকাইয়া আমি যদি সত্যই একটি রামধনু দেখিতে পারি, তাহা হইলে বলিব যে তোমার ধারণা ঠিক, ইহাতে কোন ভুল নাই। কিন্তু এইখানেই মুশকিল। আমি কি করিয়া বুঝিব যে আকাশে সত্যই একটি রামধনু উঠিয়াছে? আমি যাহা দেখিতে পাই, তাহা তো বাস্তব রামধনু নহে, উহা একটি মানস ছবি মাত্র, আমার মনের মধ্যে বিরাজ করিতেছে। এই মানস ছবির অনুরূপ কোন সত্যিকারের জিনিষ আছে কি না, তাহা জানা আমার পক্ষে মোটেই সম্ভব নহে। কারণ, তাহা জানিতে হইলে মনোজগৎ অতিক্রম করিয়া আমাকে একেবারে বহির্জগতে আসিয়া পৌঁছিতে হয়; কিন্তু তাহা কি সম্ভব? আমি যাহাই প্রত্যক্ষ করি না কেন, নিজের মনোমধ্যেই তাহা প্রত্যক্ষ করি; মন বাদ দিয়া কখন কি কোন জিনিষ প্রত্যক্ষ করা যায়? বস্তুতঃ প্রত্যক্ষ করা মানেই মানস ছবি প্রত্যক্ষ করা; এই মানস ছবির

বাহিরে কোন বাস্তব সত্তার সন্ধান পাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। কিন্তু যদি বাস্তব সত্তার সন্ধান না পাওয়া যায়, তাহা হইলে Correspondence Theory বা অনুরূপ-বাদের কোনই সার্থকতা থাকে না। কারণ, এই মতানুসারে শুধু সেই ধারণাকেই সত্য বলিয়া অভিহিত করা হইবে, যে ধারণার অনুরূপ এক সত্যিকারের বস্তু প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু সত্যিকারের বস্তু বলিতে যদি চেতনাতীত বস্তু বুঝায়, তবে মনের মাধ্যমে তাহার সন্ধান পাওয়া যাইবে কেমন করিয়া? মনের মধ্যে আসিলেই তো উহা মানস ছবি হইয়া যায়। অতএব তোমার ধারণা অনুযায়ী কোন রামধনু সত্যই বহির্জগতে আছে কি না, তাহা নির্ধারণ করিবার কোনই উপায় নাই; তোমাকে উহার মানস সত্তা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়, উহার বাস্তব সত্তা দেখিবার আশা ত্যাগ করিতে হইবে। তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে অনুরূপবাদও ত্যাগ করিতে হয়। যখন বাহিরের আসল জিনিষই আমি দেখিতে পাইতেছি না, তখন মনের তথাকথিত নকল জিনিষটি সত্যই আসলের অনুরূপ কি না—তাহা আমি জানিতে পারিব কি করিয়া?

বাস্তব সত্তা ও মানস রূপ

(২) দ্বিতীয়তঃ এই মতবাদে মনকে একেবারে নিষ্ক্রিয় পদার্থ বলিয়া গণ্য করা হয়। তাঁহারা বলেন আকাশে যখন রামধনুর উদয় হয় তখন উহার এক প্রতিচ্ছবি আমাদের মনোমধ্যে প্রতিবিম্বিত হইয়া পড়ে। এক্ষেত্রে মনের কোন কার্যকারিতা নাই; মন শুধু উদ্দীপনা গ্রহণ করে, কিন্তু উহার উপর প্রতিক্রিয়া করে না। আমরা ইহা স্বীকার করি না; আমাদের মতানুসারে জ্ঞান আহরণ করিতে হইলে শুধু উদ্দীপনা পাইলেই হয় না; উদ্দীপনার উপর ক্রিয়া করাও চাই; উহাই মনের কাজ। একটি উদাহরণ দিয়া বুঝান যাউক। আমি দেখিলাম একজন লোক গাছের দিকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িল; পরক্ষণেই দেখিলাম একটি পাখী গুলিবিদ্ধ হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। এক্ষেত্রে বহির্জগৎ হইতে আমরা পর পর কয়েকটি উদ্দীপনা পাইতেছি মাত্র। প্রথমে শুনিলাম গুলির শব্দ, তারপরে আসিল পাখীর মৃত্যু। কিন্তু শুধু দুইটি উদ্দীপনা পাইয়াই আমরা তৃপ্ত হই না; এই দুই উদ্দীপনার মধ্যে আমরা এক কার্যকারণ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া বলি যে, গুলি—কারণ, আর মৃত্যু—কার্য; বন্দুকের গুলি আসিয়া পাখীর মৃত্যু সাধন করিয়াছে। এই যে কার্যকারণ সম্বন্ধ—ইহার খবর আমরা কোথা হইতে পাইলাম? ঘটনাদ্বয়ের মধ্যে ইহার তো কোন ধরা ছোঁয়া আমরা পাই না;

ঘটনা শুধু ঘটনা—একটির পর একটি ঘটিয়া চলিয়াছে; কিন্তু উহারা যে কার্যকারণ সূত্রে গ্রথিত—সে খবর আমরা পাইলাম কেমন করিয়া? বলা বাহুল্য, সে খবর আমরা বাহির হইতে পাই নাই, সে খবর আমরা পাইয়াছি, মনের মধ্য হইতে। মনের মধ্যে কার্য-কারণ, স্থান-কাল প্রভৃতি সূত্র নিহিত আছে; এই সূত্রগুলি যথাযথভাবে প্রয়োগ করিয়া আমরা ঘটনাসমূহের অন্তর্নিহিত অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া থাকি। যেমন, এখানে কার্য-কারণ সূত্র প্রয়োগ করিয়া আমরা বলিতেছি যে গুলির জন্যই পাখীর মৃত্যু হইয়াছে, গুলিই মৃত্যুর কারণ। এইভাবে মনের সাহায্যে ঘটনাদ্বয়কে কার্যকারণ সূত্রে গ্রথিত করিতে পারিতেছি বলিয়া জ্ঞানলাভ করিতে সক্ষম হইতেছি; নতুবা শুধু বাহিরের উদ্দীপনার উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে আমরা এইসব বিচ্ছিন্ন ঘটনাসমূহের কোন যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা দিতে পারিতাম না; উহারা যেমন বিচ্ছিন্নভাবে আসিয়াছিল তেমন বিচ্ছিন্ন ভাবেই আমাদের মনের মধ্যে রহিয়া যাইত; সুসংবদ্ধ ও সুবিন্যস্ত হইয়া উহারা কখন জ্ঞান-সৌধে পরিণত হইতে পারিত না।

তাহা হইলে দেখা গেল যে জাগতিক উপাদান আসিলেই জ্ঞানোদয় হয় না; ইহার জন্য মনেরও সক্রিয় সহায়তা চাই। মন এই উপাদানগুলির উপর ক্রিয়া করিয়া, নিজের অন্তর্নিহিত সূত্রগুলির দ্বারা সুবিন্যস্ত করিয়া ইহাদিগকে যখন যথাযথরূপে ব্যাখ্যা করিতে পারে, তখনই জ্ঞানের উদয় হয়। কিন্তু এইখানেই অনুরূপবাদের বিপদ। তাহাদের মতানুসারে জ্ঞানোৎপত্তিতে মনের কোন ক্রিয়া নাই; বহির্জগতে যাহা যেমন বিদ্যমান আছে তাহা ঠিক তদনুরূপেই মনের মধ্যে প্রতিভাত হয়। ইহা মোটেই সম্ভব নহে। জাগতিক বস্তু যেমনই হউক না কেন, মনোমধ্যে যখন উহাকে আবির্ভূত হইতে হয়, তখন উহাকে মনের ছাঁচে রূপায়িত হইয়া, অর্থাৎ মন-প্রদত্ত রূপ গ্রহণ করিয়া আবির্ভূত হইতে হয়, নিজ রূপে নহে। এইভাবে স্থান ও কালের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া, কার্যকারণসূত্রে গ্রথিত হইয়া, এক কথায় মনের দ্বারা সংগঠিত হইয়া উহা যখন আমাদের মনের মধ্যে প্রতিভাত হয়, তখন আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করি তাহা উহার ঠিক আদিম ও অকৃত্রিম রূপ নহে; উহার রূপান্তরিত রূপ; মনের ক্রিয়া বশতঃ উহার রূপ কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত না হইয়া পারে না। এমতাবস্থায় অনুরূপ-বাদ স্বীকার করা যায় কেমন করিয়া? কারণ, এই মতানুসারে বলা হয় যে আমাদের মনে রামধনুর যে মানস ছবি উদিত হয় তাহা নাকি বাস্তব রামধনুর অবিকল অনুরূপ; এবং অনুরূপ বলিয়াই উহা সত্য। কিন্তু আমরা দেখিলাম যে উহা কোনমতেই সম্পূর্ণ অনুরূপ হইতে পারে না; মনের ক্রিয়াবশতঃ ইহা পরিবর্তিত হইতে বাধ্য।

II. Pragmatic Theory

এখন সত্য নির্ধারণের দ্বিতীয় পন্থার কথা আলোচনা করা যাউক। অনেকে বলেন, তুমি যে সিদ্ধান্ত করিয়াছ তাহা সত্য কি না জানিবার জন্য তর্ক করিবার দরকার নাই, তদনুযায়ী কাজ কর। যদি দেখ যে ঐ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করিলে তুমি ভাল ফল পাও, তবে বুঝিবে তোমার সিদ্ধান্ত ঠিক, আর যদি দেখ যে ঐ সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ করিলে ফল ভাল হয় না, বরং অনিষ্টই হয়, তবে বুঝিবে উহা ভুল। উদাহরণ দিয়া বুঝান যাউক। তোমার হাতের নিকটে যাহা আছে, তাহা নুন, না চিনি ? আমি বলিলাম নুন, তুমি বলিলে চিনি ; কাহার কথা সত্য ? Pragmatist বলেন, তর্ক করিয়া লাভ কি ? তুমি চা পান করিতেছ ; চায়ের মধ্যে ঐ জিনিষটি ফেলিলেই বুঝিতে পারিবে, উহা চিনি কি নুন। উহার সংমিশ্রণে চা যদি মিষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলেই স্বীকার করিতে হইবে, উহা চিনি ; এক্ষেত্রে তর্কের প্রয়োজন কি ? তাই Pragmatism বলেন, কার্যের দ্বারা সত্য নির্ধারণ কর, তর্কের দ্বারা নহে। আর একটি উদাহরণ ; আমি দেখিলাম দূরে গাছের তলায় কি একটি জিনিষ পড়িয়া আছে ; ঠিক বুঝিতে পারিলাম না জিনিষটি কি, একবার মনে হইতেছে বোধ হয় কুকুর শুইয়া আছে, আবার পরক্ষণেই ভাবিতেছি, কুকুর না, বোধ হয় একটি মানুষ বসিয়া আছে। এক্ষেত্রে সত্য নির্ধারণের জন্য তর্ক করিয়া লাভ কি ? হাঁটিয়া একটু নিকটে গেলেই তো সব পরিষ্কার হইয়া যাইবে। তখন বুঝিতে পারিবে, ঐ জিনিষটি অন্য কিছুই নহে ; তোমার বন্ধু রাম, ফ্লাস্ক্ হইতে চা ঢালিয়া খাইতেছে। তাই Pragmatism বলেন যে কার্যের ফলাফল লক্ষ্য করাই সত্য নির্ধারণের প্রকৃষ্ট পন্থা।

ইহার মধ্যে যে যথেষ্ট সত্য আছে, তাহার একটি উদাহরণ দিতেছি। শিক্ষকগণ বাংলা সরকারের নিকট বেতন বৃদ্ধির জন্য আবেদন করিলেন। সরকার বলিলেন, বাংলাদেশে বহু সহস্র শিক্ষক আছে. তাহাদের সকলেরই যদি বেতন বৃদ্ধি করিতে হয়, তবে সরকার একেবারে দেউলিয়া হইয়া যাইবে ; কারণ তাহাদের উদ্বৃত্ত অর্থ নাই। শিক্ষকেরা সরকারের কথা বিশ্বাস করিলেন না ; তাঁহারা বলিলেন সরকারের যথেষ্ট অর্থ আছে। তখন স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠিল, কাহার কথা সত্য, শিক্ষকের কথা সত্য, না সরকারের কথা সত্য ? এই সত্য নির্ধারণের জন্য শিক্ষকগণ যে পন্থা অবলম্বন করিলেন তাহাকে Pragmatic পন্থা বলা যাইতে পারে। তাঁহারা ধর্মঘট করিলেন, স্কুলে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। তখন বিব্রত হইয়া সরকার তাঁহাদের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। যদি সরকারের হিসাবই সত্য হইত তাহা হইলে বেতন

বৃদ্ধির পরে বাংলা সরকার একেবারে দেউলিয়া হইয়া যাইতেন; কিন্তু কার্যতঃ দেখা গেল যে সরকারের কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি হইল না; যেমন চলিতেছিল তেমনই চলিতে লাগিল। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে সরকার যে হিসাব দিয়াছিলেন তাহা ঠিক নহে, শিক্ষকদের হিসাবই ঠিক। বলা বাহুল্য তর্কের দ্বারা ইহা প্রমাণ করা হয় নাই; তর্ক করিলে তাঁহারা সরকারের হিসাবের কাছে দাঁড়াইতেই পারিতেন না। তাই তাঁহারা তর্ক না করিয়া কাযের দ্বারা নিজেদের তথ্য সত্য বলিয়া প্রমাণ করিলেন। ইহাকে Pragmatic মতবাদ বলে; Pragmatic বা প্রায়োগিক; কারণ এক্ষেত্রে শিক্ষকগণ তাহাদের তথ্যকে কার্যে প্রয়োগ করিয়াছেন, শুধু তাত্ত্বিক আলোচনায় নিবদ্ধ রাখেন নাই। কার্যে পরিণত করিয়া যখন সুফল পাওয়া গেল, তখন আর অন্য প্রমাণের প্রয়োজন কি? এক কথায়, সফলতাই সত্যতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

সমালোচনা

এই মতবাদও সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করা যায় না। আমরা স্বীকার করি, বহুক্ষেত্রে তর্কের দ্বারা সত্য নির্ধারণ করা যায় না; তখন কার্যের ফলাফল লক্ষ্য করাই সত্য নির্ধারণের সহজ উপায়। কিন্তু ইহার মধ্যে গুরুতর ত্রুটি আছে। (১) প্রথমতঃ, অনেক ব্যাপার আছে, যেক্ষেত্রে এই প্রায়োগিক বিধান প্রয়োগ করা সম্ভব নহে, অথচ উহাদের সত্য নির্ধারণ করা প্রয়োজন, সে ক্ষেত্রে আমরা কি করিব? যেমন ধর, ইতিহাসের কোন এক তুচ্ছ ঘটনা; আজ ইহার কোনই ব্যবহারিক মূল্য নাই বটে, কিন্তু ধর, ইতিহাসের তাগিদে আজ ইহার সত্য মিথ্যা নির্ধারণ করিবার প্রয়োজন হইল? সে ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক আলোচনা ব্যতীত আর কি উপায় আছে? অতীত ঘটনার সত্য নির্ধারণ করিবার জন্য এখন কি আর আমাদের পক্ষে কোন কার্য করা সম্ভব? (২) দ্বিতীয়তঃ, যে ক্ষেত্রে কার্য করা সম্ভব, সেক্ষেত্রেও শুধু কার্যফল লক্ষ্য করিয়া সত্য নির্ধারণ করা সঙ্গত নহে। প্রয়োগবাদিগণ বলেন যে, যে তথ্য অনুযায়ী কাজ করিয়া আমরা সফলতা অর্জন করি—সেই তথ্যই সত্য। কিন্তু সফলতা লাভ করিলেই যদি তথ্য সত্য হইয়া যায়, তাহা হইলে অনেক মিথ্যা জিনিষকেও সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। ধর, একজন বৃদ্ধ হৃদ্‌রোগে ভুগিতেছেন এবং কয়েকদিন যাবৎ শয্যাশায়ী হইয়া আছেন। এমন সময় খবর আসিল যে তাহার প্রবাসী পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে। এই সংবাদ যদি পিতাকে দেওয়া হয়, তবে

তাঁহার মৃত্যু নিশ্চিত। অথচ পীড়িত পুত্রের সংবাদ জানিবার জন্য তিনি উৎসুক হইয়া আছেন এবং একদিন স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করিলেন তাহার ছেলে কেমন আছে? আমরা বলিলাম যে সে ভালই আছে। ফলে বৃদ্ধ ধীরে ধীরে রোগমুক্ত হইয়া উঠিলেন। এ ক্ষেত্রে কার্যের ফলাফল দেখিয়া যদি সত্য নির্ধারণ করিতে হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে আমরা বৃদ্ধকে যাহা বলিয়াছি তাহা মিথ্যা হইলেও সত্য!! (৩) তৃতীয়তঃ শিক্ষকগণ সফলতা অর্জন করিয়াছিলেন, ভাল; কিন্তু যদি তাঁহারা সফলতা অর্জন করিতে না পারিতেন, তাহা হইলে কি তাঁহাদের তথ্য মিথ্যা হইয়া যাইত? বাংলার সন্ত্রাসবাদিগণ ইংরাজ হত্যা করিয়া দেশ স্বাধীন করিতে পারেন নাই; অতএব বলিতে হইবে যে সন্ত্রাসবাদের পথ ভুল পথ। অথচ আয়ারল্যাণ্ডে দেখিলাম যে সেখানকার অধিবাসীরা হত্যা ও লুণ্ঠনের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করিয়াছিলেন; অতএব বলিতে হইবে যে সন্ত্রাসবাদের পথ ভুল পথ নহে। বলা বাহুল্য, একই তথ্য একবার সত্য, আর একবার মিথ্যা হইতে পারে না। অথচ ফলাফলের উপর নির্ভর করিলে এইরূপ না হইয়া পারে না। তখন স্বীকার করিতে হয় যে, যে পক্ষ যুদ্ধে জয় লাভ করে, সেই পক্ষেই সত্য আছে, আর যে পক্ষ পরাজিত হয়—তাহার পক্ষে সত্য নাই। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই ইহা কি ঠিক?

তাহা হইলে দেখা গেল যে, তথ্য সত্য হইলেই যে সবদা সুফল পাওয়া যাইবে, তাহা ঠিক নহে; তবে অনেক ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া যায় তাহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে, সেসব ক্ষেত্রে তথ্য সত্য বলিয়াই সফলতা পাই, সফলতা পাই বলিয়া তথ্য সত্য নহে। শিক্ষকগণ সফলতা পাইলেন, কারণ তাঁহাদের তথ্যটি যথার্থই সত্য ছিল; অর্থাৎ সরকারের যথেষ্ট উদ্বৃত্ত অর্থ ছিল। তাই তাঁহারা তাঁহাদের দাবী আদায় করিতে পারিলেন। কিন্তু সত্যই যদি সরকারের টাকা না থাকিত, তাহা হইলে কি তাঁহারা সফল হইতে পারিতেন? যদিবা সফল হইতেন, তবে বাংলা সরকার সত্যই দেউলিয়া হইয়া যাইত। সেইরূপ পাত্রস্থিত দ্রব্য চিনি বলিয়াই আমার চা মিষ্ট হইয়া গেল; যদি সত্যই উহা চিনি না হইত, তাহা হইলে কি চা মিষ্ট হইতে পারিত? আমাদের বক্তব্য এই যে, তথ্য সত্য বলিয়াই উহা সুফলপ্রসূ, সুফলপ্রসূ বলিয়া উহা সত্য নহে। কিন্তু প্রয়োগবাদিগণ ঠিক ইহার বিপরীত কথা বলেন; তাঁহারা বলেন যে, যেহেতু ইহা সুফলপ্রসূ, সেইহেতু ইহা সত্য। তাঁহাদের মতানুসারে, কোন তথ্যেরই নিজস্ব দোষগুণ

নাই ; অর্থাৎ ইহা সত্যও নহে, মিথ্যাও নহে ; ইহা শুধু তথ্য মাত্র। তবুও ইহাকে যে আমরা সত্য বা মিথ্যা বলিয়া বর্ণনা করি, তাহা অন্য কারণে ; ইহার ফল যদি ভাল দেখি, তবে ইহাকে সত্য বলিয়া বিবেচনা করি ; নতুবা করি না। এক কথায়, ইহার নিজস্ব কোন দোষগুণ নাই ; ইহার ফলাফল দেখিয়া আমরা ইহাতে দোষগুণ আরোপ করিয়া থাকি। প্রয়োগ-বাদিগণের এই মত আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। আমাদের মতানুসারে প্রত্যেক তথ্যেরই নিজস্ব দোষ বা গুণ আছে ; যেমন ধর, মিথ্যা ভাষণ বা সত্য কথন ; ইহাদের কোনটিও নির্গুণ ব্যাপার নহে। মিথ্যা কথা সর্বদাই মিথ্যা ; ইহার ফলাফল যাহাই হউক না কেন, ইহা কোনকালেই সত্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। আর সত্যভাষণ, সর্বদাই সত্য ; ইহার ফলাফল যাহাই হউক না কেন, ইহা কোনকালেই মিথ্যা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। মোট কথা, তথ্যের ফলাফল দেখিয়া আমরা উহার সত্য মিথ্যা বিচার করি না ; উহার যে নিজস্ব বিশিষ্ট গুণ আছে, তাহা লক্ষ্য করিয়াই আমরা উহাকে সত্য বা মিথ্যা বলিয়া বিচার করি।

III. Self-Evidence Theory

এই মতানুসারে যাহা সত্য তাহা এতই 'স্পষ্ট' এবং প্রখর যে তাহা প্রমাণ করিবার প্রয়োজন হয় না। আমরা দেখিয়াই উহা সত্য বলিয়া বুঝিতে পারি, উহা কোনই প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। পশ্চিমদিকে তাকাইলেই তুমি বুঝিতে পারিবে যে, সূর্য অস্ত যাইতেছে ; ইহা স্বতঃস্ফূর্ত সত্য, কেহই ইহার সত্যতায় সন্দেহ করিতে পারে না। সূর্যাস্তের মধ্যেই সূর্যাস্তের প্রমাণ নিহিত আছে ; কোন নৈয়ায়িক পণ্ডিতকে সূক্ষ্ম তর্কের দ্বারা ইহার সত্যতা প্রমাণ করিতে হয় না। সেইরূপ দুই আর দুই যোগ করিলে চার হয় ; ইহাও স্বয়ংসিদ্ধ সত্য ; আমরা কেহই ইহার সত্যতায় সন্দেহ করি না ; ইহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে সত্য।

সমালোচনা

এই মতবাদও গ্রহণ করা যায় না। সূর্য উঠিতেছে, ইহা তোমার নিকট সত্য। কিন্তু একজন অন্ধ ব্যক্তিও কি ইহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিবে? অন্ধের কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম ; যে লোক জানালা দরজা বন্ধ করিয়া অন্ধকার কক্ষে শুইয়া আছে, সেও কি তোমার কথা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিবে? মোট কথা, তোমার বা আমার নিকটে যাহা

স্বতঃস্ফূর্ত সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহা যে সকলের নিকটেই সেইরূপ সত্য বলিয়া প্রতীত হইবে—ইহা জোর করিয়া বলা যায় না। তারপরে দুই আর দুই এর যোগফলের কথা লওয়া যাউক। ইহাকে কি সত্যই প্রমাণ-নিরপেক্ষ সত্য বলিয়া বর্ণনা করা যায়? মোটেই না। আজ তোমার নিকট এই যোগফল খুবই স্পষ্ট এবং প্রখর বলিয়া প্রতীত হইতেছে বটে, কিন্তু বলা বাহুল্য ইহা চিরকালই তোমার নিকট এত সহজ এবং স্পষ্ট ছিল না; ইহার জন্য অতীতে বহু শিক্ষা এবং প্রমাণের সাহায্য লইতে হইয়াছে, তবেই আজ তুমি ইহাকে নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিতেছ। যে এখনও কোনরূপ শিক্ষা পায় নাই, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, সে কি বলে? সেও কি ইহাকে স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে?

আর এক কথা, সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে, কি পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে? দুইশত বৎসর আগে সকলেই মনে করিত যে পৃথিবী স্থির হইয়া দাড়াইয়া আছে, আর সূর্যই তাহার চারিদিকে ঘুরিতেছে। ইহা এত স্পষ্ট এবং প্রখর বলিয়া প্রতীত হয় যে ইহার সত্যতা সম্বন্ধে কাহারো মনে কখন কোন সন্দেহের উদয় হয় নাই। শুধু স্পষ্টতা ও প্রখরতার উপর নির্ভর করিলে আজও বলিতে হয় যে সূর্যই পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে। কিন্তু এত স্পষ্টতা ও নিঃসন্দিগ্ধতা সত্ত্বেও কেহই আজ একথা বিশ্বাস করে না।

IV. Coherence Theory

এখন আমরা আমাদের মতবাদ ব্যাখ্যা করিব। ইহাকে ইংরাজীতে Coherence Theory বলে, বাংলায় সঙ্গতিবাদ বলা যাইতে পারে। একটি উদাহরণ দিয়া আরম্ভ করা যাউক। ইউরেনাস একটি গ্রহ; শনি, মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহের ন্যায় ইহাও সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া ঘুরিতেছে। নির্দিষ্ট সময়ে আকাশের কোণে ইহাকে দেখা যায়। কিন্তু একবার এক অদ্ভুত ব্যাপাব ঘটিল; নির্দিষ্ট সময়ে না দেখা দিয়া ইহা অনেক দেরিতে দেখা দিল। ইহার কারণ কি? ধর, একজন বলিলেন যে, অসীম ব্রহ্মাণ্ডে ঘুরিতে ঘুরিতে ইহা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল; সেইজন্য পূর্ব গতিতে না চলিয়া একটু মন্থর গতিতে চলিতেছিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিলেন যে, ঘুরিতে ঘুরিতে ইহা কিঞ্চিৎ পথভ্রষ্ট হইয়া অন্যদিকে চলিয়া গিয়াছিল। আর তৃতীয় ব্যক্তি বলিলেন যে, ঘুরিতে ঘুরিতে ইহা নিশ্চয়ই কোন এক গ্রহের নিকট আসিয়া পড়িয়াছিল (বা কোন এক গ্রহ তাহার নিকট আসিয়া

পড়িয়াছিল); ঐ গ্রহের প্রচণ্ড আকর্ষণে ইহার গতি মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছিল; সেইজন্য ঠিক সময়ে ইহা আকাশের কোণে দেখা দিতে পারে নাই, একটু দেরি হইয়া গিয়াছিল।

এখানে তিনজন তিন প্রকার ব্যাখ্যা দিতেছেন। এখন আমাদের প্রশ্ন এই; এই তিন ব্যাখ্যার মধ্যে কোনটিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে? একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে প্রথম ব্যাখ্যাটি সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কারণ, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ নক্ষত্র—সবই জড়পদার্থ, জড় পদার্থের পক্ষে ক্লান্তি বোধ করা সম্ভব নহে। জড় পদার্থ সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা আছে, তাহার সহিত শ্রান্তি বা ক্লান্তির ধারণা মোটেই খাপ খায় না, ইহা আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার বিরোধী। সেইজন্য এই ব্যাখ্যাটি আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। আর, গ্রহের পক্ষে পথভ্রষ্ট হওয়া—ইহাও বিশ্বাস করা যায় না, কারণ ইউরেনাসই একমাত্র গ্রহ নহে; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আরও অনেক গ্রহ উপগ্রহ আছে; অসীম জগতে তাহারা অনন্তকাল ধরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেখিতেছি তাহারা আশ্চর্য নিয়মানুবর্তিতার সহিত কাজ করিয়া আসিতেছে; ইহাদের কার্যাবলী দেখিয়া আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ি। এমতাবস্থায় কি করিয়া বিশ্বাস করা করা যায় যে ইউরেনাসের ক্ষেত্রেই হঠাৎ এক ব্যতিক্রমের উদ্ভব হইয়াছিল, এবং তাই বেচারা পথভ্রষ্ট হইয়া অন্যদিকে চলিয়া গিয়াছিল? ইহা কি সম্ভব? ইহা বিশ্বাস করিতে হইলে জ্যোতিঃ-শাস্ত্রকেই অবিশ্বাস করিতে হয়। বহু নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণ সহকারে যে বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে—আজ তাহাকে এত সহজে অগ্রাহ্য করা যায় না। দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি উহা অগ্রাহ্য করিবারই চেষ্টা করিয়াছে। প্রথম ব্যাখ্যাটি যেমন আমাদের এক প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে, দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি তেমন এক প্রতিষ্ঠিত তথ্যের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে। মনে রাখিতে হইবে কোন প্রচলিত ধারণা বা প্রতিষ্ঠিত তথ্যকে অপ্রতিষ্ঠ করা খুব সহজ ব্যাপার নহে। সেইজন্য এই দুই ব্যাখ্যার কোনটিকেও আমরা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। কিন্তু তৃতীয় ব্যাখ্যা সম্বন্ধে একথা মোটেই প্রযোজ্য নহে। ইহা কাহারও বিরুদ্ধাচরণ করে না; বরং সকলের সহিতই সঙ্গতি ও সংহতি বজায় রাখিয়া কাজ করে। পূর্বেই বলিয়াছি এই মতানুসারে নিকটস্থ কোন এক গ্রহ ইউরেনাসকে আকর্ষণ করিয়াছে; সেইজন্য ইহার আসিতে দেরী হইয়াছে। ইহা তো খুবই যুক্তিসঙ্গত কথা; কারণ মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব, বিজ্ঞানের এক সর্ববাদিসম্মত তত্ত্ব। এই তত্ত্বের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়াই

এই ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে; অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সহিত ইহার কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ নাই। অধিকন্তু জড়বস্তুর মধ্যে ক্লান্তি আরোপ করিয়া বা গ্রহের পক্ষে নিয়মভঙ্গের অবকাশ দিয়া প্রচলিত কোন তথ্যেরই আমরা বিরোধিতা করিতেছি না; বরং সকল তথ্যের সহিত সঙ্গতি বা সংহতি (Coherence) বজায় রাখিয়া প্রাকৃতিক ঘটনার এক অভিনব ব্যাখ্যা দিতেছি। সেইজন্য এই ব্যাখ্যাটিই আমরা সত্য বলিয়া গ্রহণ করি। অন্য ব্যাখ্যা গ্রহণ করি না।

সঙ্গতি বা সংহতি

ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, কোন একটি তথ্য সত্য কিনা নির্ধারণ করিতে হইলে, উহার সহিত অন্যান্য তথ্যের সম্বন্ধ কি তাহাই প্রথমে বিচার করিতে হইবে। মোট কথা, কোন তথ্যই একক ভাবে বিরাজ করিতে পারে না; অন্যান্য তথ্যের সহিত সম্বন্ধ হইয়া ইহাকে বিরাজ করিতে হয়। এই সম্বন্ধ লক্ষ্য করিয়াই আমরা ইহার সত্য মিথ্যা বিচার নির্ধারণ করিয়া থাকি। যেক্ষেত্রে দেখি, ইহা অন্যান্য ধারণার সহিত মিলিয়া মিশিয়া, অর্থাৎ উহাদের সহিত যথাযথ সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া বিরাজ করিতেছে, সেক্ষেত্রে ইহাকে আমরা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। কিন্তু যেক্ষেত্রে দেখি, ইহা সঙ্গতিস্থাপন না করিয়া বরং অসঙ্গতির উদ্রেক করিতেছে. পূর্ব প্রতিষ্ঠিত তথ্যের সমর্থন না করিয়া বরং উহার বিরোধিতাই করিতেছে, সেক্ষেত্রে উহাকে আমরা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। একটি উদাহরণ দেওয়া যাউক। আমাদের বাড়ি হইতে কিছু সোনা হারাইয়া গেলে তুমি যদি বল ইঁদুরে উহা খাইয়া ফেলিয়াছে, তাহা হইলে তোমার কথা কেহ বিশ্বাস করিবে না। কিন্তু কেন করিবে না? কারণ ইঁদুরের স্বভাব ও শক্তি সম্বন্ধে আমাদের যে পূর্বলব্ধ জ্ঞান আছে, তাহার সহিত ইহা মোটেই খাপ খায় না। আমরা জানি ইঁদুর ধান চাল খায়, কিন্তু সোনা রূপা খাইতে পারে না। সেইজন্য তোমার কথা মানিয়া লওয়া যায় না। কিন্তু কেহ যদি বলে যে ইঁদুরে সোনা খায় নাই, চোরে চুরি করিয়াছে, তাহা হইলে আমরা অনায়াসেই তাহার কথা মানিয়া লইতে পারি; কারণ আমাদের পূর্বলব্ধ তথ্যের সহিত প্রস্তাবিত তথ্যের কোনরূপ বিরোধিতা নাই, বরং যথেষ্ট সঙ্গতি আছে। ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, যে কোন তথ্যকেই আমরা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি; উহা যদি

অন্যান্য তথ্যের সহিত সংহতি স্থাপন করিয়া উহাদের মণ্ডলীভুক্ত হইয়া বিরাজ করিতে পারে, তবেই উহাকে আমরা সত্য বলিয়া গ্রহণ করি, নতুবা নহে। অর্থাৎ সংহতি স্থাপনের মধ্যেই সত্যের সম্ভাবনা আছে, বিচ্ছিন্নতার মধ্যে নহে। যাহা সংঘবদ্ধ হইয়া বিরাজ করিতে পারে, তাহা সত্য বলিয়া গৃহীত হয়; আর যাহা সংঘবদ্ধ হইতে পারে না তাহা মিথ্যা বলিয়া পরিত্যক্ত হয়।

সমালোচনা

উপরি উক্ত মতবাদের সমালোচনায় বলা যাইতে পারে যে, সঙ্গতি থাকিলেই যদি সত্য হয় তাহা হইলে কথামালা বা পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলিকেও সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। কারণ, পশুপক্ষী সম্বন্ধীয় এই সব গল্পগুলি পরস্পরের সহিত আগাগোড়া সঙ্গতি রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। তাহা হইলে আরব্যোপন্যাসের উদ্ভট গল্পগুলিও সত্য; কারণ গল্প হিসাবে ইহাদের মধ্যে যথেষ্ট সঙ্গতি বিদ্যমান আছে। এমন কি, আমাদের স্বপ্নের মধ্যেও যথেষ্ট সঙ্গতি দেখা যায়, অতএব স্বপ্নগুলিকেও সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে হয়। আমাদের উত্তর এই যে, গল্পগুলি গল্প হিসাবে সত্য বৈ কি, স্বপ্নগুলিও স্বপ্ন হিসাবে সত্য। যদি আমরা সব সময়েই নিদ্রিত রহিয়া স্বপ্ন দেখিতাম, তাহা হইলে স্বপ্নের সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের মনে কখনই কোন সন্দেহের উদ্রেক হইত না। স্বপ্নের সত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে তখন, যখন আমরা জাগ্রত অবস্থার সহিত ইহার তুলনা করিতে যাই, তখন দেখি, জাগ্রত অবস্থার ঘটনার সহিত ইহা মোটেই সঙ্গতি রক্ষা করিয়া চলিতে পারে না। জাগ্রত অবস্থার ধারণাগুলি সংঘবদ্ধ হইয়া যে এক ব্যাপকতর মণ্ডলীর সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার সহিত স্বপ্নাবস্থার ধারণাটি মোটেই সংহতি স্থাপন করিতে পারে না, তাই ইহাকে আমরা মিথ্যা বলিয়া পরিত্যাগ করি। গল্পের সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা প্রযোজ্য। যদি আমরা সব সময়েই গল্প পাঠে মগ্ন থাকিতে পারিতাম, তাহা হইলে গল্পকে আমরা কখনই "নিছক গল্প" বলিয়া মনে করিতাম না; ইহাকেই একমাত্র সত্য বলিয়া বিবেচনা করিতাম। কিন্তু মুশকিল এই যে, আমাদিগকে কল্পনা জগৎ ছাড়িয়া আবার বাস্তব জগতেও আসিতে হয়, তখনই দেখি, বাস্তব জগতের ঘটনার সহিত কল্পনা-জগতের কোনই মিল নাই। বলা বাহুল্য, বাস্তব জগতের অভিজ্ঞতাই আমাদের বৃহত্তর এবং ব্যাপকতর অভিজ্ঞতা; অতএব এই অভিজ্ঞতার

সহিত যে ঘটনা সঙ্গতি স্থাপন করিতে পারে না, তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

আর এক কথা। একদিন সকলেই বিশ্বাস করিত যে পৃথিবী স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, আর সূর্য তাহার চারিদিকে ঘুরিতেছে। এখন অবশ্য আমরা কেহই ইহা বিশ্বাস করি না। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি —এই মিথ্যাকে তখন সকলেই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিত কেন? আমাদের উত্তর সহজ। তখন অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে মানুষের যেরূপ ধারণা ছিল এবং তাহাদের জ্ঞানের পরিধি যেরূপ সীমায়িত ছিল, ঠিক তদনুসারেই তখন তাহারা সূর্যের কথা চিন্তা করিত; অন্যভাবে চিন্তা করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তখনকার সঞ্চিত জ্ঞান ভাণ্ডারের সহিত তাহাদের ধারণার সঙ্গতি ছিল বলিয়াই তাহারা বিশ্বাস করিত যে সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে, পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে না। আজ তাহাদের এই ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত হইতেছে বটে, কিন্তু তখন ইহা সকলের নিকটেই সত্য বলিয়া প্রতীত হইত। তাহা হইলে এখানে আর এক সমস্যা আসিয়া জোটে। আজ আমরা যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেছি, ভবিষ্যৎ বংশীয়দের নিকট তাহা বিশ্বাসযোগ্য নাও হইতে পারে; তাহারা হয়ত অন্য রকম চিন্তা করিবে। আমরা ইহা স্বীকার করি। কারণ, আমাদের বর্তমান জ্ঞান-ভাণ্ডারের সহিত সামঞ্জস্য আছে বলিয়াই ইহা আমাদের নিকট আজ সত্য প্রতীত হইতেছে। কিন্তু ভবিষ্যতে আমাদের জ্ঞান-ভাণ্ডার যখন পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়া যাইবে, তখন উহার সহিত বর্তমান ধারণার হয়ত কোনই সামঞ্জস্য থাকিবে না। তখন আমাদিগকে এই ধারণা ত্যাগ করিয়া এমন এক ধারণা গ্রহণ করিতে হইবে যাহার সহিত তদানীন্তন জ্ঞান-ভাণ্ডারের সামঞ্জস্য থাকিতে পারে। ইহাই তো স্বাভাবিক। কারণ, আমাদের মতানুসারে পৃথিবীর কোন জিনিষই চিরস্থির (stagnant) নহে। আমাদের জ্ঞান-ভাণ্ডারও চিরস্থির নহে; অভিজ্ঞতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান-ভাণ্ডারের যেমন পরিবৃদ্ধি হইতেছে, সত্যের স্বরূপও তেমন পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়া যাইতেছে। তাই বর্তমান সীমায়িত জ্ঞান-ভাণ্ডারের মধ্যে যাহা সত্য বলিয়া প্রতীত হইতেছে, ভবিষ্যৎ ব্যাপকতর জ্ঞান-ভাণ্ডারের মধ্যে উহা যে রূপান্তর গ্রহণ করিবে না—তাহা আজ কেহই জোর করিয়া বলিতে পারে না।

ষষ্ঠ খণ্ড

জ্ঞান-তত্ত্ব

(Epistemology)

অষ্টাদশ অধ্যায়

জ্ঞানের উৎপত্তি (Origin of Knowledge)
Empiricism and Rationalism

আমরা অনেক কথাই আলোচনা করিলাম, জীবাত্মা ও পরমাত্মার কথা, প্রাণ এবং প্রাণীর কথা, জড়পদার্থ ও আদর্শতত্ত্ব—ইত্যাদি অনেক কথাই আলোচিত হইল; কিন্তু এখনও আসল বিষয়ে কিছুই বলা হয় নাই। দর্শনশাস্ত্রের আসল বিষয়—**জ্ঞান-তত্ত্ব**; আসল না হইলেও ইহাই যে দর্শনশাস্ত্রের মূল বিষয়, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। মূল বিষয়—কারণ দর্শনশাস্ত্রের সকল আলোচনার মূলেই আছে জ্ঞান-তত্ত্ব। আমরা জীবাত্মার কথা জানিতে চাই বা পরমাত্মার কথা জানিতে চাই, যাহাই জানিতে চাই না কেন, উহা জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব কি না—তাহাই প্রথমে বিচার করিতে হইবে। যে ডুবুরী সমুদ্রতলে রত্ন সন্ধান করিতে যায়, সে প্রথমেই দেখিয়া লয় যে সমুদ্রের তলদেশে যাইবার পক্ষে তাহার যথাযথ সরঞ্জাম আছে কি না; নতুবা সে বিপদে পড়িতে পারে। সেইরূপ, যাঁহারা অধ্যাত্ম আলোচনায় মগ্ন হইতে চান, তাঁহাদেরও প্রথমে দেখা দরকার যে অধ্যাত্মজ্ঞান লাভ করিবার পক্ষে তাঁহাদের যথাযথ শক্তি আছে কি না, নতুবা তাঁহাদের সিদ্ধান্ত নানা দোষে দুষ্ট হইতে পারে। এতএব প্রথমেই আমাদিগকে এই জ্ঞানশক্তির কথা আলোচনা করিতে হইবে। ইহাকে **জ্ঞান-তত্ত্ব** বলে। কিভাবে আমাদের জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, কি পদ্ধতিতে আমরা জ্ঞান আহরণ করি, আমাদের জ্ঞানের সীমারেখা কতদূর, আমাদের পক্ষে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় অতিক্রম করিয়া অতীন্দ্রিয় বিষয় উপলব্ধি করা সম্ভব কি না, ইত্যাদি জ্ঞান সম্বন্ধীয় তত্ত্ব যে শাস্ত্রে আলোচনা করা হয়—তাহারই নাম "জ্ঞানতত্ত্ব" বা Epistemology। এই জ্ঞান-তত্ত্বই এখন আমাদের আলোচ্য বিষয়। এই প্রসঙ্গে আমরা একে একে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করিব (i) জ্ঞানের উৎপত্তি (Origin of Knowledge) (ii) জ্ঞানানুশীলনের পদ্ধতি (Methods of Knowledge), (iii) জ্ঞানের

বিষয়বস্তু (Objects of Knowledge) ; এবং (iv) জ্ঞানের মূলসূত্র (Categories of Knowledge)।

এই অধ্যায়ে জ্ঞানোৎপত্তির কথা আলোচনা করা যাউক। আমাদের মনের মধ্যে কি ভাবে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, এই জ্ঞানোদয়ের মূল উৎস কি (Sources of Knowledge)—তাহাই এখন আলোচনা করা হইবে। একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে জ্ঞানোদয়ের মূল উৎস দুইটি—Experience এবং Reason। Experience অর্থাৎ অভিজ্ঞতা; আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়ের মারফতে নানাপ্রকার অভিজ্ঞতা লাভ করি। চোখ দিয়া দেখি, কান দিয়া শুনি, নাক দিয়া গন্ধ পাই—ইত্যাদি বিভিন্ন ইন্দ্রিয়েব সাহায্যে আমরা বহির্জগৎ সম্বন্ধে নানাপ্রকার অভিজ্ঞতা লাভ করি। বহির্জগৎ হইতে উদ্দীপনা আসিয়া আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপর ক্রিয়া করে; ফলে আমরা বহুবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইয়া থাকি। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে এই অভিজ্ঞতা লাভ করি বলিয়া ইহাকে সাধারণতঃ Sense Experience বলে। তবে বলা বাহুল্য, বহির্জগৎ হইতে উদ্দীপনা আসিলেই জ্ঞানের উদ্ভব হয় না; এই উদ্দীপনাগুলিকে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করা দরকার। এই ব্যাখ্যা আসে মনের সাহায্যে। যখনই বাহির হইতে উদ্দীপনা আসিয়া আমাদের মনের উপর ক্রিয়া করে, তখনই আমরা ঐ উদ্দীপনা সম্বন্ধে চিন্তা করি এবং চিন্তা করিয়া উহার অন্তর্নিহিত অর্থ উপলব্ধি করি; ফলে, আমাদের মনের মধ্যে জ্ঞানের উদয় হয়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, শুধু উদ্দীপনা আসিলেই জ্ঞান হয় না, উদ্দীপনাগুলিকে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করা চাই. এই ব্যাখ্যা করাই আমাদের বুদ্ধি (Reason) বা বিচার শক্তির প্রধান কাজ। একটি উপমা দিয়া ইহার কাজের স্বরূপ বর্ণনা করা যাউক। পুস্তকের এই পৃষ্ঠার দিকে তুমি তাকাইয়া দেখ, আর একজন নিরক্ষর ব্যক্তিও তাকাইয়া দেখুক। দুইজনেই একই রকমের সংবেদন পাইবে; কতকগুলি কাল কাল হিজিবিজি দাগ তোমাদের চোখের সম্মুখে ভাসিতে থাকিবে। তবে এই দাগগুলি কিন্তু নিরক্ষর ব্যক্তির মনে কোনই অর্থ বহন করিবে না; দাগগুলি তাহার নিকট শুধু দাগই রহিয়া যাইবে। অথচ তোমার নিকট এই দাগগুলি মোটেই নিরর্থক বলিয়া প্রতীয়মান হইবে না; তুমি ইহাদের অর্থ উপলব্ধি করিয়া বুঝিতে পারিবে যে ইহা দর্শনশাস্ত্র বিষয়ক গদ্য রচনা। উভয়ক্ষেত্রে উদ্দীপনা একই প্রকারের; কিন্তু প্রথম ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা নাই বলিয়া ইহা অর্থশূন্য, আর দ্বিতীয়ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা আছে

বলিয়া ইহা অর্থপূর্ণ। আমাদের জ্ঞানোৎপত্তি সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা প্রযোজ্য। ইন্দ্রিয়ের মারফতে জগতের সংস্পর্শে আসিয়া আমরা যে অভিজ্ঞতা লাভ করি, তাহা জ্ঞানের উপাদান মাত্র। কিন্তু শুধু উপাদান থাকিলেই জ্ঞানের উদ্ভব হয় না, উপাদানগুলিকে যখন বুদ্ধি (Reason) বা বিচার শক্তির দ্বারা যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, তখনই জ্ঞানের উৎপত্তি হয়।

Sources or Factors of knowledge

তাহা হইলে দেখা গেল যে জ্ঞানোৎপত্তির মূলে আছে Experience এবং Reason; একটি আসে মনের বাহির হইতে এবং দ্বিতীয়টি আসে মনের ভিতর হইতে, ইহাদের সমন্বয়ের ফলেই জ্ঞানের উদ্ভব হইয়া থাকে। আজ ব্যাপারটি যত সহজ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে আধুনিক যুগের প্রারম্ভেও ইহা তত সহজ বলিয়া প্রতীয়মান হয় নাই। পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস আলোচনা করিলেই তাহা বুঝা যায়। অনেকের মতানুসারে ডেকার্ট (Descartes) হইতে পাশ্চাত্য দর্শনের আধুনিক যুগ আরম্ভ হইয়াছে। অতএব জ্ঞানোৎপত্তি সম্বন্ধে ডেকার্ট এবং তাঁহার পরবর্তী মনীষীগণ কি চিন্তা করিয়াছেন, তাহা একটু আলোচনা করা দরকার। ডেকার্ট অভিজ্ঞতাকে অবহেলা করিয়া বিচার শক্তিকেই জ্ঞানোৎপত্তির মূল কারণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আবার Locke এবং Hume বিচার শক্তিকে অবহেলা করিয়া অভিজ্ঞতাকেই মূল কারণ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। এইভাবে বহু বৎসর ধরিয়া অভিজ্ঞতা ও বিচারবুদ্ধির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল, কে বড় আর কে ছোট— ইহার কোন সন্তোষজনক মীমাংসা হইতেছিল না। অবশেষে ক্যাণ্ট এবং হেগেলের দর্শনশাস্ত্রে আমরা এই সমস্যার এক সন্তোষজনক মীমাংসা পাই, তাঁহারা অভিজ্ঞতা ও বিচার বুদ্ধির এক সমন্বয় সাধন করিয়া এই সমস্যার সমাধান করিয়াছেন; সেই ইতিহাসই এখন একটু সবিস্তারে ব্যাখ্যা করা যাউক।

I. Rationalism : (বুদ্ধিবাদ)

পূর্বেই বলিয়াছি ডেকার্টের মতানুসারে বিচার-বুদ্ধিই আমাদের জ্ঞানোৎপত্তির মূল কারণ। তিনি অভিজ্ঞতার উপরে মোটেই গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। তিনি বলেন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমরা যে অভিজ্ঞতা লাভ করি তাহা নিতান্তই পরিবর্তনশীল, আমাদের তৎকালীন দৃষ্টিবিন্দুর উপরে উহা নির্ভর করে, এবং ফলে দৃষ্টিবিন্দু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উহাও যথেষ্ট পরিমাণে পরিবর্তিত হইয়া যায়। দূর হইতে যাহা সুন্দর দেখায়, নিকট হইতে তাহা সুন্দর

দেখায় না; হাতীর পাশে ষাঁড়কে খুব ক্ষুদ্র দেখায়, কিন্তু ছাগলের পাশে সেই ষাঁড়ই বৃহৎ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অর্থাৎ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের কোন স্থায়ী মূল্য নাই। আজ যাহা সত্য বলিয়া মনে হয় কালই হয়ত শোনা যাইবে যে তাহা ভুল। কিন্তু আমাদের বুদ্ধিশক্তির ক্রিয়াফলে আমরা যে জ্ঞান লাভ করি তাহার কোন পরিবর্তন নাই। শুধু তাহাই নহে; এই বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞান কেবল আমার বা তোমার নিকট সত্য নহে, ইহা সকলের নিকটেই সত্য, ইহা চিরন্তন সত্য। যেমন ধর, "দুই আর দুই যোগ করিলে চার হয়"। ইহা বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞান; বহিরাগত উদ্দীপনার উপর ভিত্তি করিয়া আমরা এই জ্ঞান লাভ করি নাই; আমাদের অন্তর্নিহিত বুদ্ধিশক্তির ক্রিয়াফলেই আমরা এই সত্য আবিষ্কার করিয়াছি। ইহার কোন পরিবর্তন নাই; এবং কেহই ইহার সত্যতা অস্বীকার করিতে পারে না। এই প্রকার বুদ্ধিলব্ধ ধারণার আরও কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাউক। যেমন ভগবৎ ধারণা। ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের কাহারও কোন সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা নাই; অথচ আমাদের প্রত্যেকের মনেই ঈশ্বর সম্বন্ধীয় এক ধারণা বিদ্যমান আছে। কোথা হইতে এই ধারণা আসিল? আমরা কেহই তো ঈশ্বর দেখি নাই; অতএব জাগতিক উদ্দীপনার ফলে আমাদের মনের মধ্যে যে এই ধারণার উদ্ভব হয় নাই—তাহা নিঃসন্দেহ। তবে এই ধারণা আসিল কোথা হইতে? ডেকার্ট বলেন, ইহা বাহির হইতে আসে নাই; ইহা আসিয়াছে আমাদের মনের ভিতর হইতে। আমাদের মন তো শূন্যগর্ভ পদার্থ নহে; ইহার মধ্যে নানা-প্রকার ধারণা বিরাজ করিতেছে; ভগবৎ-ধারণাও এইরূপ এক চিরবিরাজমান ধারণা। কোনরূপ অভিজ্ঞতার ফলে আমরা ইহা অর্জন করি নাই, অভিজ্ঞতার পূর্ব হইতেই ইহা আমাদের মনের মধ্যে বিদ্যমান আছে। অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিতে হইলে, শুধু ভগবৎ ধারণা কেন, তৎ-সম্পর্কীয় কোন প্রকার ধারণাই আমরা পাইতে পারিতাম না। যেমন ধর, আমরা মনে করি ঈশ্বর অসীম ও অনন্ত, তিনি পূর্ণ বা Perfect। আমরা জিজ্ঞাসা করি, কেহ কি কোথাও পূর্ণতা (perfection) প্রত্যক্ষ করিয়াছে? কেহ কি কোথাও Infinite বা Eternity অর্থাৎ অনন্তের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে? মোটেই না, অর্থাৎ অভিজ্ঞতার ফলে আমরা এইসব ধারণা লাভ করি নাই; অভিজ্ঞতার পূর্ব হইতেই ইহা আমাদের মনে বিদ্যমান আছে। এইরকম ধারণাকে ডেকার্ট সহজাত ধারণা (Innate Idea) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সহজাত ধারণা, কারণ এইসব ধারণা আমরা জন্ম

হইতে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি। জন্ম হইতে আমরা যেমন মন লইয়া আসিয়াছি, তেমন মনের সঙ্গে সঙ্গে উহার অন্তর্ভুক্ত ধারণাগুলিও লইয়া আসিয়াছি।

সমালোচনা

ডেকার্টের এই মতবাদ সমর্থন করা যাইতে পারে না। তিনি যে সহজাত ধারণার কথা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সত্যই সহজাত কি না—সে বিষয়ে কোন সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে Locke বলেন যে, যদি কোন ধারণা সত্যই সহজাত হয় তবে উহা সকলের মনেই সমানভাবে বিদ্যমান থাকিবে, কিন্তু যে সব ধারণার কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কি সকলের মনেই সমানভাবে বিদ্যমান আছে? যেমন ধর, ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ধারণা—সকলেই কি এই ধারণা সমানভাবে পোষণ করে? কচি কচি শিশুদের মনে ভগবৎ সম্বন্ধীয় কোন ধারণা আছে কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে, আর থাকিলেও তাহা যে নিতান্ত তুচ্ছ ও নগণ্য ধরণের, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি অজ্ঞ, মূর্খ বা পাগল—সে-ও কি ঈশ্বর সম্বন্ধে চিন্তা করিতে পারে? অসীম বা অনন্তের ধারণা, Perfection বা পূর্ণতার ধারণা—ইহা পণ্ডিতেরাই ভালভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন না, তবে শিশু, মূর্খ ও পাগলেরা কি করিয়া উপলব্ধি করিবে—তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। গণিতশাস্ত্রীয় ধারণা সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা প্রযোজ্য। 'দুই এবং দুই যোগ করিলে চার হয়'—ইহা সকলেই স্বীকার করে। কিন্তু শিশুদের মনের মধ্যেও যদি ইহা ready made ধারণারূপে বিরাজ করিত, তাহা হইলে তাহাদিগকে অংক শিখাইতে মোটেই বেগ পাইতে হইত না; জন্ম হইতেই তাহারা অংকে পণ্ডিত হইতে পারিত। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে কি দেখি? দেখি যোগ করা তো দূরের কথা, অনেক বয়স্ক লোকও একশত পর্যন্ত গুণিতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, ডেকার্ট যে সব ধারণাকে সহজাত ধারণা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদিগকে আমরা অনায়াসে অভিজ্ঞতালব্ধ ধারণা রূপে ব্যাখ্যা করিতে পারি। ধর্মসম্বন্ধীয় ধারণা বা নীতিসম্বন্ধীয় ধারণাকে ডেকার্ট সহজাত ধারণা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন; কিন্তু উহাকে যদি আমরা অভিজ্ঞতা লব্ধ ধারণা বলিয়া ব্যাখ্যা করি—তাহা হইলে ক্ষতি কি হয়? বরং এই ব্যাখ্যাই সহজ এবং স্বাভাবিক বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। সত্যই তো, জীবনে বহু অভিজ্ঞতার ফলে আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতে শিখিয়াছি। অবশ্য, এবিষয়ে শিশুদের কোন সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা নাই, তাহা স্বীকার করি; কিন্তু শিশুকাল হইতেই যদি তাহাদিগকে ইহা শিক্ষা

দেওয়া হয়, তবে কি তাহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস না করিয়া পারে? এইভাবে শিশুকাল হইতে তাহারা বিনা দ্বিধায় আমাদের নিকট হইতে ভগবৎ ধারণা গ্রহণ করিয়াছে। বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সমাজে বাস করি বলিয়া আমাদের অভিজ্ঞতাও বিভিন্ন হইয়া থাকে; এবং অভিজ্ঞতা বিভিন্ন বলিয়া আমাদের ভগবৎ ধারণ ও নৈতিক ধারণাও বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করিয়াছে। তাই দেখি, প্রতিমা পূজা মুসলমান সমাজে পাপ বলিয়া গণ্য হয়, অথচ হিন্দু সমাজে ইহা মোটেই অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হয় না; সেইরূপ, বহুবিবাহ খৃষ্টান সমাজে পাপ, কিন্তু মুসলমান সমাজে ইহা মোটেই অন্যায় নহে। মোট কথা, আমাদের নৈতিক ধারণা যদি সহজাত ধারণা হইত, তাহা হইলে ইহা সর্বত্রই একই রকমের হইত; কিন্তু তাহা তো নহে; বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন রকমের নৈতিক আদর্শ দেখা যায়। তাই আমরা বলিয়াছি যে অভিজ্ঞতার দ্বারাই ইহা স্বষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, সহজাত ধারণার প্রয়োজন হয় না। গণিতশাস্ত্রের উদাহরণটি লওয়া যাউক। শিশুকে প্রথমে বহু পরিশ্রম সহকারে দশ কি কুড়ি পর্যন্ত গুণিতে শিখান হয়; তারপরে কত মার্বেল, কত ফল ফুল দেখাইয়া তাহাকে যোগ শিখান হয়। এইভাবে ধীরে ধীরে সে বুঝিতে পারে যে দুই আর দুই যোগ করিলে চার হয়। শিক্ষা কিছুদূর অগ্রসর হইলে তখন আর তাহাকে কোন মার্বেল বা কোন মূর্তির কথা চিন্তা করিতে হয় না; সমস্ত মূর্তি হইতে চিন্তাধারাকে পৃথক করিয়া লইয়া সে তখন অমূর্তভাবে যোগ বিয়োগের কথা ভাবিতে পারে। কিন্তু প্রথম প্রথম তাহাকে যে বহু পরিশ্রম সহকারে ইহা শিক্ষা করিতে হইয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। সেইজন্য Locke বলেন যে, এই গণিত তথ্যও অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ তথ্য নহে। সত্যই তো, বহু অভিজ্ঞতার পরিণামে যাহা আয়ত্ত করা হইয়াছে, তাহাকে সহজাত ধারণা বলিয়া ব্যাখ্যা করা সঙ্গত হয় কি?

II. Empiricism : (অভিজ্ঞতাবাদ)

এইভাবে Locke এবং Hume সহজাত ধারণার অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেন। এক কথায়, তাহারা ডেকার্টের মতবাদ গ্রহণ করেন না, বরং ঠিক তাহার বিপরীত মতবাদ প্রচার করেন। ডেকার্ট অভিজ্ঞতাকে অবহেলা করিয়া বুদ্ধিকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করেন, আর Locke এবং Hume বুদ্ধিকে অবহেলা করিয়া অভিজ্ঞতাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করেন। ডেকার্ট বলেন, আমরা একেবারে শূন্যগর্ভ মন লইয়া পৃথিবীতে আসি নাই; মনের সহিত বহু সহজাত ধারণাও সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি। আর Locke এবং Hume বলেন যে আমরা একেবারে শূন্যগর্ভ মন লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি। জন্মের সময় আমাদের মন ছিল

একটি অলিখিত সাদা কাগজের মতন (Tabula rasa); যেন একটি পরিষ্কার শ্লেট, তাহাতে কোথাও কোন দাগ বা আঁচড় নাই। তারপরে যতই আমরা জীবন পথে অগ্রসর হইতে থাকি, যতই আমাদের অভিজ্ঞতা বাড়িতে থাকে, ততই আমাদের এই শূন্য কাগজ নানা কথায় পূর্ণ হইতে থাকে; ক্রমবর্ধমান অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে ডায়েরির খালি পাতাও ভর্তি হইয়া ওঠে। আমাদের অভিজ্ঞতা শুধু জাগতিক বিষয়ে নিবদ্ধ নহে; মানসিক বিষয়ও ইহার মধ্যে যথেষ্ট আছে। আমরা গাছ পাতা ফল ফুল কত কি দেখি; ইহারা সবই জাগতিক বস্তু; ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা ইহা প্রত্যক্ষ করি। এইভাবে চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা যে জ্ঞান আহরণ করি, তাহাকে External Experience বলা হয়। আর সুখ দুঃখ, গর্ব অনুতাপ প্রভৃতি যে সব মানসিক ব্যাপার আমরা সকলেই মনে মনে অনুভব করিয়া থাকি—তাহাকে Internal Experience নামে অভিহিত করা হয়। দার্জিলিং গিয়া আমি যখন কাঞ্চনজংঘা প্রত্যক্ষ করি, তখন পাই জাগতিক অভিজ্ঞতা; আর কাঞ্চনজংঘার সৌন্দর্য চিন্তা করিয়া আমি যখন আনন্দ বোধ করি—তখন পাই মানসিক অভিজ্ঞতা। এইভাবে নানাবিধ অভিজ্ঞতা আসিয়া আমাদের জীবন কানায় কানায় পূর্ণ করিয়া দিতেছে। তাই Locke এবং Hume বলেন যে অভিজ্ঞতাই আমাদের জীবনের সবস্ব, বুদ্ধি বা বিচার শক্তির বিশেষ কোন কার্যকারিতা নাই। এক কথায়, অন্তর হইতে এবং বাহির হইতে যাহা আমরা পাই তাহার দ্বারাই আমাদের মনের ভাণ্ডার পূর্ণ হইতেছে, ইহাতে Reason বা বিচার বুদ্ধির কোন অবদান নাই।* ডেকার্ট যে সহজাত ধারণার কথা বলিয়াছেন—এবং যাহাকে তিনি বিচার-বুদ্ধির অবদান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—তাহার কোনই অস্তিত্ব Locke এবং Hume স্বীকার করেন না।

সমালোচনা

ডেকার্টের বুদ্ধিবাদ যেমন গ্রহণ করা যায় না, লক এবং হিউমের অভিজ্ঞতাবাদও তেমন গ্রহণ করা যায় না। (i) প্রথমতঃ, অভিজ্ঞতাবাদ স্বীকার করিলে জ্ঞানের সম্ভাব্যতা অস্বীকার করিতে হয়। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে অভিজ্ঞতা হইতে আমরা যাহা পাই তাহা জ্ঞান নহে, জ্ঞানের উপাদান মাত্র। মনে রাখিতে হইবে যে শুধু উপাদান থাকিলেই জ্ঞান হয় না; জ্ঞান লাভের জন্য ইহার অন্তর্নিহিত অর্থ উদ্ঘাটন করা চাই। এই অর্থ উদ্ঘাটন করিবার চাবিকাঠি আছে বুদ্ধির মধ্যে;

* Lock বলেন "There is nothing in the intellect (i.e. in our mind) which was not previously present in the sense" (external and internal).

তাই আমরা বলিয়াছি যে বুদ্ধির সহায়তায় ইহার যথার্থ অর্থ উপলব্ধি না করিতে পারিলে জ্ঞানোৎপত্তি হয় না। একটি উদাহরণ দিয়া বুঝান যাউক। আমি দেখিলাম একটি লোক গাছের উপর পাখী লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুঁড়িল; পরমুহূর্তেই দেখিলাম একটি পাখী গুলিবিদ্ধ হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। এক্ষেত্রে বাহির হইতে দুইটি উদ্দীপনা আসিতেছে; প্রথমে আসিতেছে গুলির শব্দ পরে আসিতেছে পাখীর মৃত্যু। শুধু যদি অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিতে হয়, তাহা হইলে আমরা বলিব যে আগে আসিয়াছে গুলির শব্দ, পরে আসিয়াছে পাখীর মৃত্যু; এই পারম্পর্যটুকু ব্যতীত ঘটনাদ্বয়ের মধ্যে আর কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে, ঘটনাদ্বয়ের মধ্যে এক গভীর সম্বন্ধ নিহিত আছে, উহাকে কার্য-কারণ সম্বন্ধ বলে। যেমন, আমরা বলি, গুলি—কারণ, আর মৃত্যু—কার্য; বন্দুকের গুলি যাইয়া পাখীর মৃত্যু সাধন করিয়াছে। এই যে কার্য-কারণ সম্বন্ধ—এ জ্ঞান আমরা কোথা হইতে পাইলাম? ঘটনাদ্বয়ের মধ্যে ইহার তো কোন ধরা ছোঁয়া পাই না, ঘটনা শুধু ঘটনা—একটির পর একটি ঘটিয়া চলিয়াছে; কিন্তু উহারা যে কার্যকারণ সূত্রে গ্রথিত—সে খবর আমরা পাইলাম কেমন করিয়া? বলা বাহুল্য, সে খবর আমরা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পাই নাই, সে খবর আমরা পাইয়াছি বুদ্ধির নিকট হইতে। বুদ্ধির মধ্যে, 'কার্য' 'কারণ', 'স্থান' 'কাল' প্রভৃতি অনেকগুলি সূত্র নিহিত আছে; এই সূত্রগুলি, যথাযথভাবে প্রয়োগ করিয়া আমরা ঘটনা সমূহের অন্তর্নিহিত অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া থাকি। যেমন, এখানে কার্য-কারণ সূত্র প্রয়োগ করিয়া আমরা বলিতেছি যে গুলির জন্যই পাখীর মৃত্যু হইয়াছে, গুলিই মৃত্যুর কারণ। এইভাবে বুদ্ধির সাহায্যে ঘটনাদ্বয়কে কার্য-কারণ-সূত্রে গ্রথিত করিতে পারিতেছি বলিয়া আমরা জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হইতেছি; নতুবা শুধু অভিজ্ঞতার উপরে নির্ভর করিয়া থাকিলে, আমরা এইসব বিচ্ছিন্ন ঘটনাসমূহের কোন যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা দিতে পারিতাম না; উহারা যেমন বিচ্ছিন্নভাবে আসিয়াছিল, তেমন বিচ্ছিন্নভাবেই আমাদের মনের মধ্যে রহিয়া যাইত; সুসম্বদ্ধ ও সুবিন্যস্ত হইয়া উহারা কখন জ্ঞান সৌধে পরিণত হইতে পারিত না।

(ii) দ্বিতীয়তঃ, অভিজ্ঞতাবাদ স্বীকার করিলে বিজ্ঞানের সম্ভাব্যতা অস্বীকার করিতে হয়। বিজ্ঞান যে সত্য আবিষ্কার করে, তাহা সর্বজন-সম্মত সত্য। যেমন 'সকল আপেলই মাটিতে পড়ে'; ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য; কেবল আমি বা তুমি ইহার সত্যতা স্বীকার করি, তাহা নহে; যেখানে যত মানুষ আছে—সকলেই ইহার সত্যতা স্বীকার করে। বলা বাহুল্য, শুধু অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিতে হইলে আমাদের পক্ষে এই প্রকার সর্বসম্মত তথ্য আবিষ্কার করা সম্ভব হইত না।

কারণ, যাহা আমার নিকট বা তোমার নিকট সত্য, তাহা সকলের পক্ষেই যে সত্য হইবে—ইহার প্রমাণ কি? শুধু অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে কোনদিনই ইহার সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া যাইবে না; ইহার সন্তোষজনক উত্তর পাইতে হইলে আমাদিগকে বুদ্ধির সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। আমরা বলিয়াছি যে আমাদের বুদ্ধির মধ্যে কতকগুলি জ্ঞানসূত্র বিদ্যমান আছে। এই সূত্রগুলি অভিজ্ঞতা-প্রসূত সূত্র নহে; অভিজ্ঞতার পূর্ব হইতেই ইহা আমাদের মনের মধ্যে নিহিত আছে। উপরে আমরা গুলি ও পাখীর উদাহরণে যে কার্য-কারণের কথা বলিয়াছি—উহাও এইরূপ এক সূত্র। ঘটনা প্রবাহ দেখার পরে বা ঘটনা প্রবাহ দেখার ফলে আমরা এই সূত্রের কথা অবগত হই নাই; ঘটনা প্রবাহ দেখার আগে হইতেই আমরা এই সূত্রের কথা অবগত ছিলাম। বস্তুতঃ এই সূত্র অনুসরণ করিয়াই আমরা ঘটনা প্রবাহ প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাই ঘটনা প্রবাহকে বিচ্ছিন্ন বা বিক্ষিপ্ত না মনে করিয়া কার্যকারণ সম্বন্ধে আবদ্ধ বলিয়া মনে করিয়াছি। এইভাবে যে জ্ঞান লাভ করা হয়, তাহাকে বৈজ্ঞানিক তথ্য বলে। বৈজ্ঞানিক তথ্য সর্বসম্মত তথ্য, কারণ যে সূত্র অনুসরণ করিয়া আমরা বন্দুকের গুলিকে পাখীর মৃত্যুর কারণ বলিয়া নির্দেশ করিতেছি—সে সূত্র আমার সূত্র বা তোমার সূত্র নহে; উহা মানুষমাত্রেরই সাধারণ সূত্র। এক কথায়, উহা আমাদের সর্বজনীন সম্পত্তি, কোনও ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নহে। সেইজন্য যখন এই সূত্রের সাহায্যে আমরা কোন ঘটনা ব্যাখ্যা করি, তখন ইহা সর্বজন সম্মত তথ্য না হইয়া পারে না। যখন আমরা সকলেই একই সূত্র অনুসারে চিন্তা করি, তখন আমাদের মধ্যে মতানৈক্য হইবে কেমন করিয়া? সেইজন্য বিজ্ঞান বলেন যে, আপেলের পতনের মধ্যে আমরা যদি কোন কার্য-কারণ সূত্র আবিষ্কার করিতে পারি, তাহা হইলে আমরা তখন এক সর্বজনসম্মত তথ্যের সন্ধান পাই।

তাহা হইলে দেখা গেল যে বুদ্ধি হইতে 'কার্য' 'কারণ' প্রভৃতি জ্ঞান-সূত্রের সাহায্য না পাইলে আমাদের পক্ষে সর্বজনসম্মত, তথা বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার করা সম্ভব হইত না। অর্থাৎ শুধু অভিজ্ঞতার উপরে নির্ভর করিয়া থাকিলে আমাদিগকে চিরদিনই কূপমণ্ডুকের ন্যায় ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হইত, বিজ্ঞানের বিশাল সর্বব্যাপকতা আমরা কখনই উপলব্ধি করিতে পারিতাম না।

Criticism : (Kant)

বুদ্ধিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদ—দুই মতবাদই, আমাদের মতানুসারে, চরম মতবাদ। বুদ্ধিবাদিগণ অভিজ্ঞতাকে অবহেলা করেন, আর অভিজ্ঞতাবাদিগণ বুদ্ধিকে অবহেলা করেন; কিন্তু তাহা মোটেই সঙ্গত নহে; বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা—

দুই-ই সমান প্রয়োজনীয়। বুদ্ধিবাদিগণ যদি অভিজ্ঞতা হইতে উপাদান গ্রহণ না করেন, তবে তাঁহাদের জ্ঞানের পরিসীমা নিতান্তই ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ হইয়া পড়ে। অভিজ্ঞতা হইতে নূতন নূতন সংবাদ না পাইলে তাঁহারা কি বিষয়ে চিন্তা করিবেন? দিবারাত্রই যদি শুধু মনের কথা চিন্তা করিতে হয়, বাহিরের সহিত যদি সকল সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যায়, তাহা হইলে নূতন জ্ঞান লাভের কোন সম্ভাবনাই তখন আর থাকে না; ফলে জ্ঞানের অগ্রগতি চিরতরে রুদ্ধ হইয়া যায়। ইহাই বুদ্ধিবাদের চরম পরিণতি। অভিজ্ঞতাবাদের পরিণতিও বিশেষ কিছু শুভকর নহে; অভিজ্ঞতাবাদিগণ ইন্দ্রিয়ের সাহায্য নূতন নূতন উপাদান সংগ্রহ করেন বটে, কিন্তু ইহাদিগকে সুবিন্যস্ত ও সুসংবদ্ধ করিতে পারেন না বলিয়া তাঁহাদের চিন্তাধারা বিশৃঙ্খল ও অপরিসর রহিয়া যায়। বহির্জগৎ হইতে যেসব উদ্দীপনা আসিয়া আমাদের মনের মধ্যে সংবেদন সৃষ্টি করে, তাহাদের মধ্যে কোনপ্রকার শৃঙ্খলা ও সংহতি নাই; বিশৃঙ্খলভাবে আসিয়া তাহারা আমাদের মনের মধ্যে জমা হয় মাত্র। কিন্তু শুধু উপাদান জমা হইলেই জ্ঞানোৎপত্তি হয় না; ইহাদিগকে সুসংবদ্ধ করিতে হইবে, যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করিতে হইবে, তবেই তো জ্ঞান-সৌধ রচনা করা যাইবে।* কিন্তু অভিজ্ঞতাবাদিগণ সে পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন; কারণ তাঁহারা বুদ্ধির কারকারিতা স্বীকার করেন না। অথচ বুদ্ধি হইতে জ্ঞান সূত্র না পাইলে এইসব উপাদানগুলিকে একত্র গ্রথিত করা যাইবে কেমন করিয়া? তাই ক্যাণ্ট বলেন যে জ্ঞানোৎপত্তির জন্য বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা—দুই-ই সমান প্রয়োজন। ইহাই মহামতি ক্যাণ্টের প্রতিপাদ্য বিষয়। তাহার সুপ্রসিদ্ধ দর্শন পুস্তকে তিনি ইহাদের সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। তাহার পুস্তকের নাম Critique of Pure Reason; এই Critique শব্দ হইতেই তাহার মতবাদকে সাধারণতঃ Criticism নামে অভিহিত করা হয়।

ক্যাণ্ট বলেন বাহির হইতে যতই সংবাদ আসুক না কেন, ভিতর হইতে মনের সক্রিয় সহায়তা না আসিলে জ্ঞানোৎপত্তি হয় না। কথাটি ভাল করিয়া বুঝান যাউক। অনেকে বলেন যে মন একটি নিষ্ক্রিয় পদার্থ বিশেষ, যেন একটি ফটোগ্রাফের প্লেট; বাহির হইতে উদ্দীপনা আসিলেই উহা আমাদের মনের মধ্যে গাঁথিয়া বসে, ফলে আমরা বহির্জগতের কথা জানিতে পারি। এক্ষেত্রে

---

* তাই জ্ঞানকে ইংরাজীতে "Rationalised Experience" বলে। Experience, কারণ জাগতিক উপাদান না আসিলে জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হয় না। তবে শুধু উপাদান আসিলেই হয় না; ইহাকে বিচারবুদ্ধির দ্বারা সুবিন্যস্ত ও সুসম্বদ্ধ করা দরকার। এক কথায়, আমাদের ইন্দ্রিয়-লব্ধ অভিজ্ঞতা যখন বিচার-বুদ্ধির দ্বারা সংগঠিত হয় তখনই সম্যক জ্ঞানের উৎপত্তি হয়।

মনের কোন অবদান নাই ; মন নিষ্ক্রিয়ভাবে উদ্দীপনা গ্রহণ করে মাত্র। কিন্তু ক্যাণ্ট বলেন, ইহা ঠিক নহে ; উদ্দীপনা আসিলে মন নিষ্ক্রিয়ভাবে উহা গ্রহণ করে না ; মনও উহার উপর প্রতিক্রিয়া করে ; উহাকে এক ছাঁচের মধ্যে ঢালিয়া এক বিশিষ্টরূপে রূপায়িত করিয়া তোলে। বাহির হইতে যাহাই আসুক না কেন, উহা যেমন তেমন ভাবে আমাদের মনের মধ্যে আবির্ভূত হইতে পারে না ; মনের নিকট নতি স্বীকার করিয়া, মনের প্রদত্ত রূপ গ্রহণ করিয়া তবে উহাকে আবির্ভূত হইতে হয়। যেমন, ধর, আমি শুনিলাম ঘড়ি টং টং করিয়া দশবার ধ্বনি করিল ; এক্ষেত্রে বাহির হইতে ধ্বনি আসিতেছে, সন্দেহ নাই, তবে ধ্বনিগুলি একই সঙ্গে না আসিয়া পর পর আসিতেছে। কিন্তু এই যে পারম্পর্য আমরা লক্ষ্য করিতেছি—ইহাও কি ঘড়ির ন্যায় বহির্জগতেই বিরাজ করিতেছে? ইহার উত্তরে ক্যাণ্ট বলেন যে বহির্জগতে পারম্পর্য (Succession) নাই, পারম্পর্য আছে মনোজগতে। পারম্পর্য মানে কালের গতি ; কিন্তু ক্যাণ্টের মতানুসারে কালের কোন জাগতিক অস্তিত্ব নাই ; কালের চিন্তা আমাদের এক মানসিক ছাঁচ (Mould) মাত্র। যখনই ঘড়ির ধ্বনিগুলি আমাদের মনের মধ্যে আসিতে চায় তখনই ইহাদিগকে এই ছাঁচের মধ্য দিয়া, একের পর এক ক্রমান্বয়ে আসিতে হয়। এইভাবে ছাঁচের দ্বারা রূপায়িত হইয়া জাগতিক ঘটনাগুলি ধারাবাহিক রূপে আমাদের মনের মধ্যে প্রতিভাত হয়। এইরূপ আর এক ছাঁচের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে, যেমন স্থান। আমি আকাশে তাকাইয়া দেখিলাম অসংখ্য নক্ষত্র একই সঙ্গে পাশাপাশি অবস্থান করিতেছে। আকাশে নক্ষত্র আছে—তাহাতে সন্দেহ নাই ; কিন্তু ইহারা সত্যই কি একই সঙ্গে অবস্থান করিতেছে ? সহ-অবস্থান করিতে হইলেই স্থান-ব্যাপ্তির প্রয়োজন ; কিন্তু বহির্জগতে সত্যই কি স্থান-ব্যাপ্তি বলিয়া কোন জিনিষ আছে ? ক্যাণ্ট বলেন বহির্জগতে স্থান নাই ; স্থান আমাদের এক মানসিক ছাঁচ মাত্র। তাই যখনই আমরা বহু নক্ষত্র একই সঙ্গে প্রত্যক্ষ করিতে চাই, তখনই ইহাদিগকে এই ছাঁচের মধ্যে ঢালিয়া সহ-অবস্থিত রূপে প্রত্যক্ষ করি।

জ্ঞান-সূত্র (Categories)

উপরে আমরা দুইপ্রকার ছাঁচের নাম করিলাম, স্থান এবং কাল ; এইরকম আরও কতকগুলি ছাঁচ আছে, যথা দ্রব্য, কার্য, কারণ ইত্যাদি। বহির্জগতে ইহাদের কোন অস্তিত্ব নাই, ইহাদের অস্তিত্ব আছে মনোজগতে। ক্যাণ্ট ইহাদিগকে Categories বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন ; আমরা জ্ঞান-সূত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। ক্যাণ্টের মতানুসারে প্রত্যেক মানুষের মনেই এই সূত্রগুলি

বিদ্যমান আছে। এই সূত্রগুলি যথাযথভাবে প্রয়োগ করিয়া আমরা জ্ঞান আহরণ করি। যখন ঘড়ি হইতে ধ্বনি আসিল, তখন ধ্বনিগুলিকে সহ-অবস্থিত মনে না করিয়া পরম্পর আগত বলিয়া চিন্তা করিলাম; আবার যখন নক্ষত্র প্রত্যক্ষ করিলাম তখন উহাদিগকে পরম্পরাগত বিবেচনা না করিয়া সহ-অবস্থিত বলিয়া চিন্তা করিলাম। কখন পারম্পর্যের কথা ভাবিতেছি, আর কখন বা সহ-অবস্থিতির কথা ভাবিতেছি; এই পারম্পর্য বা সহ-অবস্থিতি জাগতিক উপাদান নহে; ইহা মনের অবদান মাত্র। বহির্জগৎ হইতে যখনই কোন বস্তু আমাদের মনের মধ্যে উদিত হইতে চায় তখনই উহাকে আমরা কোন এক সূত্রের দ্বারা শৃঙ্খলিত করিয়া ফেলি; ফলে ঐ শৃঙ্খলিত রূপেই উহা তখন আমাদের মনের মধ্যে বিরাজ করে। বাহির হইতে যে অসংবদ্ধ বিষয়বস্তু আসে—তাহা Matter; আর সূত্রের বন্ধনে ইহা যে সুবিন্যস্ত রূপ গ্রহণ করে, তাহা Form। এইভাবে সূত্রের বন্ধনে উপাদান (Matter) যখন বিশিষ্ট রূপ (Form) গ্রহণ করে, তখনই জ্ঞানের উদ্ভব হয়। তাই ক্যাণ্ট বলেন যে জ্ঞানোৎপত্তির জন্য Matter এবং Form উভয়েরই সমান প্রয়োজন। উপাদান তে. চাই-ই; তাহা না হইলে সৌধ রচিত হইবে কি দিয়া? তবে শুধু উপাদান থাকিলেই চলে না; আরও কিছু চাই; এই উপাদানগুলিকে একত্র গ্রথিত করিয়া যথাযথ রূপ (Fo m) দান করিবার শক্তিও থাকা চাই। ইহাকেই মনের সক্রিয় অবদান বলে। তাই ক্যাণ্ট বলেন যে বাহির হইতে যত সংবাদই (Experience) আসুক না কেন, মনের সক্রিয় সহায়তা (Reason) না থাকিলে জ্ঞানোৎপত্তি হয় না।

এইভাবে ক্যাণ্ট বুদ্ধিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদের সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। বুদ্ধবাদ সম্বন্ধে তাঁহার প্রধান বক্তব্য বিষয়—Categories বা জ্ঞান-সূত্র। ক্যাণ্ট বলেন এই সূত্রগুলি আমরা কেহই অভিজ্ঞতার পরে বা অভিজ্ঞতার ফলে অর্জন করি নাই; অভিজ্ঞতার পূর্ব হইতেই ইহারা আমাদের মনের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। তাই ক্যাণ্ট ইহাদিগকেপ্রাকসিদ্ধ (a priori) ধারণা বলেন। যেমন, স্থান, কাল, কার্য, কারণ প্রভৃতি সূত্র—জন্ম হইতেই ইহারা আমাদের মনের মধ্যে নিহিত আছে। ইহাদের কোনটিই কেহ চেষ্টা করিয়া অর্জন করে না। আমরা যেমন চেষ্টা করিয়া মন অর্জন করি নাই, তেমন চেষ্টা করিয়া এই ধারণাগুলিও অর্জন করি নাই; মনের সঙ্গে সঙ্গে এই ধারণাগুলিও আমরা লাভ করিয়াছি। ইহাতে সুবিধা হইয়াছে যে বহির্জগৎ হইতে যখন কোন উপাদান আসে তখন উহা অনুশীলন করিতে আমাদের একটুও বেগ

পাইতে হয় না; আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই উহা সূত্রগুলির মধ্যে আধৃত হইয়া পড়ে, অর্থাৎ সূত্রগুলি উহাকে আত্মসাৎ করিয়া ফেলে এবং যথাযথভাবে রূপায়িত ও সুবিন্যস্ত করিয়া তোলে। তাই নক্ষত্রগুলি আমাদের নিকট একে একে আসে না; স্থানের মধ্যে আধৃত হইয়া সহ-অবস্থিত রূপে আবির্ভূত হয়। আবার ঘণ্টাধ্বনিগুলি একই সঙ্গে আসে না; কালের নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করিয়া লইয়া তাহারা একে একে আমাদের মনের মধ্যে আসে। এইভাবে সূত্রের নিয়ন্ত্রণে আমরা উপাদানগুলিকে সহ-অবস্থিত বা পরম্পরাগত বলিয়া প্রত্যক্ষ করি।

উপসংহার

কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন আছে। উপাদান আসিতেছে বহির্জগৎ হইতে আর সূত্র আসিতেছে মনোজগৎ হইতে; ইহারা বিভিন্ন দেশের অধিবাসী। তবে উদ্দীপনা আসিয়া কেন সূত্রের নিয়ন্ত্রণ মানিয়া লয়? নক্ষত্রের সহিত মনের এমন কি সম্পর্ক আছে যে ইহাকে মনের নির্দেশে স্থানাবস্থিত বলিয়া প্রতিভাত হইতে হইবে? সেইরূপ ধ্বনিও তো বহির্জগতের বিষয়; উহাই বা কেন মনোজগতের নির্দেশ মানিযা লইয়া পরম্পরাগত বলিয়া প্রতিভাত হইবে? মোট কথা, এই সব জাগতিক বস্তু কেন মনোজগতের শাসন মানিয়া লয়, আর মনই বা কি অধিকারে এইসব বাহ্যবস্তুর উপর কর্তৃত্ব করিতে যায়? মনের সূত্র মনের মধ্যেই থাকুক, কাহারও কোন আপত্তি নাই; কিন্তু বাহ্যবস্তুর উপরে ইহা কেন ন্যস্ত করা হইবে, আর বাহ্যবস্তুই বা কেন ইহার নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করিবে? কবিগুরুর উপমায় বলা যায়, বনের পাখী বনেতে তো ভালই ছিল: সে কেন খাঁচার পাখীর কাছে আসিতে গেল?* সেইরূপ, বাহ্যবস্তু তো বাহ্যজগতে ভালই ছিল, উহা তবে কেন মনের কথা শুনিতে আসিল? ক্যান্ট ইহার কোন উত্তর দেন নাই, ইহার উত্তর দিয়াছেন হেগেল। তিনি বলেন, বাহ্যজগৎকে আমরা সাধারণত মনোজগৎ হইতে পৃথক বা স্বতন্ত্র বলিয়া বিবেচনা করি, কিন্তু তাহা তো ঠিক নহে; উহারা মূলতঃ এক—একই ব্রহ্মের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। যে

---

* খাঁচার পাখী ছিল সোনার খাঁচাটিতে,
বনের পাখি ছিল বনে
একদা কী করিয়া মিলন হল দোঁহে
কী ছিল বিধাতার মনে।

ব্রহ্ম বাহ্যজগতের মধ্যে প্রকটিত আছেন, সেই ব্রহ্মই মনোজগতের মধ্যেও বিরাজ করিতেছেন। হেগেলের ব্রহ্মকে আমরা বেদান্তের ভাষায় চৈতন্য-স্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিতে পারি—এই একই ব্রহ্ম-চৈতন্য নানারূপে বিরাজ করিতেছে; কখন বহির্জগতে জড়রূপে সমাহিত আছে, আর কখন মনোজগতে চেতনারূপে অধিষ্ঠিত আছে। তাই হেগেল বলেন, আমরা যখন বাহ্যবস্তুর কথা চিন্তা করি, তখন কোন বিজাতীয় বস্তুর কথা চিন্তা করি না, ব্রহ্মেরই জড়রূপের কথা চিন্তা করি। আর আমরা যাহারা চিন্তা করি আমরাও কোন বিজাতীয় বস্তু নহি; আমরাও ব্রহ্মেরই আর এক রূপ—ব্রহ্মের চেতন-রূপ। এক কথায়, ব্রহ্মের চেতন রূপে আমরা ব্রহ্মেরই অচেতন রূপ প্রত্যক্ষ করি। তাহা হইলে, চেতন-জগৎ ও অচেতন জগতের মধ্যে বিজাতীয় ভাব রহিল কোথায়?

এখন আমাদের মূল প্রশ্নে আসা যাউক। আমাদের মূল প্রশ্ন এই: বাহ্যজগত কেন মনোজগতের কথা মানিয়া লয়; আর মনই বা কি অধিকারে এইসব বাহ্যবস্তুর উপর কর্তৃত্ব করিতে যায়? মনের সূত্র মনেই থাকুক; কিন্তু বাহ্যবস্তুর উপর ইহা কেন ন্যস্ত করা হইবে, আর বাহ্যবস্তুই বা কেন ইহার নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করিবে? আমাদের উত্তর সহজ, বাহ্যবস্তু যখন মনের নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করে, তখন কোন বিজাতীয় নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করে না। আমরা তো পূর্বেই বলিয়াছি, মনোজগৎ ও বহির্জগৎ—একই ব্রহ্মের বিভিন্ন প্রকাশমাত্র; অর্থাৎ ইহারা সমজাতীয়। অতএব মন যখন বাহ্য-জগতের জন্য সূত্র নির্দেশ করে, তখন মন কোন বিজাতীয় বস্তুর প্রতি হুকুম জারি করে না; আর বাহ্যবস্তুও যখন সেই সূত্র অনুযায়ী আচরণ করে, তখন সেও কোন বিজাতীয় শাসনের প্রতি নতি স্বীকার করে না। মনের মধ্যে স্থান, কাল প্রভৃতি যে সব সূত্র আছে, তাহা শুধু মনের সম্পত্তি নহে; বাহ্যজগতের মধ্যেও সেসব সূত্র আছে; অতএব উহা বাহ্যজগতেরও সম্পত্তি বলা যাইতে পারে। অথবা আরও স্পষ্টভাবে বলা যায় যে উহা কাহারও নিজস্ব সম্পত্তি নহে; উহা একমাত্র ব্রহ্মেরই সম্পত্তি। তবে তিনি নিজের মধ্যে উহা সঞ্চিত করিয়া রাখেন নাই, সর্বত্রই উহা বিলাইয়া দিয়াছেন—আমাদের মনের মধ্যে যেমন বিলাইয়া দিয়াছেন, তেমন বহির্জগতেও বিলাইয়া দিয়াছেন। যেমন ধর, "স্থান"; ইহাকে আমরা জ্ঞান-সূত্র নামে অভিহিত করিয়াছি। ক্যাণ্ট বলেন যে, যখনই আমরা বহির্জগতের কথা চিন্তা করি তখনই উহাকে স্থানবদ্ধ রূপে চিন্তা করি। ইহাতে প্রতীয়মান হইতে পারে

যে বাহ্যবস্তুর মধ্যে বুঝি কোন স্থানব্যাপ্তি নাই; শুধু মনের আদেশেই ইহাকে স্থানের পরিচ্ছদে ভূষিত হইতে হইয়াছে। কিন্তু হেগেল বলেন, ইহা ঠিক নহে, স্থান শুধু মনের অবদান নহে; বাহ্যজগতের মধ্যেও স্থানব্যাপ্তি আছে। কারণ, ঈশ্বরের এই সৃষ্ট জগৎ যত বৃহৎ-ই হউক না কেন, সসীম তো বটে; সসীম জগৎ সৃষ্টি করিতে হইলেই উহাকে স্থান-বদ্ধ (ও কালবদ্ধ) করিয়া সৃষ্টি করিতে হয়। তাই ঈশ্বর যখন এই জগৎ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছেন, তখন ইহাকে স্থানবদ্ধ রূপেই চিন্তা করিয়াছেন। বস্তুতঃ তিনি ইহাকে স্থান-বদ্ধ রূপে চিন্তা করিয়াছেন বলিয়া আমরাও ইহাকে স্থান-বদ্ধরূপে চিন্তা করিতেছি; আমাদের চিন্তা-ধারা যে ঈশ্বরেরই চিন্তা-ধারা অনুসরণ করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি ?

তাহা হইলে দেখা গেল যে, আমাদের মনের মধ্যে স্থান, কাল প্রভৃতি যেসব সূত্র বিদ্যমান আছে, তাহা বাহ্যবস্তুর উপর জোর করিয়া ন্যস্ত করা হয় না; বাহ্যবস্তুগুলি নিজেরাই সাদরে এই সূত্রগুলি গ্রহণ করে, কারণ এগুলি তাহাদেরও সম্পত্তি, বিজাতীয় নিয়মাবলী নহে। এখন কবিগুরুর উপমাটি লওয়া যাউক। বনের পাখী খাঁচার পাখীর কাছে গেল কেন? ইহার উত্তর, বনের পাখী ও খাঁচার পাখী—একই প্রকারের পাখী, ইহারা বিজাতীয় নহে, সমজাতীয়। অতএব ইহারা যে পরস্পরের সহিত মিলিত হইবে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কি আছে ? "বিধাতার মনে" যে পরিকল্পনা ছিল—সেই পরিকল্পনা অনুযায়ীই ইহারা পরস্পরের নিকটে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। আমাদের বাহ্যজগৎ ও মনোজগৎ সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা প্রযোজ্য। ঈশ্বরের চিন্তা অনুযায়ী উহারা উভয়েই একই রকমের সূত্রে গ্রথিত হইয়াছে: আমাদের মনের খাঁচায় আসিয়া উহারা পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়াছে।

উনবিংশ অধ্যায়

অনুশীলন পদ্ধতি

Methods of Philosophy

জ্ঞান-তত্ত্ব প্রসঙ্গে এখন দ্বিতীয় বিষয়ের কথা আলোচনা করা হইবে, যথা Methods of Philosophy; কি পদ্ধতিতে আমরা দার্শনিক জ্ঞান আহরণ করিয়া থাকি—উহাই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়; যেমন জ্যোতিঃ-

শাস্ত্র অনুশীলনের জন্য দূরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করা হয়, আর মনোবিজ্ঞান অনুশীলনের জন্য অন্তর্দর্শনের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। সেইরূপ দর্শনশাস্ত্র অনুশীলনের জন্য সাধারণতঃ যে সব পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়—তাহাই এখন একে একে বর্ণনা করা হইবে। বলা বাহুল্য, এখানে আমরা পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস অনুসরণ করিয়া আলোচনা করিব, ভারতীয় দর্শন অনুযায়ী নহে।

I. Dogmatism

Dogmatism মানে নির্বিচারবাদ। যে কোন কাজ করিবার আগেই আমাদের বিচার করা উচিত যে ঐ কাজ করিবার পক্ষে আমাদের যথোপযুক্ত শক্তি আছে কি না। দার্শনিক আলোচনা সহজ কাজ নহে; কঠিন কাজ। এক্ষেত্রে আমরা শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় লইয়া আলোচনা করি না; অতীন্দ্রিয় বিষয়ের কথাও চিন্তা করি। বস্তুতঃ আত্মা পরমাত্মা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ই দর্শনশাস্ত্রের মুখ্য আলোচ্য বিষয়। অতএব আমাদের প্রথমেই প্রশ্ন করা উচিত—এইসব ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় আলোচনা করিবার পক্ষে আমাদের যথাযথ শক্তি আছে কি না। যে বিচার বুদ্ধির (Reason) সাহায্যে আমরা সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্রের কথা জানিতে পারি, সেই বিচার বুদ্ধির সাহায্যে আমরা আত্মা-পরমাত্মার কথাও জানিতে পারি। তাই অনেকে বলেন যে, পরম-তত্ত্ব আলোচনা করার পূর্বে জ্ঞান-তত্ত্ব আলোচনা করা দরকার; অর্থাৎ কি পদ্ধতিতে আমরা জ্ঞান আহরণ করি, ইহার দোষত্রুটি কি, ইহার সীমারেখা কতদূর—ইত্যাদি কথাই আগে বিচার করা দরকার, তারপরে অধ্যাত্ম-তত্ত্ব বা ভগবৎ-তত্ত্বের ন্যায় পারমার্থিক-তত্ত্ব আলোচনা করা বিধেয়। কিন্তু অনেকে ইহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন আগে জ্ঞান-তত্ত্ব আলোচনা করিবার প্রয়োজন কি ? প্রথমেই পারমার্থিক আলোচনা শুরু করিয়া দাও। এই আলোচনা শুরু না করিলে, আগে হইতেই ইহার যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করিবে কেমন করিয়া ? জলের মধ্যে না নামিয়া কেহ কি কখন আগে হইতেই সাঁতার শিখিতে পারে ? জলের মধ্যে হাবুডুবু খাইয়া আমরা বুঝিতে পারি আমাদের দৌড় কত; সেইরূপ পারমার্থিক আলোচনায় মগ্ন হইয়া আমরা বুঝিতে পারি আমাদের শক্তি কত। অর্থাৎ আগে হইতে ইহার সীমানির্দেশ করা যায় না; আলোচনা আরম্ভ করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে এ বিষয়ে কতদূর অগ্রসর হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব, আর কতদূর নহে; প্রথম হইতেই ইহার দোষ-ত্রুটি বুঝা যায় না। তাঁহারা আরও বলেন যে, আগে হইতেই ইহার দোষ-ত্রুটি, শক্তি ও সীমা প্রভৃতি নির্দেশ করিয়া রাখিলে আমাদের

আলোচনা মোটেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রবাহিত হইতে পারে না। কারণ, কোথায় কোন্ নিয়মকানুন লঙ্ঘন করিলাম বা কোথায় কোন্ নির্দিষ্ট সীমারেখা অতিক্রম করিলাম—সর্বদাই এই ভাবনায় ভীত থাকিলে আমাদের পক্ষে স্বচ্ছন্দ-চিত্তে আলোচনা করা সম্ভব হয় না। ফলে আমাদের চিন্তাধারা পদে পদে ব্যাহত হইয়া থাকে। তাই তাঁহারা বলেন যে, আগে হইতেই এই সব কথা বিচার বিবেচনা করিবার কোনই সার্থকতা নাই; একেবারে নির্বিচারভাবে প্রথম হইতেই পারমার্থিক আলোচনায় মগ্ন হইয়া যাও। তার পরে কোথাও যদি কোন বাধা আসে, তখন দেখা যাইবে; আগে হইতে এইসব ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা চিন্তা করিয়া লাভ কি? এইপ্রকার নির্বিচারবাদকে ইংরাজীতে Dogmatism বলে।

Rationalistic Dogmatism

পূর্ব অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি যে, জ্ঞানোৎপত্তির মূলে আছে বিচার-বুদ্ধি (Reason) এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা (Experience)। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, বুদ্ধিবাদীগণই উপরি উক্ত নির্বিচারবাদ গ্রহণ করিয়া থাকেন; অর্থাৎ যাঁহারা বলেন যে বিচার বুদ্ধিই জ্ঞান লাভের প্রকৃষ্ট পন্থা তাঁহারাই কিনা অবশেষে নির্বিচারবাদী হইয়া পড়েন। তাঁহারা মানুষের বিচারবুদ্ধির উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেন। যে বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে তাঁহারা কোটি কোটি মাইল দূরস্থিত গ্রহ-নক্ষত্রের কথা জানিতে পারিতেছেন, এবং মুহূর্তের মধ্যে হাজার হাজার মাইল দূরে সংবাদ প্রেরণ করিতেছেন, যে বুদ্ধির সাহায্যে তাহারা বৈদ্যুতিক শক্তি এবং আণবিক শক্তিকে জয় করিয়াছেন এবং মেঘের মধ্য দিয়া অনায়াসে উড়িয়া যাইতে পারিতেছেন, এক কথায় যে বুদ্ধির সাহায্যে তাঁহারা প্রকৃতিকে পরাভূত করিয়া এই বৃহৎ জগৎকে একেবারে করতলগত করিয়া ফেলিয়াছেন, সেই বুদ্ধি-শক্তির প্রতি তাহাদের যে অপরিমেয় শ্রদ্ধা থাকিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? তাঁহারা মনে করেন যে মানুষের এই বিচার-বুদ্ধির নিকট পৃথিবীর সমস্ত রহস্যই একদিন উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িবে; জন্ম, মৃত্যু, আত্মা, পরমাত্মা—কোন তত্ত্বই আর তাহাদের নিকট অবিদিত থাকিবে না। তাই তাঁহারা বলেন যে আমাদের এই বুদ্ধি-শক্তির সীমা নিরূপণ করা বা ইহার কার্যকারিতা বিচার করা প্রভৃতি কোনরূপ প্রাথমিক আলোচনার প্রয়োজন নাই। ইহাকে নির্বিচারে কাজ করিতে দাও, দেখিবে ইহা পৃথিবীর সকল সমস্যার সমাধান করিয়া দিবে। বুদ্ধি-শক্তির প্রতি এই অন্ধ বিশ্বাসকে Dogmatism বলে।

সমালোচনা। আমাদের বুদ্ধি-শক্তি যতই প্রখর হউক না কেন, উহা মানুষের বুদ্ধি-শক্তি, ঈশ্বরের নহে; ইহা সসীম ও সংকীর্ণ; ইহার মধ্যে যথেষ্ট ক্রটি-বিচ্যুতি আছে, এবং ইহার কার্যে যথেষ্ট ভুল-ভ্রান্তি হইয়া থাকে। অতএব মানুষের বিচার-বুদ্ধিকে একেবারে অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করা উচিত নহে। তাই, আমাদের মতানুসারে, ইহার শক্তি সম্বন্ধে সত্যই অনেক কিছু প্রশ্ন করিবার আছে। ইহার স্বরূপ কি, ইহাতে ভুল-ভ্রান্তি হয় কেন এবং কিভাবে ইহাকে পরিচালিত করা উচিত—ইত্যাদি অনেক কথাই বিচার করা দরকার, অর্থাৎ ইহাকে নির্বিচারে প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। সেইজন্য ইহার সাহায্যে কোন আধ্যাত্মিক বিষয় উপলব্ধি করিতে হইলে প্রথমেই ইহার কার্যকারিতা বিচার করিয়া দেখা উচিত; নতুবা আমাদের সিদ্ধান্ত ভুল হইয়া যাইতে পারে। যে ডুবুরী সমুদ্রতলে রত্ন সন্ধান করিতে যায়, সে প্রথমেই দেখিয়া লয় যে সমুদ্রের তলদেশে যাইবার পক্ষে তাহার যথাযথ সরঞ্জাম আছে কি না, নতুবা সে বিপদে পড়িতে পারে। সেইরূপ যাঁহারা অধ্যাত্ম-আলোচনায় মগ্ন হইতে চাহেন তাঁহাদেরও প্রথমে দেখা দরকার যে অতীন্দ্রিয়-তত্ত্ব আলোচনা করিবার পক্ষে মানুষের বুদ্ধি-শক্তি পর্য্যাপ্ত কি না, নতুবা তাঁহাদের সিদ্ধান্ত নানা দোষে দুষ্ট হইতে পারে। অতএব নির্বিচারবাদ সমর্থন করা যাইতে পারে না।

II. Scepticism

উপরিউক্ত নির্বিচারবাদ যে একটি চরম মতবাদ তাহা বলাই বাহুল্য; ইহা কোন মধ্যপন্থায় বিশ্বাস করে না। যেমন, বুদ্ধিবাদিগণ বলেন যে, আমাদের বুদ্ধি-শক্তি একেবারে অভ্রান্ত শক্তি, এবং ইহার সাহায্যে আমরা জাগতিক ও পারমার্থিক সকল তত্ত্বই সঠিকভাবে অবগত হইতে পারি; পৃথিবীতে এমন কোন বিষয়বস্তু নাই যাহা এই বিচারবুদ্ধির দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না। এই চরম মতবাদের প্রত্যুত্তরে আর এক চরম মতবাদের উদ্ভব হইয়াছে, উহার নাম সংশয়বাদ বা সন্দেহবাদ (Scepticism)। ইহা ঠিক বিপরীত কথা বলে; এই মতানুসারে পৃথিবীর কোন তত্ত্বই আমরা নিঃসন্দেহভাবে অবগত হইতে পারি না। আত্মা ও পরমাত্মার ন্যায় অতীন্দ্রিয় বিষয়বস্তুর কথা জানা তো সম্ভবই নহে; এমন কি জাগতিক ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তত্ত্ব সম্বন্ধেও আমরা নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে কিছু বলিতে পারি না। মোট কথা, কোন তথ্যই আমাদের বোধগম্য নহে। আমরা অন্ধকারের জীব, চিরকালই আমাদিগকে অন্ধকারে থাকিতে হইবে; আমাদের পক্ষে

অন্ধকার হইতে আলোয় যাওয়া সম্ভব নহে। বলা বাহুল্য, নির্বিচারবাদের ন্যায় এই সংশয়বাদও এক চরম মতবাদ; ইহাকেও সমর্থন করা যাইতে পারে না, বরং ইহাকে আমরা নির্বিচারবাদেরই অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া বলিয়া মনে করি। কারণ, নির্বিচারবাদ যদি ঠিক হইত তবে আত্মা পরমাত্মা সম্বন্ধে এত রকম বিভিন্ন মতবাদের উদ্ভব হইতে পারিত না। আমাদের বুদ্ধি-শক্তি যদি যথার্থই অভ্রান্ত হইত তাহা হইলে সকলের নিকটেই সত্য সমানভাবে প্রতিভাত হইত; ফলে মতানৈক্য থাকিত না, সকলেই একই তথ্য প্রচার করিতেন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে, একই তথ্য প্রচার করা তো দূরের কথা, তাঁহারা পরস্পর-বিরোধী তত্ত্ব প্রচার করিয়া আমাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া তোলেন। তখন আমাদের মনে প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া না হইয়া পারে না; আমরা তখন বিরোধী মতবাদের একটিকেও সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে চাহি না; বরং প্রত্যেকটিকেই সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকি। এক কথায় দুনিয়ায় অবিসংবাদী সত্য বলিয়া যে কিছু থাকিতে পারে, তাহা বিশ্বাস করি না। ইহারই নাম **সংশয়বাদ**।

নির্বিচার প্রসঙ্গে বলিয়াছি যে, বুদ্ধিবাদীগণই সাধারণতঃ dogmatic ভাবাপন্ন হইয়া থাকেন। বুদ্ধি-শক্তির দম্ভে তাঁহারা ধরাকে সরা জ্ঞান করেন; মনে করেন বিশ্বের সকল তত্ত্বই তাঁহাদের করতলগত। অভিজ্ঞতাবাদিগণের অবস্থা ঠিক ইহার বিপরীত। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সংকীর্ণতা লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা বলেন যে, মানুষের পক্ষে অবিসংবাদিত সত্য উপলব্ধি করা একেবারে অসম্ভব। কথাটি ভাল করিয়া বুঝান যাউক। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে অভিজ্ঞতাবাদিগণ বুদ্ধি-শক্তির উপর মোটেই গুরুত্ব আরোপ করেন না; ইহাকে নিষ্ক্রিয় ও নগণ্য বলিয়া অবহেলা করেন। তাঁহাদের মতানুসারে আমাদের মন এক অলিখিত সাদা কাগজ মাত্র (tabula rasa), বাহির হইতে যে উদ্দীপনা আসে তাহা শুধু গ্রহণ করে, কিন্তু তাহার উপর ক্রিয়া করিতে পারে না। ফলে জ্ঞান উৎপাদনে মনের বিশেষ কোন অবদান নাই, সমস্ত অবদানই আসে বাহির হইতে।* বাহির হইতে এই উপাদান গ্রহণ করাকে Experience বলে। একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে আমাদের এই অভিজ্ঞতার পরিমাণ নিতান্তই সংকীর্ণ; বহির্জগৎ

* বলা বাহুল্য, ইহাও এক প্রকার Dogmatism ব্যতীত কিছুই নহে। জ্ঞানোৎপাদনে বুদ্ধি-শক্তির কোন অবদান নাই, অভিজ্ঞতাই আমাদের একমাত্র সম্বল—বিনা বিচারেই ইহা বলা হইতেছে; এতএব ইহাকে Empirical Dogmatism বলা যাইতে পারে।

হইতে উদ্দীপনা আসিয়া আমাদের মনের মধ্যে যে সংবেদন সৃষ্টি করে—ঐ সংবেদনটুকুর মধ্যেই আমাদের সমস্ত অভিজ্ঞতা নিবদ্ধ থাকে; উহার বাহিরে আর কোন পদার্থ আছে কি না, তাহা জানা আমার পক্ষে সম্ভব নহে। কারণ, তাহা জানিতে হইলে মনোজগৎ অতিক্রম করিয়া আমাকে একেবারে বহির্জগতে আসিয়া পৌঁছিতে হয়; কিন্তু তাহা কি সম্ভব? আমি যাহাই প্রত্যক্ষ করি না কেন, সংবেদনের মাধ্যমে, মনোমধ্যেই তাহা প্রত্যক্ষ করি; অতএব উহাকে আমরা মানস-ছবি বলিতে পারি। কিন্তু এই মানস ছবির অনুরূপ কোন বাস্তব পদার্থ সত্যই আছে কি না—তাহা জানা কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে; কারণ, জানিতে হইলেই মনের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে; কিন্তু মনোমধ্যে যাহা প্রত্যক্ষ করি তাহা তো বাস্তব-রূপ নহে, মানস-রূপ। তাই সন্দেহবাদিগণ বলেন, আমরা যে সূর্য-চন্দ্র প্রত্যক্ষ করি, তাহা আমাদের মনের মধ্যেই বিরাজ করে; বহির্জগতে তদনুরূপ কোন পদার্থ সত্যই আছে কি না—তাহা সন্দেহের বিষয়।

সত্য : অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়।

বাস্তব জগতের অস্তিত্বে যখন সন্দেহ করা হইতেছে, তখন আধ্যাত্মিক জগতের পক্ষে আর কি বলিবার আছে? আমাদের আত্মা কেহ কখনও স্পর্শ করিতে পারে না; পরমাত্মা কেহ কখনও দেখিতে পারে না; অর্থাৎ আত্মা বা পরমাত্মা হইতে আমরা কোনরূপ সংবেদন পাই না। অথচ আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে সংবেদন না পাইলে আমাদের পক্ষে জ্ঞানলাভ করা সম্ভব নহে; যে বিষয়েই যাহা জানিতে চাহি না কেন, সংবেদনের মাধ্যমেই তো তাহা জানিতে হইবে। কিন্তু আত্মা-পরমাত্মা হইতে যখন কোন সংবেদনই পাওয়া যায় না, তখন উহাদের অস্তিত্ব অবগত হওয়াও আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। ফলে উহাদের অস্তিত্ব চিরকালই আমাদের নিকট অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় রহিয়া যায়। তাহা হইলে দেখা গেল যে সংশয়-বাদিগণের মতে সম্যক জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব। সংবেদনের মাধ্যমে আমরা যে যেটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করি, উহাতেই আমাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে; এই ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা অতিক্রম করিয়া কোন পরম তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে। কিন্তু এইখানেই সন্দেহবাদের বিপদ! পরম-তত্ত্বের সন্ধান পাওয়াই যদি সম্ভব নহে, তবে পরম-তত্ত্বের নামোল্লেখই বা তাহারা কি করিয়া করিতে পারেন? তাহারা বলিতেছেন—'পরম-তত্ত্ব'

অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয়, ইহার কথা কেহ জানিতে পারে না। কিন্তু তাহাদের বর্ণনা পড়িয়া তো তাহা মনে হয় না; বরং মনে হয় তাঁহারা ইহার সম্বন্ধে সত্যই কিছু জানেন; অন্ততঃ এইটুকু তো নিশ্চয়ই জানেন যে ইহা অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয়, নতুবা তাহারা ইহাকে অজ্ঞেয় বলিতেছেন কেমন করিয়া? অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বলিয়া বর্ণনা করাও তো একরকম জ্ঞান। আর এক কথা, সন্দেহবাদিগণ বলেন যে, সংবেদনের মাধ্যমে আমরা যাহা পাই তাহা মানস-প্রতিমূর্তি মাত্র, উহার বাস্তব রূপ আমাদের নিকট অজ্ঞাত রহিয়া যায়। আমরা জিজ্ঞাসা করি—সবই যদি মানস-প্রতিমূর্তি হইয়া থাকে, তবে বাস্তবের কথা ওঠে কি করিয়া? কোন বিষয়কে 'মানস' বলিলে বুঝিতে হইবে যে 'বাস্তব' কি তাহা তুমি জান; এই বাস্তবের সহিত তুলনা করিয়া তুমি ইহাকে মানস বলিতেছ। নতুবা 'বাস্তব' ও 'মানসের' পার্থক্য তুমি জানিলে কেমন করিয়া? তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, সন্দেহবাদিগণও বাস্তবের কথা কিছু জানেন, এবং জানেন বলিয়াই তাঁহারা মানস-রূপকে বাস্তব-রূপ হইতে পৃথক বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন। অতএব নির্বিচারবাদের ন্যায় সংশয়বাদকেও আমরা সমর্থন করিতে পারি না।

III. Critical Method (বিচারবাদ)

জ্ঞানানুশীলন সম্বন্ধে যিনি বিশেষভাবে গবেষণা করিয়াছেন তাঁহার নাম ক্যাণ্ট, তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ পুস্তকের নাম "Critique of Pure Reason", এই Critique কথা হইতে তাঁহার অনুশীলন পদ্ধতিকে Critical Method বা (বিচারবাদ) নামে অভিহিত করা হয়। তিনি সংশয়বাদ সমর্থন করেন না বটে, তবে সংশয়বাদিগণের ন্যায় তিনিও অভিজ্ঞতার উপরে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁহার মতানুসারে অভিজ্ঞতা হইতেই আমরা জ্ঞান-সৌধের উপাদান সংগ্রহ করি। জাগতিক উদ্দীপনা হইতে আমরা যেসব সংবেদন পাই—তাহাই আমাদের জ্ঞান-সৌধের উপাদান। তবে মনে রাখিতে হইবে যে শুধু উপাদান থাকিলেই জ্ঞান হয় না; জ্ঞান লাভের জন্য ইহার অন্তর্নিহিত অর্থ উদ্ঘাটন করা চাই। এই অর্থ উদ্ঘাটন করিবার চাবিকাঠি আছে বুদ্ধির মধ্যে। তাই আমরা বলিয়াছি যে বুদ্ধির সহায়তায় ইহার যথার্থ অর্থ উপলব্ধি না করিতে পারিলে জ্ঞানোৎপত্তি হয় না। একটি উদাহরণ দেওয়া যাউক। আমি দেখিলাম একটি লোক পাখী লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িল; পরমুহূর্তেই দেখিলাম পাখী গুলিবিদ্ধ হইয়া মাটিতে পড়িয়া

গেল। এক্ষেত্রে বাহির হইতে দুইটি উদ্দীপনা আসিতেছে; প্রথমে আসিতেছে গুলির শব্দ, পরে আসিতেছে পাখীর মৃত্যু। শুধু যদি অভিজ্ঞতার উপরে নির্ভর করিতে হয়, তাহা হইলে আমরা বলিব যে আগে আসিয়াছে গুলির শব্দ, পরে আসিয়াছে পাখীর মৃত্যু; এই পারম্পর্যটুকু ব্যতীত ঘটনাদ্বয়ের মধ্যে আর কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ঘটনাদ্বয়ের মধ্যে এক গভীর সম্বন্ধ নিহিত আছে, উহাকে কার্য-কারণ সম্বন্ধ বলে। যেমন আমরা বলি, গুলি—কারণ, আর মৃত্যু—কার্য; বন্দুকের গুলি গিয়া পাখীর মৃত্যু সাধন করিয়াছে। এই যে কার্য-কারণ সম্বন্ধ—এ জ্ঞান আমরা কোথা হইতে পাইলাম? ঘটনাদ্বয়ের মধ্যে ইহার তো কোন ধরা ছোঁয়া পাই না; ঘটনা শুধু ঘটনা—একটির পর একটি ঘটিয়া চলিয়াছে; কিন্তু উহারা—যে কার্য-কারণ সূত্রে গ্রথিত—সে খবর আমরা পাইলাম কেমন করিয়া? বলা বাহুল্য, সে খবর আমরা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পাই নাই; সে খবর আমরা পাইয়াছি বুদ্ধির নিকট হইতে। বুদ্ধির মধ্যে 'কার্য' 'কারণ', 'স্থান', 'কাল, প্রভৃতি অনেকগুলি সূত্র (Categories) নিহিত আছে। এই সূত্রগুলি যথাযথভাবে প্রয়োগ করিয়া আমরা ঘটনাসমূহের অন্তর্নিহিত অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া থাকি। যেমন, এখানে কার্য-কারণের সূত্র প্রয়োগ করিয়া আমরা বলিতেছি যে গুলির জন্যই পাখীর মৃত্যু হইয়াছে, গুলি-ই মৃত্যুর কারণ। এইভাবে বুদ্ধির সাহায্যে ঘটনাদ্বয়কে কার্য-কারণ-সূত্রে গ্রথিত করিতে পারিতেছি বলিয়া আমরা জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হইতেছি; নতুবা শুধু অভিজ্ঞতার উপরে নির্ভর করিয়া থাকিলে, আমরা এইসব বিচ্ছিন্ন ঘটনা সমূহের কোন যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা দিতে পারিতাম না; উহারা যেমন বিচ্ছিন্নভাবে আসিয়াছিল, তেমন বিচ্ছিন্নভাবেই আমাদের মনের মধ্যে রহিয়া যাইত; সুসম্বদ্ধ ও সুবিন্যস্ত হইয়া উহারা কখন জ্ঞান্-সৌধে পরিণত হইতে পারিত না।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে শুধু উদ্দীপনা আসিলেই জ্ঞান হয় না; উদ্দীপনাগুলিকে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করিবার জন্য বুদ্ধি বা বিচার-শক্তিরও প্রয়োজন। অতএব যাঁহারা বলেন যে জ্ঞান উৎপাদনে মনের কোন সক্রিয় সহযোগিতা নাই, তাঁহারা খুব ভুল করেন। মন নিষ্ক্রিয় নহে, নগণ্য নহে; এবং যাহারা বলেন যে **মন** শূন্য সাদা কাগজ মাত্র—তাঁহারাও ভুল করেন। আমরা কেহ **শূন্য মন** লইয়া এ-পৃথিবীতে আসি নাই; মনের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি জ্ঞান-সূত্র (categories) লইয়া আসিয়াছি; যেমন স্থান, কাল, কার্য, কারণ প্রভৃতি। ক্যাণ্ট বলেন যে, এই সূত্রগুলি আমরা

কেহই অভিজ্ঞতার পরে বা অভিজ্ঞতার ফলে অর্জন করি নাই। অভিজ্ঞতার পূর্ব হইতেই, সহজ কথায়, জন্ম হইতেই ইহারা আমাদের মনের মধ্যে নিহিত আছে; তাই ক্যাণ্ট ইহাদিগকে প্রাকসিদ্ধ (a priori) বলিয়া অভিহিত করেন। ইহাতে সুবিধা এই হইয়াছে যে বাহির হইতে উদ্দীপনা আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা উহাকে কোন এক সূত্রের দ্বারা শৃঙ্খলিত করিয়া ফেলি; তখন আর অবিন্যস্ত হইয়া উহা আমাদের মনের মধ্যে উদিত হইতে পারে না; সুবিন্যস্ত ও সুসম্বদ্ধ হইয়া উদিত হয়। এইভাবে সূত্রের বন্ধনে উপাদান (Matter) যখন বিশিষ্ট রূপ (Form) গ্রহণ করে তখনই জ্ঞানের উদ্ভব হয়।

IV. Dialectic Method

ক্যাণ্টের অনুশীলন পদ্ধতিই পরিমার্জিত হইয়া অবশেষে Dialectic Method-এ পরিণত হইয়াছে। Dialectic কথাটি আসিয়াছে Dialogue হইতে; Dialogue মানে কথোপকথন। সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক পণ্ডিত সক্রেটিস এই কথোপকথনের মাধ্যমেই লোকদিগকে শিক্ষা দিতেন, এবং কাহারও কোন সিদ্ধান্ত যদি ভুল মনে করিতেন তবে এই কথোপকথনের মাধ্যমেই তাহার ক্রটি-বিচ্যুতি বাহির করিয়া দিতেন। তিনি তাহাকে প্রশ্ন করিতেন এবং প্রতিপক্ষ তাহার প্রতিপাদ্য বিষয় অনুধাবন করিয়া উত্তর দিত। সক্রেটিস এত সুকৌশলে তাহার কথাবার্তা পরিচালনা করিতেন যে বহুক্ষেত্রে উত্তর দিতে দিতে বেচারা একেবারে বিভ্রান্ত হইয়া পড়িত; ফলে সে পরস্পর বিরোধী কথা বলিয়া ফেলিত; অনেক সময়ে এমন কথাও হয়ত বলিত যাহা তাহার সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিরোধী। তখন তাহাকে নিজেই নিজের ভুল স্বীকার করিতে হইত। এইরকম পদ্ধতির উদ্দেশ্য যে ঠিক জ্ঞান-অন্বেষণ নহে, তাহা বলাই বাহুল্য; ইহার প্রধান উদ্দেশ্য প্রতিপক্ষকে পরাজিত করা। সেইজন্য ইহাকে **ধ্বংসাত্মক পদ্ধতি** বলা যাইতে পারে। উকিলেরা বিচারালয়ে যখন সাক্ষীকে জেরা কবিতে থাকেন, তখন তাহারা সাধারণতঃ সত্যের সন্ধান করেন না, তাহারা কেবল প্রতিপক্ষের দোষক্রটি বাহির করিয়া তাহাকে পরাভূত করিবার চেষ্টা করেন। ইহাকে উচ্চস্তরের পদ্ধতি বলা যাইতে পারে না।

উচ্চস্তরের ক্রিয়া পাই হেগেলের Dialectic পদ্ধতিতে। প্রতিপক্ষকে পরাভূত করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে, তাঁহার উদ্দেশ্য সত্য সন্ধান করা; সেইজন্য ইহাকে **রচনাত্মক পদ্ধতি** বলা যাইতে পারে। উপরি উক্ত পদ্ধতিতে ধরিয়া লওয়া হইতেছে যে, যেহেতু প্রতিপক্ষ স্ব-বিরোধী কথা বলিতেছেন, সেইহেতু তাহার সিদ্ধান্ত সত্য হইতে পারে না; অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে দুইটি পরস্পর

বিরোধী তথ্য আছে, সে ক্ষেত্রে দুইটিই সত্য হইতে পারে না; একটি সত্য হইলে আর একটি মিথ্যা। কিন্তু হেগেল বলেন, তাহা হইবে কেন? দুইটিই আংশিকভাবে সত্য হইতে পারে; দুইটিকেই এক ব্যাপকতর তথ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দুইটিকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। উদাহরণ দিয়া কথাটি বুঝান যাউক। 'পুরুষ' কি বুঝিতে হইলে শুধু পুরুষের কথা ভাবিলে চলে না; 'নারীর' সহিত তুলনা করা দরকার। এইভাবে তুলনা করিলে আমরা পুরুষের সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করিতে পারি। কিন্তু নারী তো পুরুষ নহে, পুরুষের বিপরীত; কিন্তু বিপরীত হইলেও নারীকে কেহই মিথ্যা বলে না; বস্তুতঃ নারীও মিথ্যা নহে, পুরুষও মিথ্যা নহে; উভয়েই সত্য—উভয়েই এক বৃহত্তর এবং ব্যাপকতর জাতির অন্তর্ভুক্ত—ঐ জাতির নাম মানুষ। যে বিষয় লইয়া চিন্তা শুরু হয়, তাহাকে বলে Thesis; এক্ষেত্রে পুরুষ Thesis; আর যে বিরোধী বিষয়ের সহিত তুলনা করিয়া আমাদের চিন্তাধারা সমৃদ্ধ করা হয়, তাহাকে বলে Anti-thesis; এক্ষেত্রে নারী Anti-thesis। এবং যে বৃহত্তর জাতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিয়া ইহাদের পারস্পরিক বিরোধিতা দূর করা হয়, তাহার নাম Synthesis; এক্ষেত্রে 'মানুষ' Synthesis। এখানে পুরুষ ও নারীর মধ্যে কোন বিরোধিতা নাই, তাহারা উভয়েই সমজাতীয়; উভয়ের মধ্যেই মানুস জাতির যে সাধারণ গুণ (Animality এবং Rationality) তাহা সমভাবে বিদ্যমান।

এইভাবে কোন এক Synthesis বা সমন্বয়ে আসিয়া পৌঁছিলেই যে আমাদের চিন্তাধারার সমাপ্তি হয়, তাহা নহে। পরে এই সমন্বয়কে এক পৃথক Thesis রূপে গ্রহণ করিয়া এবং উহার বিরোধী কোন ধারণাকে Anti-thesis রূপে লইয়া আমরা আবার এক দ্বিতীয় Synthesis সৃষ্টি করিতে পারি। উদাহরণ, মানুষের মধ্যে পুরুষ ও নারীর সমন্বয় সাধন করিবার পরে, আমরা এই মানুষকেই আবার Thesis রূপে চিন্তা করিতে পারি। কিন্তু মানুষের সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হইলে যাহারা মানুষ নহে, তাহাদের কথাও চিন্তা করা দরকার, যেমন জীবজন্তু, পশুপক্ষী ইত্যাদি; ইহারা মানুষ নহে বটে, কিন্তু ইহাদের সহিত তুলনা করিবার ফলেই আমাদের মানুষ সম্বন্ধীয় ধারণা পরিস্ফুট হয়; এক্ষেত্রে জীবজন্তু Anti-thesis। যেখানে Thesis এবং Anti-thesis আছে, সেখানেই উহাদের এক Synthesis কল্পনা করা যাইতে পারে। এক্ষেত্রে আমরা প্রাণীর কথা কল্পনা করিতে পারি; কারণ প্রাণীর মধ্যে মানুষ আছে, আবার জীব জন্তুও আছে; তাই 'প্রাণী' বলিতে আমরা দুই-ই বুঝি; 'প্রাণী' হিসাবে মানুষ

এবং পশুর মধ্যে কোন বিরোধিতা নাই। আবার এই প্রাণীকে আমরা Thesis রূপে গ্রহণ করিয়া উহার বিরোধী 'জড়বস্তুর' কথা চিন্তা করিতে পারি। 'জড়বস্তু' তখন হয় Anti-thesis; কারণ জড়বস্তুর সহিত তুলনা না করিলে আমাদের প্রাণী সম্বন্ধীয় ধারণা পরিস্ফুট হয় না। কিন্তু শুধু তুলনা করিলেই হয় না; যে দুই বিরোধী বিষয়ের তুলনা করা হইতেছে, উহাদের আবার সমন্বয় (Synthesis) সাধন করাও দরকার; তখন হয়ত আমরা "দ্রব্যের" কথা চিন্তা করি—কারণ 'দ্রব্য' বলিতে আমরা প্রাণীও বুঝি আবার জড়বস্তুও বুঝি; উহারা উভয়েই দ্রব্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে। নিম্নে এক রেখা চিত্রের দ্বারা বিষয়টি বুঝান গেল।
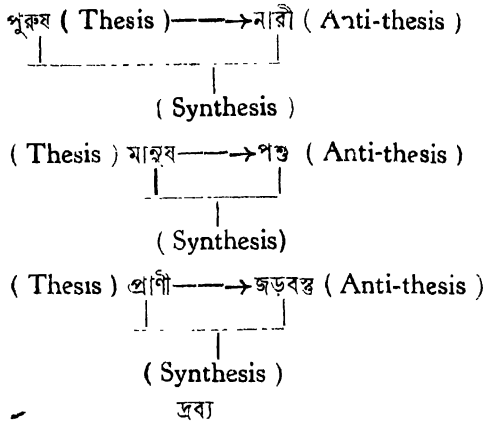
এইভাবে আমাদের চিন্তাধারা নিরন্তর অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। বিরোধিতা দেখিয়া আমরা ভয় পাই না, বরং নিজেরাই ইচ্ছা করিয়া বিরোধিতা আহ্বান করিয়া আনি। কারণ আমরা জানি যে বিরোধিতা না আসিলে আমাদের চিন্তাধারা সম্পূর্ণভাবে পরিস্ফুট হইতে পারে না। বিরোধী ধারণা সমূহের সমন্বয় সাধন করিয়াই আমাদের চিন্তাধারা আত্মবিকাশ লাভ করিতেছে। তাই হেগেল বলেন যে, যেখানে বিরোধিতা দেখা যায় সেখানেই বুঝিতে হইবে উহাদের সমন্বয়ের কোন এক তথ্যও নিহিত আছে। যেমন আমরা সাধারণতঃ বলি যে, বাস্তব-তত্ত্ব এবং মানস-তত্ত্ব সম্পূর্ণ বিভিন্ন তত্ত্ব; মানস-তত্ত্ব—চেতন, আর বাস্তব-তত্ত্ব—অচেতন; ইহারা পরস্পর বিরোধী। হেগেলও ইহা স্বীকার করেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলেন যে, বিরোধী হইয়াও ইহারা সমজাতীয়। পুরুষ ও নারী বিভিন্ন হইয়াও উহারা যেমন একই মানুষ জাতির অন্তর্ভুক্ত, সেইরূপ বাস্তব-তত্ত্ব ও মানস-

তত্ত্ব বিভিন্ন হইলেও উহারা একই পরম-তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত। এই পরম-তত্ত্ব ব্রহ্ম; ব্রহ্ম কখন বাস্তব-রূপে আর কখন বা মানস-রূপে প্রকাশিত হইয়াছেন; 'মানুষ' যেমন ক্ষেত্র বিশেষে পুরুষরূপে এবং ক্ষেত্র বিশেষে নারীরূপে বিরাজ করিতেছে, ব্রহ্মও তেমন কখন জড়রূপে আর কখন বা চেতনরূপে প্রতিভাত হইতেছেন। তাই হেগেল বলেন যে, জড় ও চেতনের মধ্যে বিরোধিতা থাকিয়াও বিরোধিতা নাই; পরমসত্তার মধ্যে ইহাদের সমন্বয় হইয়াছে। তাঁহার ভাষায় "Whatever is real is rational, and whatever is rational is real."

V, Intuitional Method

ক্যাণ্ট ও হেগেল উভয়েই অভিজ্ঞতা ও বিচারবুদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। অভিজ্ঞতা—Experience; বিচারবুদ্ধি—Reason; সেইজন্য ইহাদের মতবাদকে একসঙ্গে Empirico-Rational মতবাদ বলা যাইতে পারে। কিন্তু দর্শন-তত্ত্ব অনুশীলনের জন্য বিচারবুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা ব্যতীত আর এক পদ্ধতি আছে—উহার নাম Intuition বা স্বজ্ঞা। অতীন্দ্রিয়বাদিগণ ইহার উপরে খুবই গুরুত্ব আরোপ করেন, এবং বর্তমান কালে Bergson ইহার পক্ষে যথেষ্ট প্রচার করিয়া গিয়াছেন। Intuition মানে সহজ-জ্ঞান। প্রথমে ইহার একটি সাধারণ উদাহরণ লওয়া যাউক। প্রত্যেক বৎসরে কলেজে কত ছেলে মেয়ে আসে। তাহাদের একজনকে দেখিয়া হঠাৎ তোমার ধারণা হইল যে ছেলেটি খুবই ভাল, এবং তাই তুমি তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইলে। ছেলেটিকে যে তুমি ভাল বলিয়া অনুমান করিলে, ইহার কারণ কি? তাহাকে তুমি আগে কখনও দেখ নাই, তাহার স্বভাব চরিত্র বিষয়ে কিছুই জান না; অতএব তাহার সম্বন্ধে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবার হেতু কি—যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহা হইলে তুমি হয়ত মুশ্‌কিলে পড়িয়া যাইবে; যথার্থ কারণ তো বলিতেই পারিবে না, বরং বহু অযথার্থ কথা বলিয়া নিজেকে হাস্যাস্পদ করিয়া ফেলিবে। এ সম্পর্কে একটি সুন্দর গল্প আছে। একজন নূতন ব্যক্তিকে বিচারক নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তিনি আসামীকে দেখিয়া ও তাহার কথাবার্তা শুনিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে লোকটী দোষী। তাঁহার এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে তিনি এক দীর্ঘ রায় লিখিয়া প্রধান বিচারপতিকে দেখাইলেন। বিচারপতি তাঁহার রায় পড়িয়া বলিলেন "তোমার সিদ্ধান্ত ঠিক হইয়াছে, কিন্তু ইহার পক্ষে যে সব প্রমাণ উল্লেখ করিয়াছ, তাহা সবই ভুল।"

এরকম ব্যাপার মোটেই অসাধারণ নহে; আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক সময় এইরূপ ঘটিয়া থাকে। আমরা কি দেখিয়া, কেমন করিয়া হঠাৎ এক অনুমান করিয়া বসি; কিন্তু যে হেতুর উপর নির্ভর করিয়া হঠাৎ এইরকম অনুমান করি তাহা প্রকৃতপক্ষে এত তুচ্ছ যে উহাকে গণনার মধ্যে আনা যায় না। অথচ এইরূপ নগণ্য ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত যে ভুল না হইয়া প্রায়ই ঠিক হয়—ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে কি?

কেবল আমাদের ন্যায় সাধারণ লোকের চিন্তায় কেন, বড় বড় কবি ও বৈজ্ঞানিকের চিন্তাতেও এইরূপ Intuition বা সহজজ্ঞানের যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়। তাঁহারা অনেক সময়ে যে অসাধারণ কল্পনা করিয়া বসেন, তাহা প্রত্যেক-ক্ষেত্রেই বুদ্ধি-প্রসূত ক্রিয়া বলিয়া মনে হয় না, তাঁহারা যে ভাবিয়া চিন্তিয়া, বিচার বিবেচনা করিয়া এমন অসাধারণ কল্পনা করিয়াছেন ঠিক তাহা নহে। বিদ্যুতের ন্যায় হঠাৎ ইহা তাহাদের মনের মধ্যে আসিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। মহাকবি শেক্স্‌পিয়ার তাঁহার নাটকের জন্য অনেক ঘটনার সৃষ্টি করিয়াছেন এবং বহু দৃশ্যের পরিকল্পনা করিয়াছেন; কিন্তু কোথায় কোন্ দৃশ্য (scene) আসিলে নাটকটি চিত্তাকর্ষক হইবে, কোন্ ঘটনাটি প্রথমে আসিলে বিষয়টি অধিক সমীচীন হইবে, এসব যে তিনি প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বিচার বিশ্লেষণ পূর্বক স্থির করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় কেহই বিশ্বাস করিবে না। তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁহার স্বজ্ঞা (Intuition) বা সহজ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়াছেন। ডাক্তার যেমন অনেক ক্ষেত্রে নাড়ীর গতি না পরীক্ষা করিয়াও রোগীর অবস্থা কল্পনা করিতে পারেন, তুমি যেমন ভাল করিয়া না দেখিয়াও একজন অপরিচিত ব্যক্তি সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্ত করিতে পার, কবিও তেমন সকল বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার না করিয়াও অতি সহজে তাঁহার নাটকীয় ঘটনাসমূহের পারম্পর্য স্থির করিতে পারেন। কোন্ দৃশ্যটি কোথায় আসিলে সমীচীন হয়—ইহা তিনি যুক্তিসিদ্ধ অনুমানের দ্বারা মীমাংসা করেন নাই; তাঁহার অন্তর্নিহিত শক্তির প্রেরণায় তিনি ইহার মীমাংসা করিয়াছেন। ইহাকে বলে Intuition বা সহজ জ্ঞান।

Intuition (অতীন্দ্রিয়বাদ)

যাহা কাব্য-জগৎ ও বৈজ্ঞানিকজগৎ সম্বন্ধে প্রযোজ্য, তাহা যে অধ্যাত্ম জগৎ সম্বন্ধে অধিকতর প্রযোজ্য হইবে—উহা বলাই বাহুল্য। সত্যই তো, সাধারণ মানুষ আমরা, অধ্যাত্ম-জগৎ সম্বন্ধে আমাদের কোনরূপ অভিজ্ঞতা নাই; অতএব সেই অধ্যাত্ম জগতের কথা আমরা সাক্ষাৎভাবে জানিতে

পারিব কেমন করিয়া? সেইজন্য আমরা সত্যদ্রষ্টা ঋষির নিকট যাই; কারণ, আমরা মনে করি যে তিনি এই অতীন্দ্রিয়-জগৎ সম্বন্ধে হয়ত প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়-জগৎ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করা সহজ, কারণ, চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা ইহার কথা জানিতে পারি; কিন্তু ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা অতীন্দ্রিয়-জগতের কথা জানিতে পারিব কেমন করিয়া? অতএব যাঁহারা অতীন্দ্রিয়-জগৎ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই অন্য উপায়ে লাভ করিয়াছেন; সেই উপায়কে ইংরাজীতে Intuition বলা হয়। যুবক নরেন্দ্রনাথ অনেককেই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"আপনি কি ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ করিয়াছেন?" সকলেই বলিলেন "ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ করা যায় না; মানুষ সীমাবদ্ধ জীব, তাহার পক্ষে অসীম ও অনন্ত ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নহে। শেষে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নিকটে গেলে তিনি বলিলেন "ব্রহ্ম কেন প্রত্যক্ষ করা যাইবে না? তুমি যেমন গাছের উপর ফুল দেখিতে পাইতেছ আমিও তেমন ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ করিতেছি।" যিনি এরকম কথা বলিতে পারেন, তিনি সাধারণ লোক নহেন; তিনি সত্যদ্রষ্টা ঋষি; অতীন্দ্রিয়-জগৎ সম্বন্ধে তিনি প্রত্যক্ষ-জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। বিচার বিবেচনা বা অনুমানের সাহায্যে এইপ্রকার প্রত্যক্ষ জ্ঞান পাওয়া যায় না; কারণ, অনুমান-লব্ধ জ্ঞান প্রত্যক্ষ-জ্ঞান নহে। প্রত্যক্ষ-জ্ঞান—যেমন, আকাশে এখন আমরা সূর্য দেখিতেছি, এক্ষেত্রে আমরা যাহা দেখিতেছি তাহা সাক্ষাৎভাবে দেখিতেছি; কোন মধ্যবর্তী পন্থার সাহায্যে দেখিতেছি না। কিন্তু জ্ঞাত বস্তুর উপরে ভিত্তি করিয়া আমরা যখন অজ্ঞাত বিষয় সম্বন্ধে অনুমান করি, তখন আমাদিগকে এক মধ্যবর্তী পন্থার সাহায্য লইতে হয়। এইভাবে মধ্যবর্তী পন্থার সাহায্যে যে জ্ঞান লাভ করা হয়. তাহাকে প্রত্যক্ষ-জ্ঞান বলা যায় যায় না, উহা পরোক্ষ জ্ঞান। কিন্তু ঋষিদের জ্ঞান তো পরোক্ষ-জ্ঞান নহে, প্রত্যক্ষ জ্ঞান; যেমন রামকৃষ্ণদেব বলেন যে তিনি সাক্ষাৎ-ভাবেই ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। তাহা হইলে বলিতে হইবে যে বিচার বিবেচনা বা অনুমানের মাধ্যমে তিনি এই জ্ঞান আহরণ করেন নাই; তিনি অন্যভাবে ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ইহাকে ইংরাজীতে Intuition বলে।

Intellect and Intuition

Intuition যে ঠিক কি ব্যাপার, তাহা বলা কঠিন। তবে Intellect বা বিচার বুদ্ধির সহিত তুলনা করিয়া আমরা ইহার এক সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতে

পারি। প্রথমতঃ, বুদ্ধির দ্বারা যখন বিচার করি তখন বিষয়বস্তুকে আমরা উহার গুণসমূহে বা অংশসমূহে বিশ্লেষণ করিয়া ফেলি। এইভাবে বিশ্লেষণপূর্বক যে জ্ঞান লাভ করি তাহার মধ্যে সমগ্র জিনিষটির সামগ্রিক সত্তা আমরা পাই না; আমরা পাই উহার প্রত্যেক অংশের এক একটি বিশিষ্টরূপ। কথাটি ভাল করিয়া বুঝান যাউক। বনের মধ্যে গিয়া আমরা যদি প্রত্যেকটি গাছকে পৃথক পৃথক রূপে অনুশীলন করিতে থাকি, তাহা হইলে আমরা বনের অংশগুলি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করিতে পারি বটে, কিন্তু বনের সামগ্রিক রূপটি একেবারে হারাইয়া ফেলি। সেইরূপ, পশু ব্যবচ্ছেদ করিলে আমরা উহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পাই বটে, কিন্তু পশুটি পাই না, পশুটি নাশ প্রাপ্ত হয়। বুদ্ধি-লব্ধ জ্ঞান সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা প্রযোজ্য। বিশ্লেষণ সহকারে আমরা যখন জ্ঞান লাভ করি তখন আমরা অখণ্ড জিনিষকে খণ্ড খণ্ড রূপে প্রত্যক্ষ করি; ইহাতে আমাদের সুবিধা হয় বটে, কিন্তু অখণ্ড জিনিষকে খণ্ড করিলে উহার অখণ্ডত্ব নষ্ট হইয়া যায়; ফলে উহার যথার্থ স্বরূপ আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। উহার যথার্থ স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিতে হইলে উহাকে অখণ্ডরূপে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। ইহা একমাত্র স্বজ্ঞার (Intuition) পক্ষেই সম্ভব, বুদ্ধির পক্ষে সম্ভব নহে; কারণ স্বজ্ঞার জন্য বিশ্লেষণের প্রয়োজন নাই; সমগ্র সত্তাকেও ইহা একই সঙ্গে একই মুহূর্তে উপলব্ধি করিতে পারে—যেমন ভাবে আমরা আমাদের প্রাণ-সত্তা উপলব্ধি করিয়া করিয়া থাকি। নাড়ি টিপিয়া, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস লক্ষ্য করিয়া, এক কথায়, প্রাণের আংশিক ক্রিয়াসমূহ বিচার করিয়া আমরা প্রাণ-সত্তা উপলব্ধি করি না; একই মুহূর্তে সামগ্রিকভাবে আমরা আমাদের প্রাণের অস্তিত্ব অনুভব করি।

দ্বিতীয়তঃ, বুদ্ধির মাধ্যমে আমরা যখন জ্ঞান আহরণ করি, তখন শুধু বিশ্লেষণ করি না, তুলনাও করি, অর্থাৎ আমাদের বুদ্ধি-লব্ধ জ্ঞান শুধু বিশ্লেষণাত্মক নহে, তুলনামূলকও বটে। একটি জিনিষ দেখিয়া আমি বলিলাম "ইহা কলম"। ইহার অর্থ এই যে দোয়াত বা পেন্সিল বা কাগজের সহিত তুলনা করিয়া আমি ইহাকে কলম বলিয়া অবগত হইতেছি; নতুবা ইহাকে কলম নামে বা কোন নামেই অভিহিত করিতে পারিতাম না। সেইরূপ, তুলনা করিয়া আমি কোন কলমকে ভাল বলি আর কোন কলমকে খারাপ বলি, কোন জিনিষকে সুন্দর বলি আর কোন জিনিষকে বা অসুন্দর বলি। এইভাবে বিভিন্ন দৃষ্টিবিন্দু হইতে তুলনা করিয়া আমরা নানাবিধ জ্ঞান লাভ করি। জ্ঞান লাভের পক্ষে ইহা খুব সহজ পন্থা বটে, কিন্তু উহার বিশ্লেষণাত্মক ক্রিয়া প্রসঙ্গে যাহা

বলা হইয়াছে, উহার এই তুলনামূলক ক্রিয়া সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা বলা যাইতে পারে। বিশ্লেষণের ফলে আমরা যেমন বিষয়বস্তুর যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি না, তুলনার ফলেও আমরা তেমন উহার যথার্থ স্বরূপ অবগত হইতে পারি না। কারণ, আমরা যখন বস্তুগুলির তুলনা করি, তখন বাহির হইতে লক্ষ্য করিয়াই তুলনা করি; ফলে উহাদের বাহ্যিক সাদৃশ্য বা বাহ্যিক বৈসাদৃশ্যই আমাদের চোখে পড়ে, উহাদের অন্তর্নিহিত প্রাণ-সত্তার কোন পরিচয় পাই না। প্রাণ-সত্তার পরিচয় পাইতে হইলে উহাদের অন্তরে প্রবেশ করিতে হইবে। কিন্তু বুদ্ধির দ্বারা তো ইহা সম্ভব নহে; বুদ্ধির দ্বারা আমরা একটি বস্তুর সহিত আর একটি বস্তুর তুলনা করি, উহাদের বাহ্যিক রূপ-বৈচিত্র্য লক্ষ্য করি, অর্থাৎ উহাদের চারিদিকে ঘোরাফেরা করি, কিন্তু উহাদের অন্তরে প্রবেশ করিতে পারি না। অথচ অন্তরে প্রবেশ না করিতে পারিলে, শুধু বাহির হইতে লক্ষ্য করিয়া তো উহাদের মর্মকথা উপলব্ধি করা যায় না। তাই আমরা বলিয়াছি, উহাদের অন্তরে প্রবেশ করিতে হইবে; কিন্তু বুদ্ধির পক্ষে ইহা সম্ভব নহে; একমাত্র স্বজ্ঞার পক্ষেই ইহা সম্ভব। কারণ, স্বজ্ঞার জন্য অন্য কোন বস্তুর সহিত তুলনা করিবার প্রয়োজন নাই, জ্ঞাতব্য বিষয়টিকে আমরা সাক্ষাৎভাবে আমাদের ধ্যানের বিষয়ীভূত করিতে পারি। তখন জ্ঞাতা ও জ্ঞাতব্যের মধ্যে কোন দূরত্ব বা পার্থক্য থাকে না; জ্ঞাতা তখন জ্ঞাতব্যের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া একাত্ম হইয়া যায়; ফলে উহার অন্তঃস্বরূপ জ্ঞাতার নিকট আর অবিদিত থাকে না, পূর্ণরূপে প্রকটিত হইয়া পড়ে।

উপসংহার

এই প্রসঙ্গের উপসংহারে বলা যায় যে, বুদ্ধি-লব্ধ জ্ঞানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে যেরকম দূরত্ব বোধ থাকে, স্বজ্ঞা-লব্ধ জ্ঞানে সেরকম কোন দূরত্ব বোধ নাই। বুদ্ধির দ্বারা আমরা যে ঈশ্বরের কথা জানিতে পারি, সে ঈশ্বর আমাদের বাহিরে থাকেন, আমরা দূর হইতে তাঁহাকে লক্ষ্য করি। কিন্তু স্বজ্ঞার মাধ্যমে ঋষি যে ঈশ্বরের সত্তা উপলব্ধি করেন, সে ঈশ্বর তো দূরে অবস্থিত নাই, সে ঈশ্বর তাঁহার হৃদয় কন্দরে অধিষ্ঠিত আছেন; তাই তিনি সাক্ষাৎভাবে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। ইহাই স্বজ্ঞা-লব্ধ জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য; এক্ষেত্রে একাত্মবোধ আছে; দ্বিত্ব বোধ নাই। নদীর জল যেমন সমুদ্রের মধ্যে আসিয়া এক হইয়া যায়, জ্ঞাতাও

তেমন জ্ঞাতব্যের মধ্যে মিলিত হইয়া একাত্ম অনুভব করে, উহাদের মধ্যে তখন আর কোন ব্যবধান থাকে না, উহারা তখন "ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই ভেদ নাই"। কিন্তু বুদ্ধি-লব্ধ জ্ঞানে দেখি ঠিক ইহার বিপরীত অবস্থা; জ্ঞাতা থাকে একদিকে, আর জ্ঞেয় থাকে অন্যদিকে; জ্ঞাতা দূর হইতে জ্ঞেয়কে জানিবার চেষ্টা করে, তাই এখানে দ্বিত্ব-বোধ আছে, একাত্ম-বোধ নাই। আর এক কথা; একাত্মতা না থাকাতে জ্ঞাতার পক্ষে জ্ঞাতব্য বস্তুকে একই মুহূর্তে সমগ্রভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব নহে; উহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া আংশিকরূপে প্রত্যক্ষ করিতে হয়। যেক্ষেত্রে সামগ্রিক দৃষ্টি-বিন্দু সম্ভব নহে; সেক্ষেত্রে স্বভাবতঃই আমাদিগকে নিজ নিজ সংকীর্ণ দৃষ্টিবিন্দু হইতে বিষয়টি অনুশীলন করিতে হয়. কিন্তু ইহাতে মুশকিল আছে। মুশকিল এই যে, দৃষ্টিবিন্দুর বিভিন্নতা হেতু আমাদের প্রত্যেকের সিদ্ধান্তও বিভিন্ন হইয়া থাকে; ফলে পরমতত্ত্ব প্রসঙ্গে আমরা কেহই একমত হইতে পারি না। এ বিষয়ে একটি সুন্দর গল্প আছে: চারিজন অন্ধ ব্যক্তিকে হাতীর রূপ বর্ণনা করিতে বলা হইল। যে ব্যক্তি হাতীর শুঁড় ধরিয়াছিল সে একরকম বর্ণনা করিল আর যে হাতীর দাঁত ধরিয়াছিল সে আর একরকম বর্ণনা করিল, সেইরূপ যে হাতীর পা ধরিয়াছিল আর যে হাতীর কান ধরিয়াছিল তাহারাও বিভিন্ন রকমের বর্ণনা দিল। মোট কথা কাহারও বর্ণনা একই রকমের হইল না। হইবে কেমন করিয়া? প্রত্যেকেই বিভিন্ন দৃষ্টি-বিন্দু হইতে হাতীর রূপ অনুমান করিতেছে, সেইজন্য কেহই একমত হইতে পারিতেছে না। কিন্তু একজন চক্ষুষ্মান ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা কর, সে সম্পূর্ণ হস্তিটিকে সামগ্রিক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়া যাহা বলিবে সে সম্বন্ধে আর কাহারও কোন দ্বিমত হইবার সম্ভাবনা নাই। চক্ষুষ্মান ব্যক্তির এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে আমরা স্বজ্ঞার সহিত তুলনা করিতে পারি; স্বজ্ঞার মাধ্যমে পরমসত্তার যে সাক্ষাৎ উপলব্ধি আমরা পাই তাহা সামগ্রিক এবং সঠিক। আর বুদ্ধির মাধ্যমে পরমসত্তার যে সন্ধান পাই তাহা অন্ধ ব্যক্তির হস্তি বর্ণনার ন্যায় আংশিক এবং বিভ্রান্তিকর।

উপরিউক্ত ব্যাখ্যার ফলে স্বজ্ঞার যে কয়েকটি লক্ষণ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে; নিম্নে তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে। প্রথমতঃ এক্ষেত্রে জ্ঞাতা ও জ্ঞাতব্যের মধ্যে কোন দূরত্ব বা ব্যবধান নাই। জ্ঞাতা সাক্ষাৎভাবে জ্ঞাতব্যকে উপলব্ধি করিতে পারে, যেমন ঋষি সাক্ষাৎভাবে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, কোন মধ্যবর্তী পন্থার সাহায্য লইতে হয় না। দ্বিতীয়তঃ, এক্ষেত্রে

কোন সংকীর্ণ দৃষ্টিবিন্দু হইতে আমরা বিষয়টিকে প্রত্যক্ষ করি না; সংকীর্ণ দৃষ্টিতে বিচার করিলেই বিষয়বস্তুকে অংশসমূহে বিভাগ করিয়া ফেলা হয়; তাহাতে উহার সামগ্রিক সত্তা নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু স্বজ্ঞার মাধ্যমে আমরা যখন প্রত্যক্ষ করি, তখন আমরা উহাকে সামগ্রিকভাবেই উপলব্ধি করি, আংশিকভাবে নহে। তৃতীয়তঃ, স্বজ্ঞার মধ্যে কোন ভুল ভ্রান্তির সম্ভাবনা নাই। যেখানে অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হয় সেখানেই ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা আছে; কিন্তু স্বজ্ঞার মধ্যে অনুমানের কোন স্থান নাই, এখানে বিশ্লেষণ নাই, তুলনামূলক বিচার নাই, অর্থাৎ অনুমান সম্পর্কিত কোনপ্রকার ক্রিয়া প্রক্রিয়া নাই, তাই এখানে ভুল-ভ্রান্তিরও কোন সম্ভাবনা নাই। এখানে আছে শুধু সাক্ষাৎ এবং প্রত্যক্ষ উপলব্ধি; সেইজন্য স্বজ্ঞা-লব্ধ জ্ঞানকে অভ্রান্ত বলিয়া বর্ণনা করা হয়।

স্বজ্ঞা সম্বন্ধে Bergson যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহার মধ্যে এই তিনটি লক্ষণই পরিস্ফুট আছে। তাঁহার মতে "Intuition is a kind of intellectual sympathy by which one places oneself within an object.।" এখানে Sympathy বা সহানুভূতি শব্দটির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। পীড়িত শিশুর বেদনা ডাক্তার বুঝিতে পারেন, আবার জননীও বুঝিতে পারেন; কিন্তু ডাক্তার বোঝেন বুদ্ধির সাহায্যে অনুমানের মাধ্যমে, আর জননী বোঝেন সহানুভূতির সাহায্যে প্রত্যক্ষভাবে। শিশুর সহিত জননীর যে নাড়ীর টান বা একাত্মবোধ আছে; ডাক্তারের তাহা নাই; তাই জননী শিশুর ব্যথা নিজের ব্যথা বলিয়া অনুভব করেন, ডাক্তার তাহা পারেন না।

সমালোচনা

এখন স্বজ্ঞা-লব্ধ জ্ঞানের সমালোচনা করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করা যাউক। প্রথমতঃ স্বজ্ঞা-লব্ধ জ্ঞানে অবগতি অপেক্ষা অনুভূতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় বেশী। অতীন্দ্রিয়বাদিগণ (Mystics) বলেন যে, স্বজ্ঞার মাধ্যমেই তাঁহারা পরমাত্মার সহিত একাত্মতা উপলব্ধি করেন। এই উপলব্ধির মধ্যে অবগতি অপেক্ষা অনুভূতির পরিমাণই যে বেশি, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে শুষ্ক বিচার বুদ্ধির মাধ্যমে নহে, রসঘন অনুভূতির মাধ্যমেই জননী তাঁহার শিশুর বেদনা বুঝিতে পারেন। এই অনুভূতির নাম Sympathy বা সহানুভূতি। আমরা এই অনুভূতিকে অবহেলা করিতে চাই না; তবে ইহা ঠিক যে, যখন অনুভূতি আসিয়া পাইয়া বসে তখন অবগতির পথ রুদ্ধ হইয়া যায়; আমরা যখন ভাবের আবেগে অভিভূত হইয়া পড়ি, তখন

আমরা জ্ঞানের আলো দেখিতে পাই না; ভাবগ্রস্থ অবস্থায় সম্যক উপলব্ধি সম্ভব নহে। দ্বিতীয়তঃ, অনুভূতি নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার; যাহা আমার নিকট প্রীতিজনক বলিয়া অ.ভূত হয় অপরের নিকট তাহা প্রীতিজনক নাও হইতে পারে। যে প্রতিমা হিন্দুর মনে ভক্তিব উদ্রেক করে, মুসলমানের মনে তাহা ভক্তির উদ্রেক করে না; আবার মুসলমানের নিকট যাহা কঠোর সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, অপরের নিকট তাহা নাও হইতে পারে। এমতাবস্থায় সত্য আহরণের জন্য স্বজ্ঞার উপর নির্ভর করিয়া থাকা মোটেই নিরাপদ নহে; কারণ পূর্বেই বলিয়াছি, স্বজ্ঞা অনুভূতি-প্রধান, অবগতি-প্রধান নহে। অনুভূতির মাধ্যমে যে তথ্য পাওয়া যায় তাহা ব্যক্তিবিশেষের নিকট সত্য হইলেও সকলের নিকটেই সমান সত্য নহে। তাই দেখি অতীন্দ্রিয়-বাদিগণও তাঁহাদের স্বজ্ঞা-লব্ধ তথ্য সম্বন্ধে একমত নহেন; তাহাদের মধ্যেও যথেষ্ট মতানৈক্য আছে। ইহার অর্থ এই যে স্বজ্ঞা-লব্ধ সকল তথ্যই সঠিক নহে; নতুবা তাঁহারা এক সর্ববাদীসম্মত তথ্য আবিষ্কার করিতে পারিতেন। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, বুদ্ধি-লব্ধ জ্ঞানের মধ্যে যেমন ভুল-ভ্রান্তি থাকা সম্ভব, স্বজ্ঞা-লব্ধ জ্ঞানের মধ্যেও তেমন ভুল-ভ্রান্তি থাকা সম্ভব; অর্থাৎ ইহা অভ্রান্ত নহে।

তৃতীয়তঃ, স্বজ্ঞাকেও প্রজ্ঞাব নিকট নতি স্বীকাব করিতে হয়। প্রজ্ঞা মানে বিচারবুদ্ধি, Intellect। যাঁহারা স্বজ্ঞাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন, তাহারা শুধু মনে করিলেই তো ইহা হইবে না; তাঁহাদের এই তথ্য প্রমাণ করিতে হইবে। তাই নানা যুক্তি-তর্কের দ্বারা তাঁহারা স্বজ্ঞার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিয়া থাকেন। কিন্তু এইখানেই বিপদ, কারণ যুক্তির দ্বারা ইহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা মানে বিচার-বুদ্ধির নিকট নতি স্বীকার করা। আমরা যদি বিচার করিয়া ইহাকে শ্রেষ্ঠ বলি, তবেই ইহা শ্রেষ্ঠ। ইহার অর্থ এই যে স্বজ্ঞা অপেক্ষা বিচার-বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ; নতুবা স্বজ্ঞা আসিয়া বিচার-বুদ্ধির অনু-মোদন যাচ্ঞা করিবে কেন? তাই স্বজ্ঞাবাদিগণকে পদে পদে প্রমাণ করিতে হয় যে স্বজ্ঞার মাধ্যমে তাঁহারা যে তথ্যের সন্ধান পান তাহা মোটেই অযৌক্তিক নহে; উহা যুক্তিসম্মত, অতএব গ্রাহ্য। এইখানেই বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব।

তবে আমরা স্বজ্ঞাকে একেবারে অস্বীকার করি না, জ্ঞান আহরণের জন্য স্বজ্ঞারও প্রয়োজন আছে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, কেবল অতীন্দ্রিয়-জগৎ সম্বন্ধে কেন, কাব্য-জগৎ, বিজ্ঞান-জগৎ এমন কি সাধারণ-জগৎ সম্পর্কীয় চিন্তাতেও স্বজ্ঞার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মহাকবি ও মহাবৈজ্ঞানিক

অনেক সময়ে যে অসাধারণ কল্পনা করিয়া বসেন; তাহা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বুদ্ধি-প্রসূত ক্রিয়া বলিয়া মনে হয় না। তাঁহারা যে ভাবিয়া চিন্তিয়া, বিচার বিবেচনা করিয়া এমন অসাধারণ কল্পনা করিয়াছেন, ঠিক তাহা নহে। বিদ্যুতের ন্যায় হঠাৎ ইহা তাহাদের মনের মধ্যে আসিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ইহাকে আমরা স্বজ্ঞা-লব্ধ জ্ঞান বলিতে পারি। অতএব স্বজ্ঞার কার্য্যকারিতা আমরা অস্বীকার করি না; আমরা শুধু বলি যে; স্বজ্ঞার মাধ্যমে আমরা যে জ্ঞান লাভ করি তাহা স্বজ্ঞা-লব্ধ হইলেও অযৌক্তিক হইতে পারিবে না; উহাকেও যুক্তিসম্মত ও বুদ্ধিগ্রাহ্য হইতে হইবে।

বিংশ অধ্যায়

জ্ঞানের বিষয়বস্তু

Realism and Idealism

জ্ঞান-তত্ত্ব প্রসঙ্গে এখন আমরা আর একটি প্রশ্ন আলোচনা করিব। আমরা সকলেই জ্ঞান আহরণ করি বটে, কিন্তু আমাদের জ্ঞানের বিষয়বস্তু কি ? আমরা কি বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করি (Object of knowledge)? এই প্রশ্নের আলোচনা প্রসঙ্গে সাধারণতঃ দুই প্রকার মতবাদের উদ্ভব হইয়াছে, বস্তুবাদ এবং ভাববাদ—Realism এবং Idealism। ইহাদের মধ্যে আবার নানারকম প্রকারভেদ আছে; আমরা একে একে ইহাদের কথা আলোচনা করিব।

বস্তুবাদ (Realism)

বস্তুবাদ দুই রকমের, সাধারণ বস্তুবাদ (Popular or Naive Realism) এবং বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ (Scientific Realism)। প্রথমে সাধারণ মতবাদের কথা লওয়া যাউক। উদাহরণ; আমি বাগানে ফুল দেখিতেছি; এক্ষেত্রে আমি জ্ঞাতা এবং ফুল জ্ঞেয়। সাধারণ মতানুসারে ইহাদের প্রত্যেকেরই স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সত্তা আছে; আমার যেমন স্বাধীন সত্তা আছে, ফুলেরও তেমন স্বাধীন সত্তা আছে। আমি দেখি বা না দেখি, বহির্জগতে ফুল বলিয়া এক স্বতন্ত্র বস্তু আছে; ইহার নিজস্ব গন্ধ আছে, রং আছে, আকার আছে, আয়তন আছে, অর্থাৎ বিবিধ গুণসমন্বিত হইয়া ইহা বহির্জগতে বিরাজ করিতেছে। আমি দেখিতেছি—ভাল; কিন্তু কেহ না দেখিলেও ইহার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না; ইহা যেমন আছে তেমনই

রহিয়া যায়। এক কথায়, ইহা জ্ঞান নিরপেক্ষ বস্তু; কাহারও দেখা বা না দেখার উপর ইহার অস্তিত্ব নির্ভর করে না। এই মতবাদকে **"সাধারণ বস্তুবাদ"** বলা হয়। **বস্তুবাদ,** কারণ, এক্ষেত্রে বস্তুর স্বাধীন ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করা হইতেছে; আর, **সাধারণ,** কারণ সাধারণতঃ আমরা সকলেই বিশ্বাস করি যে বহির্জগতে সত্যই বস্তু বিদ্যমান আছে; সেইজন্য যে কোন লোক ইচ্ছা করিলেই ইহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে। বাগানের ফুলটি শুধু তুমি আর আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহা নহে; রাম, শ্যাম, যদু, হরি, যে কেহ এইদিকে তাকাইতেছে সেই ফুলটি দেখিতে পাইতেছে। মোটকথা, ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কাহারো কোন সন্দেহ নাই; এবিষয়ে সকলেই একমত। আর এক কথা, তাহারা শুধু ফুলটি দেখিতেছে, তাহা নহে; ফুলটি যেমন আছে ঠিক তেমন ভাবেই তাহারা ইহা দেখিতে পাইতেছে। তাহাদের মনের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হইয়া ইহা একটুও পরিবর্তিত রূপ গ্রহণ করিতেছে না; অর্থাৎ বহির্জগতে ইহা যে রূপে বিদ্যমান আছে, মনোজগতেও ইহা ঠিক সেই রূপেই প্রতিভাত হইতেছে: ইহার বাস্তব রূপ আর মানস রূপের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

Scientific Realism (Locke)

উপরিউক্ত মতবাদ যতই সহজ বলিয়া প্রতীয়মান হউক না কেন, ইহার মধ্যে যথেষ্ট ত্রুটি আছে; ইহা গ্রহণ করা যাইতে পারে না। Locke বলেন, বহির্জগতে ফুল আছে বটে, তবে ফুলের সবটুকুই বহির্জগতে বর্তমান নাই; কিছু আছে মনোজগতে আর কিছু আছে বহির্জগতে। কথাটি ভাল করিয়া বুঝান যাউক। ফল ফুল, কাগজ কলম প্রভৃতি যে কোন বস্তুর কথাই লওয়া যাউক না কেন, একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে ইহাদের প্রত্যেকেরই দুই রকম গুণ আছে, মুখ্যগুণ (Primary qualities) এবং গৌণগুণ (Secondary qualities)। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা প্রভৃতি স্থান সম্বন্ধীয় গুণকে মুখ্যগুণ বলা হয় আর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধকে গৌনগুণ বলা হয়। ফুলের উদাহরণটি লওয়া যাউক। ইহার বর্ণ লাল এবং গন্ধ মধুর; এই বর্ণ ও গন্ধের জন্য ফুলটি যত মনোহরই হউক না কেন—এই গুণগুলি তাহার মুখ্যগুণ নহে, গৌণগুণ। কারণ এই গুণগুলি না থাকিলেও ফুলের অস্তিত্ব নষ্ট হয় না; ফুলটি শুকাইয়া গেলে ইহার গন্ধ নষ্ট হইয়া যাইবে এবং ইহার বর্ণও পরিবর্তিত হইয়া যাইবে, কিন্তু ফুলটির অস্তিত্ব নষ্ট হইবে না; তাই এই গুণগুলিকে গৌণগুণ বলা হয়, কারণ বস্তুটির অস্তিত্বের জন্য এই গুণগুলি মোটেই অপরিহার্য নহে; এই গুণগুলি বাদ গেলেও ফুলটি বজায় থাকিয়া যায়। কিন্তু মুখ্যগুণ সম্বন্ধে ইহা বলা যায় না;

মুখ্যগুণ মানে স্থান সম্বন্ধীয় গুণ, যেমন দৈর্ঘ্য-প্রস্থ, আকৃতি-আয়তন প্রভৃতি গুণ। যে বস্তুর কোন দৈর্ঘ্য প্রস্থ বা আকৃতি নাই, সেই বস্তুর অস্তিত্ব সম্ভব কি? মনে করা যাউক আমাদের উপরিউক্ত গোলাপ ফুলটির দৈর্ঘ্য প্রস্থ বা উচ্চতা নাই; ইহার আকৃতি নাই, আয়তন নাই, ঘনত্ব নাই—এক কথায় স্থান সম্বন্ধীয় কোন গুণই নাই—তাহা হইলে বহির্জগতে ফুল বলিয়া কোন বস্তু থাকিতে পারে কি? ইহা অসম্ভব। বহির্জগতে অবস্থান করিতে হইলেই ইহাকে কিঞ্চিৎ স্থান দখল করিয়া বিরাজ করিতে হইবে, এবং স্থান দখল করিলেই ইহাকে কিঞ্চিৎ দীর্ঘ প্রস্থ বা উচ্চরূপে প্রতিভাত হইতে হইবে। অতএব যাহার স্থান সম্বন্ধীয় কোন গুণই নাই তাহার জাগতিক অস্তিত্ব সম্ভব নহে। এক কথায় মুখ্যগুণগুলি বস্তুর অপরিহার্য গুণ। গৌণগুণ, যেমন রং না থাকিলেও বাতাসের অস্তিত্ব সম্ভব, কিন্তু স্থানব্যাপ্তি না থাকিলে বাতাসের অস্তিত্ব সম্ভব নহে।

মুখ্যগুণ ও গৌণগুণ

এইভাবে জড়পদার্থের গুণগুলিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়া Locke বলেন যে, মুখ্যগুণ মনঃনিরপেক্ষ গুণ। কিন্তু গৌণগুণ-গুলি মনঃনিরপেক্ষ নহে; আমাদের মনের ওপর ইহাদের অস্তিত্ব নির্ভর করে। যেমন ধর, রং, আমি যাহাকে লাল বলি, একজন বর্ণান্ধ ব্যক্তি তাহাকে লাল বলে না। সেইরূপ গন্ধ; বর্মীদের নিকট ভাপীর (শুকনা মাছ) গন্ধ অতি মনোরম, কিন্তু সে গন্ধে আমার বা তোমার বমি হইয়া যাইবে। অন্যান্য গৌণগুণ সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা বলা যাইতে পারে। যাহা মাদ্রাজীর নিকট সুস্বাদু তাহা বাঙালীর নিকট সুস্বাদু নহে; আবার যে গান শুনিয়া একজন ইংরাজ বালক মুগ্ধ হইয়া যায় সে গান আমার নিকট অত্যন্ত কর্কশ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। মোট কথা, এই গুণগুলি আমাদের নিজ নিজ মানসিক অবস্থার উপরে নির্ভর করে; আমাদের মানসিক রুচি বিভিন্ন বলিয়া আমার নিকট যাহা সুগন্ধ লাগে তোমার নিকট তাহা সুগন্ধ লাগে না। তাহা হইলে বলিতে হইবে যে সুগন্ধ বা দুর্গন্ধের কোন জাগতিক সত্তা নাই। কারণ, সত্যই যদি ইহার কোন জাগতিক সত্তা থাকিত তাহা হইলে সকলের নিকটেই ইহা সুগন্ধ বা সকলের নিকটেই ইহা দুর্গন্ধ বলিয়া প্রতিভাত হইত। কিন্তু তাহা যখন হইতেছে না তখন স্বীকার করিতে হইবে যে গন্ধ আমাদের মনের সৃষ্টিমাত্র; নিজেদের মনে সৃষ্টি করিয়া আমরা বস্তুর মধ্যে বিলাইয়া দিয়াছি। এবং বিলাইয়া দিয়া ভাবিতেছি যে বস্তুর মধ্যেই বুঝি ইহা নিহিত আছে; কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে বস্তুর মধ্যে কোন গন্ধ নাই। বস্তু শুধু বস্তু মাত্র, সুগন্ধও নহে, দুর্গন্ধও নহে।

গন্ধ আমাদের মানসিক সৃষ্টি ; বস্তুর মধ্যে আরোপ করিয়া ইহাকে সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ বলিয়া মনে করিতেছি।

Locke বলেন যে, গৌণগুণ মনের সৃষ্টি বটে, কিন্তু মুখ্যগুণ মনের সৃষ্টি নহে। মুখ্যগুণ স্থান সম্বন্ধীয় গুণ, বাস্তব জগতে ইহার সত্যিকারের অস্তিত্ব আছে ; তাই আমরা সকলেই ইহা সমানভাবে প্রত্যক্ষ করিতে পারি, ইহার সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে কোনপ্রকার মতানৈক্য নাই। যে জিনিষটি গোলাকার তাহা সকলের নিকটেই গোলাকার ; যাহা দীর্ঘ তাহা সকলের নিকটেই দীর্ঘ, যাহা ঋজু তাহা সকলের নিকটেই ঋজু, কাহারো নিকট ঋজু আর কাহারো নিকট বক্র নহে। সেইরূপ, জিনিষের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতা, বা নৈকট্য-দূরত্ব প্রভৃতি গুণ সম্বন্ধে আমরা সকলেই একমত। গৌণগুণের ন্যায় এইসব মুখ্যগুণ আমাদের মানসিক অবস্থার উপরে নির্ভর করে না ; সেইজন্য জ্ঞাতার রুচি অনুসারে ইহারা বিভিন্নক্ষেত্রে বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হয় না ; ইহারা সকলের নিকটেই একইরূপে প্রতিভাত হয়। এক কথায়, ইহারা জ্ঞান সাপেক্ষ বস্তু নহে, ইহাদের প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সত্তা আছে।

তাহা হইলে দেখা গেল যে, Locke-এর মতানুসারে বাস্তব পদার্থের দুইরকম গুণ আছে, মুখ্যগুণ ও গৌণগুণ ; তবে গৌণগুণের কোন বাস্তব সত্তা নাই, ইহা আমাদের মানসিক সৃষ্টি (Subjective) ; কিন্তু মুখ্যগুণ আমাদের মানসিক সৃষ্টি নহে, ইহার বাস্তব অস্তিত্ব আছে (Objective)। এইখানেই সাধারণ বস্তুবাদের সহিত বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের পার্থক্য। সাধারণ মতানুসারে ; পরিদৃশ্যমান জগতের সবটুকুই বাস্তব ; ইহার শব্দ বা স্বাদ বা গন্ধ যেমন বাস্তব, ইহার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতাও তেমন বাস্তব। এক কথায়, বহির্জগতে শুধু পুষ্পাকার এক পদার্থ আছে, তাহা নহে, পুষ্পের সঙ্গে সঙ্গে উহার গন্ধ ও বর্ণও বিদ্যমান আছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত বলেন যে, বহির্জগতে শুধু এক পুষ্পাকার পদার্থ বিদ্যমান আছে কিন্তু উহার কোন বর্ণ বা গন্ধ নাই। বর্ণ বা গন্ধ আমাদের মনের সৃষ্টি ; উহার কোন বাস্তব সত্তা নাই। নারী সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন, "অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা", সেইরূপ, প্রত্যেক জড়বস্তু সম্বন্ধেও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত বলিতে পারেন "অর্ধেক মানস তুমি অর্ধেক বাস্তব"। জড় বস্তুর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ, আকৃতি-আয়তন প্রভৃতি মুখ্যগুণ বাস্তব, উহারা বহির্জগতে বিরাজ করে ; আর বর্ণ-গন্ধ-শব্দ প্রভৃতি গৌণগুণ মানস—উহারা মনোজগতে বিরাজ করে, বহির্জগতে উহাদের কোন অস্তিত্ব নাই।

মুখ্যগুণ (Representationalism)

সাধারণ বস্তুবাদের সহিত বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের আর একটি পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া আমরা এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। সাধারণ মতানুসারে, বাহিরের ফুলটি সাক্ষাৎভাবে আমাদের মনের মধ্যে প্রতিভাত হয়; বাহিরে যেমন আছে ঠিক তেমনভাবেই আমাদের মনের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। কিন্তু Locke বলেন, ইহা ঠিক নহে। বাহিরের ফুলটি প্রথমে ইন্দ্রিয়ের মারফতে আমার মনের উপর ক্রিয়া করে; ফলে আমার মনের মধ্যে ফুলের এক ধারণার সৃষ্টি হয়; পরে এই ধারণার মাধ্যমে আমি ফুলের কথা অবগত হইয়া থাকি। বহির্জগতে যে ফুলটি আছে, তাহাকে বাস্তব-ফুল বলা যাউক; উহা আমার মনের মধ্যে যে ধারণার সৃষ্টি করে, তাহাকে মানস-ফুল বলা যাউক। এই মানস-ফুলের মাধ্যমেই আমি বাস্তব-ফুলের অস্তিত্ব অবগত হইযা থাকি। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, আমরা সরাসরিভাবে বাস্তব জগতের কথা জানিতে পারি না; উহার মানসরূপের মাধ্যমে উহার বাস্তবরূপের কথা জানিতে পারি। এইখানেই সাধারণ মতবাদের সহিত Locke-এর মতবাদের পার্থক্য। সাধারণ মতে আমরা সরাসরিভাবে বাস্তব ফুলটি প্রত্যক্ষ করিতে পারি; কাহারো মধ্যস্থতা গ্রহণ করিবার প্রয়োজন হয় না; কিন্তু Locke-এর মতানুসারে আমরা সরাসরি ভাবে বাস্তব ফুলটি প্রত্যক্ষ করিতে পারি না; প্রথমে উহার মানস ছবিটি লক্ষ্য করি, তারপরে উহারই মাধ্যমে, বাস্তব ফুলটি প্রত্যক্ষ করি।

যে ক্ষেত্রে রাজার সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় সম্ভব নহে, সে ক্ষেত্রে তাহার প্রতিনিধি বা প্রতিভূর (Representative) মাধ্যমেই আলাপ আলোচনা করিতে হইবে। Locke-এর মতানুসারে, রাজার ন্যায় এই জড়জগৎও আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাহিরে; অতএব ইহার সহিত পরিচয় স্থাপন করিতে হইলে প্রতিনিধির সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। আমাদের মনের মধ্যে জড়জগৎ যে সব ধারণার সৃষ্টি করিয়াছে—উহাই জড়জগতের প্রতিনিধি; উহার মাধ্যমেই আমরা জড়জগতের কথা অবগত হইয়া থাকি। কোন কোন ক্ষেত্রে এই ধারণা জড়জগতের অবিকল প্রতিরূপ মাত্র; ফলে উহার মাধ্যমে জড়পদার্থের কথা সম্যক অবগত হওয়া আমাদের পক্ষে একটুও অসুবিধাজনক নহে। যেমন দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, ঘনত্ব, দূরত্ব প্রভৃতি মুখ্যগুণ; জড়পদার্থের মধ্যে ইহা যেমন ভাবে বিরাজ করে আমাদের মনের মধ্যেও ইহা ঠিক তেমন ভাবেই প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। অতএব এইসব মানস ছবির মাধ্যমে আমরা যে বাস্তব পদার্থের কথা অবিকল ভাবে জানিতে পারি। তাহাতে আর আশ্চর্য কি? গান্ধীজীর ছবির সহিত

গান্ধীজীর চেহারার অবিকল সাদৃশ্য আছে, তাই তাঁহার ছবি দেখিয়া আমরা অনায়াসে তাঁহার কথা জানিতে পারি। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে মানস-ছবির সহিত বাস্তব পদার্থের মোটেই সাদৃশ্য নাই; তথাপি আমরা ঐ ছবির মাধ্যমেই বাস্তব জগতের কথা অবগত হইয়া থাকি। ওয়ার্ধা গিয়া গান্ধীজীর যে সব নিত্য-ব্যবহৃত জিনিষপত্র দেখি, উহাদের সহিত গান্ধীজীর যে কোনপ্রকার সাদৃশ্য নাই, তাহা বলাই বাহুল্য; তবুও ঐগুলি দেখিয়াই আমরা গান্ধীজীর কথা স্মরণ করিতে পারি; কারণ উহাদের মধ্যে এমন এক শক্তি আছে যাহা আমাদের মনে গান্ধীজীর মূর্তি পুনরুদ্রেকে না করিয়া পারে না, তাই আমরা মানস চক্ষে তাঁহাকে যেন প্রত্যক্ষ করিতে থাকি। Locke বলেন গৌণগুণ সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা প্রযোজ্য। আমরা যে বর্ণ বা গন্ধ বা শব্দ প্রত্যক্ষ করি—তাহার সহিত জড়-জগতের কোনপ্রকার সাদৃশ্য নাই; তবুও ইহারই মাধ্যমে আমরা জড়জগৎ সম্বন্ধে অনেক কথাই জানিতে পারি। ইহার মধ্যে এমন এক শক্তি আছে যাহা জড়-জগতের প্রতি নির্দেশ করে, এবং জড়বস্তু সম্বন্ধে আমাদিগকে নানাবিধ সংবাদ প্রদান করে।

গৌণগুণ (Representationalism)

কিন্তু জড়বস্তু সম্বন্ধে আমাদিগকে ইহা কি প্রকার সংবাদ দান করিতে পারে? পূর্বেই তো বলিয়াছি, বর্ণ বা শব্দ বা গন্ধ—সম্পূর্ণ মানসিক ব্যাপার; ইহা মনের সৃষ্টি; বহির্জগতে ইহার অনুরূপ কোন জিনিষ নাই। তাহা হইলে বহির্জগতের কী কথা আমরা ইহার মাধ্যমে জানিতে পারি? কিসের প্রতিনিধিত্ব ইহা দাবী করিতে পারে? ইহার উত্তরে Locke বলেন যে, বহির্জগতে শব্দ নাই বটে, তবে বহির্জগতে এমন কিছু আছে যাহা শব্দ সৃষ্টি করিতে পারে; ইহাই শব্দের হেতু বা কারণ, যেমন বায়ুতরঙ্গ। সেইরূপ, বহির্জগতে আলো নাই বটে, কিন্তু বহির্জগতে ঈশ্বরের স্পন্দন তো আছে; এই ঈশ্বর-স্পন্দনই চোখে আসিয়া আলো সংবেদনে পরিণত হইয়া যাইতেছে। বহির্জগতে গন্ধ নাই বটে, কিন্তু বহির্জগতে রেণুকণা তো আছে; এই রেণুকণাই আমাদের নাকে আসিয়া গন্ধ-সংবেদনে পরিণত হইয়া যাইতেছে। সংবেদন মানসিক ব্যাপার, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু মানসিক ব্যাপার হইলেও ইহার মূলে আছে এক জাগতিক উদ্দীপনা; এই জাগতিক উদ্দীপনাই মনে আসিয়া সংবেদনে পরিণত হইয়া যাইতেছে। অতএব আমাদের মনে যখন সংবেদনের উদয় হয় তখন উহা "স্বভাবতঃই উহার জাগতিক উপকরণের প্রতি নির্দেশ প্রদান করে।

এই প্রসঙ্গে "মনোবিজ্ঞানে" আমরা যাহা বলিয়াছি তাহা এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। আমরা সাধারণতঃ বলিয়া থাকি যে, এই বিচিত্র জগৎ কত না রূপে ও কত না বর্ণে, কত না শব্দে ও কত না গন্ধে পরিপূর্ণ; অর্থাৎ আমরা মনে করি যে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস প্রভৃতি গৌণগুণগুলি সত্যই বুঝি জগতের অঙ্গে বিরাজ করিতেছে; সত্যই বুঝি ঘাসের গায়ে সবুজ রং লাগিয়া আছে, বজ্রের মধ্যে শব্দ নিহিত আছে, ফুলের ভিতরে গন্ধ প্রচ্ছন্ন আছে এবং কুইনাইনের মধ্যে তিক্ততা মিশিয়া আছে। কিন্তু আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, রূপ, রস, শব্দ বা গন্ধ সবই সংবেদন মাত্র; বহির্জগতে ইহাদের কোন অস্তিত্ব নাই; বহির্জগতে কোন বর্ণ নাই, গন্ধ নাই, স্বাদ নাই, শব্দ নাই—এসব কিছুই নাই। তাহা হইলে আছে কি? বর্ণহীন, গন্ধহীন, স্বাদহীন, শব্দহীন এই দুনিয়ায় তবে কি কিছুই নাই? অবশ্যই আছে; আছে শুধু তরঙ্গ এবং তরঙ্গ-সংঘাত, আছে শুধু অণু পরমাণু এবং তাহাদের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া। আকাশে বাতাসে জলে স্থলে সর্বত্রই তাহাদের অবাধ গতি; কখন একত্র মিলিত হইতেছে, কখন ভাঙিয়া যাইতেছে; কখনও বা অসীম জগতে ছুটিয়া চলিয়াছে। ইহাদের মিলন এবং ভাঙন, গতি এবং স্থিতি, স্পন্দন এবং উত্তেজন —এ সমস্তই জড়জগতের ক্রিয়া; এখানে সংবেদনের কোন অস্তিত্ব নাই, সংবেদনের অস্তিত্ব আছে শুধু আমাদের মনে। হারমনিয়ামের ভিতরে কোন ধ্বনি নাই, ধ্বনি আছে আমার মনের ভিতরে; বাতির ভিতরে কোন জ্যোতি নাই, জ্যোতি আছে আমার মনে। বাতি হইতে যে তরঙ্গ আসিতেছে তাহাই আমাদের চোখের সাহায্যে মনে যাইয়া জ্যোতিতে পরিণত হইতেছে। আমরা যদি চোখের ক্রিয়া না করিতাম, তবে দুনিয়ায় আলো আসিত কোথা হইতে? আমরা যদি কানের ব্যবহার না করিতাম, তবে দুনিয়ায় শব্দ আসিত কেমন করিয়া? আমাদের এই সকল ইন্দ্রিয় যদি বিকল হইয়া যায় তবে কোথায় থাকিবে বর্ণ আর কোথায় থাকিবে গন্ধ? যাহার চোখ নাই, দুনিয়া কি তাহার নিকট সম্পূর্ণ বর্ণহীন নহে? যাহার কান নাই, দুনিয়া কি তাহার নিকট সম্পূর্ণ শব্দহীন নহে? ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, শব্দ, স্বাদ, বর্ণ প্রভৃতি গুণ দুনিয়ার সম্পত্তি নহে; ইহা আমাদের মনের সৃষ্টি। আমরা নিজেরা নিজেদের মনে ইহা সৃষ্টি করিয়া দুনিয়ায় বিতরণ করিয়া দিয়াছি; ইহা আমাদের নিজেদের ধন, অপরকে বিলাইয়া দিয়াছি। এবং বিলাইয়া দিয়া ভাবিতেছি যে, ইহা বুঝি সত্যই অপরের জিনিষ, আমাদের নহে। অথচ ইহা যে প্রকৃত পক্ষে আমাদেরই সৃষ্টি এবং আমাদেরই দান তাহা ভুলিয়া গিয়াছি।

সমালোচনা

Locke দুই নৌকায় পা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যাহারা দুই নৌকাতে পা দিবার চেষ্টা করেন তাহাদের বিপদ সাধারণতঃ অবশ্যম্ভাবী। Locke-এর মতানুসারে প্রত্যেক জাগতিক বস্তুরই দুই প্রকার সত্তা আছে—বাস্তব সত্তা এবং মানস সত্তা। ফুলটির বাস্তব সত্তা আছে, তাই আমরা দেখি বা না দেখি তাহাতে ফুলের কোনই ক্ষতি হয় না; কেহ না দেখিলেও ইহা আমাদের মনের অগোচরে স্বাধীন ভাবে বিরাজ করিতে পারে। কিন্তু আমরা যখন দেখি, তখন উহার নিজস্ব বাস্তব সত্তা আমরা দেখিতে পাই না; আমাদের মনের বিষয়ীভূত হইয়া মানসরূপে উহা তখন আমাদের চিত্ত মধ্যে বিরাজ করে। এই মানস ছবির মাধ্যমেই আমরা জড়বস্তু প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, নতুবা সরাসরিভাবে জড়বস্তু প্রত্যক্ষ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। Locke বলেন, কোন কোন মানস ছবি জড়বস্তুর অবিকল অনুরূপ, আর কোন কোন মানস ছবি জড়বস্তুর অবিকল অনুরূপ নহে। এইখানেই Locke-এর বিপদ। মানস ছবি সত্যই জড়বস্তুর অনুরূপ কি না—তাহা কেমন করিয়া জানিতে পারা যায়? তাঁহার মতানুসারে বাস্তব সত্তা ও উহার মানস ছবি—সম্পূর্ণ বিভিন্ন জগতের জিনিষ, বাস্তব সত্তা আছে বহির্জগতে, আর মানস ছবি আছে মনোজগতে। এমতাবস্থায় মানস ছবিটি সত্যই বাস্তবের অনুরূপ কি না—তাহা কেমন করিয়া বলা যায়? দুইটির মধ্যে যেটি আমাদের মনের মধ্যে বিরাজ করে শুধু তাহার কথাই আমরা জানিতে পারি, আর যাহা আমাদের মনের অগোচরে বিদ্যমান থাকে, তাহার স্বরূপ জানা তো সম্ভব নহে। এইখানেই Locke-এর বিপদ।

তাই আমরা বলিয়াছি যে, দুই নৌকায় পা দিতে গিয়া Locke তাঁহার নিজের বিপদ ডাকিয়া আনিয়াছেন। তিনি বাস্তব-জগতে বিশ্বাস করেন, আবার ধারণা-জগতেও বিশ্বাস করেন; তাঁহার মতানুসারে আমাদের ধারণাগুলি নাকি বাস্তব পদার্থের অনুরূপ। অথচ সত্যই অনুরূপ কি না, তাহা জানিবার কোনই উপায় নাই। মোট-কথা, Locke যত চেষ্টাই করুন না কেন, এই দুই জগতের মধ্যে কোন সামঞ্জস্যই তিনি স্থাপন করিতে পারেন না। অথচ শুধু এক জগৎ লইয়াও তিনি সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না; তিনি দুই জগৎ-ই চান। তিনি Realist, তাই বস্তু-জগৎ না হইলে তাঁহার চলে না, আবার তিনি Representationalist, তাই ধারণা-জগৎ না হইলেও তাঁহার চলে না; কারণ এই ধারণার মধ্য দিয়াই তিনি জড়বস্তুর সন্ধান পাইতে চান—অথচ ধারণার মাধ্যমে উহার সন্ধান পাওয়া

মোটেই সম্ভব নহে। এইভাবে দুই নৌকায় পা দিতে গিয়া তিনি বিপদে পড়িয়া যান। শাস্ত্রে বলে "সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ"। অতএব অর্ধেক তাহাকে ত্যাগ করিতেই হইবে। তাই Berkeley বলেন যে, এই দুইটি জগতের মধ্যে একটি জগৎ যখন ত্যাগ করিতেই হইবে তখন বাস্তব-জগৎটি ত্যাগ করাই ভাল। তখন থাকিবে শুধু ধারণা-জগৎ, বাস্তব-জগৎ বলিয়া কোন জিনিষই তখন আর থাকিবে না। অতএব ধারণার সহিত বস্তুজগতের কোনরূপ সামঞ্জস্য আছে কি না—এরকম কোন প্রশ্নই তখন আর উত্থাপিত হইবে না; ফলে আমরা নিশ্চিন্ত চিত্তে আমাদের ধারণা-জগতের মধ্যে নিমগ্ন থাকিতে পারিব, কোনরূপ সন্দেহ বা সমস্যার উদয় হইবে না। ইহাই Berkeley-র মত। কিন্তু তাঁহার এই মতবাদ অনুসরণ করিতে গেলে দুনিয়ায় "বাস্তব" বলিয়া কোন জিনিষ থাকে না, সবই "মানস" হইয়া যায়, সবই ধারণারূপে আমাদের মনের মধ্যে বিরাজ করে, বাহিরে কিছুই থাকে না। ইহাকে Idealism বা ভাববাদ বলে। তাহা হইলে Realism বা বস্তুবাদের কি হইবে? Berkeley বলেন যে, বস্তুবাদ স্বীকার করিয়া লাভ কি? বস্তুবাদ স্বীকার করিলে যে সমস্যার উদ্ভব হয়, উহার তো কোন সমাধান পাওয়া যায় না, অতএব ইহাকে ত্যাগ করাই শ্রেয়।

Subjective Idealism (Berkeley)

আমরা বলিয়াছি যে Locke দুই নৌকায় পা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার আর এক নমুনা পাই যখন দেখি তিনি জড়বস্তুর গুণাবলীকে মুখ্যগুণ ও গৌণগুণরূপে বিভাগ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতানুসারে শব্দ, স্পর্শ. গন্ধ প্রভৃতি গৌণগুণ; ইহারা মনঃসাপেক্ষ গুণ; আমাদের মানসিক অবস্থার উপরে ইহারা নির্ভর করে। তাই যে জিনিষ আমার নিকট সুস্বাদু লাগে, সে জিনিষ অপরের নিকট সুস্বাদু লাগে না; যে জিনিষে আমি সুগন্ধ পাই অন্যলোকে সে জিনিষে মোটেই সুগন্ধ পায় না। অতএব গৌণগুণের কোন বাস্তব অস্তিত্ব নাই; ইহা আমাদের মনের সৃষ্টি, মনের মধ্যেই ইহা বিরাজ করে। কিন্তু মুখ্যগুণ স্থান সম্বন্ধীয় গুণ; ইহা মোটেই মানসিক ব্যাপার নহে; ইহার বাস্তব অস্তিত্ব আছে। তাই আমাদের মানসিক অবস্থার উপর ইহার স্বরূপ নির্ভর করে না; যাহা আমার নিকট ঋজু তাহা সকলের নিকটেই ঋজু; যাহা আমার নিকট গোলাকার, তাহা সকলের নিকটেই গোলাকার; বিভিন্ন লোকের নিকট ইহা বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হয় না।

Berkeley ইহা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন গৌণ গুণের ন্যায় মুখ্যগুণও

মনঃনিরপেক্ষ নহে, ইহাও আমাদের মানসিক অবস্থার উপরে নির্ভর করে; ফলে ইহাও বিভিন্ন লোকের নিকটে বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়। টেবিলের উপরে একটি টাকা রাখিয়া উপর হইতে তাকাইয়া দেখ, ইহা গোলাকার প্রতিভাত হইবে; কিন্তু টেবিলের এক কোণ হইতে নীচু হইয়া তাকাইয়া দেখ—ইহা ডিম্বাকার প্রতীয়মান হইবে। সেইরূপ একটি লাঠি টেবিলের উপরে রাখিয়া তাকাইয়া দেখ, ইহা ঋজু দেখাইবে; কিন্তু জলের মধ্যে ডুবাইয়া দেখ, ইহা বাঁকা দেখাইবে। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে গৌণগুণের ন্যায় মুখ্যগুণেরও কোন বাস্তব-সত্তা নাই; মানসিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিভিন্নতার জন্য ইহাও বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করিয়া থাকে। সেইজন্য Berkeley বলেন যে মুখ্যগুণ ও গৌণগুণের মধ্যে Locke যে পার্থক্য সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা মোটেই বিজ্ঞানসম্মত নহে। গৌণগুণ যেমন সংবেদন ব্যতীত আর কিছুই নহে; মুখ্যগুণও তেমন সংবেদন ব্যতীত আর কিছুই নহে; ইহাদের কাহারো কোন বাস্তব-সত্তা নাই। ধর আমি একটি ফল দেখিতেছি; ইহার এক বিশিষ্ট বর্ণ, গন্ধ এবং স্বাদ আছে; অধিকন্তু ইহার এক নিজস্ব আকৃতি, আয়তন এবং ঘনত্ব আছে। বর্ণ, গন্ধ এবং স্বাদ—ইহাদিগকে গৌণগুণ বলা হয়; Locke-এর মতে ইহাদের প্রত্যেকটিই সংবেদন মাত্র; মনের মধ্যে উদিত হইয়া মনের মধ্যেই লীন হইয়া যায়। উত্তরে Berkeley বলেন, ফলের আকৃতি ও আয়তন সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা প্রযোজ্য নহে কি? ইহাদিগকে মুখ্যগুণ বলা হয় বটে, কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে ইহারাও সংবেদন ব্যতীত আর কিছুই নহে। চোখ দিয়া দেখিয়া বা হাত দিয়া স্পর্শ করিয়া বুঝিতেছি যে, ইহার আকার কিঞ্চিৎ গোল এবং ইহার ওজন খুবই সামান্য। কিন্তু আমরা জানি যে চোখ দিয়া দেখিয়া বা হাত দিয়া স্পর্শ করিয়া যাহা পাই তাহা সংবেদন ব্যতীত আর কিছুই নহে। দর্শন-সংবেদন, স্পর্শ-সংবেদন—সবই সংবেদন, এবং সংবেদন মাত্রই মনের জিনিষ, বাহিরের জিনিষ নহে। এইভাবে বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যাইবে যে ফলটির কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই; ইহা কতকগুলি সংবেদনের সমষ্টিমাত্র। মোট কথা, ইহার সম্বন্ধে যাহাই আমরা বলি না কেন—সবই সংবেদন-লব্ধ মানসিক তথ্য মাত্র। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, বহির্জগৎ বা জড়জগৎ বলিয়া কোন কিছু নাই; যাহা কিছু আছে সবই আমাদের মনের মধ্যে ভাবধারা রূপে বিরাজ করিতেছে।

ইহাকে ভাববাদ (Idealism) বলে। এই মতানুসারে পৃথিবীর সব জিনিষই ভাবরূপে বা ধারণারূপে অর্থাৎ মানসরূপে আমাদের চেতনার মধ্যে প্রতিভাত হইয়া বিরাজ করে। চেতনার মধ্যে যাহা প্রতিভাত হয় না,

তাহার কোন অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। সুখ-দুঃখ, হিংসা-দ্বেষ প্রভৃতি জিনিষ যে চেতনার বাহিরে থাকিতে পারে না—তাহা সকলেই জানে; ইহাদের প্রত্যেকটিই মানসিক ব্যাপার, চেতনার মধ্যে উদিত হইয়া চেতনার মধ্যেই ইহারা লয় প্রাপ্ত হয়; চেতনার বাহিরে ইহাদের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। কিন্তু টেবিল চেয়ার, ফল ফুল—উহাদেরও কি কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই? ভাববাদিগণ বলেন, উহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অর্থ কি? ধর, বহির্জগতে একটি টেবিল আছে; কিন্তু কোন লোকই উহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছে না; তাহা হইলে উহার থাকা বা না থাকার মধ্যে পার্থক্য কি? যাহা আমার বা তোমার বা আর কাহারো চেতনার মধ্যে প্রতিভাত হয় না, তাহার অস্তিত্ব আমরা জানিতে পারিব কি করিয়া? আমাদের মনের মধ্যে উহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারিলে তো আমরা উহার অস্তিত্ব স্বীকার করিব? তাই Berkeley বলেন যে, যাহা আমাদের মনের মধ্যে ভাব বা ধারণা সৃষ্টি করিতে পারে, আমরা শুধু তাহারই অস্তিত্ব স্বীকার করি; চেতনা-বহির্ভূত জিনিষের অস্তিত্ব স্বীকার করা সম্ভব নহে (Esseest percipi)।

সমালোচনা: (Solipsism)

উপরিউক্ত মতবাদকে ইংরাজীতে Subjective Idealism বলে। Subjective কারণ এই মতে, জ্ঞাতার ভাবধারা ব্যতীত অন্য কোন বস্তুরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই: পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই জ্ঞাতার ভাবধারারূপে বিদ্যমান আছে; জ্ঞাতৃ-নিরপেক্ষ কোন পদার্থ নাই। এখানে একটি কথা আছে। আমি ঘরের মধ্যে উপস্থিত আছি এবং সম্মুখে টেবিলের উপরে একখানি বই দেখিতেছি। এক্ষেত্রে আমি নিজে পুস্তক প্রত্যক্ষ করিতেছি; অতএব পুস্তকের অস্তিত্ব আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু ধর, আমি যদি ঘর হইতে বাহির হইয়া যাই, তাহা হইলে পুস্তকের কি হইবে? তখন কি সঙ্গে সঙ্গে পুস্তকের অস্তিত্বও অবলুপ্ত হইয়া যাইবে? Berkeley বলেন, তাহা হইবে কেন? আমি ঘরে নাই বটে, কিন্তু অন্য লোক তো আছে; যে আছে, সে যখন ইহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছে তখন ইহা তাহার মনের মধ্যেই বিরাজ করিতে থাকে; তাহা হইলে ইহার অস্তিত্ব অবলুপ্ত হইবে কেন? কিন্তু আমরা যদি বলি যে ঘরের মধ্যে তখন কেহই নাই; সকলেই ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে, তাহা হইলে কি

হইবে? Berkeley বলেন, তাহাতেও ইহার অস্তিত্ব অবলুপ্ত হইবে না; কারণ, ঘরে কোন মানুষ না থাকিলেও ঈশ্বর তো সর্বত্রই আছেন। মানুষের মনে যাহা বিরাজ করে তাহার যেমন অস্তিত্ব আছে, ঈশ্বরের মনে যাহা বিরাজ করে তাহারও ঠিক তেমন অস্তিত্ব আছে। অতএব কোন ক্ষেত্রেই পুস্তকের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না; আমার মনে বিরাজ না করিলে ইহা আর কাহারো মনে তো বিরাজ করিতে পারে; অন্ততঃ ঈশ্বরের মনে তো নিশ্চয়ই বিরাজ করে, কারণ, তিনি সর্বজ্ঞ।

ইহার উত্তরে Hume বলেন যে, বিভিন্ন মনের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে বার্কলির ব্যাখ্যা খুব সহজ হয় বটে, কিন্তু বার্কলির পক্ষে নিজ মনের অস্তিত্ব ব্যতীত অপর কোন মনেরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করা সম্ভব নহে। ধরা যাউক, আমি ছাড়াও আর একজন মননশীল কর্তা আছেন; কিন্তু আমার চেতনার বাহিরে তো তাঁহার অস্তিত্ব সম্ভব নহে; তাঁহাকে থাকিতে হইলে আমার মনের মধ্যেই তাঁহাকে থাকিতে হইবে। আমার মনের বিষয়ীভূত না হইলে আমি তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিব না? যে কোন মননশীল কর্তার কথা লওয়া যাউক না কেন, এমন কি ঈশ্বরকেও আমার মনের মধ্যে ধারণারূপে বিরাজ করিতে হইবে; নতুবা উহার অস্তিত্ব আমি স্বীকার করিতে পারি না। ইহার সরল অর্থ—**আমি ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছুই নাই; আমিই একমাত্র সত্য।** তাই ঈশ্বরকেও তাঁহার অস্তিত্ব বজায় রাখিতে হইলে আমার নিকট আসিতে হয়; আমার মনে যদি তিনি ধারণারূপে বিরাজ করিতে পারেন, তবেই তাহার অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়, নতুবা তিনিও মিথ্যা হইয়া পড়েন। পৃথিবীতে যাহা কিছু সত্য, সবই আমার মনের মধ্যে অধিষ্ঠিত আছে; আমার বাহিরে সত্য বলিয়া কিছুই নাই। এইপ্রকার দম্ভোক্তিকে ইংরাজীতে Solipsism বলে; Solus=কেবল; ipse=আমি।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, Berkeley ঠিক এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে চান নাই; আমি ছাড়াও অন্যান্য মননশীল কর্তার অস্তিত্বে তিনি বিশ্বাস করেন; ঈশ্বরের স্বাধীন সত্তা তো তিনি স্বীকার করেনই। কিন্তু স্বীকার করিলে কি হয়? স্বীকার করাকে প্রমাণ করা বলে না। Hume তাঁহার মতবাদকে সবিশেষ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বার্কলির মতবাদের অপরিহার্য পরিণাম—Solipsism; এই পরিণতি হইতে তাঁহার মতবাদকে রক্ষা করা যায় না। এমতাবস্থায় বার্কলির মতবাদ গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে মোটেই সম্ভব নহে। কারণ, ইহা যদি ঠিক হয়, তবে আমাদের সামাজিক জীবন

বলিয়া কিছুই থাকে না; প্রত্যেকেই এক একজন সত্যস্বরূপ দেবতায় পরিণত হইয়া পড়ে। আমি যাহা জানি তাহাই যদি শুধু সত্য হয়, তবে সত্যের মাপকাঠি বলিয়া কিছু থাকে কি? তখন সত্য ও মিথ্যার কোনই প্রভেদ থাকে না; সব একাকার হইয়া যায়।

Kantian Idealism

এই অসম্ভব পরিণতি হইতে রক্ষা পাইতে হইলে বহির্জগতের অস্তিত্ব এবং বহু বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। ক্যাণ্ট ঠিক তাহাই করিয়াছেন। বার্কলির ন্যায় তিনি শুধু মানসিক-জগৎ লইয়া তৃপ্ত রহেন নাই; আমাদের মনের বাহিরে যে এক স্বতন্ত্র জগৎ আছে, তাহাও তিনি স্বীকার করিয়াছেন। এ বিষয়ে ক্যাণ্ট এবং লক্ একমত, তবুও তাহাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। লক বলেন, যাহা বাহিরে আছে তাহার এক অবিকল ধারণা আমাদের মনের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে, ফলে এই ধারণার মাধ্যমে আমরা সেই বহির্বস্তুর কথা অবগত হইয়া থাকি। কিন্তু ক্যাণ্ট বলেন, ইহা অসম্ভব। আমাদের মানস ছবি সত্যই বহিবস্তুর অনুরূপ কি না তাহা কেমন করিয়া বলিতে পারা যায়? পূর্বেই বলিয়াছি, ইহারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের জিনিষ; বাস্তব সত্তা আছে বহির্জগতে আর মানস ছবি আছে মনোজগতে। ইহাদের মধ্যে আমরা শুধু মানস ছবির কথাই জানিতে পারি; বাস্তব সত্তার কথা জানিতে পারা আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে; কারণ, যাহা সম্পূর্ণভাবে মনের অগোচরে বিদ্যমান থাকে তাহাকে কি করিয়া মনের বিষয়ীভূত করা যায়? এইখানেই লকের বিপদ। এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ক্যাণ্ট বলেন যে আমাদের মনের অগোচরে যে বাস্তব সত্য প্রচ্ছন্ন আছে তাহা চিরকালই অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় রহিয়া যায়। এইখানেই ক্যাণ্টের সহিত লকের পার্থক্য; লকের মতানুসারে, প্রচ্ছন্ন থাকিলেও ইহা অজ্ঞাত নহে; আর ক্যাণ্টের মতানুসারে ইহা চিরকালের জন্যই অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়।

চেতনাতীত এই অজ্ঞাত সত্তাকে ক্যাণ্ট "Thing-in-itself" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; ইহা নিরুপাধি-নির্গুণ-সত্তা। চেতনার মধ্যে প্রকাশিত হইলে ইহার আর এই নির্গুণ-অবস্থা থাকে না; চেতনা সম্পাতে ইহা তখন চেতনা-গুণসম্পন্ন হইয়া যায়। অতএব চেতনার মধ্যে প্রকাশিত না হইয়া অপ্রকট অবস্থায় যাহা আদি ও অকৃত্রিমভাবে বিরাজ করে, তাহাকেই তিনি Thing-in-itself বলেন; ইহার কোন প্রকাশ নাই, বিকার নাই; নির্বিকার

নিরুপাধি হইয়া চেতনার বাহিরে বিরাজ করে বলিয়া—ইহা -চিরকালই অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় রহিয়া যায়। ক্যাণ্ট ইহাকে Thing-in-itself বলিয়াছেন, তবে সাধারণতঃ ইহাকে ইংরাজীতে Noumenon বলা হয়। Noumenon অর্থাৎ অপ্রকট সত্তা; ইহার প্রকাশিত সত্তাকে Phenomenon বা আবভাসিক সত্তা বলা হয়। অবভাস মানে প্রকাশ বা স্ফুরণ। অপ্রকট বা পারমার্থিক সত্তার এই প্রকাশ বা স্ফুরণ সম্বন্ধে ক্যাণ্টের নিজস্ব কিছু বক্তব্য আছে। তিনি বলেন পারমার্থিক সত্তা আমাদের মনের উপর ক্রিয়া করিয়া নানাপ্রকার সংবেদন সৃষ্টি করে; কিন্তু শুধু সংবেদন আসিলেই জ্ঞান হয় না; এইসকল সংবেদনকে যথাযথভাবে সংবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত করা দরকার। ইহাই মনের আসল কাজ। আমাদের মনের মধ্যে যে-সকল জ্ঞান সূত্র নিহিত আছে—তাহাদের সাহায্যে আমরা সংবেদনগুলিকে যথাযথভাবে সংবদ্ধ করিয়া ফেলি। এইভাবে মনের সক্রিয় প্রচেষ্টায় যে জ্ঞান-সৌধ রচিত হয়, তাহাকে আমরা আবভাসিক জ্ঞান (Phenomenal knowledge) বলিতে পারি। ইহা পারমার্থিক জ্ঞান নহে; কারণ পারমার্থিক সত্তা চিরকালই চেতনাতীত সত্তা; ইহাকে চেতনার মধ্যে ধরা যায় না; যাহাকে চেতনার মধ্যে ধরা যায়, তাহা ইহার আবভাসিক রূপ মাত্র, পারমার্থিক নহে। চেতনার মধ্যে আধৃত হইলে ইহার পারমার্থিক-রূপ আর থাকে না, তখন ইহা অবভাসিত হইয়া যায়।

এইপ্রকার চেতনাতীত (Transcendental) পারমার্থিক সত্তার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন বলিয়া ক্যাণ্টের মতবাদকে Transcendentalism বলা হয়। তবে ইহাকে Phenomenalism-ও বলা হইয়া থাকে, কারণ পারমার্থিক সত্তার উপরে তিনি যত গুরুত্বই আরোপ করুন না কেন, এই পারমার্থিক সত্তা আমাদের নিকট চিরকালই অজ্ঞাত রহিয়া যাইতেছে; কেবল ইহার আবভাসিক (Phenomenal) রূপই আমরা অবগত হইতে পারিতেছি। কিন্তু যে নামেই ইহাকে অভিহিত করা হউক না কেন, ক্যাণ্টের মতবাদ বিশুদ্ধ Idealism ব্যতীত আর কিছুই নহে। বুদ্ধিসূত্রের সাহায্যে সংবেদনগুলিকে সুসংবদ্ধ করিয়া মনের মধ্যে আমরা যে জ্ঞান-সৌধ রচনা করি—তাহার কোনই জাগতিক অস্তিত্ব নাই; উহা সম্পূর্ণ মানসিক সৃষ্টি; ফলে আমরা ভাবের রাজ্যে বিচরণ করি, বস্তুর রাজ্যে নহে।

Objective Idealism (Hegel)

তাহা হইলে দেখা গেল যে ক্যাণ্ট বস্তু ও ভাব—দুইয়েরই অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। কিন্তু বস্তুকে তিনি সম্পূর্ণ চেতনাতীত মনে করেন; সেইজন্য

তাঁহার মতবাদের মধ্যে বস্তুবাদের কোন প্রকার ছোঁয়াচ লাগিতে পারে না; ফলে তাঁহার মতবাদ বিশুদ্ধ ভাববাদে পরিণত হইয়া যায়। কিন্তু এই যে বস্তুবিহীন ভাববাদ—ইহা তো ভাববিলাসেরই নামান্তর মাত্র। অতএব বস্তুর অস্তিত্ব শুধু স্বীকার করিলে হইবে না, উহাকে আমাদের কাজে লাগাইতে হইবে; উহাকে চেতনাতীত বলিয়া দূরে সরাইয়া রাখিলে চলিবে না, উহাকে চেতনার মধ্যে অধিষ্ঠিত করিতে হইবে; তবেই তো উহা আমাদের চিন্তা-ধারাকে সংযত করিতে পারিবে। কারণ, চিন্তাধারা তখন আর যথেচ্ছভাবে প্রবাহিত হইতে পারিবে না; বস্তুর সহিত পদে পদে সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। এইভাবে বস্তুকে অনুসরণ করিতে গিয়া আমাদের চিন্তাধারা স্বভাবতঃই সংযত ও নিয়ন্ত্রিতরূপ পরিগ্রহ করে; নতুবা স্বপ্ন-ধারার ন্যায় ইহাও যথেচ্ছভাবে ও অনিয়ন্ত্রিতরূপে প্রবাহিত হইত। অতএব ক্যাণ্ট যে স্বতন্ত্র বস্তু-সত্তার কথা বলিয়াছেন, আমরা তাহার সার্থকতা স্বীকার করি। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি ইহাকে তিনি কোন কাজে লাগাইতে পারেন নাই, কারণ তাঁহার মতানুসারে এই বস্তু-সত্তা সম্পূর্ণ চেতনাতীত সত্তা (Noumenon); চেতনার মধ্যে ইহার কোন স্থান নাই, ইহার স্থান চেতনার বাহিরে। ইহা যখন চেতনার মধ্যে প্রকাশিত হয়, তখন ইহার পারমার্থিক রূপ আর থাকে না; ইহা তখন আবভাসিক (Phenomenon) রূপে আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। ক্যাণ্টের এই মতবাদের সমালোচনায় Hegel বলেন যে পারমার্থিক সত্তা ও আবভাসিক সত্তার এইপ্রকার বিভেদ সৃষ্টি করা মোটেই সঙ্গত নহে। যাহাকে পারমার্থিক সত্তা (Noumenon) বলা হইতেছে, তাহা কখনও চেতনাতীত হইয়া অপ্রকট থাকিতে পারে না; থাকিতে হইলেই ইহাকে চেতনার মধ্যে অবভাসিত হইয়া থাকিতে হইবে। আর যাহাকে আবভাসিক সত্তা (Phenomenon) বলা হইতেছে, তাহাও কখন পারমার্থিক সত্তা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না। বস্তুতঃ পারমার্থিক সত্তাই চেতনার মধ্য দিয়া আমাদের নিকট অবভাসিত হইয়া থাকে: অতএব ইহা পারমার্থিক সত্তারই আত্মপ্রকাশ মাত্র।

একটি উদাহরণ দিয়া কথাটি বুঝান যাউক। ধর, আমরা মনকে বলিলাম Noumenon, আর সুখ-দুঃখ, ইচ্ছা-দ্বেষ প্রভৃতি ক্রিয়াকে বলিলাম Phenomenon। কিন্তু মন কি এইসব ক্রিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এককভাবে বিরাজ করিতে পারে? মোটেই না; তাহা হইলে ইহা শূন্যগর্ভ পদার্থে পরিণত হইয়া যায়! যে মনের মধ্যে সুখ-দুঃখ, ইচ্ছা-দ্বেষ প্রভৃতি কোনপ্রকার

ভাব বা ক্রিয়া নাই, তাহা তো মন নহে, তাহা শূন্য পদার্থ মাত্র; উহার স্বরূপ কল্পনা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। অতএব মনকে বিরাজ করিতে হইলে সুখদুঃখ প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়াই তাহাকে বিরাজ করিতে হয়; তাই আমরা বলিয়াছি যে পারমার্থিক সত্তা (Noumenon) অপ্রকট হইয়া বিরাজ করিতে পারে না; Phenomenon-এর মধ্যে প্রকাশিত হইয়াই ইহা বিরাজ করে। আবার যাহা আবভাসিক সত্তা (Phenomenon), তাহাও ইহার পারমার্থিক সত্তা (Noumenon) হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিরাজ করিতে পারে না। যখন সুখদুঃখ প্রভৃতি ভাবের উদয় হয়, তখন কি তাহারা মন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিরবলম্ব হইয়া বিরাজ করে? মোটেই না, বস্তুতঃ মনই উহাদের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ লাভ করে; অর্থাৎ উহারা মনেরই প্রকাশিত বা অবভাসিত রূপ।

Real and Ideal

তাহা হইলে দেখা গেল যে, ক্যাণ্ট যে চেতনাতিরিক্ত (extra-mental) সত্তার কথা বলিয়াছেন তাহা চেতনাতিরিক্ত হইলেও চেতনাতীত নহে; চেতনার মধ্য দিয়াই উহা আত্মপ্রকাশ লাভ করিতেছে। হেগেলের এই মতবাদকে Objective Idealism বা Ideal-Realism বলে; ইহাতে চেতন ও অচেতন, ভাব ও বস্তু—উভয় প্রকার সত্তারই অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। হেগেল বলেন ব্রহ্ম কখন সৃষ্টি ছাড়া থাকিতে পারেন না; সৃষ্টির মধ্য দিয়া তিনি নিরন্তর আত্ম-প্রকাশ করিয়া চলিয়াছেন। হেগেলের এই ব্রহ্মকে বেদান্তের ভাষায় আমরা "চিৎ" (Reason, Consciousness) বলিতে পারি; তিনি অনন্ত জ্ঞান স্বরূপ। তিনি শুধু মানুষের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, তাহা নহে; সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি অচেতন পদার্থ এবং জীবজন্তু পশুপক্ষী প্রভৃতি চেতন পদার্থ—সকল পদার্থের মধ্য দিয়াই তিনি আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। অতএব চেতন ও অচেতন—সকল পদার্থেরই মূলে আছেন তিনি। ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, চেতন ও অচেতন পদার্থের মধ্যে কোন মূলগত পার্থক্য নাই; বরং মূলে তাহারা একই—একই ব্রহ্মের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। তাই হেগেল বলেন যে আমাদের পক্ষে জ্ঞান লাভ করা মোটেই কঠিন নহে। কারণ, যে ব্রহ্ম আমার মনের মধ্যে প্রকাশিত আছেন সেই ব্রহ্ম সূর্য-চন্দ্রের মধ্যেও প্রকটিত আছেন, অতএব আমি যখন সূর্য-চন্দ্রের কথা চিন্তা করি, তখন কোন বিজাতীয় বস্তুর কথা চিন্তা করি না। তখন ব্রহ্মেরই চেতনরূপে আমি ব্রহ্মেরই অচেতন রূপের কথা চিন্তা করি। "I know reality in so far as I am that reality myself" (—Paulsen)।

শুধু তাহাই নহে, ব্রহ্মও আমাদের নিকট অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয় থাকিতে পারেন না ; কারণ ব্রহ্ম তো আমাদের নিকট কোন বিজাতীয় পদার্থ নহেন ; আমরা তো তাঁহারই প্রকাশ মাত্র। আমাদের বুদ্ধি তাঁহারই বুদ্ধি, আমাদের চিন্তা তাঁহারই চিন্তা—শুধু আমাদের মধ্যে পরিমিত হইয়া একটু সসীমরূপ গ্রহণ করিয়াছে মাত্র। নতুবা ঈশ্বরের সেই অনন্ত অসীম জ্ঞানই আমাদের মনের মধ্যে প্রতিভাত হইতেছে, তিনি যাহা জানেন আমরাও ঠিক তাহাই জানি, তিনি যাহা চিন্তা করেন, আমরাও ঠিক তাহাই চিন্তা করি। "We rethink what has already been thought out by God"। এমতাবস্থায়, ব্রহ্মাকে অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয় বলিয়া বর্ণনা করা যায় কি করিয়া? আমরা যখন ব্রহ্মেরই আত্মপ্রকাশ মাত্র তখন ব্রহ্ম কি করিয়া আমাদের নিকট অজ্ঞাত থাকিতে পারেন?

একবিংশ অধ্যায়

জ্ঞান-সূত্র (Categories)

Substance and Causality

জ্ঞানতত্ত্ব প্রসঙ্গে আমরা এখন যে বিষয় আলোচনা করিব—তাহার ইংরাজী নাম Categories; বাংলায় আমরা জ্ঞান-সূত্র বলিয়া অভিহিত করিয়াছি। জ্ঞান-সূত্র বলিতে কি বুঝায় তাহা আমরা যথাস্থানে ব্যাখ্যা করিয়াছি; এবং তৎপ্রসঙ্গে তিন প্রকার জ্ঞানসূত্রের নাম উল্লেখ করিয়াছি। যথা, স্থান কাল এবং কার্য-কারণ-তত্ত্ব। ইহাদের মধ্যে স্থান ও কাল সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা কবা হইয়াছে; এখানে আমরা কার্য-কারণ-তত্ত্ব আলোচনা করিব। তবে এই কার্য-কারণ-তত্ত্বের সহিত আর একটি সূত্রের অতি গভীর সম্বন্ধ আছে, উহার নাম **দ্রব্য-তত্ত্ব** (Substance): বস্তুতঃ এই দ্রব্যকেই অনেকে মূল-তত্ত্ব বলিয়া অভিহিত করেন, যেহেতু এই দ্রব্যই 'কারণ' রূপে ক্রিয়া কবিয়া 'কার্য' উৎপাদন করে। অতএব বর্তমান প্রবন্ধে আমরা মোট দুইটি সূত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিব—**দ্রব্য-তত্ত্ব** এবং **কার্য-কারণ-তত্ত্ব**। *

* জ্ঞান-সূত্র প্রধানতঃ চারিটি; ইহাদের মধ্যে দুইটি সূত্রের কথা পূর্বেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, যথা "স্থান" এবং "কাল"; বাকি দুইটি সূত্র এখানে ব্যাখ্যা করা হইবে, যথা "দ্রব্য" এবং "কার্য-কারণ-তত্ত্ব"। ইচ্ছা করিয়াই এইরূপ পৃথকভাবে আলোচনা করা হইতেছে, কারণ সূত্রগুলি একটু নীরস ব্যাপার; অতএব সবগুলি সূত্রই যদি একসঙ্গে উপস্থাপিত করা হয়, তাহা হইলে

আমরা Category শব্দকে বাংলায় সূত্র নামে অভিহিত করিয়াছি। কিন্তু Category শব্দের প্রকৃত অর্থ সূত্র নহে; Category মানে Predicate বা বিধেয় পদ; Subject সম্বন্ধে যাহা বলা হয়, তাহাকেই বিধেয় পদ বা Predicate বলে। যেমন "ইহা আগুন"; এক্ষেত্রে "ইহা" Subject, এবং ইহার সম্বন্ধে যাহা বলা হইতেছে, অর্থাৎ "আগুন" Predicate। সেইরূপ "ইহা টেবিল" "ইহা চেয়ার", "ইহা বেঞ্চ" ইত্যাদি প্রত্যেক ক্ষেত্রেই Subject "ইহা", কিন্তু ইহার সম্বন্ধে যাহা বলা হইতেছে (অর্থাৎ Predicate) প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন, কখন "টেবিল", কখন "চেয়ার" কখন "বেঞ্চ" ইত্যাদি। তবে এখানে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে; টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চ প্রত্যেকটিই বিভিন্ন বস্তু বটে, কিন্তু উহাদের প্রত্যেকটিকেই আমরা এক সাধারণ নামে অভিহিত করিতে পারি, যথা দ্রব্য বা Substance। টেবিল যেমন এক দ্রব্য, বেঞ্চও তেমন এক দ্রব্য; অতএব উহারা যতই বিভিন্ন হউক না কেন, দ্রব্য হিসাবে উহারা সমান। এমতাবস্থায়, Predicate নির্দেশ কবিতে গিয়া আমরা যদি বিভিন্ন পদার্থগুলির নামোল্লেখ না করিয়া উহাদের সাধারণ নাম যে দ্রব্য তাহাকেই Predicate বলিয়া উল্লেখ করি—তাহা হইলে কোনই অন্যায় হয় না। ইহা ঠিক; তবুও দ্রব্যকে আমরা Predicate না বলিয়া Category বলি; কারণ দার্শনিক ব্যাখ্যার জন্য ইহাদের পার্থক্যের দিকেও লক্ষ্য বাখা দরকার। Predicate বা বিধেয় পদ বিভিন্নক্ষেত্রে বিভিন্নরকমের হইতে পারে, যেমন টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি; ইহারা প্রত্যেকটিই বিচিত্র, বিভিন্ন ও মূর্ত্ত; কিন্তু Category-র মধ্যে কোন বৈচিত্র্য বা বিভিন্নতা নাই; সর্বক্ষেত্রেই শুধু দ্রব্য। আর একটি উদাহরণ; আমি বলিলাম "টেবিল উপরে আছে বা নীচে আছে, অফিসে আছে বা ক্লাসে আছে"। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই Subject টেবিল, কিন্তু Predicate বিভিন্ন, যেমন "উপরে আছে, নীচে আছে" ইত্যাদি। তবে ইহারা যত বিভিন্নই হউক না কেন, ইহাদের প্রত্যেকেরই এক সাধারণ গুণ আছে; যথা স্থান-ব্যাপ্তি। উপরে বা নীচে, ক্লাসে বা অফিসে যেখানেই থাকুক না কেন প্রত্যেক ক্ষেত্রেই টেবিলটি কিঞ্চিৎ স্থান দখল করিয়া বিরাজ করিতেছে; অতএব উহারা যতই বিভিন্ন হউক না কেন, স্থান হিসাবে উহারা এক। তাহা হইলে "উপরে নীচে, অফিসে ক্লাসে" প্রভৃতি পদকে যেমন আমরা Predicate বলিতে পারি, স্থান

বিষয়টি আরও নীরস হইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে; একই সঙ্গে এতগুলি শুষ্ক বিষয় নাও ভাল লাগিতে পারে। সেই সম্ভাবনা পরিহার করিবার জন্যই সূত্রগুলি এইরূপ পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করা হইল।

ব্যাপ্তিকেও তেমন Predicate বলিতে পারি। কিন্তু সাধারণতঃ তাহা বলি না ; যাহা বিভিন্ন ও বিচিত্র—সেই পৃথক পৃথক স্থানকে Predicate বলি, আর যাহা উহাদের সাধারণ গুণ, সেই বৈচিত্র্যহীন স্থান-ব্যাপ্তিকে Category বলি। সেইরূপ, "রাম গতকল্য ছিল, আজ নাই, আগামী কাল আসিবে'—এখানে প্রত্যেক ক্ষেত্রে Subject রাম, কিন্তু Predicate বিভিন্ন, যেমন "আজ" "কাল" ইত্যাদি। তবে যত বিভিন্নই হউক না কেন, ইহাদের প্রত্যেকেরই এক সাধারণ গুণ আছে, যথা কালব্যাপ্তি। অতএব 'আজ' 'কাল' প্রভৃতি পদের ন্যায় কালব্যাপ্তিকেও আমরা Predicate বলিতে পারি। তবে সাধারণতঃ তাহা করি না ; যাহা বিভিন্ন ও বিচিত্র, সেই পৃথক মুহূর্তগুলিকে Predicate বলি ; আর যাহা তাহাদের সাধারণ গুণ, সেই বৈচিত্র্যহীন কালব্যাপ্তিকে Category বলি।

দ্রব্য, স্থান ও কালের পরে, আর একটি Category লওয়া যাউক ; তাহার নাম কার্য-কারণ-তত্ত্ব (Causality)। ইহাকেও প্রকারান্তরে Predicate বলা যাইতে পারে। যেমন, 'আগুনে হাত পুড়িয়া গেল' বা "আগুনে বাড়ী ধ্বংস হইয়া গেল ; প্রত্যেক ক্ষেত্রেই Predicate বিভিন্ন ; কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যতই বিভিন্ন হউক না কেন, উহারা একই কার্য-কারণ-তত্ত্বের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র ; প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আগুন-রূপ কারণের ফলে বিভিন্নরূপ কার্য সম্পাদিত হইতেছে। অতএব কার্য-কারণ-তত্ত্বকেও Predicate বলা যাইতে পারে ; কিন্তু সাধারণতঃ তাহা আমরা করি না ; স্থান, কাল ও দ্রব্যের ন্যায় ইহাকেও ইংরাজীতে Category নামে অভিহিত করিয়া থাকি।

এইভাবে যে কোন বাক্য বা চিন্তা-কণার কথা লওয়া যাউক না কেন, দেখা যাইবে প্রত্যেকটির মধ্যেই কোন না কোন Category নিহিত আছে। যেমন, "জাহাজ বুধবারে ছাড়িবে" ; এখানে জাহাজ 'দ্রব্য'; এবং বুধবার 'কাল'। "গাছে ফুল ফুটিয়াছে", এখানে ফুল-দ্রব্য', এবং গাছ 'স্থান'। 'বন্দুকের গুলীতে' পাখীটির মৃত্যু হইয়াছে'—এক্ষেত্রে 'স্থান' ও 'কাল' অপেক্ষা কার্য-কারণ-তত্ত্বই বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। মোট কথা, এমন কোন বাক্য বা চিন্তা-কণা থাকিতে পারে না, যাহার মধ্যে কোন একটি Category নিহিত নাই। চিন্তা করিতে গেলেই কোন একটি Category-কে কেন্দ্র করিয়া চিন্তা করিতে হয়। এক কথায়, ইহা আমাদের চিন্তা ক্রিয়ার অপরিহার্য উপাদান।

দ্রব্য-তত্ত্ব (Substance)

প্রথমে Substance বা দ্রব্য-তত্ত্ব আলোচনা করা যাউক। দ্রব্য বলিতে আমরা সাধারণতঃ তিনটি কথা বুঝি ; ইহার গুণ, ইহার শক্তি এবং ইহার

স্থায়িত্ব। একে একে এই কথাগুলি ব্যাখ্যা করা যাউক। প্রথমতঃ **ইহা গুণের আধার**। ন্যায় দর্শন বলেন যে, কোন গুণই স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে বিরাজ করিতে পারে না; কোন এক দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া বিরাজ করে। যেমন ধর, মিষ্টত্ব; ইহা কি নিরবলম্ব হইয়া শূন্যে থাকিতে পারে? মোটেই না; কোন এক দ্রব্যের মধ্যেই মিষ্টত্ব থাকে; এই দ্রব্য ছাড়া মিষ্টত্ব থাকিতে পারে না। তাই আমরা শুধু মিষ্ট বলি না; আমরা বলি, মিষ্ট গুড়, মিষ্ট চিনি ইত্যাদি। এক্ষেত্রে চিনি বা গুড়—দ্রব্য, আর মিষ্টত্ব উহার গুণ। এক কথায়, দ্রব্যই সকল গুণের আধার, এই আধার ব্যতীত গুণ থাকিতে পারে না। তবে দ্রব্য ব্যতীত যেমন গুণ থাকিতে পারে না, তেমন গুণ ব্যতীতও দ্রব্য থাকিতে পারে না। যেমন, চিনি দ্রব্য; এবং ইহার কোন গুণই নাই; অর্থাৎ যেসব গুণ ইহাতে আরোপ করা হয়, সে সব গুণই ইহা হইতে বাদ দেওয়া হইল; তাহা হইলে চিনি বলিয়া কোন দ্রব্য থাকিতে পারে কি? চিনি আছে, অথচ ইহার মিষ্টত্ব নাই, শুভ্রতা নাই, আয়তন নাই ওজন নাই, এক কথায়, কোন গুণই নাই, তাহা হইলে রহিল কি? উহাকে তখন শূন্য ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে? তাই আমরা বলিয়াছি যে দ্রব্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গুণ যেমন আলাদা ভাবে থাকিতে পারে না, সেইরূপ গুণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দ্রব্যও আলাদা ভাবে থাকিতে পারে না। দ্রব্য ও গুণ—পৃথক বটে, তবুও ইহারা পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া বিরাজ করে। তাই দ্রব্য ব্যতীত গুণের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, আর গুণ ব্যতীত দ্রব্যেরও কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্ভব নহে। দ্রব্য না থাকিলে গুণ থাকিতে পারে না, আর গুণ না থাকিলে দ্রব্য থাকিতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ **দ্রব্য শক্তির আধার**। ইহার গুণ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, ইহার শক্তি সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা প্রযোজ্য। প্রত্যেক দ্রব্যেরই কিঞ্চিৎ শক্তি আছে; এই শক্তি প্রয়োগ করিয়া ইহা নিজ সত্তা বজায় রাখে। জীবজন্তু, পশুপক্ষী প্রভৃতি প্রাণবন্ত দ্রব্যের যে শক্তি আছে—তাহা আমরা সকলেই স্বীকার করি, সেবিষয়ে কাহারো কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু জড়দ্রব্যের শক্তি আছে কি না—সেবিষয়ে কেহ হয়ত সন্দেহ করিতে পারেন। সেইজন্য এখানে জীবজন্তুর উদাহরণ না দিয়া জড়বস্তুর উদাহরণ দেওয়া যাউক। জড় দ্রব্য, যেমন ধর টেবিল। টেবিলটি সরাইতে যাও, দেখিবে তোমার আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য টেবিলও নিজ শক্তি প্রয়োগ করিতেছে। অবশ্য মানুষ যেভাবে শক্তি প্রয়োগ করে, টেবিল ঠিক তেমনভাবে শক্তি প্রয়োগ করে না। তবুও নিজের ভারে বলীয়ান হইয়া উহা নিজের স্থানটুকুতে জাঁকিয়া বসিয়া থাকিতে চায়,

সহজে স্থানচ্যুত হইতে চায় না। তবে তোমার শক্তির অধিক বলিয়া তুমি জোর করিয়া উহাকে স্থানচ্যুত করিতেছ, নতুবা উহা নিজের স্থানেই দৃঢ় হইয়া বসিয়া থাকিত। তুমি রাগ করিয়া টেবিলে আঘাত করিয়া দেখ, টেবিলও তোমার হাতে প্রত্যাঘাত করিবে, ফলে তোমার হাত কন্‌কন্ করিয়া উঠিবে। এক্ষেত্রে তোমার হাতে আঘাত করিল কে? বলা বাহুল্য, টেবিলটি স্বীয় শক্তি প্রকাশ করিয়া তোমাকে জব্দ করিয়াছে। এইভাবে বিচার করিলে বুঝা যাইবে যে প্রত্যেক দ্রব্যেরই কিঞ্চিদধিক শক্তি আছে; তাই সহজে কেহ অপরের নিকট নতি স্বীকার করে না; অন্ততঃ নতি স্বীকার করিবার পূর্বে যথাসাধ্য প্রতিরোধ করিয়া থাকে। তবে এখানেও মনে রাখিতে হইবে যে, শক্তি ছাড়া যেমন দ্রব্য থাকিতে পারে না, তেমন দ্রব্য ছাড়াও শক্তি থাকিতে পারে না। দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া শক্তি বিরাজ করে, আবার শক্তিকে অবলম্বন করিয়াই দ্রব্য ক্রিয়া করে। শক্তি বাদ দিলে দ্রব্য শূন্য হইয়া যায়, আর দ্রব্য বাদ দিলে শক্তির কোন অস্তিত্ব থাকে না। সত্যই তো, দ্রব্য না থাকিলে শক্তি থাকিবে কোথায়।

তৃতীয়তঃ **দ্রব্য-সত্তার স্থায়িত্ব**। সকালে দেখিলাম একটি বালক লেখাপড়া করিতেছে, সন্ধ্যায় দেখিলাম সে খেলা করিতেছে, এবং রাতে দেখিলাম সে ঘুমাইতেছে। তাহাকে বিভিন্ন অবস্থায় দেখিতেছি, অথচ সে যে একই ব্যক্তি তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এক্ষেত্রে তাহার অবস্থার পরিবর্তন হইতেছে, কিন্তু তাহার সত্তার কোন পরিবর্তন নাই, সে যাহা ছিল তাহাই রহিয়া যাইতেছে। গরমের ছুটীর পরে আসিয়া দেখি আমার টেবিলটির রং পরিবর্তন করা হইয়াছে, আগে সাদা ছিল এখন কাল হইয়াছে। তবে গুণের এত পরিবর্তন সত্ত্বেও উহার আধার কিন্তু অপরিবর্তিত রহিয়া গিয়াছে; আগে উহা যাহা ছিল এখনও ঠিক তাহাই আছে। পাঁচ বৎসর পরে তোমার পুরাতন ক্লাসে গিয়া দেখ, দেখিবে তুমি যে বেঞ্চে বসিতে, সেই বেঞ্চের শক্তি কিঞ্চিৎ ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, কেমন যেন একটু নডবড় করে। কিন্তু উহা যে পূর্বেকার সেই বেঞ্চ তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই; উহার উপরে ছুরি দিয়া তুমি যে নাম খোদাই করিয়াছিলে তাহা এখনও লেখা আছে। এক্ষেত্রে দ্রব্যের শক্তি ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে বটে. কিন্তু উহার সত্তার কোন পরিবর্তন হয় নাই। সেইরূপ, চারা গাছটি ধীরে ধীরে বড় হইতেছে, উহাতে ফুল হইতেছে, ফল হইতেছে, কতরকমের পরিবর্তন হইতেছে। কিন্তু তুমি বেশ বুঝিতে পারিতেছ যে উহা তোমার সেই পুরাতন চারা গাছটি ব্যতীত আর কিছুই নহে; এত বিভিন্ন অবস্থার মধ্যেও উহার সত্তার কোন পরিবর্তন হইতেছে না। মোট কথা, উহার গুণের পরিবর্তন হয়, শক্তির পরিবর্তন হয়,

কিন্তু উহার বিশিষ্ট সত্তার কোন পরিবর্তন নাই। সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যেও ইহা অপরিবর্তিত রহিয়া যাইতেছে। তবে ইহা যে চিরস্থায়ী নহে, তাহা বলা বাহুল্য; তবুও গুণ ও শক্তির তুলনায় ইহার স্থায়িত্ব যে অধিক—সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

হিউমের মতবাদ (A posteriori)

দ্রব্য বলিতে কি বুঝি তাহা ব্যাখ্যা করা হইল। এখন আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন এই: কোথা হইতে আমরা দ্রব্য সম্বন্ধে এই ধারণা লাভ করিলাম? ইহার উত্তরে অভিজ্ঞতাবাদিগণ (Empiricists) একরকম কথা বলেন আর বুদ্ধিবাদিগণ (Rationalists) অন্যরকম বলেন। প্রথমে অভিজ্ঞতাবাদিগণের উত্তর শোনা যাউক। অভিজ্ঞতাবাদী Hume বলেন যে আমরা যে উপায়ে সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্রের কথা জানিতে পারি, ঠিক সেই উপায়ে দ্রব্যের কথাও জানিতে পারি। কারণ, হিউমের মতানুসারে সর্বপ্রকার জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায় অভিজ্ঞতা (Experience)। চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমরা যে জ্ঞান লাভ করি—তাহাকেই অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞান বলে। এইভাবে আমরা সূর্য চন্দ্রের কথা জানিতে পারি, এবং ঠিক এইভাবে আমরা দ্রব্যের কথাও জানিতে পারি। আমি আজ দেখিতেছি টেবিলটি সাদা, আর তিন মাস পরে আসিয়া দেখিলাম ইহা কাল; আজ দেখিতেছি বেঞ্চটি শক্ত, কয়েক বৎসর পরে দেখিলাম ইহা নরম হইয়া গিয়াছে; আজ দেখিতেছি গাছটি ছোট, কয়েকমাস পরে দেখিলাম ইহা ফলফুলে-সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে; সকালে দেখিলাম ছেলেটি লেখাপড়া করিতেছে, আর বিকালে দেখিলাম সেই ছেলেটিই মাঠে খেলা করিতেছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমি বিভিন্ন রকমের অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছি। এই প্রকার অভিজ্ঞতা হইতেই আমার মনের মধ্যে দ্রব্য সম্বন্ধে এক ধারণার উদ্ভব হইতেছে। অতএব ইহাকে অভিজ্ঞতা-লব্ধ (a posteriori) জ্ঞান বলা যাইতে পারে।

একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে, এক্ষেত্রে দ্রব্য বলিতে Hume যাহা বোঝেন তাহা ঠিক দ্রব্য নহে; তাহা অন্য জিনিষ। অতএব দ্রব্য বলিতে আমরা কি বুঝি আর হিউমই বা কি বোঝেন—তাহাই প্রথমে বিচার করা যাউক। আমরা বলিয়াছি যে, দ্রব্য মানে শুধু গুণ নহে, ইহা গুণের আধারও বটে; কিন্তু দ্রব্য বলিতে হিউম শুধু গুণই বোঝেন, উহার আধারের প্রতি লক্ষ্য করেন না। তাঁহার মতানুসারে, চিনি বলিলে আমরা শুধু ইহার গুণ সমষ্টিই বুঝি, অন্য কিছু বুঝি না; বুঝি যে ইহার রং সাদা, ইহার স্বাদ মিষ্ট এবং ইহার

স্পর্শ অকোমল। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, এই গুণগুলি জানিতে পারিলেই কি চিনির সম্বন্ধে সব কথা জানা হইয়া যায়? মোটেই না; কারণ, আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, গুণগুলি তো নিরবলম্ব হইয়া শূন্যে ঝুলিতে পারে না; ইহাদের জন্য এক আধার দরকার—যাহাকে আশ্রয় করিয়া ইহারা বিরাজ করিতে পারে। কিন্তু সেই আধারের কথা আমরা জানিতে পারিব কেমন করিয়া? হিউম নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের মারফতে, আমরা এই প্রচ্ছন্ন আধারের কথা জানিতে পারি না; ইন্দ্রিয়ের মারফতে আমরা শুধু ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য গুণের কথাই জানিতে পারি, ইহার আধারের কোন ধরা ছোঁয়া পাই না। তাই হিউমের মতানুসারে দ্রব্য শুধু গুণের সমষ্টি মাত্র, ইহার কোন আধার নাই। কিন্তু ইহাকে তো ঠিক দ্রব্য বলা যায় না; অন্ততঃ দ্রব্য বলিতে আমরা যাহা বুঝি ইহা ঠিক তাহা নহে। আমাদের মতানুসারে দ্রব্য = আধার + গুণ; আর হিউমের মতে দ্রব্য মানে শুধু গুণ। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি—আধার বিহীন হইয়া গুণ কি কখন স্বতন্ত্রভাবে থাকিতে পারে? তাহা তো সম্ভব নহে। অতএব আধারের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু হিউম্ যাহা বলেন তাহাও ঠিক; ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ইহার অস্তিত্ব জানা যায় না। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে অন্যবিধ উপায়ে আমরা ইহার অস্তিত্ব জানিয়া থাকি। একটু পরেই উপায়ের কথা আলোচনা করা হইবে।

গুণের পরে ক্রিয়ার কথা লওয়া যাউক। আমরা বলিয়াছি যে দ্রব্যের মধ্যে শুধু ক্রিয়া নাই, ক্রিয়ার উৎসও ইহার মধ্যে নিহিত আছে। যেমন, টেবিলে আঘাত করিলে টেবিলও আমার হাতে প্রত্যাঘাত করে। এক্ষেত্রে প্রত্যাঘাত ক্রিয়ামাত্র। কিন্তু এই ক্রিয়া আসিতেছে কোথা হইতে? কোথা হইতে শক্তি সঞ্চারিত হইতেছে? শক্তি সঞ্চারিত না হইলে তো কোন ক্রিয়া সম্পাদিত হইতে পারে না; তবে এই শক্তির উৎস কোথায়? আমাদের মতানুসারে দ্রব্যের মধ্যেই এই শক্তি নিহিত আছে; কারণ শক্তি তো শূন্য হইতে নিঃসৃত হইতে পারে না; কোন উৎস না থাকিলে ইহা নিঃসৃত হইবে কোথা হইতে? তাই আমাদের মতানুসারে দ্রব্য = শক্তির উৎস + শক্তির প্রকাশ। উৎস হইতে শক্তি নিঃসরণের ফলে ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। কিন্তু হিউম শুধু এই ক্রিয়ার প্রতিই লক্ষ্য করেন; এই ক্রিয়ার মূলে যে শক্তি-নিঃসরণ আছে তাহা তিনি স্বীকার করেন না। বস্তুতঃ ইহা স্বীকার করা তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। কারণ, দ্রব্য সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের জন্য তিনি সম্পূর্ণ ভাবে ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করেন। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের মারফতে আমরা শুধু ক্রিয়া-প্রক্রিয়াই লক্ষ্য করিতে পারি; ইহার জন্য

কোন শক্তি সঞ্চারিত হইতেছে কি না তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। যেমন, টেবিল যে প্রত্যাঘাত করে তাহা আমরা সকলেই প্রত্যক্ষ করি; কিন্তু ইহার জন্য টেবিলকে ভিতর হইতে শক্তি প্রয়োগ করিতে হইতেছে কি না—তাহা কি কখন প্রত্যক্ষ করা যায়? এবং যেহেতু উহা প্রত্যক্ষ করা যায় না, সেইহেতু হিউম উহার অস্তিত্বও স্বীকার করেন না। তাই তাঁহার দ্রব্যের মধ্যে শুধু ক্রিয়া আছে, শক্তি নাই। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, শক্তি ব্যতীত কি কোন ক্রিয়া সম্পাদিত হইতে পারে? তাহা তো সম্ভব নহে; অতএব শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু হিউম যাহা বলেন তাহাও ঠিক; ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ইহার অস্তিত্ব জানা যায় না। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, অন্যবিধ উপায়ে আমরা ইহার অস্তিত্ব জানিয়া থাকি। একটু পরেই সেই উপায়ের কথা আলোচনা করা হইবে।

শক্তির পরে এখন স্থায়িত্বের কথা লওয়া যাউক। আমাদের মতানুসারে দ্রব্যের মধ্যে শুধু পরিবর্তন নাই, উহার মধ্যে এক স্থায়ী সত্তাও বিদ্যমান আছে। বিভিন্ন অবস্থায় দ্রব্য বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে বটে, কিন্তু এই বিভিন্নতার মধ্যেও আমরা এক অভিন্ন সত্তার সন্ধান পাই। কিন্তু হিউম ইহা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন আজ আমরা যে গাছ দেখি, তিন বৎসর পরে ঠিক সেই গাছ দেখি না; তখন যাহা দেখি তাহা এক সম্পূর্ণ বিভিন্ন জিনিষ; ইহাদের মধ্যে আবার অভিন্নতা কোথায়? ইহার উত্তরে আমরা বলি যে, সবই যদি পরিবর্তিত হইতে থাকে, তবে দ্রব্য বলিয়া কোন জিনিষ থাকে না। যেমন ধর, মানুষ। হিউম্ বলিবেন যে এক বৎসর আগে যে "আমি" ছিলাম, আজ সে "আমি" নাই; পূর্বেকার "আমি" পরিবর্তিত হইয়া এক নূতন "আমির" উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, পূর্বেকার আমি এবং বর্তমান আমি—ইহাদের মধ্যে যদি কোন অপরিবর্তিত সত্তা না থাকে, তাহা হইলে আমাদের পক্ষে নৈতিক জীবন বা সামাজিক জীবন যাপন করা সম্ভব হয় কি? এক বৎসর আগে আমি যদি কোন অন্যায় করিয়া থাকি, তাহা হইলে আজ আমি উহার জন্য অনুতাপ বোধ করিতে পারি কি? এক বৎসর আগে যে আমি অন্যায় করিয়াছিলাম, তাহার যদি আজ কোনই অস্তিত্ব না থাকে, তবে আজ আমার পক্ষে অনুতাপ করার কোনই অর্থ হয় না। এমন কি, অতীত কাজের জন্য আমাকে শাস্তি দেওয়া বা পুরস্কৃত করারও কোন অর্থ হয় না; কারণ, যে ঐ কাজ করিয়াছিল সে তো আজ নাই, আজ অন্য লোক আসিয়াছে। অতএব উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে দেওয়ার কোন মানে নাই মোট কথা, দ্রব্যের অপরিবর্তনীয়তা না স্বীকার করিলে

আমাদের সামাজিক জীবনই অবলুপ্ত হইয়া যায়। ইহার উত্তরে হিউম্ বলেন যে, সত্যই যদি কোন অপরিবর্তনীয় সত্তা থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা উহার কোন সন্ধান পাইতাম। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের মারফতে আমরা তো উহার কোন সন্ধান পাই না; ইন্দ্রিয়ের মারফতে আমরা শুধু উহার বিভিন্ন রূপই দেখিতে পারি, উহার অভিন্ন সত্তা কোথাও প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। ইহা আমরাও স্বীকার করি; আমরাও বলি যে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অপরিবর্তনীয়তার কথা জানা যায় না। তবে অভিজ্ঞতা ব্যতীত জ্ঞান লাভের যে অন্য কোন উপায় নাই, তাহা আমরা স্বীকার করি না। এইখানেই হিউমের সহিত আমাদের পার্থক্য। হিউম বলেন, জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায় ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতা; অতএব ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা যখন দ্রব্যের অন্তর্নিহিত শক্তি বা অপরিবর্তনীয় সত্তার কথা জানিতে পারি না, তখন ইহার অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। কিন্তু আমরা বলি, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যে জ্ঞান আমরা লাভ করিতে পারি না, তাহা অন্য উপায়ে লাভ করিতে পারি এবং লাভ করিয়া থাকি। সেই উপায়ের নাম বুদ্ধি-শক্তি বা Reason। এক কথায়, দ্রব্য-তত্ত্ব অভিজ্ঞতা-লব্ধ তথ্য নহে, ইহা **বুদ্ধি-লব্ধ তথ্য**। অভিজ্ঞতার পূর্ব হইতেই ইহা আমাদের মনের মধ্যে বিরাজ করে, ইহা **প্রাক-সিদ্ধ তথ্য**। ইহাই ক্যাণ্টের মত। এখন তাঁহার মতবাদ ব্যাখ্যা করা যাউক।

ক্যাণ্টের মতবাদ (A priori)

ক্যাণ্ট হিউমের মতবাদ সমর্থন করেন না বটে, তবে হিউমের ন্যায় তিনিও অভিজ্ঞতার উপরে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁহার মতানুসারে অভিজ্ঞতা হইতেই আমরা জ্ঞান-সৌধের উপাদান সংগ্রহ করি। জাগতিক উপাদান হইতে আমরা যেসব সংবেদন পাই, তাহাই আমাদের জ্ঞান-সৌধের উপাদান। তবে মনে রাখিতে হইবে যে শুধু উপাদান আসিলেই জ্ঞান হয় না; উপাদানগুলিকে যথাযথভাবে সুবিন্যস্ত করিয়া ব্যাখ্যা করিবার জন্য বুদ্ধি বা মনের ক্রিয়াও সমান প্রয়োজন। অতএব যাঁহারা বলেন যে জ্ঞান উৎপাদনে মনের কোন সক্রিয় সহযোগিতা নাই, তাঁহারা খুব ভুল করেন। মন নিষ্ক্রিয় নহে; এবং যাঁহারা বলেন যে ইহা শূন্য সাদা কাগজ মাত্র, তাঁহারাও খুব ভুল করেন। আমরা কেহই শূন্য মন লইয়া আসি নাই; মনের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি জ্ঞান-সূত্র লইয়া আসিয়াছি, তাহাদের মধ্যে দ্রব্য-তত্ত্ব অন্যতম। তাই ক্যাণ্ট বলেন যে এই দ্রব্য সম্বন্ধীয় ধারণা আমরা

কেহই অভিজ্ঞতার পরে বা অভিজ্ঞতার ফলে অর্জন করি নাই ; অভিজ্ঞতার পূর্ব হইতেই, সহজ কথায়, জন্ম হইতেই, ইহা আমাদের মনের মধ্যে নিহিত আছে। তাই ক্যাণ্ট ইহাকে প্রাকসিদ্ধ (a priori) ধারণা বলিয়া অভিহিত করেন। এইভাবে আমরা যে দ্রব্যের কথা জানিতে পারি তাহার স্বরূপ আমরা পূর্বেই ব্যাখ্যা করিয়াছি ; (i) ইহা শুধু গুণের সমষ্টি নহে; গুণের আধারও বটে ; (ii) ইহার মধ্যে শুধু ক্রিয়া নাই, ক্রিয়া-সম্পাদনের জন্য শক্তি-সঞ্চারণও আছে , (iii) ইহার পরিবর্তন আছে, কিন্তু বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্যেও ইহার এক অভিন্ন সত্তা বিদ্যমান থাকে। এক কথায়, নানাবিধ গুণ বুকের মধ্যে ধারণ করিয়া এবং বহুবিধ অবস্থার মধ্যে বিভিন্নভাবে ক্রিয়া করিয়াও যাহা নিজস্ব বিশিষ্ট সত্তা বজায় রাখিতে পারে—তাহাকেই দ্রব্য বলে। বলা বাহুল্য, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এই দ্রব্য-তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায় না ; অভিজ্ঞতার পূর্ব হইতেই ইহা আমাদের মনের মধ্যে বিরাজমান আছে। বস্তুতঃ অভিজ্ঞতাকে যথাযথভাবে পরিচালিত করাই ইহার কাজ।

আর একটি কথা বলিয়াই এই প্রসঙ্গ শেষ করা যাইবে। ক্যাণ্ট বলেন Category বা জ্ঞান-সূত্র মনের মধ্যে বিরাজমান আছে বটে, তবে ইহা শুধু আমার বা তোমার মনে বিদ্যমান নাই ; প্রত্যেক মানুষের মনেই ইহা সমভাবে বিদ্যমান আছে। তাই কেবল আমি বা তুমি এইসব সূত্রের মাধ্যমে চিন্তা করি, তাহা নহে ; যে যেখানে মানুষ আছে সকলেই এইভাবে চিন্তা করে। এক কথায়, ইহা আমাদের সার্বজনীন সম্পত্তি, কোন ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তি নহে। কিন্তু কেন ইহা সার্বজনীন সম্পত্তি, তাহার কোন ব্যাখ্যা আমরা ক্যাণ্টের নিকট হইতে পাই না। তিনি শুধু বলেন যে, সকলের মনেই স্থান, কাল প্রভৃতি সূত্র বিদ্যমান আছে ; ফলে সকলেই একই ছাঁচে চিন্তা করে। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি—সকলের মনেই এইসব একই রকমের সূত্র আসিয়া জুটিল কেমন করিয়া ? সকলেই কেন একই ছাঁচে চিন্তা করে ? ক্যাণ্ট ইহার কোন উত্তর দেন নাই ; ইহার উত্তর দিয়াছেন হেগেল। তিনি বলেন, আমার মন ও তোমার মনের মধ্যে কোন মূলগত পার্থক্য নাই। আমরা সকলেই এক অসীম ব্রহ্মের সসীম প্রকাশ মাত্র ; যে ভগবৎ-শক্তি আমার মনে ক্রিয়া করিতেছে, সেই ভগবৎ-শক্তিই তোমার মনেও ক্রিয়া করিতেছে। এক কথায়, আমাদের সকলের চিন্তার মধ্যেই একই ভগবৎ-মন ক্রিয়া করিতেছে ; তাই স্বয়ং ভগবান যেসব সূত্র অনুযায়ী চিন্তা করেন,

আমরাও ঠিক সেই সব সূত্র অনুযায়ী চিন্তা করিয়া থাকি। ফলে, আমরা সকলেই একই ছাঁচে চিন্তা করি।

কার্য-কারণ-তত্ত্ব (Causality)

দ্রব্য-তত্ত্বের পরে এখন আমরা কার্য-কারণ-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিব। কার্য-কারণ সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করিলে আমরা ইহার যে তিনটি প্রধান লক্ষণ দেখিতে পাই—তাহাই প্রথমে উল্লেখ করা যাউক।

(১) **'কারণ'** আগে আসে; **'কার্য'** আসে পরে। আগে বন্দুক হইতে গুলি বাহির হয়, তারপরে পাখী গুলিবিদ্ধ হয়; আগে পাখী গুলিবিদ্ধ হয়, তারপরে পাখীর মৃত্যু হয়। প্রথম ক্ষেত্রে গুলি-আসা **'কারণ'** এবং গুলি-বিদ্ধ হওয়া, **'কার্য'** আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে গুলিবিদ্ধ হওয়া 'কারণ' এবং মৃত্যু হওয়া 'কার্য'। যেখানেই কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে, সেখানেই আমরা এইরূপ পারম্পর্য (Succession) লক্ষ্য করিয়া থাকি; অর্থাৎ "কারণের" পরে "কার্য" সংঘটিত হয়।

(২) 'কার্য' যে শুধু পরে আসে তাহা নহে; উহা না আসিয়া পারে না, অর্থাৎ আসিতে বাধ্য। বৃষ্টি হইলে মাঠ জলে ভিজিয়া যায়। এক্ষেত্রে বৃষ্টি আগে আসিতেছে, ইহা 'কারণ', আর মাঠ ভিজিয়া যাইতেছে—ইহা **'কার্য'**। একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে, এখানে বৃষ্টির সহিত ভিজার এমন এক নিবিড় সম্বন্ধ আছে যে বৃষ্টি আসিলে মাঠ না ভিজিয়া পারে না; ইহা ভিজিবেই। এইপ্রকার অনিবার্য সম্বন্ধকে ইংরাজীতে "Necessary connection" বলে। 'কারণ' এবং 'কার্য' পরস্পরের সহিত এমনভাবে সংযুক্ত থাকে যে 'কারণ' আসিলে উহার কার্যটিকে আসিতেই হইবে, না আসিয়া উপায় নাই। পাখীটি গুলিবিদ্ধ হইলে উহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। যেখানে এই প্রকার অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী সংযোগ নাই সেখানে কার্যকারণ সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। উদাহরণ—ধর, এই বছরে আকাশে ধূমকেতুর উদয় হইল, তারপরে দেশে বন্যার প্রাদুর্ভাব হইল। শুধু আগে আসিলেই যদি 'কারণ' হয় এবং পরে আসিলে 'কার্য' হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে ধূমকেতু 'কারণ' আর বন্যা উহার 'কার্য'। কিন্তু ইহাদের মধ্যে সত্যই কি কার্য-কারণ সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে? ইহা স্বীকার করা সম্ভব হইত, যদি আমরা প্রমাণ করিতে পারিতাম যে যতবার ধূমকেতু উঠিয়াছে, ততবারই বন্যার প্রকোপ দেখা গিয়াছে। কিন্তু উহা তো ঠিক নহে। গতবছরেও তো ধূমকেতু উঠিয়াছিল, কিন্তু কৈ? সেবার তো বন্যায় প্রাদুর্ভাব হয় নাই। তাহা

হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, ধূমকেতু ও বন্যার মধ্যে কোনরূপ অনিবার্য বা অপরিহার্য সংযোগ নাই ; অর্থাৎ ধূমকেতুর পরে বন্যা আসিতে পারে, আবার নাও আসিতে পারে ; কোনরূপ বাধ্যবাধকতা নাই। সেইজন্য ইহাদিগকে আমরা কার্য-কারণ সূত্রে আবদ্ধ বলিয়া মনে করিতে পারি না। তাই আমরা বলিয়াছি যে, একটি ঘটনা আর একটি ঘটনার পরে আসিলেই উহাকে 'কারণ' নামে অভিহিত করা যায় না 'কারণ' হইতে হইলে উহাদের মধ্যে অনিবার্য সম্বন্ধ থাকা চাই অর্থাৎ এমন সম্বন্ধ থাকা চাই যাহার ফলে কার্যটি না ঘটিয়া পারে না।

(৩) কিন্তু কেন না ঘটিয়া পারে না ? ইহার উত্তর এই যে, প্রত্যেক কারণেরই এক বিশিষ্ট গুণ বা ধর্ম আছে, যাহাকে আমরা উহার নিজস্ব শক্তি বলিয়া বর্ণনা করিতে পারি। এই শক্তির প্রভাবেই যথাযথ 'কার্য' সংঘটিত হইয়া থাকে। গুলির মধ্যে এমন এক শক্তি আছে যাহা পাখীর দেহে বিদ্ধ হইলে উহার হত্যাসাধন না করিয়া পারে না। বিষ খাইলে মৃত্যু হয় ; এক্ষেত্রে বিষকে আমরা 'কারণ' বলি, যেহেতু বিষের মধ্যে এমন এক শক্তি আছে যাহা মানুষের দেহে প্রবেশ করিলে তাহার প্রাণনাশ করিতে পারে ; চিনির মধ্যে সেশক্তি নাই, তাই চিনি খাইলে আমাদের মৃত্যু হয় না। তাই আমরা বলিয়াছি যে, প্রত্যেক কারণেরই এক নিজস্ব শক্তি আছে ; সেই শক্তির ক্রিয়াতেই কার্য সংঘটিত হয়। ধূমকেতুর মধ্যে অন্যরকমের শক্তি থাকিতে পারে, কিন্তু বন্যা সংঘটনের শক্তি ইহার নাই ; তাই ধূমকেতু আসিলেও বন্যা হয় না। বন্যা হয় অন্য কারণে, যেমন, প্রচণ্ড বর্ষায় নদীর বাঁধ ভাঙিয়া গেলে বন্যার প্রাদুর্ভাব হয়। এক্ষেত্রে নদীস্রোতের যে শক্তি আছে—সেই শক্তির প্রভাবেই বন্যার উদ্ভব হয়। সেইরূপ আগুন হইতে শক্তি আসিয়া যখন কেটলি ভর্তি জলের মধ্যে ক্রিয়া করে, তখন উহা হইতে বাষ্প নির্গত না হইয়া পারে না। আগুন ইহার 'কারণ' ; এক্ষেত্রে আগুনের তেজেই 'কার্য' সংঘটিত হইতেছে (Production)।

হিউমের মতবাদ (A posteriori)

উপরে আমরা কার্য-কারণ সম্বন্ধের তিনটি লক্ষণ উল্লেখ করিলাম ; যথা (১) পর পর আসা (২) অনিবার্য ভাবে আসা (৩) এবং শক্তি প্রয়োগ করা। বলা বাহুল্য, সকলেই ইহা স্বীকার করেন না। যেমন, হিউম ; তিনি শুধু প্রথম লক্ষণটিকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন, অপর দুইটি লক্ষণ তিনি স্বীকার করেন না। এ প্রসঙ্গে তিনি যাহা বলেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, যে তিনটি লক্ষণের

কথা বলা হইতেছে—উহাদের সত্যতা আমরা জানিতে পারি কি করিয়া ? তাঁহার মতানুসারে জ্ঞান লাভ করিবার একমাত্র উপায় অভিজ্ঞতা (Experience)। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমরা যাহা জানিতে পারি, তাহাই শুধু গ্রাহ্য ; আর যাহা ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার বাহিরে, তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করা সম্ভব নহে ; উহা অগ্রাহ্য। তাই তিনি বলেন যে উপরি উক্ত লক্ষণগুলি যদি আমাদের ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার মধ্যে ধরা পড়ে, তাহা হইলে উহাদের অস্তিত্ব আমরা নিশ্চয়ই স্বীকার করিব ; কিন্তু উহাদের সম্বন্ধে কোন প্রকার সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা যদি সম্ভব নহে বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে উহাদের সত্যতা স্বীকার করা আমাদের পক্ষে সঙ্গত হইবে না। হিউমের মতানুসারে, উপরি উক্ত প্রথম লক্ষণটিই শুধু ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় ; অপর লক্ষণগুলি মোটেই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে। সেইজন্য তিনি প্রথম লক্ষণটিকেই শুধু স্বীকার করিয়াছেন, বাকী দুইটি তিনি গ্রহণ করেন নাই। এখন তাঁহার মতবাদ একটু সবিস্তারে আলোচনা করা যাউক।

(১) আমাদের ন্যায় হিউমও বলেন যে, আগে আসে 'কারণ', পরে আসে 'কার্য'। তাঁহার মতানুসারে, এই পারম্পর্য স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। যাহা আমরা সাক্ষাৎ ভাবে প্রত্যক্ষ করি তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, প্রথমে গুলি বাহির হইল, তারপরে পাখীটি গুলিবিদ্ধ হইল ; প্রথমে তুমি জল পান করিলে, তারপরে তোমার তৃষ্ণা নিবারিত হইল ; প্রথমে বৃষ্টি হইল, তারপরে মাঠ জলে ভিজিয়া গেল , প্রথমে লোকটি বিষ খাইল, তারপরে তাহার মৃত্যু হইল। প্রত্যেকটি ঘটনাই আমরা স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছি। এইরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। অতএব 'কার্য' যে কারণের পর আসে, সে বিষয়ে হিউম আমাদের সহিত একমত।

(২) আমরা আরও বলিয়াছি যে কার্য যে শুধু পরে আসে, তাহা নহে, ইহা না আসিয়া পারে না ; ইহা আসিতে বাধ্য। কিন্তু হিউম ইহা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন একটি ঘটনা অতীতে ঘটিয়াছে বলিয়া উহা যে প্রত্যেকবারেই ঘটিতে থাকিবে, এমন কথা জোর করিয়া বলা যায় না। আজ বৃষ্টিতে মাঠ ভিজিয়া গেল বটে. কিন্তু ভবিষ্যতেও যে মাঠ ভিজিয়া যাইবে, তাহার প্রমাণ কি ? আজ মাঠ ভিজিয়া গিয়াছে ; ইহা আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি ; কিন্তু ভবিষ্যতে কি হইবে তাহা তো আজ কেহই প্রত্যক্ষ করিতে পারে না ; অতএব ভবিষ্যতের কথা এখন আমি কেমন করিয়া বলিতে পারি ? আজ বিষ পান করার ফলে রামের মৃত্যু হইল ; অতএব বিষ

পানকে আমরা তাহার মৃত্যুর 'কারণ' বলিতে পারি। কিন্তু রামের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া শ্যামেরও যে মৃত্যু হইবে, তাহা আমরা কি করিয়া বলিতে পারি? মোট কথা, যে বিষয়ে আমাদের কোন সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা নাই বা সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার সম্ভাবনা নাই—সে বিষয়ে আমরা জোর করিয়া কিছুই বলিতে পারি না। বলিতে পারি না বটে, তবে বলিয়া থাকি। যেমন আমরা সকলেই বলি যে আগুনে হাত দিলে হাত পুড়িয়া যাইবে। তবে ইহার অর্থ এই নহে যে আগুনে হাত দেওয়া এবং আগুনে হাত পুড়িয়া যাওয়া—ইহাদের মধ্যে সত্যই এক অনিবার্য এবং অবশ্যম্ভাবী সম্বন্ধ আছে। ইহার অর্থ এই যে, আমরা বহুবার এইরূপ ঘটনা ঘটিতে দেখিয়াছি; ফলে আমাদের মনের মধ্যে ইহা এমন ভাবে গাঁথিয়া গিয়াছে যে, আগুন দেখিলেই আজ আমরা হাত পুড়িয়া যাইবার কথা চিন্তা করি। মনোবিজ্ঞানে ইহাকে Law of Association বলে। রাম ও শ্যাম দুইজনে একসঙ্গে থাকে, একসঙ্গে খেলে এবং একসঙ্গে কলেজে আসে; ফলে ইহাদের মধ্যে এমন এক অনুষঙ্গ স্থাপিত হইয়া যায় যে রামকে একলা দেখিলেই আমি শ্যামের কথা স্মরণ করি। কিন্তু তাই বলিয়া কেহ যদি মনে করে যে রাম ও শ্যামের মধ্যে কোন এক অনিবার্য সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে, তবে তাহা খুবই ভুল হইবে; কারণ, আমরা স্পষ্টই দেখিতেছি যে অনেক ক্ষেত্রে রাম আছে অথচ শ্যাম নাই। তথাপি রামকে দেখিয়া আমি শ্যামের কথা ভাবি, উহা আমার মনের সংস্কার মাত্র—আর কিছুই নহে। সেইরূপ আগুন দেখিয়া আমরা হাত পুড়িবার কথা ভাবি; উহাও মনের সংস্কার ব্যতীত আর কিছুই নহে, নতুবা ইহাদের মধ্যে কোনরূপ অবশ্যম্ভাবী অনিবার্যতা (Necessary Connection) নাই।

(৩) আমরা বলিয়াছি যে, প্রত্যেক কারণেরই এক যথাযথ শক্তি আছে; সেই শক্তির ক্রিয়াফলেই 'কার্য' সম্পাদিত হইয়া থাকে। গুলি আসিয়া যখন পাখীর গায়ে লাগে, তখন উহা প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগ করে; এই ক্রিয়াফলেই পাখীর দেহ বিদ্ধ হইয়া যায়। এইরূপ শক্তি-প্রয়োগের কথা হিউম মোটেই স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, আমরা শুধু গুলি প্রবেশ করিতে দেখিতেছি; কিন্তু উহার সহিত শক্তি প্রবেশ করিতেছে বা ঐ শক্তি গিয়া দেহের মধ্যে ক্রিয়া করিতেছে—এসব কথা কোথা হইতে আসে? কেহ কি কখন শক্তি প্রবেশ করিতে দেখিয়াছে বা দেখিতে পারে? সেই শক্তি গিয়া দেহের ভিতের কি করে বা না করে—তাহা কি কেহ কখন প্রত্যক্ষ করিতে পারে? হিউম স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, যে বিষয়ে আমাদের কোন সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা

নাই, তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করা সঙ্গত নহে। অবশ্য কবি ইচ্ছা করিলে অনেক কথাই কল্পনা করিতে পারেন বটে, তবে কবির কল্পনা আর দার্শনিকের যুক্তি একই জিনিষ নহে। গুলি আসিয়া যখন পাখীর দেহ স্পর্শ করে, তখন উহার শক্তি পাখীর দেহে সঞ্চারিত হইয়া নানাবিধ ধ্বংসাত্মক ক্রিয়া সম্পাদন (Production) করে—ইত্যাদি কল্পনা করা খুবই সহজ; কিন্তু উহা কল্পনা, যুক্তি নহে। সত্যই কোন শক্তি সঞ্চারিত হয় কি না, তাহার প্রমাণ চাই। হিউমের মতানুসারে, প্রমাণ পাইতে হইলে অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই প্রমাণ পাইতে হইবে। কিন্তু অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা যখন উহার কোন প্রমাণ পাই না, অর্থাৎ সাক্ষাৎভাবে আমরা যখন কোন শক্তি-সঞ্চারণ প্রত্যক্ষ করিতে পারি না—তখন উহার অস্তিত্ব অস্বীকার করাই যুক্তি-সঙ্গত।*

সমালোচনা

তাহা হইলে দেখা গেল যে কার্য-কারণ সম্বন্ধে আমরা যে তিনটি লক্ষণের কথা বলিয়াছি—তাহাদের মধ্যে একটিমাত্র লক্ষণই হিউম স্বীকার করেন, বাকী দুইটি লক্ষণ তিনি স্বীকার করেন না। যেমন, শক্তি প্রয়োগের ফলে "কার্য" সম্পাদিত হয় ইহা তিনি স্বীকার করেন না; যেহেতু অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা উহার কোন সন্ধানই পাই না। দ্বিতীয়তঃ, কার্য ও কারণের মধ্যে অনিবার্য সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে—ইহাও তিনি স্বীকার করেন না, যেহেতু এক্ষেত্রে ও আমরা অভিজ্ঞতা হইতে কোন সমর্থন পাই না। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে

---

* তাই অনেকে বলেন যে, আমরা যদি জাগতিক অভিজ্ঞতার দিকে লক্ষ্য না করিয়া মানসিক অভিজ্ঞতার দিকে লক্ষ্য করি, তাহা হইলে হিউমের এই আপত্তি হইতে হয়ত রক্ষা পাইতে পারি। বহির্জগতের দিকে লক্ষ্য করিলে শক্তির ক্রিয়া প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় না সত্য—যেমন, গুলির শক্তি কখন পাখীর মধ্যে প্রবেশ করে এবং কেমন করিয়াই বা উহা ক্রিয়া করে, তাহা কেহই প্রত্যক্ষ করিতে পারে না বটে—কিন্তু অন্তর্জগতের দিকে লক্ষ্য করিলে উহার ক্রিয়া প্রক্রিয়া আমরা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। আমরা যখন সংকল্প পূর্বক কোন কাজ করি, যেমন মনোযোগ সহকারে প্রবন্ধ লিখিতে বসি বা বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করি তখন আমরা স্পষ্ট উপলব্ধি করি যে, মন হইতে প্রভূত শক্তি নির্গত হইতেছে এবং সেই শক্তির প্রয়োগেই যথাযথ কার্য সম্পাদিত হইতেছে। এইভাবে মানসিক অভিজ্ঞতার ফলে আমরা যে শুধু শক্তির কথা জানিতে পারি, তাহা নহে; শক্তি যে আগে আসে এবং "কার্য" পরে আসে—তাহাও বুঝিতে পারি; এবং আরও বুঝিতে পারি যে যথাযথ শক্তি প্রয়োগ করিলে যথাযথ কার্য সংঘটিত না হইয়া পারে না। এক কথায়, আমরা "কার্য কারণ" সম্বন্ধের তিনটী লক্ষণই প্রত্যক্ষ করিতে পারি।

আমরা একটিমাত্র লক্ষণের প্রমাণ পাই—তাহা পারম্পর্য সম্বন্ধ। অতএব হিউম শুধু ইহারই অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তাই তাঁহার মতানুসারে "কারণ" মানে সেই ঘটনা যাহা আগে আসে আর "কার্য" মানে সেই ঘটনা যাহা পরে আসে। এইভাবে পুনঃপুনঃ সংঘটিত হইলে উহাদিগকে আমরা কার্য-কারণ সম্বন্ধে আবদ্ধ বলিয়া মনে করি।

আমরা হিউমের মতবাদ গ্রহণ করিতে পারি না। (১) তিনি বলেন, যাহা বারে বারে আগে আসে তাহাই "কারণ", আর যাহা পরে আসে তাহা "কার্য"। তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, রবিবারই সোমবারের কারণ, যেহেতু রবিবার আগে আসে, আর সোমবার পরে আসে। সেইরূপ দিন রাত্রির কারণ, বা রাত্রি দিনের 'কারণ', যেহেতু একটি অন্যটির পরে আসে। রোজই আগে আমি কলেজে আসি, তারপরে ঘণ্টা পড়ে; তাহা হইলে কি বলিতে হইবে যে আমার আসাই ঘণ্টা পড়ার কারণ? এইসব উদাহরণ হইতে বুঝা যাইবে যে হিউম 'কার্য-কারণের' যে সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন তাহা মোটেই গ্রহণযোগ্য নহে। অর্থাৎ পারম্পর্য ব্যতীত "আরো কিছু" চাই —যাহার জন্য একটি ঘটনাকে 'কারণ' এবং অন্যটিকে 'কার্য' বলা যাইতে পারে।* এই "আরো কিছু" লক্ষণের কথা আমরা যথাস্থানে নির্দেশ দিয়াছি, কিন্তু হিউম সেরকম কোন লক্ষণ নির্দেশ করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, শক্তির ক্রিয়া বা শক্তি প্রয়োগের কথা হিউম স্বীকার করেন না। অথচ শক্তির ক্রিয়া স্বীকার না করিলে বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের অস্তিত্বই অস্বীকার করিতে হয়। সকল বিজ্ঞানের মূলসূত্র Conservation of matter and energy; এই মতানুসারে কোন বস্তুর ধ্বংস নাই, কোন শক্তিরও ক্ষয় নাই। শক্তি রূপান্তর গ্রহণ করিতে পারে, যেমন পেট্রলের সুপ্ত-শক্তি মোটরের চলংশক্তিতে রূপায়িত হইতে পারে, কিন্তু উহা কখনও ধ্বংস হইতে পারে না। ইহাই বিজ্ঞানের মূলসূত্র, বস্তুতঃ শক্তি লইয়াই বিজ্ঞানের কারবার। পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, স্থিতিবিজ্ঞান—প্রভৃতি ভৌত-বিজ্ঞান মাত্রই শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছে; এবং উহার উপর নির্ভর করিয়া তাহারা আজ যে জ্ঞান-সৌধ নির্মাণ করিয়াছে, তাহার কার্যকারিতা আজ কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। এমতাবস্থায় হিউমের মতবাদ গ্রহণ করিয়া আমরা কি করিয়া শক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারি?

* It must be not only invariable, but also unconditional antecedent —Mill

হিউমের সহিত আমাদের মতভেদের মূল কারণটি ব্যাখ্যা করিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করা হইবে। হিউম বলেন যে, জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়; ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতা; অতএব ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা যখন কার্যের অনিবার্যতা বা কারণের শক্তি-সঞ্চারণতা জানিতে পারি না, তখন ইহার অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। আমাদের মতানুসারে, তাঁহার এই তথ্যটি আংশিকভাবে সত্য, সম্পূর্ণ সত্য নহে। আংশিকভাবে সত্য, যেহেতু শুধু অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অনিবার্যতা ও শক্তি-সঞ্চারণতার কথা যে জানিতে পারা যায় না, তাহা সকলেই স্বীকার করেন; কিন্তু অভিজ্ঞতা ব্যতীত জ্ঞান লাভের যে অন্য কোন উপায় নাই—তাহা অনেকেই স্বীকার করেন না, আমরাও তাহা মানি না। আমাদের মতানুসারে, অভিজ্ঞতা ছাড়া অন্য উপায়েও আমরা নানাবিধ জ্ঞানলাভ করিতে পারি ও করিয়া থাকি। সেই উপায়ের নাম বুদ্ধি শক্তি বা Reason। এক কথায়, কার্য কারণ-তত্ত্ব অভিজ্ঞতা-লব্ধ তথ্য নহে, ইহা বুদ্ধি-লব্ধ তথ্য। অভিজ্ঞতার পূর্ব হইতেই ইহা আমাদের মনের মধ্যে বিরাজ করে; ইহা প্রাকসিদ্ধ তথ্য। ইহাই ক্যাণ্টের মত। এখন তাঁহার মতবাদ ব্যাখ্যা করা যাউক।

ক্যাণ্টের মতবাদ (A priori)

ক্যাণ্ট হিউমের মতবাদ সমর্থন করেন না বটে; তবে হিউমের ন্যায় তিনিও অভিজ্ঞতার উপরে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁহার মতানুসারে অভিজ্ঞতা হইতেই আমরা জ্ঞান-সৌধের উপাদান সংগ্রহ করি। তবে মনে রাখিতে হইবে যে, শুধু উপাদান আসিলেই জ্ঞান হয় না, উপাদানগুলিকে যথাযথভাবে সুবিন্যস্ত করিয়া ব্যাখ্যা করিবার জন্য বুদ্ধি বা মনের ক্রিয়াও সমান প্রয়োজন। অতএব যাঁহারা বলেন যে, জ্ঞান উৎপাদনে মনের কোন সক্রিয় সহযোগিতা নাই, তাঁহারা খুব ভুল করেন। তাঁহারা বলেন যে, ইহা শূন্য সাদা কাগজ মাত্র, ইহার মধ্যে কিছুই নাই। কিন্তু ক্যাণ্ট তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহার মতানুসারে আমরা কেহই শূন্য মন লইয়া আসি নাই; মনের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি জ্ঞানসূত্রও লইয়া আসিয়াছি, তাহাদের মধ্যে কার্য-কারণ-তত্ত্ব অন্যতম। তাই ক্যাণ্ট বলেন যে, এই কার্য-কারণ সম্বন্ধীয় ধারণা আমরা কেহই অভিজ্ঞতার পরে বা অভিজ্ঞতার ফলে অর্জন করি নাই; অভিজ্ঞতার পূর্ব হইতেই, সহজ কথায়, জন্ম হইতেই ইহা আমাদের মনের মধ্যে নিহিত আছে। তাই ক্যাণ্ট ইহাকে প্রাকসিদ্ধ (A priori) ধারণা বলিয়া অভিহিত করেন। এইভাবে আমরা যে কার্য কারণের কথা জানিতে

পারি, তাহার স্বরূপ আমরা পূর্বেই ব্যাখ্যা করিয়াছি, (i) কার্যের আগে আসে 'কারণ', (ii) কারণের পরে 'কার্য' না আসিয়া পরে না (iii) 'কারণ' হইতে শক্তি প্রয়োগের ফলেই কার্য সম্পাদিত হয়। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এই তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায় না; অভিজ্ঞতার পূর্ব হইতেই ইহা আমাদের মনের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। বস্তুতঃ আমাদের অভিজ্ঞতাকে যথাযথভাবে পরিচালিত করাই ইহার কাজ।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

উপসংহার

দর্শনশাস্ত্রের প্রধান বিষয়গুলি একে একে আলোচনা করা হইল, এখন এই পুস্তকের উপসংহার করা হইবে। আমরা প্রথমে ভগবৎ-তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছি; ঈশ্বর আছেন কি না, তাঁহার স্বরূপ কি, মানুষের সহিত এবং বিশ্বজগতের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ কি—ইত্যাদি বিষয় প্রথম খণ্ডে আলোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে আমরা অধ্যাত্ম-তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছি; আত্মা আছে কি না, তাহার সহিত দেহের সম্পর্ক কি, আত্মা অমর কি না, জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ কি—ইত্যাদি বিষয় সেখানে আলোচিত হইয়াছে। পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডে আমরা প্রাণ ও প্রাণীর সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি; প্রাণ ও প্রাণীর উৎপত্তি প্রসঙ্গে যেসব বিভিন্ন মতবাদ আছে তাহা সেখানে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। চতুর্থ খণ্ডে আমরা জড়-তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছি; জড় পরমাণু হইতে কি করিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিবর্তিত হইল, এই বিবর্তনের পশ্চাতে ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণ আছে কি না, স্থান ও কালের সহিত এই বিবর্তনের সম্বন্ধ কি—ইত্যাদি বিষয় সেখানে আলোচিত হইয়াছে। তারপরে চতুর্থ খণ্ডে আমরা মূল-তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছি। এখানে প্রকৃত পক্ষে কোন নূতন বিষয় আলোচিত হয় নাই। ঈশ্বর এবং আত্মা সম্বন্ধে, প্রাণ এবং পরমাণু সম্বন্ধে আমরা যে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি—তাহাদের সমন্বয় সাধনপূর্বক, এখানে এক ঐক্যের সন্ধান করা হইয়াছে। ঐ ঐক্যই আমাদের মূল-তত্ত্ব; উহাকে আমরা বেদান্তের ভাষায় ব্রহ্ম চৈতন্য বলিয়া উল্লেখ করিতে পারি। এই ব্রহ্মোপলব্ধিই আমাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। উহাকেই আমরা সত্য, শিব এবং সুন্দরের আদর্শ বলিয়া অভিহিত করিয়াছি।

উপরে যে বিষয়বস্তুগুলির উল্লেখ করা হইল—উহা অনুধাবন করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব যে দর্শন-শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় (**Scope of Philosophy**) কত ব্যাপক এবং বিশাল। সাধারণ ভাষায় বলা যায় যে, স্বর্গ হইতে মর্ত—সবই আমাদের দর্শনশাস্ত্রের বিষয়বস্তু। ঈশ্বরের কথা হইতে আরম্ভ করিয়া আত্মার কথা, প্রাণের কথা, জড়ের কথা—সবই যখন আলোচনা করা হয়, তখন আর বাকী থাকে কি ? তারপরেও যাহা কিছু বাকী থাকে, তাহার আলোচনা করা হইয়াছে, পুস্তকের শেষ খণ্ডে, "জ্ঞান-তত্ত্বে"। কারণ, সর্ববিধ জ্ঞান আহরণ করাই যখন দর্শনশাস্ত্রের উদ্দেশ্য, তখন ইহাও একবার বিচার করিয়া দেখা দরকার যে, এইসব জ্ঞান লাভ করা সত্যই আমাদের পক্ষে সম্ভব কি না—বিশেষতঃ আত্মা এবং পরমাত্মা সম্বন্ধীয় জ্ঞান। কারণ আত্মা ও পরমাত্মা তো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নহে ; ইহারা প্রত্যেকটিই অতীন্দ্রিয়-তত্ত্ব। তাই স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে—আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে এই সব অতীন্দ্রিয়-তত্ত্ব উপলব্ধি করা কি সম্ভব। দর্শনশাস্ত্রের "জ্ঞান-তত্ত্ব" বিভাগে এই প্রশ্ন আলোচনা করা হইয়াছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে দর্শনশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় সুদূর প্রসারী, বিশ্বের সমস্ত বিষয়ই এখানে আলোচনা করা হইয়া থাকে।

"Sumtotal of Sciences"

তবে কি দর্শনশাস্ত্রকে Encyclopaedia বা বিশ্বকোষ বলিয়া অভিহিত করিতে হইবে ? আপাততঃ তাহাই তো মনে হয়। ইহার প্রত্যেক বিভাগের জন্য কতরকমের শাস্ত্র আলোচনা করা দরকার, তাহা উল্লেখ করিলেই আমাদের কথার যথার্থতা উপলব্ধি করা যাইবে। ভগবৎ-তত্ত্ব ও অধ্যাত্ম-তত্ত্ব আলোচনা করিতে হইলে পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করা দরকার। বেদ বেদান্ত, গীতা উপনিষদ্—সমস্তই অধ্যয়ন করিতে হইবে। বাইবেল কি বলেন, কোরাণ কি বলেন, কন্‌ফুসিয়াস্ কি বলেন, আর বুদ্ধদেবই বা কি বলেন—সবই জানা দরকার। সেখানে যত মহাজ্ঞানী মহাজন যেসব মহাসত্য আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন—তাহাদের সহিত সম্যক পরিচিত না হইতে পারিলে আমাদের পক্ষে পরম-তত্ত্ব সন্ধান করা সহজ হয় না। তারপরে, ভগবৎ-তত্ত্বের জন্য না হইলেও, অন্ততঃ অধ্যাত্ম আলোচনার জন্য নীতিবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান অনুশীলন করা অপরিহার্যরূপে প্রয়োজন। দেহের সহিত মনের সম্বন্ধ কি, আমরা দৈহিক সুখের জন্য কাজ করি, না আত্মিক সুখের জন্য কাজ করি; মানব জীবনের উদ্দেশ্য কি, মৃত্যুর পরে আমাদের আত্মার কি

পরিণতি হয়—ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করিতে হইলে মনোবিজ্ঞান ও নীতিবিজ্ঞান অনুশীলন করিতেই হইবে।

ইহার পরে আসে প্রাণ-তত্ত্ব, ইহার জন্য Botany, Biology এবং Zoology সম্বন্ধীয় পুস্তক অবশ্য পাঠ্য। Darwin, Lamarck প্রভৃতি মনীষীগণ প্রাণী সম্বন্ধে যেসব গবেষণা করিয়া গিয়াছেন তাহার সহিত পরিচয় না থাকিলে আমাদের পক্ষে প্রাণ-তত্ত্ব আলোচনা করা অসম্ভব। তারপরে আমরা জড়-তত্ত্বের কথা বলিয়াছি; ইহার জন্য Chemistry, Physics, Astronomy প্রভৃতি ভৌত-বিজ্ঞান অপরিহার্যরূপে প্রয়োজন। পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে Chemistry কি বলেন, জড়বস্তুর শক্তি ও গতি সম্বন্ধে Physics কি বলেন, এবং গ্রহনক্ষত্রের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে Astronomy কি অনুমান করেন—সবই আমাদের জানা দরকার; নতুবা জড়জগৎ সম্বন্ধে আমরা জ্ঞান লাভ করিব কেমন করিয়া? সর্বশেষে আমরা যে জ্ঞানতত্ত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছি, ইহার জন্য Logic এবং Psychology আলোচনা করা প্রয়োজন। আমাদের জ্ঞানের সীমা কতদূর, আমরা কিভাবে জ্ঞান আহরণ করি, স্থান কাল ও কার্য-কারণ বলিতে আমরা কি বুঝি—ইত্যাদি সবই তর্ক-বিজ্ঞান ও মানস-বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু; অতএব জ্ঞান-তত্ত্ব আলোচনা করিতে হইলে এইসব বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ ব্যুৎপত্তি থাকা দরকার।

এই দিক দিয়া চিন্তা করিলে দর্শন-শাস্ত্রকে সত্যই এক বৃহৎ বিশ্বকোষ বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। এখানে বেদ বেদান্ত প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন-বিজ্ঞান প্রভৃতি প্রত্যেক ভৌত-বিজ্ঞানেরই স্থান আছে; আর প্রাণীবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতির তো কথাই নাই—ইহারা সবই দর্শনশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। সেইজন্য দর্শনশাস্ত্রকে অনেকে বিজ্ঞানসমূহের সমষ্টি (Sumtotal of all Sciences) বলিয়া বর্ণনা করেন। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। প্রথমতঃ মনে রাখিতে হইবে যে বিজ্ঞানের সংখ্যা এক নহে, বিজ্ঞানের সংখ্যা বহু। এই অসংখ্য বৈজ্ঞানিক বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করা কাহারো পক্ষে সম্ভব নহে। অতএব দর্শনশাস্ত্রকে যদি বিজ্ঞানসমূহের সমষ্টি বলিয়া অভিহিত করিতে হয়, তাহা হইলে, বলা বাহুল্য, কাহারো পক্ষে দার্শনিক হওয়া সম্ভব হয় না; ফলে দর্শনশাস্ত্র একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়ে। কিন্তু দর্শনশাস্ত্র তো অসম্ভব নহে; বহু পুরাকাল হইতে দর্শনশাস্ত্র আলোচিত হইয়া আসিতেছে, এবং এখনও হইতেছে; অথচ কেহই তো সর্ববিদ্যাবিশারদ নহেন। তাহা হইলে কি করিয়া বলা যায়

যে দর্শনশাস্ত্র বিজ্ঞানসমূহের সমষ্টি মাত্র ? তারপরে, আর এক কথা। বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে এত মূলগত পার্থক্য বিদ্যমান যে তাহাদিগকে একই পর্য্যায়ভুক্ত করা যায় না। নিম্নে ইহাদের পার্থক্যগুলি যথাক্রমে ব্যাখ্যা করা যাইতেছে।

দর্শন ও বিজ্ঞান

(১) উহাদের বিষয়বস্তু। পূর্বেই বলিয়াছি, বিজ্ঞান একরকমের নহে, বহু রকমের; বিজ্ঞানের সংখ্যা বহু, যেমন পদার্থবিজ্ঞান, প্রাণীবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান ইত্যাদি। প্রত্যেকটি বিজ্ঞানেরই এক নিজস্ব বিষয়বস্তু আছে; ঐ বিষয়বস্তু ব্যতীত অন্য বিষয় লইয়া ইহা আলোচনা করে না। যেমন, মনোবিজ্ঞান, ইহা শুধু মনের কথা লইয়াই আলোচনা করে, উদ্ভিদের কথা বা রাসায়নিক পদার্থের কথা আলোচনা করে না। আবার উদ্ভিদবিজ্ঞান—শুধু উদ্ভিদের কথাই ইহার আলোচ্য বিষয়, কোনরূপ নৈতিক তথ্য এখানে আলোচিত হয় না। এইভাবে আমাদের সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্যকে বিজ্ঞান খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাগ করিয়া ফেলিয়াছে। উহাদের বিভিন্ন খণ্ড লইয়া বিভিন্ন বিজ্ঞান রচিত হইয়াছে। ইহাতে সুবিধা এই হইয়াছে যে, কোন বৈজ্ঞানিককেই বহু বিষয় লইয়া ব্যাপৃত থাকিতে হয় না; শুধু নিজের নির্দিষ্ট বিষয় লইয়াই তিনি মগ্ন থাকিতে পারেন। যিনি পদার্থবিজ্ঞান অনুশীলন করেন, তিনি শুধু পদার্থবিজ্ঞানই অনুশীলন করেন, অধ্যাত্মবিজ্ঞান লইয়া তিনি তাঁহার শক্তি ব্যয় করেন না। এইভাবে শুধু এক নির্দিষ্ট বিষয়ে তাঁহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করাতে তিনি ঐ বিষয়টি অতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুশীলন করিবার সুযোগ পান; ফলে ঐ বিষয়ে বহু তথ্য আবিষ্কার করিয়া তিনি আমাদের জ্ঞানভাণ্ডার বর্দ্ধিত করিতে পারেন। কিন্তু দর্শনশাস্ত্রের পক্ষে এইরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ঘটনাপুঞ্জ অনুশীলন করা সম্ভব নহে। Darwin এবং Lamarck যেভাবে পোকামাকড় ও জীবজন্তু লইয়া গবেষণা করিয়াছেন, কোন দার্শনিক পণ্ডিতের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে; তাই তিনি ঘটনাপুঞ্জ (Details) পরিহার করিয়া শুধু সিদ্ধান্তগুলি লইয়া গবেষণা করেন। যেমন ধর, Darwin বহু জীবজন্তুর জন্ম ইতিহাস নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন যে প্রতিকূল পরিবেশের সহিত নিরন্তর সংগ্রাম করিতে হয় বলিয়া তাহাদের দেহাভ্যন্তরে নানারূপ প্রকারণের (modifications) সৃষ্টি হয়; এইসব প্রকারণের প্রভাবেই জন্তুগুলি ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইয়া বিভিন্নরূপ গ্রহণ করে; এইভাবেই বানর হইতে মানুষ বিবর্তিত হইয়াছে। ডারউইনের এই মূলতথ্যটি লইয়া

দার্শনিক পণ্ডিত তখন তাঁহার গবেষণা শুরু করেন; যেসব ঘটনাপুঞ্জের উপর ভিত্তি করিয়া Darwin তাঁহার এই তথ্যটি আবিষ্কার করিয়াছেন—সেসব বিষয়ে দার্শনিকের বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই। সেসব বিষয়ে Lamarck বা অন্যান্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত যাহা ভাল বিবেচনা করেন, বলুন; তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে যত খুসী তর্কাতর্কি করুন, তাহাতে দার্শনিকের কিছুই বলিবার নাই। তিনি শুধু অপেক্ষা করিয়া থাকেন কখন তাঁহাদের আলোচনা শেষ হইবে। এইসব প্রাথমিক আলোচনার ফলে তাঁহারা যে শেষ সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছেন, সেই শেষ সিদ্ধান্তই দর্শনের বিচার্য বিষয়, তাঁহাদের প্রাথমিক আলোচনা দর্শনের বিচার্য বিষয় নহে। সহজ কথায় বলা যায় যে, বিজ্ঞান যেখানে তাহার কাজ শেষ করেন, দর্শন সেখান হইতে তাহার কাজ আরম্ভ করেন।

(২) উহাদের দৃষ্টিবিন্দু

তাহা হইলে দেখা গেল যে বিজ্ঞানের ঘটনাপুঞ্জ লইয়া দর্শনশাস্ত্র আলোচনা করেন না; দর্শনশাস্ত্র আলোচনা করেন বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলি লইয়া। এই সিদ্ধান্তগুলি যে সর্বক্ষেত্রে একই রকমের নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। বিষয়বস্তুর বিভিন্নতার জন্য উহাদের সিদ্ধান্তও বিভিন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু যেক্ষেত্রে উহাদের বিষয়বস্তু বিভিন্ন নহে সেক্ষেত্রেও উহাদের সিদ্ধান্ত বিভিন্ন হইতে পারে। যেমন ধর, শব্দ; মনোবিজ্ঞান বলে, আমরা যে শব্দ শুনি তাহা সম্পূর্ণ মানসিক ব্যাপার; অতএব মনের দিক দিয়া উহাকে বিচার করিতে হইবে; তখন বুঝা যাইবে যে উহা মনের অবদান ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞান বলে যে মনের দিক দিয়া বিচার করিলে শব্দের কোন মূল কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না; উহার মূল কারণ নিহিত আছে বহির্জগতে; অতএব বহির্জগতেই উহার সন্ধান করিতে হইবে, অন্যত্র নহে; তখন স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে উহা বায়ুতরঙ্গ ব্যতীত আর কিছুই নহে। মোট কথা, প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই এক নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী আছে; সেই দৃষ্টিভঙ্গী হইতেই ইহা তাহার বিষয়বস্তু বিচার করিয়া থাকে, অন্য দৃষ্টিভঙ্গীতে কিরূপ দেখায়—তাহা সে বিচার করিতে যায় না। এইভাবে প্রত্যেক বিজ্ঞানই বিভিন্ন দৃষ্টিবিন্দু হইতে বিচার করে বলিয়া তাহাদের সিদ্ধান্তগুলিও বিভিন্ন হইয়া থাকে। ইহাতে সুবিধা যেমন আছে, তেমন অসুবিধাও আছে প্রচুর। সুবিধা এই যে, কোন এক বিজ্ঞানের পক্ষে একই সঙ্গে বিভিন্ন দিক হইতে বিচার করা সহজ নহে, সঙ্গতও নহে। কারণ, একই মুহূর্তে বিভিন্ন দিক হইতে বিচার করিতে গেলে বিষয়টি গভীরভাবে

অনুশীলন করা যায় না; উহাতে যে বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়, তাহা জ্ঞান আহরণের পক্ষে মোটেই অনুকূল অবস্থা নহে। আর, অসুবিধা এই যে—বিভিন্ন দিক হইতে চিন্তা না করিয়া সর্বদাই একই দৃষ্টিবিন্দু হইতে চিন্তা করিলে আলোচনার পরিধি নিতান্তই সংকীর্ণ হইয়া পড়ে। প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই এই অবস্থা ঘটিয়াছে; নিজস্ব দৃষ্টিবিন্দু ব্যতীত অন্য দৃষ্টিবিন্দু হইতে চিন্তা করা হয় না বলিয়া কোন বিজ্ঞানই তাহার বিষয়বস্তুর সামগ্রিক রূপটি উপলব্ধি করিতে পারে না, সংকীর্ণ দৃষ্টি হইতে উহার এক অসম্পূর্ণ রূপই শুধু উপলব্ধি করিতে পারে। সেইজন্য শিশিরকণার মধ্যে বিজ্ঞান শুধু Hydrogen এবং Oxygen-ই লক্ষ্য করে, ইহার মধ্যে যে অসীম সৌন্দর্য ও রহস্য লুক্কায়িত আছে—তাহার কোন সন্ধান পায় না। সেইরূপ মানবদেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া শারীর-বিজ্ঞান শুধু নার্ভ এবং স্নায়ু, পেশী এবং লিভার প্রভৃতির কথাই জানিতে পারে, প্রাণ-স্পন্দনের কোন সন্ধান পায় না।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিবিন্দুর এই প্রকার সংকীর্ণতা ও অসম্পূর্ণতা পরিহার করিবার একমাত্র উপায়—দার্শনিক দৃষ্টিবিন্দু। কোন এক বিজ্ঞানের কোন এক বিশিষ্ট সিদ্ধান্ত লইয়া দর্শনশাস্ত্র তৃপ্ত থাকিতে পারে না; অন্যান্য বিজ্ঞানের অন্যবিধ সিদ্ধান্তের সহিত তুলনামূলক বিচার করিতে হয়। এইভাবে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত তথা বিভিন্ন দৃষ্টিবিন্দুর সমন্বয় সাধন করিতে হয় বলিয়া দার্শনিক দৃষ্টিবিন্দু যে কিরূপ ব্যাপকতা লাভ করিতে পারে, তাহার একটি উদাহরণ দেওয়া যাউক। পদার্থ-বিজ্ঞান মতে জড়বস্তু মাত্রেরই স্থান-ব্যাপ্তি আছে এবং দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা আছে; ইহাই সমস্ত বিশ্বজগৎ পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে, বস্তুতঃ ইহা হইতেই বিশ্বচরাচর উদ্ভূত হইয়াছে। আবার মনোবিজ্ঞান মতে 'মন' বলিয়া এমন এক পদার্থ আছে যাহার মধ্যে কোন প্রকার জড় গুণ নাই; ইহার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা নাই, ইহা স্থানহীন ব্যাপ্তিহীন চৈতন্যময় পদার্থ। তখন স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে—এই মনোময় পদার্থের উদ্ভব হইল কেমন করিয়া? জড় পদার্থের সহিত ইহার কোনপ্রকার সাদৃশ্য নাই, অতএব জড় পদার্থ হইতে ইহার উদ্ভব হইতে পারে না। জড় পদার্থ হইতে জড় সদৃশ বস্তুই উৎপন্ন হইতে পারে, সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী "মনের" উৎপত্তি হইতে পারে না। এইভাবে জড়বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান পরস্পরের সহিত দ্বন্দ্ব করিয়া আমাদের এই বিশ্বজগৎকে দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ফেলিতেছে; প্রত্যেকেই কূপমণ্ডুকের ন্যায় নিজ নিজ ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে নিবদ্ধ রহিয়া যে সিদ্ধান্ত করিতেছে তাহার সহিত অপর সিদ্ধান্তের কোন সামঞ্জস্য নাই,,

বরং প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে। কিন্তু মানুষের মন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তৃপ্ত থাকিতে পারে না; দ্বিধাবিভক্ত হইয়া সর্বদাই বিরোধী চিন্তায় বিক্ষিপ্ত থাকা মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে। তাই প্রতিদ্বন্দ্বী সিদ্ধান্তগুলির সামঞ্জস্য সাধনপূর্বক এক বিরাট ঐক্য স্থাপনের জন্য তাহার মন চঞ্চল হইয়া ওঠে। ইহার জন্য দার্শনিক দৃষ্টিবিন্দুর প্রয়োজন। তাই দার্শনিক পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন যে, জড় ও চেতন পদার্থের মধ্যে কোন প্রকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকিতে পারে না; উহারা বিভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও উহাদের মধ্যে মূলতঃ কোন পার্থক্য নাই; উহারা একই ব্রহ্মের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। যে ব্রহ্ম চৈতন্য জড়ের মধ্যে প্রকটিত আছে, তাহাই আমাদের মনের মধ্যেও আত্মপ্রকাশ লাভ করিয়াছে। এইভাবে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলির সমন্বয় সাধনপূবক এক ব্যাপক ঐক্য স্থাপন করাই দর্শনশাস্ত্রের কাজ (Philosophy unifies the truths of the sciences into a consistent world view)। তখন আমরা কূপমণ্ডুকের ক্ষুদ্রত্ব পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞান সমুদ্রের অসীমত্ব উপলব্ধি করিতে পারি।

(৩) বিজ্ঞানের মূল-তত্ত্ব

বিজ্ঞান ও দর্শন—কেহই কাহাকে উপেক্ষা করিতে পারে না, উহারা উভয়েই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। বহুবিধ গবেষণা করিয়া বিজ্ঞান যে সকল সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌছে, সেই সকল সিদ্ধান্ত অনুশীলন করাই দর্শনশাস্ত্রের প্রধান কাজ; এই সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া এক বিরাট ঐক্যের সন্ধান করাই ইহার লক্ষ্য। এই সিদ্ধান্তগুলি যখন বিজ্ঞানেরই অবদান, তখন আমরা অনায়াসে বলিতে পারি যে বিজ্ঞানের দানেই দর্শন-শাস্ত্রের সমৃদ্ধি: এক কথায়, বিজ্ঞানের নিকট দর্শনশাস্ত্র ঋণী। সেইরূপ, বিজ্ঞানও আবার দর্শনশাস্ত্রের নিকট ঋণী, দর্শনশাস্ত্রের সাহায্য না পাইলে বিজ্ঞানের কাজ অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। কথাটি ভাল করিয়া বুঝান যাউক। প্রত্যেক বিজ্ঞানই কতকগুলি অবশ্য স্বীকার্য তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, যেমন স্থান, কাল ও কার্য-কারণ-তত্ত্ব। পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন-বিজ্ঞান, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান, শারীর-বিজ্ঞান প্রভৃতি প্রত্যেক বিজ্ঞানই মানিয়া লইয়াছে যে "স্থান" বলিয়া এক জিনিষ আছে; কারণ, স্থান না থাকিলে জড়পদার্থসমূহ অবস্থান করিবে কোথায়? ইহারা তো শূন্যে অবস্থান করিতে পারে না; আর শূন্যে অবস্থান করার মানেও স্থানে অবস্থান করা। অতএব বিজ্ঞানের পক্ষে স্থান এক অবশ্য স্বীকার্য তত্ত্ব (Postulate); ইহার সত্তা স্বীকার করিতেই হইবে, নতুবা

বিজ্ঞান অনুশীলন করা সম্ভব নহে। স্থানের ন্যায় কালও বিজ্ঞানের এক অবশ্য স্বীকার্য তত্ত্ব; শুধু জড়বস্তুই কালের মধ্যে বিদ্যমান থাকে, তাহা নহে; আমাদের মানসিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়াও কালের মধ্যে সংঘটিত হইয়া থাকে। কাল না থাকিলে জন্ম-মৃত্যু, ক্ষয়-বৃদ্ধি—কোন কিছুই সম্ভব নহে; পরিবর্তন, পরিবর্ধন, বিবর্তন—যাহাই হউক না কেন, সমস্তই কালের মধ্যে সংঘটিত হইয়া থাকে; কাল না থাকিলে পৃথিবীর গতি চিরতরে রুদ্ধ হইয়া যায়। তাই প্রত্যেক বিজ্ঞানই কালের অস্তিত্ব মানিয়া লইয়াছে, নতুবা কাহারো পক্ষে কোন ঘটনাই ব্যাখ্যা করা সম্ভব নহে। সেইরূপ, কার্য-কারণ-তত্ত্বও বিজ্ঞানের এক অবশ্য স্বীকার্য তত্ত্ব; প্রত্যেক বিজ্ঞানই বলে যে, পৃথিবীর কোন কার্য অকারণ ঘটিতে পারে না; কার্যমাত্রেরই এক বিশিষ্ট কারণ আছে। ইহা যদি স্বীকার না করা হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞানের কোন সার্থকতাই থাকে না। পূর্বেই বলিয়াছি, ঘটনাপুঞ্জ ব্যাখ্যা করাই বিজ্ঞানের কাজ; প্রত্যেক ঘটনার এক যথাযথ কারণ আবিষ্কার করিয়াই বিজ্ঞান তাহার এই কার্য সম্পাদন করে; কিন্তু কার্য-কারণ-তত্ত্বই যদি অস্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞানের আর করণীয় রহিল কি?

তাহা হইলে দেখা গেল যে, বিজ্ঞান-অনুশীলনের জন্য আমাদিগকে এই তথ্যগুলি স্বীকার করিয়া লইতেই হইবে. কিন্তু স্বীকার করিয়া লইলেই তো চলে না, ইহাদের সম্বন্ধে সম্যক আলোচনা করাও দরকার। যেমন, কেন আমরা ইহাদের অস্তিত্ব স্বীকার করিব? ইহাদের প্রমাণ কি? ইহারা সত্য, না মিথ্যা? ইহারা বাস্তব, না মানস? ইত্যাদি অনেক প্রশ্নই আমাদিগকে বিচার কবিতে হইবে কিন্তু এসব প্রশ্ন লইয়া বিজ্ঞান মোটেই মাথা ঘামায় না; বিজ্ঞান শুধু অন্ধের মতন ইহাদের কথা মানিয়া লয়। কিন্তু মানিয়া লওয়া তো কঠিন কাজ নহে, আসল কাজ ইহাদের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা এবং ইহাদের যথার্থতা প্রমাণ করা; দর্শনশাস্ত্র তাহাই করিয়াছে। এইখানেই দর্শনশাস্ত্রের সার্থকতা। যে মূলসূত্রগুলির উপর বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত, সেই মূল সূত্রগুলি লইয়া বিজ্ঞান কোন আলোচনা করে না, উহাদের কথা আলোচনা করিয়াছে দর্শনশাস্ত্র। এইভাবে সূত্রগুলি অনুশীলন করিয়া এবং উহাদের যথার্থতা প্রমাণ করিয়া দর্শনশাস্ত্র প্রকারান্তরে বিজ্ঞানেরই মূলভিত্তি সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। এক কথায়, বিজ্ঞানের জন্য বিজ্ঞান যাহা করে নাই, বিজ্ঞানের জন্য দর্শন তাহাই করিয়াছে। তাই আমরা বলিয়াছি যে শুধু দর্শনশাস্ত্রই বিজ্ঞানের নিকট ঋণী নহে, বিজ্ঞানও দর্শনশাস্ত্রের নিকট ঋণী।

(৪) দর্শনের অন্তর্দৃষ্টি

বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে আর একটি পার্থক্য বিশ্লেষণ করিয়া আমরা এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বজগৎ-ই বিজ্ঞানের একমাত্র আলোচ্য বিষয়; ইহার পশ্চাতে কোন অপ্রকট সত্তা আছে কি না—তাহা বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় নহে। কিন্তু দর্শনের মতে এই পরিদৃশ্যমান জগতের পশ্চাতেও এক অপ্রকট সত্তা আছে, তাহাকে আমরা পারমার্থিক সত্তা (Noumenon) বলিতে পারি; উহাই এই পরিদৃশ্যমান জগতের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ লাভ করিতেছে (Phenomenon)। অতএব এই বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে ইহার পারমার্থিক সত্তা সম্বন্ধেও আলোচনা করা দরকার; নতুবা আমাদের আলোচনা অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে। ইহাই দর্শনশাস্ত্রের বক্তব্য।

একটি উদাহরণ দিয়া কথাটি বুঝান যাউক। আমাদের মনের ভিতরে তাকাইলে আমরা কি দেখি? আমরা দেখি সেখানে সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ প্রভৃতি নানাপ্রকার ভাবের উদয় হইতেছে এবং ক্ষণপরে আবার বিলীন হইয়া যাইতেছে। কখন লোভ আসে, কখন কামনা আসে, আর কখন বা কল্পনা আসে। সিনেমার পর্দার উপর দৃশ্যের পর দৃশ্য যেমন পরিবর্তিত হইয়া চলিযাছে, আমাদের মনের পটেও সেইরূপ ক্রিয়ার পর ক্রিয়া পরিবর্তিত হইয়া চলিয়াছে। কিন্তু মন বলিতে এই বিভিন্ন ক্রিয়াগুলি ব্যতীত আর কিছুই বুঝি না কি? ক্রিয়াগুলি ছাড়াও মনের মধ্যে এমন কোন "অতিরিক্ত কিছু" নাই কি—যাহা নিজেকে এই ক্রিয়াগুলির কর্তা বলিয়া দাবী করে? তোমার নিজের মনের ভিতরে তাকাও, তাহা হইলেই এই প্রশ্নের উত্তর পাইবে; তুমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে যে এই সকল ক্রিয়া ব্যতীত তোমার এক নিজের স্বামিত্ব-বোধ বা কর্তৃত্ববোধ আছে; উহাই তোমার Ego বা অহং-বোধ। তোমার এই অহং বা আত্মাই বিভিন্ন মানসিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে। তাহা হইলে দেখা গেল যে মনকে সম্পূর্ণভাবে অনুশীলন করিতে হইলে কেবল ক্রিয়াগুলির কথা লইয়া আলোচনা করিলে চলে না, সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের কর্তার কথাও আলোচনা করিতে হয়। অতএব আমরা আশা করিতে পারি যে, বিজ্ঞান যখন মনের কথা আলোচনা করিবে তখন শুধু ক্রিয়া-প্রক্রিয়া আলোচনা করিয়াই তাহার কাজ শেষ করিবে না; এইসব ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার পশ্চাতে যে অহং বা আত্মা আছে, তাহার কথাও আলোচনা করিবে। অর্থাৎ চিন্তা, কল্পনা, কামনা প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া তো বিশ্লেষণ করিবেই, সঙ্গে সঙ্গে যে আত্মা এইসব ক্রিয়া প্রক্রিয়ার

মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ লাভ করিতেছে—তাহার কথাও অনুশীলন করিবে। আমার আত্মার সহিত তোমার আত্মার প্রভেদ কি—জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ কি—ইত্যাদি অনেক কথাই এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা দরকার। কিন্তু কোন বিজ্ঞানই তাহা করে না। ইহার দুইটি কারণ আছে। প্রথমতঃ কাজের সুবিধার দিকে তো লক্ষ্য রাখিতে হইবে; একই সঙ্গে আত্মা এবং তাহার ক্রিয়ার কথা আলোচনা করা দুরূহ ব্যাপার। আত্মা পারমার্থিক সত্তা; ইংরাজীতে ইহাকে Noumenon বলে; আর উহার ক্রিয়াগুলিকে ইংরাজীতে Phenomenon বলে। এই Phenomenon-এর মধ্য দিয়া আত্মা প্রকাশ লাভ করিতেছে বলিয়া Phenomenon-কে আমরা বাংলায় আবভাসিক সত্তা বলিতে পারি (অবভাস = প্রকাশ বা পরিস্ফুরণ)। বলা বহুল্য, একই সঙ্গে Noumenon এবং Phenomenon আলোচনা করা সহজ নহে; তাই কাজের সুবিধার জন্য বিজ্ঞান শুধু Phenomenon লইয়াই আলোচনা করে Noumenon সম্বন্ধে কোন কথা বলে না। তাই মনোবিজ্ঞানে আমরা চিন্তা, কামনা প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া অনুশীলন করি, উহাদের কর্তা বা আত্মার কথা আলোচনা করি না। ইহার আর এক কারণ আছে, অনেক বৈজ্ঞানিকের মতে আত্মা বলিয়া কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই, মনের মধ্যে যাহা দেখি সবই ক্রিয়া প্রক্রিয়া, কোথাও কোন আত্মার সন্ধান পাওয়া যায় না; অর্থাৎ তাহাদের মতে মনের মধ্যে কোন পারমার্থিক সত্তা (Noumenon) নাই, সবই আবভাসিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া মাত্র (Phenomenon); তাই তাঁহারা আত্মার আলোচনা পরিহার করিয়া শুধু মানসিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া অর্থাৎ Phenomenon লইয়া আলোচনা করিয়া থাকেন।

অধ্যাত্ম-জগৎ ছাড়িয়া এখন বিশ্বজগতের কথায় আসা যাউক। এখানেও দেখি সেই অবস্থা। বৈজ্ঞানিকগণ শুধু Phenomenon লইয়া আলোচনা করেন, অর্থাৎ এই প্রকাশমান বা আবভাসিক জগৎ-ই শুধু তাঁহাদের আলোচ্য বিষয়; ইহার পশ্চাতে কোন পারমার্থিক সত্তা (Noumenon) আছে কি না—তাহা তাঁহারা বিবেচনা করেন না। এইখানেই বিজ্ঞানের সহিত দর্শন-শাস্ত্রের প্রভেদ। দর্শনশাস্ত্র বলেন যে শুধু এই দৃশ্যমান জগৎ লইয়া তৃপ্ত থাকিলে চলিবে না, ইহার পশ্চাতে কোন অদৃশ্য সত্তা আছে কি না—তাহারও সন্ধান করিতে হইবে। দর্শনশাস্ত্রের মতে, এই বিশ্বজগতে যাহা কিছু আমরা দেখিতেছি—সবই সেই অপ্রকট সত্তার আত্মপ্রকাশ মাত্র। তাঁহার প্রতি নির্দেশ না করিয়া বিশ্বজগৎ ব্যাখ্যা করা আর আত্মার প্রতি নির্দেশ না করিয়া মানসিক

ক্রিয়া-প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা—একই কথা এইসব মানসিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মূলে যেমন আত্মা আছে, এই বিশ্বজগতের মূলেও তেমন এক পরমাত্মা আছেন; তিনিই এই বিশ্বজগতের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ লাভ করিতেছেন। অতএব এই পারমার্থিক সত্তার কথা বাদ দিয়া বিজ্ঞান যেভাবে এই বিশ্বজগতের কথা ব্যাখ্যা করে, তাহা দার্শনিকের দৃষ্টিতে নিতান্ত সংকীর্ণ ও অসম্পূর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পূর্বেই বলিয়াছি দার্শনিকের দৃষ্টি—ব্যাপক দৃষ্টি; ইহা জগৎকে খণ্ডিত করিয়া না দেখিয়া অখণ্ডরূপে প্রত্যক্ষ করিবার চেষ্টা করে, শুধু ইহার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করিয়াই দর্শনশাস্ত্র ক্ষান্ত হয় না, ইহার মর্মস্থল আবিষ্কার করিয়া ইহার সামগ্রিক সত্তা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করে। ইহার দৃষ্টি—অন্তর্দৃষ্টি।

Philosophy and Metaphysics

উপরে আমরা দুইপ্রকার সত্তার কথা উল্লেখ করিয়াছি—পারমার্থিক সত্তা এবং আবভাসিক সত্তা; এবং তৎপ্রসঙ্গে বলিয়াছি যে, বিজ্ঞান শুধু আবভাসিক সত্তা লইয়া আলোচনা করে। যে শাস্ত্র শুধু পারমার্থিক সত্তা লইয়া আলোচনা করে, তাহাকে **তত্ত্ব-বিজ্ঞান** বলে, ইংরাজী নাম Metaphysics। Meta মানে পশ্চাতে, Physics মানে ভৌত-জগৎ। এই পরিদৃশ্যমান ভৌত-জগতের পশ্চাতে যে অদৃশ্য অপ্রকট সত্তা বিদ্যমান আছে—তৎসম্বন্ধীয় আলোচনাকেই Metaphysics বলে। ইহার আর এক নাম Ontology, Onta মানে Reality বা মূলতত্ত্ব।* যেমন আত্মা; আমাদের সকল রকম মানসিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মূলে আছে এই আত্মা; এই আত্মা হইতেই আমাদের ভাবরাশি বা চিন্তারাশি উদ্গত হইয়া থাকে। সমস্ত মানসিক ক্রিয়ার পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন রহিয়া ইহা আবার সেই সব ক্রিয়া-

* Onta অর্থাৎ মূলতত্ত্ব। ইহাকে আমরা Noumenon নামে অভিহিত করিয়াছি; কারণ Noumenon মানে সেই তত্ত্ব যাহা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না—যাহা উপলব্ধি করিবার একমাত্র উপায় বুদ্ধি বা বিচার-শক্তি (Nous = Reason)। এই বুদ্ধি-গ্রাহ্য অতীন্দ্রিয় সত্তাকেই ONTA বলা হয়; বাংলায় আমরা পারমার্থিক সত্তা বলিয়াছি। এই পারমার্থিক সত্তার প্রকটিত জগৎকে আমরা আবভাসিক সত্তা (Phenomenon) নামে ব্যাখ্যা করিয়াছি, ইংরাজীতে ইহাকে Appearance নামেও অভিহিত করা হয়; Appearance—কারণ, ইহা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমাদের চেতনার মধ্যে প্রতিভাত হয়। এক কথায়, Appearance ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়, সেইজন্য ইহার মধ্যে মিথ্যা বা ভ্রান্তির সম্ভাবনা আছে, যেমন শংকরাচার্য বলেন যে জগৎ মিথ্যা, কিন্তু Reality (যেমন ব্রহ্ম) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, ইহা চিরন্তন সত্য, ইহার মধ্যে কোন মিথ্যা বা ভ্রান্তির সম্ভাবনা নাই।

প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়াই নিজেকে প্রকাশ করিতেছে। এই আত্মা বা জীবাত্মা ব্যতীত পরমাত্মাও আর এক মূল-তত্ত্ব; ইহাই সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মূল কারণ, ইহা হইতেই জগৎ সংসার উদ্ভূত হইয়াছে। "নয়ন ইহাকে পায় না দেখিতে", অথচ প্রত্যেকের নয়নে নয়নে ইহা বিরাজ করিতেছে; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন রহিয়া ইহা আবার সেই জগতের মধ্য দিয়াই নিজেকে প্রকটিত করিতেছে। এই সব অতীন্দ্রিয় মূলতত্ত্বের কথা যে শাস্ত্রে আলোচনা করা হয় তাহাকে **তত্ত্ব-বিজ্ঞান** বলে।

একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে বিজ্ঞান এবং তত্ত্ব-বিজ্ঞান—দুই-ই কিঞ্চিৎ অসম্পূর্ণ শাস্ত্র। প্রথমে তত্ত্ব-বিজ্ঞানের কথা লওয়া যাউক। তত্ত্ব-বিজ্ঞান শুধু জীবাত্মা ও পরমাত্মার ন্যায় মূলতত্ত্বের কথা আলোচনা করে। কিন্তু পরমাত্মা কি কখনও সৃষ্টি ছাড়া থাকিতে পারেন? সৃষ্টির মধ্যেই তাঁহার সত্তা, সৃষ্টির মাধ্যমেই তিনি আত্মপ্রকাশ লাভ করিতেছেন। কবি বলিয়াছেন "আমি নহিলে, ত্রিভুবনেশ্বর, তোমার প্রেম হত যে মিছে"। শুধু প্রেম নহে, তাঁহার জীবনই বৃথা হইয়া যাইত; সৃষ্টি না থাকিলে তিনি এক মহাশূন্যে পরিণত হইয়া যাইতেন। অতএব এই সৃষ্টি বাদ দিয়া তত্ত্ব বিজ্ঞান যে ঈশ্বরের রূপ কল্পনা করে, তাহা পূর্ণ ঈশ্বর নহে, শূন্য ঈশ্বর। সেইরূপ মানসিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া যে স্বতন্ত্র আত্মা কল্পনা কবা হয়—তাহাও পূর্ণ আত্মা নহে, শূন্য আত্মা। কারণ ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়াই আত্মা পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়; অতএব এই সব ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার কথা বাদ দিলে আত্মাব মধ্যে আব থাকে কি? তাই আমরা বলিয়াছি যে, তত্ত্ব-বিজ্ঞান যে পারমার্থিক সত্তার কথা চিন্তা করে, তাহা এক অসম্পূর্ণ সত্তা। আবার সাধারণ বিজ্ঞান যে আবভাসিক সত্তার কথা আলোচনা করে তাহাও এক অসম্পূর্ণ সত্তা। যেমন ধর, মনোবিজ্ঞান; ইহাতে শুধু মানসিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার বর্ণনা আছে; কিন্তু এইসব ক্রিয়ার মধ্য দিয়া যে কর্তা বা আত্মা প্রকাশলাভ করিতেছে, তাহার প্রতি কোন নির্দেশ নাই। সেইরূপ ভৌত-বিজ্ঞানে আমরা শুধু চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্রের বিবরণ পাই, কিন্তু এই সূর্যচন্দ্রের মধ্য দিয়া যিনি আত্মপ্রকাশ লাভ করিতেছেন—সেই পরমাত্মার কোন নির্দেশ পাই না। উপমার ভাষায় বলা যায় যে, বিজ্ঞান যখন নদীর কথা আলোচনা করে তখন শুধু ইহার দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বিস্তৃতি লইয়া আলোচনা করে, কিন্তু ইহার যে মূল উৎস—সেই প্রস্রবণের প্রতি কোন নির্দেশ করে না। তাই তত্ত্ব-বিজ্ঞানের ন্যায় সাধারণ

বিজ্ঞানের ব্যাখ্যাও অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। তত্ত্ব-বিজ্ঞানে মূলতত্ত্ব বা পারমার্থিক সত্তার আলোচনা আছে কিন্তু উহার প্রকটিত রূপের কোন বিবরণ নাই; আর বিজ্ঞানে শুধু উহার প্রকটিত রূপ বা অবভাসের বিবরণ আছে; কিন্তু উহার পারমার্থিক সত্তার কোন আলোচনা নাই। তাই উভয় ব্যাখ্যাই অসম্পূর্ণ।

সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা পাই যে শাস্ত্রে তাহারই নাম দর্শনশাস্ত্র বা Philosophy। এক্ষেত্রে পারমার্থিক সত্তা ও আবভাসিক সত্তা—উভয়েরই গুরুত্ব স্বীকার করা হয়; দর্শনশাস্ত্র মতে, অবভাস ব্যতীত পরমসত্তা থাকিতে পারে না, আবার পরমসত্তা ব্যতীত অবভাসেরও কোন অর্থ হয় না। পরমসত্তা থাকিলেই বুঝিতে হইবে উহার প্রকাশ আছে, আর প্রকাশ থাকিলেই বুঝিতে হইবে উহার মূলে কোন অপ্রকট সত্তা বিদ্যমান আছে—যাহা উহারই মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করিতেছে। এইভাবে পারমার্থিক তত্ত্ব ও আবভাসিক সত্তার সমন্বয় সাধন করে বলিয়াই দর্শনশাস্ত্রের ব্যাখ্যাকে আমরা পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা বলিয়া গ্রহণ করি। তবে এখানে একটু সাবধান করিয়া দেওয়া দরকার। দর্শনশাস্ত্রে পারমার্থিক তত্ত্ব এবং আবভাসিক সত্তা—উভয়েরই গুরুত্ব স্বীকার করা হয় বটে, তবুও এখানে পারমার্থিক তত্ত্ব লইয়াই অধিকতর আলোচনা করা হয়, উহার অবভাসের প্রতি তত লক্ষ্য করা হয় না। ইহার কারণ আছে; আবভাসিক সত্তার কথা বিজ্ঞানে সবিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে; দর্শনশাস্ত্র আর অধিক কি বলিবে? তাই ইহার কথা না বলিয়া পারমার্থিক সত্তার কথাই দর্শনশাস্ত্র বিশেষভাবে আলোচনা করে। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে বলিতে হইবে যে বিজ্ঞান অপেক্ষা তত্ত্ব-বিজ্ঞানের সহিতই দর্শনশাস্ত্রের সাদৃশ্য অধিক। সেইজন্য দর্শনশাস্ত্রকে অনেকে তত্ত্ব-বিজ্ঞান বা Metaphysics নামেও অভিহিত করেন। ইহাতে বিশেষ কোন অসঙ্গতি নাই; তবে মনে রাখিতে হইবে যে Philosophy এবং Metaphysics ঠিক একই জিনিষ নহে; ইহাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে—তাহাই উপরে ব্যাখ্যা করা হইল।

Philosophy and Epistemology

যে কোন কাজ করিবার আগেই আমাদের বিচার করা উচিত যে ঐ কাজ করিবার পক্ষে আমাদের যথোপযুক্ত শক্তি আছে কি না। দার্শনিক আলোচনা সহজ কাজ নহে, কঠিন কাজ। এক্ষেত্রে আমরা শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় লইয়া আলোচনা করি না; অতীন্দ্রিয় বিষয়ের কথাও চিন্তা করি। বস্তুতঃ আত্মা, পরমাত্মা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ই দর্শনশাস্ত্রের মুখ্য আলোচ্য বিষয়। অতএব

আমাদের প্রথমেই প্রশ্ন করা উচিত, এই সব ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় আলোচনা করিবার পক্ষে আমাদের যথাযথ শক্তি আছে কি না। যে বিচার বুদ্ধির সাহায্যে আমরা সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্রের কথা জানিতে পারি, সেই বিচার বুদ্ধির সাহায্যে আত্মা পরমাত্মার কথাও জানা সম্ভব কিনা—তাহাই প্রথমে আলোচনা করা দরকার। যে ডুবুরী সমুদ্রতলে রত্ন সন্ধান করিতে যায়, সে প্রথমেই দেখিয়া লয় যে সমুদ্রের তলদেশে যাইবার পক্ষে তাহার যথাযথ সরঞ্জাম আছে কি না, নতুবা সে বিপদে পড়িতে পারে। সেইরূপ যাঁহারা অধ্যাত্ম আলোচনায় মগ্ন হইতে চান, তাঁহাদেরও প্রথমে দেখা দরকার যে অধ্যাত্ম-জ্ঞান লাভ করিবার পক্ষে তাঁহাদের যথাযথ শক্তি আছে কি না, নতুবা তাহাদের সিদ্ধান্ত নানাদোষে দুষ্ট হইতে পারে। অতএব প্রথমেই আমাদিগকে এই জ্ঞান-শক্তির কথা আলোচনা করিতে হইবে। ইহাকে জ্ঞান-তত্ত্ব (Epistemology) বলে। কিভাবে আমাদের জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, কি পদ্ধতিতে আমরা জ্ঞান আহরণ করি, আমাদের জ্ঞানের সীমারেখা কতদূর, অর্থাৎ আমাদের পক্ষে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় অতিক্রম করিয়া অতীন্দ্রিয় বিষয় উপলব্ধি করা মোটেই সম্ভব কি না, ইত্যাদি জ্ঞান সম্বন্ধীয় তত্ত্ব যে শাস্ত্রে আলোচনা করা হয়, তাহারই নাম জ্ঞান-তত্ত্ব বা Epistemology।

এইদিক দিয়া বিবেচনা করিলে জ্ঞান-তত্ত্বকে আমরা দর্শন-শাস্ত্রের মূলভিত্তি বলিয়া বর্ণনা করিতে পারি। সেইজন্য দেখি, জ্ঞান-তত্ত্ব প্রসঙ্গে আমরা যেরূপ মতবাদ গ্রহণ করি আমাদের দার্শনিক সিদ্ধান্তও ঠিক তদনুরূপ হইয়া থাকে। যেমন, ধর, হিউম মনে করেন যে, ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতাই আমাদের জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়; ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম করিয়া ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। যিনি জ্ঞান-তত্ত্ব প্রসঙ্গে এইরূপ মতবাদ গ্রহণ করেন, তাঁহার পক্ষে আত্মা বা পরমাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করা সম্ভব নহে। সেইজন্য দেখি হিউমের দর্শনশাস্ত্রে আত্মা বা পরমাত্মার কোন স্থান নাই; তাঁহার নিকট সবই আবভাসিক, পারমার্থিক সত্তায় তিনি বিশ্বাস করেন না। আবার, হেগেল বলেন যে, ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতাই জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায় নহে; বুদ্ধি বা বিচার-শক্তিরও প্রয়োজন; এই ধীশক্তির প্রভাবে আমরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু অতিক্রম করিয়া অতীন্দ্রিয় বস্তুর কথা চিন্তা করিতে পারি। যিনি জ্ঞান-তত্ত্ব প্রসঙ্গে এইরূপ মতবাদ গ্রহণ করেন, তাঁহার দর্শনশাস্ত্রে পারমার্থিক সত্তার স্থান না হইয়া পারে না। সেইজন্য দেখি, হেগেল শুধু ব্রহ্মের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, তাহা নহে, তাঁহার মতানুসারে জগতে যাহা কিছু আছে সবই ব্রহ্মময়। তাহা হইলে দেখা

গেল যে, জ্ঞান-তত্ত্ব অনুসরণ করিয়াই আমরা দর্শনশাস্ত্র অনুশীলন করি; জ্ঞান-তত্ত্বের উপরেই দর্শনশাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত।

[সেইজন্য দেখি, প্রত্যেক গ্রন্থকারই জ্ঞান-তত্ত্ব দিয়া তাঁহাদের পুস্তক আরম্ভ করেন। প্রথমে জ্ঞান-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন, তারপরে জড়-তত্ত্ব, প্রাণ-তত্ত্ব, অধ্যাত্ম তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া ভগবৎ-তত্ত্বে শেষ করেন। জ্ঞান-তত্ত্বে আরম্ভ, আর ভগবৎ-তত্ত্বে শেষ। এই পুস্তকে আমরা ইহার ঠিক বিপরীত পন্থা অবলম্বন করিয়াছি; ভগবৎ-তত্ত্ব দিয়া আরম্ভ করিয়া জ্ঞান-তত্ত্বে শেষ করিয়াছি। ইহার কারণ আছে। জ্ঞান-তত্ত্ব একটু জটিল; দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে যদি কোন অংশ থাকে যাহাকে একটু শুষ্ক বলা যাইতে পারে, তবে তাহা এই জ্ঞান-তত্ত্ব; নতুবা অন্যান্য তত্ত্ব সত্যই খুব চিত্তাকর্ষক। যেমন ধর, ভগবৎ-তত্ত্ব; ঈশ্বর আছেন কি না, মানুষের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ কি, সংসারে পাপ ও অন্যায়ের জন্য তিনি দায়ী কি না, ইত্যাদি বিষয় জানিবার জন্য কাহার না আগ্রহ হয়? সেইরূপ অধ্যাত্ম-তত্ত্ব; আত্মার সহিত দেহের সম্বন্ধ কি, দেহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও মৃত্যু হয় কি না—ইত্যাদি জানিবার জন্য কে না ইচ্ছা করে? তারপরে, প্রাণতত্ত্ব ও জড়তত্ত্ব; প্রথম প্রাণীর উদ্ভব হইল কেমন করিয়া, প্রাণী হইতে প্রাণ আসিয়াছে, না, জড় হইতে প্রাণ আসিয়াছে; জড়ের মধ্যে চেতনা আছে কি না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইল কি করিয়া—ইত্যাদি বিষয় জানিবার জন্য কাহার না ঔৎসুক্য হয়? এইসব বিষয়ের তুলনায় জ্ঞান-তত্ত্বের বিষয়গুলি যে তেমন চিত্তাকর্ষক নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। জ্ঞানের উৎপত্তি হয় কেমন করিয়া, জ্ঞানের সীমারেখা কতদূর, ইত্যাদি বিষয় জানিবার জন্য সাধারণ লোকের বিশেষ কোন আগ্রহ নাই। সেইজন্য জ্ঞান-তত্ত্ব আলোচনা অনেকের নিকটেই খুব শুষ্ক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অথচ এই শুষ্ক আলোচনা লইয়াই সাধারণতঃ দর্শনশাস্ত্রের গ্রন্থ আরম্ভ হয়; ফলে অনভিজ্ঞ পাঠকের মনে প্রথমেই ভীতির উদ্রেক হয়। জ্ঞান-তত্ত্ব আলোচনার মধ্যে হাবুডুবু খাইতে খাইতে তাহারা মনে করিয়া বসে যে Metaphysics বুঝি আগাগোড়াই খুব শুষ্ক ও নীরস বিষয়, ইহার মধ্যে কোথাও কোন রস নাই। এই সম্ভাবনা পরিহার করিবার উদ্দেশ্যে আমরা জ্ঞান-তত্ত্ব দিয়া আরম্ভ না করিয়া ভগবৎ-তত্ত্ব দিয়া পুস্তক আরম্ভ করিয়াছি। চিত্তাকর্ষক বিষয় সমূহ আলোচনা করিতে করিতে তাহারা যখন দর্শনশাস্ত্রের পদ্ধতি ও বিষয়বস্তুর সহিত কিঞ্চিৎ পরিচিতি লাভ করিবে, তখন জ্ঞান-তত্ত্ব অনুশীলন করা তাহাদের পক্ষে আর বিশেষ অপ্রীতিকর হইবে না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।]

সমাপ্তি

এখন দর্শনশাস্ত্রের সংজ্ঞার্থ (Definition) নির্দেশ করিয়া এই পুস্তক সমাপ্ত করা হইবে। অন্যান্য পুস্তকে প্রথমেই এই সংজ্ঞার্থ দেওয়া হয়, তারপরে বিষয়বস্তুর আলোচনা করা হয়। ইহাই সঙ্গত পন্থা; কিন্তু কোন এক বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া আমরা ইহার বিপরীত পন্থা অবলম্বন করিয়াছি; অর্থাৎ সংজ্ঞার্থ না দিয়াই আমরা বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করিয়াছি। কারণ, আমাদের বিশ্বাস যে, ইহার বিষয়বস্তু এবং আলোচনা পদ্ধতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইলেই দর্শনশাস্ত্রের সংজ্ঞার্থ উপলব্ধি করা সহজ হইবে। অতএব ঐ প্রসঙ্গে আমরা পূর্বে যাহা বলিয়াছি তাহাই সংক্ষিপ্ত করিয়া দর্শনশাস্ত্রের বৈশিষ্ট্য তথা সংজ্ঞার্থ রূপে নির্দেশ করা যাইতে পারে।

(১) প্রথমতঃ, দর্শনশাস্ত্রের মুখ্য বিষয়—ভগবৎ-তত্ত্ব, অধ্যাত্ম-তত্ত্ব, প্রাণ-তত্ত্ব এবং জড়-তত্ত্ব। তবে বিজ্ঞান যেভাবে তাহার বিষয়বস্তু আলোচনা করে, দর্শনশাস্ত্র সেভাবে তাহার বিষয়বস্তু আলোচনা করে না; বিজ্ঞান লক্ষ্য করে ইহার বাহিরের রূপ, ইহার আবভাসিক সত্তা, আর দর্শনশাস্ত্র লক্ষ্য করে ইহার অন্তরেব রূপ, ইহার পারমার্থিক সত্তা। দৃশ্যমান জগতের পশ্চাতে যে মূল-তত্ত্ব আছে, তাহার সন্ধান করাই দর্শনশাস্ত্রের কাজ, ইহার জন্য অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন। (২) দ্বিতীয়তঃ, বিজ্ঞান যেভাবে তাহার নিজস্ব সংকীর্ণ দৃষ্টি হইতে জগৎসত্তাকে খণ্ডিত করিয়া জ্ঞানলাভ করে, দর্শনশাস্ত্র সেভাবে জ্ঞান আহরণ করে না। যিনি মূল-তত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছেন, তিনি খণ্ডের দিকে লক্ষ্য করিবেন কেন? পরমসত্তার সন্ধানী আলোকে যাঁহার নিকট সমস্ত জগৎ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, জগতের সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে যিনি এক মহান ঐক্যের সুর উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন—তাঁহার নিকট জগৎ আর খণ্ডিতরূপে প্রতিভাত হয় না; অখণ্ড সত্য অখণ্ডরূপেই তাঁহার মনে প্রতিফলিত হয়। (৩) তৃতীয়তঃ, দর্শনশাস্ত্র এই পরম সত্যকে শুধু সত্যরূপেই উপলব্ধি করে না; ইহাকে সত্য, শিব এবং সুন্দরের প্রতীক বলিয়া উপলব্ধি করে। ইহাই মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ; এই আদর্শ অনুযায়ী মানুষ তাহার জীবনকে সুন্দর ও মধুর করিয়া তুলিবে, এবং এই আদর্শ অনুসরণ করিয়া মানুষ তাহার জীবনকে মহৎ ও উন্নত করিতে পারিবে—ইহাই দর্শনশাস্ত্রের শেষ বক্তব্য।

দর্শনশাস্ত্রের ইংরাজী নাম Philosophy। এই ইংরাজী নামের একটু ইতিহাস আছে। সক্রেটিসের পূর্বে গ্রীসে যাঁহারা দর্শনশাস্ত্র আলোচনা

করিতেন তাঁহারা নিজদিগকে Sophists বা জ্ঞানী বলিয়া বর্ণনা করিতেন। সক্রেটিস নিজেকে জ্ঞানী বলিয়া বর্ণনা করিতে সংকোচ বোধ করিতেন ; তাই তিনি নিজেকে জ্ঞানানুরাগী (Philosopher) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন ; ইহা হইতেই Philosophy শব্দের উদ্ভব। ইহার মধ্যে মূলতঃ দুইটি শব্দ আছে, যথা Philos = Love, এবং Sophia = Knowledge ; অতএব Philosophy শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ Love of Knowledge, বাংলায় বলা যায় জ্ঞানানুরাগ। বলা বাহুল্য ; যেখানে অনুরাগ আছে সেখানে আকাঙ্ক্ষা বা পিপাসা না থাকিয়া পারে না। অতএব আমরা যদি বলি যে জ্ঞানের জন্য মানুষের মনে যে সহজাত আকাঙ্ক্ষা বা পিপাসা আছে, উহা হইতেই দর্শনশাস্ত্রের উৎপত্তি (Origin) হইয়াছে, তাহা হইলে বিশেষ কিছু ভুল হয় না।

প্লেটোর মতানুসারে, এই জ্ঞান-পিপাসার মূলে আছে মানুষের অদম্য ঔৎসুক্য এবং আগ্রহ (Curiosity)। পশুপক্ষী যাহা দেখে বা শোনে তাহাতেই তৃপ্ত থাকে ; অজ্ঞাত বিষয় সম্বন্ধে জানিবার জন্য তাহাদের কোন ঔৎসুক্য নাই। কিন্তু মানুষের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে ; এক অদম্য ঔৎসুক্য তাহাকে নিরন্তর অস্থির ও চঞ্চল করিয়া রাখিয়াছে, জ্ঞাত বিষয়ের উপর নির্ভর করিয়া অজ্ঞাত (হয়ত বা অজ্ঞেয়) বিষয় সম্বন্ধে তাহার জানিবার আগ্রহ অপরিসীম। ইহা তাহাকে কিছুতেই তৃপ্ত থাকিতে দেয় না। সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র পরিব্যাপ্ত এই পৃথিবীর উদ্ভব হইল কেমন করিয়া, কখন্ ইহার উদ্ভব হইল, আর কখন্ই বা ইহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে—সব কিছুই মানুষ স্পষ্টভাবে জানিতে চায়। এই বিশ্বসৃষ্টির মূলে ভগবান বলিয়া কোন জিনিস আছে কি না, এবং থাকিলে তাঁহার স্বরূপ কি ; মানুষের মধ্যে আত্মা আছে কি না, এবং যদি থাকে তবে সেই আত্মা সত্যই অমর কি না, ইত্যাদি প্রত্যেক বিষয়ই জানিবার জন্য মানুষের মনে অদম্য আগ্রহ বিদ্যমান। বিষয়বস্তু যতই জটিল ও দুরূহ হউক না কেন, সে কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইতে চাহে না। জন্মের পূর্বে আমরা কোথায় ছিলাম এবং মৃত্যুর পরেই বা আমাদের কি অবস্থা হইবে—জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ কি—ইত্যাদি সকল রহস্যই উদ্ঘাটন করিবার জন্য আমরা ব্যগ্র। এক কথায়, জানিবার ঔৎসুক্য, অর্থাৎ আমাদের জ্ঞান-পিপাসার কোন সীমা নাই। এই জ্ঞান পিপাসা হইতেই জ্যোতির্বিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যা প্রভৃতি যাবতীয় শাস্ত্রের উৎপত্তি ; এবং সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ বিদ্যা যে Philosophy—উহারও উৎপত্তি-মূলে আছে জ্ঞান-পিপাসা। এই জ্ঞান-পিপাসায় অনুপ্রাণিত হইয়া সত্য

সন্ধান করাই দর্শনশাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য, এবং ইহাই Philosophy নামের বুৎপত্তিগত অর্থ।

পূর্বেই বলিয়াছি জ্ঞানের জন্য এই অদম্য ঔৎসুক্য এবং আগ্রহ আমাদিগকে কিছুতেই তৃপ্ত থাকিতে দেয় না। যাহা জানি না, তাহা জানিবার জন্য চঞ্চল হইয়া তো পড়িই; এমন কি যাহা জানি, তৎ সম্বন্ধেও আমাদের অস্থিরতার শেষ নাই। যাহা জানি তাহা কি আমরা ঠিক ভাবেই জানি? আমাদের সিদ্ধান্তের মধ্যে কোন ভুল নাই তো? আমি যাহা ঠিক মনে করি, অন্য সকলেও কি ঠিক তাহাই মনে করে? এইরকম নানাপ্রকার প্রশ্ন আমাদের মনের মধ্যে উদিত হইয়া আমাদিগকে অস্থির করিয়া তোলে। একটি সামান্য উদাহরণ দেওয়া যাউক। আমি উপরের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম আকাশে রামধনু উঠিয়াছে। কিন্তু সত্যই কি "আকাশে" রামধনু দেখিতেছি? কারণ একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে আমি যাহা দেখিতেছি তাহা সংবেদন মাত্র: কিন্তু সংবেদন তো বাহিরের জিনিষ নহে, মনের জিনিষ; মনেব মধ্যেই ইহা বিরাজ করে। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে আকাশে কোন রামধনু নাই; রামধনু আছে আমার মনে। আর যদি মনের মধ্যেই ইহার অস্তিত্ব থাকে, তবে বাহিরে যাহা দেখিতেছি তাহা কি জিনিষ? উহার সহিত আমার মানস ছবির কি কোনই সাদৃশ্য নাই? ইত্যাদি নানারকম প্রশ্ন আসিয়া আমাদিগকে সংশয়াকুল করিয়া তোলে। বলা বাহুল্য, এই প্রকার প্রশ্ন করা এবং ক্রমাগত সন্দেহ করা মনের পক্ষে খুবই অস্বস্তিকর বটে, কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে এইপ্রকার প্রশ্ন ও সন্দেহের উদ্রেক না হইলে জ্ঞানেরও উদ্রেক হওয়া সম্ভব নহে। যাহার কোন সন্দেহ নাই, তাহার কোন সমস্যাও নাই; এবং যাহার সমস্যা নাই, সমস্যা-সমাধানের কোন প্রয়োজনও তাহার নাই; এক কথায় জ্ঞান লাভের কোন প্রয়োজনীয়তাই সে অনুভব করে না, তাহার মনে জ্ঞান-স্পৃহা নাই। কিন্তু যেখানে সন্দেহ আছে, সেখানেই বুঝিতে হইবে জ্ঞানের জন্য স্পৃহা আছে; নতুবা আমরা সন্দেহ করিব কেন? তাই ডেকার্ট (Descarts) বলেন যে, দার্শনিক জ্ঞানের মূলে আছে সন্দেহ। তাঁহার মতানুসারে, কোন জিনিষই নিঃসন্দেহ চিত্তে মানিয়া লওয়া উচিত নহে; প্রশ্ন কর, সন্দেহ কর—তারপরে যাচাই করিয়া সত্য নির্ধারণ কর। ইহা ঠিক, তবে মনে রাখিতে হইবে যে শুধু সন্দেহের জন্যই সন্দেহ করার

কোন অর্থ হয় না; সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহ-নিরসনের চেষ্টাও করা উচিত। ডেকার্ট ঠিক তাহাই করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে সবই সন্দেহ করিতে শুরু করিলেন। প্রত্যেক পদার্থেরই অস্তিত্ব সম্বন্ধে তিনি সংশয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সন্দেহ করিয়াই তাঁহার কাজ শেষ হইল না। সন্দেহ করিতে করিতে তিনি অবশেষে এক মহাসত্যের সন্ধান পাইলেন। তিনি বলিলেন "Cogito ergo sum" = I doubt, therefore, I exist। আমি রামধনুর অস্তিত্বে সন্দেহ করিতে পারি বটে, কিন্তু যে আমি সন্দেহ করিতেছি তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না; নতুবা কে সন্দেহ করিতেছে? যে সন্দেহ করে তাহারই যদি অস্তিত্ব না থাকে, তবে সন্দেহ করার কোন অর্থই হয় না।

সমাপ্ত

প্রশ্নোত্তরমালা

প্রথম অধ্যায়

1. What are the different kinds of evil ? How do you account for them if you are to believe in God ? (P. 6—8)

দ্বিতীয় অধ্যায়

1. State the different grounds of your belief in God.

তৃতীয় অধ্যায়

1. Explain the doctrine of Panentheism. How does it differ from Deism and Pantheism ? (P. 29—31)

2. What do you understand by "immanence" and "transcendence" of God ? How can the two ideas be reconciled ? (P. 27—30)

চতুর্থ অধ্যায়

1. Explain the relation of God to man. (P. 33—36)

2. Explain the nature of Divine Consciousness. (P. 39—41)

3. Is belief in human freedom reconciliable with the belief in an omniscient & omnipotent God ? (P. 35—37)

4. Do God and the Absolute mean two different principles ? (P. 43—45)

পঞ্চম অধ্যায়

1. Examine the following theories of mind-body relation. Interactionism, Occacionalism and Parallelism. (P. 48, 50, 52)

2. Is mind a by-product of matter ? Discuss (P. 55)

ষষ্ঠ অধ্যায়

1. State and examine the Empirical (Hume's Sceptical) theory of the Self. (P. 64—66)

2. State the principal meanings of the term "Self".

সপ্তম অধ্যায়

1. Explain Determinism (P. 76), Indeterminism and self-determinism. (P. 83)

2. State and explain the different arguments for and against the theory of Determinism. (P. 77—81)

3. What are your grounds for the belief in immortality of the human soul ?

অষ্টম অধ্যায়

1. What is the fundamental difference between animal mind and human mind ? (P. 94) ? Has the latter been evolved out of the former ? (P. 94 & 96 & 98)

নবম অধ্যায়

1. Distinguish between a machine and a living organism. (P. 105—107)

2. Can life be explained mechanically or should any hypothesis of vital force be postulated ? (P. 107—109)

3. What is the origin of life ? Does life come out of non-living matter ? (P. 110—112)

দশম অধ্যায় এবং একাদশ অধ্যায়

1. What is Evolution as Distinguished from creation ? Explain your reasons for believing in Evolution. (P. 117—119)

2. What is meant by mechanical & teleological interpretation of Evolution ? (P. 97-98 ; 129-130)

3. What is a Final cause ? Distinguish in this connection between external & internal teleology. (P. 131—134)

4. Discuss the difference between Emergent Evolution and Creative Evolution. (P 133 & 137—138)

5. Criticise Lamarck's theory of acquired modification and Darwin's Theory of chance or Spontaneous variation. (P 126—128)

দ্বাদশ অধ্যায়

1. Distinguish between the atomic and electronic theories of matter. (P. 141—144)

2. Explain—"Dematerialisation of matter" (P. 146) Is there any ultimate distinction between matter & Energy ? (P. 147)

3. Can matter, life and mind be regarded as stages in the natural process of Evolution ? (P. 149)

ত্রয়োদশ অধ্যায় এবং চতুর্দশ অধ্যায়

1. Distinguish between (a) absolute and relative, (b) perceptual and conceptual space. (P 155 & 158)

2. "Space and Time are a priori categories"—Explain. (P. 161 & 171)

3. Would you consider space and time to be real and objective? Explain Hegel's view of the question. (P. 163 & 173)

পঞ্চদশ অধ্যায়

1. Critically explain the pluralistic world views. (P. 177—180)

2. Explain the distinction between abstract and concrete monism. Which of them is more satisfactory and why? (P. 183–186)

ষোড়শ অধ্যায়

1. Distinguish between fact-judgment and value-judgment. (189–190)

2. "Values are subjectively conditioned objective realities" —Explain. (P. 193—194)

সপ্তদশ অধ্যায়

1. "A judgment that works in practice is true". Do you agree? (P. 206—208)

2. Criticise the correspondence theory of truth (P 203—205) or Explain the coherence theory of truth (P 211—213)

অষ্টাদশ অধ্যায়

1. "There is nothing in the intellect which was not previously in the senses" (Locke). Do you agree? (P 221—223)

2. Explain "knowledge is rationalised experience" (P 224—226)

3 "Whatever is real is rational, and whatever is rational is real," (P 227—229)

ঊনবিংশ অধ্যায়

1. Explain the importance of critical method in Philosophy. (P 235—237)

2. Explain the dialectic method. What is meant by saying that thought moves in a triadic fashion? (P 238–240).

3. Discuss the adequacy of Intuitionism as a philosophical method. (P 245—247)

বিংশ অধ্যায়

1. Explain Locke's theory of Representationalism (252—254)

2. Explain how Locke's Representationalism prepares the way for Berkeley's Idealism. (P 255—257)

3 Explain the difference between Transcendental Idealism objective Idealism of Hegel (P. 262—263)

একবিংশ অধ্যায়

1. Explain the notion of Substance. (P 267—268), and show wherein Hume erred in this respect (P 270—271)

2. Analyse the notion of cause and show how it is related to the idea of "power."

3. How does causal judgment arise in the mind ? Is causation of law of thought, or of things, or of both ?

দ্বাবিংশ অধ্যায়

1. Discuss the scope of Philosophy and distinguish it from Epistemology.

2. How is Philosophy related to the Sciences ? Is Philosophy "the sum total of scienctific knowledge" ?

3. What is the origin of philosophy ? What is its utility ?